উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

সম্পাদনা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শ

শঙ্কর প্রকাশন ॥ ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৫
প্রকাশক : নিতাই মজুমদার, শঙ্কর প্রকাশন,
১৫।১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬
মুদ্রক : শ্রীগৌর মজুমদার
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
গ্রন্থণ : শঙ্কর বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ১৫।১এ,
যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় একবার "প্রবাসী"তে একটি গল্প পড়েছিলুম। পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা। নাম ঠিক মনে নেই। বোধ হয় "অর্থমনর্থম্"? গল্পটি আমার বড় ভালো লেগেছিল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সেই প্রথম চোখে পড়ে। তখন আমি জানতুম না কে তিনি ও কোথায় থাকেন। পরবর্তী বয়সে যখন পাটনা কলেজে পড়ি তখন ভাগলপুরের সহপাঠী কৃপানাথ মিশ্র আমাকে উপেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতাদের পরিচয় শোনায়।

একদিন কৃপানাথের কাছেই শুনি উপেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে "বিচিত্রা" নামে একটি বিরাট ও বিচিত্র মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে যাচ্ছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে লিখছেন। কৃপানাথের পরামর্শে আমি আমার একটি রচনা "বিচিত্রা" সম্পাদকের দরবারে পাঠাই। যতদূর মনে পড়ে কৃপানাথেরই মারফত। উপেনবাবু বোধ হয় তখনো ভাগলপুর থেকে বিদায় নেননি। আমার প্রবন্ধটি সাদরে গ্রহণ করেন ও পরের মাসেই প্রকাশ করেন। আমার দেওয়া নাম বদলে দিয়ে নামকরণ করেন "রক্তকরবীর তিনজন।"

তার পর আমার বন্ধু কৃপানাথ আমাকে চিঠি লেখে, সম্পাদক বলেছেন আরো রচনা পাঠাতে। আমি তার উত্তরে লিখি, আমি তো বিলেত যাচ্ছি। বিলেত সম্বন্ধে আমার ইম্প্রেসন লিখতে পারি। কৃপানাথ আমাকে জানায় যে আমার প্রস্তাব মঞ্জুর।

সম্পাদকের সঙ্গে তখনো আমার সাক্ষাৎকার বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটেনি। ঘটতে পারত যদি কলকাতা হয়ে বোম্বে যেতুম। কিন্তু সেবার হঠাৎ বন্যায় রেলপথ ভেঙে যায়। কটক থেকে কলকাতা যেতে হলে বেজওয়াডা হায়দরাবাদ মানমাদ ঘুরে যেতে হয়। আমার তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কটক থেকে যেদিন মাদ্রাজ মেলে উঠতে যাব সেদিন আমার কটক কলেজের বন্ধু প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় এসে বলেন যে তাঁর বৌদিদি নির্মলা দেবীও সেই ট্রেনে যাচ্ছেন, তিনি যাবেন কলকাতা, আমি যেন একটু দেখি শুনি।

কে কাকে দেখে শোনে! আমি নির্মলাদিকে না নির্মলাদি আমাকে! অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘ রেলপথে বোম্বে ও দীর্ঘতর জলপথে বিলেত যাচ্ছি। ঘোল ভিন্ন আর কোনো পথ্য নেই। তারই এক বোতল আমার সঙ্গে। যাত্রা শুরু হলো মাঝরাত্রে। দেখলুম নির্মলাদিও খুব উদ্বিগ্ন। কলকাতার আত্মীয়দের জন্যে। পথে আমরা কথা যদি কয়ে থাকি তো সাহিত্য সম্বন্ধে নয়। কেই বা জানত যে আমি একজন সাহিত্যিক। "বিচিত্রা" সম্বন্ধেও নয়। কেমন করে জানব যে নির্মলাদি হলেন উপেন্দ্রনাথের আত্মীয়া!

বোম্বের যাত্রী আমি, কলকাতার যাত্রী তিনি, মানমাদে আমরা বিভিন্ন ট্রেন ধরি। তার পর বোম্বেতে বসে প্রথম কিস্তি লিখি আমার "পথে প্রবাসে"র। জাহাজে ওঠার আগেই ডাকে দিই। এমনি করে "বিচিত্রা"র সঙ্গে দু'বছরের ধারাবাহিক সম্পর্ক আরম্ভ হয়।

দু'বছর পরে যখন দেশে ফিরি উপেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তখন তিনি কলকাতায়। তাঁর বাড়ীতেই আবার দিদির সঙ্গে দেখা। এইসব আকস্মিক যোগাযোগের দরুন উপেনবাবুর মনে ছাপ থেকে যায় যে তাঁর পত্রিকায় "পথে প্রবাসে" প্রকাশিত হওয়ার মূলে ছিলেন নির্মলা দেবী। সেটা ঠিক নয়। মূলে ছিল কৃপানাথ। সেও তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। তা হলেও বলা যেতে পারে যে আমার প্রতি উপেনবাবুর যে অপরিসীম স্নেহ পরবর্তীকালে অনুভব করেছি তা কেবল সাহিত্যিক কারণে নয়। অলক্ষ্যে অন্য কারণও ছিল। "পথে প্রবাসে"র না হোক, পথের ও প্রবাসের গোড়ায় তো দিদি।

"পথে প্রবাসে" যখন শেষ হয়ে গেল উপেন্দ্রনাথ বললেন আমাকে উপন্যাস লিখতে। উপন্যাস লিখব আমি! কখনো তো লিখিনি। পারব কি লিখতে? তিনি আমাকে অভয় তো দিলেনই, এমন কথা বললেন যা একটি নতুন লেখকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। তার পর আমাকে একখানি চিঠি লিখে উপন্যাস লেখার কৌশলও শিখিয়ে দিলেন। বলতে গেলে তাঁরই কাছে আমার উপন্যাস রচনার হাতেখড়ি। "সত্যাসত্য" তাঁরই আগ্রহে "বিচিত্রা"য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে মাঝ পথে থেমে যায় আমারই দোষে। আমিই নিয়মিত কপি যোগাতে পারিনে। সরকারী কাজের চাপে অস্থির। সেই একই কারণে "বিচিত্রা"র সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হতে হতে ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুদিন পরে "বিচিত্রা"ও বন্ধ হয়ে যায়।

আগে ও পরে কত বার দেখা হয়েছে। নিজের জীবনের কথা বলেছেন। নিকট আত্মীয়ের মতো। উৎসাহের কোনো দিন কমতি দেখিনি। সঙ্গতি থাকলে আবার "বিচিত্রা" বার করতেন। আমাকেও টেনে নামাতেন। "গল্পভারতী"র সম্পাদনভার পেয়ে লিখেছিলেন "বিচিত্রা"র দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চান। আমরাও যেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে "বিচিত্রা"র দিনগুলিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আমিও তাঁর মতো আপনার সম্পাদক আর পাইনি। আমি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি এর মূলে "বিচিত্রা" ও তার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ। আমার কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। পূরণ করতে পারিনি। সম্পাদক হিসাবে রামানন্দবাবুর পরেই তাঁর স্থান। লেখক তৈরি করে নেওয়ার রহস্য তিনি জানতেন। নইলে আমাকে দিয়ে উপন্যাস লেখানোর খেয়াল আর কার মাথায় আসত।

তাঁর স্নেহের ঋণ কি শোধ করতে পারব কোনো দিন!

সাহিত্য-স্রষ্টা
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পথের পাঁচালীতে পিসিমার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ইন্দিরঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্তপুরের ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পিসিমা নিঃসন্তান, বাংলাদেশের বাল্য-বিধবা; ভাইয়ের সংসারে থাকেন—সাধারণ পল্লী-বাংলার একটি রমণীচরিত্র নয়—ইন্দিরঠাকরুণকে ঘিরিয়া সমগ্র পল্লীবঙ্গের সংস্কৃতি জড়াইয়া আছে। তাই পথের পাঁচালীতে পিসিমার মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। তাঁহার মৃত্যুতে ইতিহাসের একটি অধ্যায় স্খলিত।

রবীন্দ্রযুগের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে যোগাযোগ তিনি বহন করিয়া চলিতেছিলেন—অকস্মাৎ তাহার ধারাটি রুদ্ধ হইয়া গেল। উপেন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া প্রাচীন ও নবীনের যে মিলনসূত্র—সেটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার বেদনা সামগ্রিক। উপেন্দ্র বিয়োগ তাই শুধু পারিবারিক শোক নয়, নয় শুধু তাঁহার প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা পাঠক-পাঠিকার বিরহ-ব্যথা—তাঁহার বিহনে বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাসের একটি সমন্বয়ের প্রবাহ আজ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বিচিত্রা যুগ হইতে বর্তমানকালের গল্প-ভারতীর যুগকে একটি মিলন-রাখীতে বাঁধিয়াছিলেন। প্রবীণ হইতে নবীন সাহিত্যিকের যে বিচিত্র মেলা তাহার মধ্যমণি ছিলেন উপেন্দ্রনাথ।

বৈঠকী আসরে, সভা-সমিতিতে, লেখায়, কথায়, বলায়, গানে, সুরে সর্বদাই তিনি আপন ব্যক্তিত্বের সহিত সমগ্রকে টানিয়া লইতেন।

বর্তমান যুগে যে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠি সঙ্কীর্ণতা—বোধ করি উপেন্দ্রনাথই সেক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষ ছিলেন, যিনি ইহার ব্যতিক্রম।

লেখক উপেন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রধানতঃ এই একই সুর। বিগতদিনের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং কাহিনীর সঙ্গে এ-যুগীয় মনোভাবের সমন্বয় করিয়াছেন উপেন্দ্রনাথ। চমক্ অপেক্ষা বিরাটত্বের আদর্শকেই তিনি লেখায় এবং রেখায় পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। "স্মৃতিকথায়" যে সব বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—'বিগত দিনে' তাহার সহিত বর্তমানের সুর প্রোজ্জ্বল। আর "শেষ-বৈঠকে" পরিপূর্ণ বর্তমানকে তিনি স্মৃতি-সৌরভে শুধু সুরভিত করেন নাই—পুরাতনের সঙ্গে নবীনকে মিশাইয়াছেন একই খাদে। গানের সুরে খেয়ালের সঙ্গে যেমন টপ্পার মিশ্রণ—তাঁহার ইদানিং কালের সাহিত্যেও তাহারই সুর-কাকলী। পূর্বসূরীদের সহিত বর্তমানের এমন অভিন্ন যোগাযোগ বাংলাদেশে আর কোথাও দেখা যায় নাই।

সূচীপত্র

উৎসর্গ-পত্র

অভিজ্ঞান

প্রতিষ্ঠান্বিত কথা-সাহিত্যিক

কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

করকমলে উপহার

দিলাম

বৈতানিক

বাঙলা ভাষার সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক

আবাল্য সুহৃদ

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে

এই বই উৎসর্গ ক'রলাম

স্মৃতিকথা : ১ম পর্ব

সোদরোপম বৈবাহিক

শ্রীমান সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তাঁর জন্মদিনে উপহার

অভিজ্ঞান

এক

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রেল ষ্টেশনের প্রায় দশ মাইল উত্তরে কাঁসাই নদীর অপর পারে পীরনগর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এ অঞ্চলের জমিদার রায় চৌধুরীদের দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার চতুর্দিকে বাগান পুষ্করিণী, দক্ষিণদিকে বারখণ্ড, তার পশ্চিম দিকে বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ; সদর দেউড়ির দুই দিকে পাইক বরকন্দাজদের মহল। বহির্বাটির সুবৃহৎ তোরণের উপর পাকা নহবৎখানা। দেখলে বেশ বোঝা যায়, জমিদাররা যখন গ্রামে বাস করতেন বিশেষ সমারোহের সহিতই করতেন। কলিকাতায় বাড়ি নির্মাণ হওয়ার পর থেকে বিশ পঁচিশ বৎসর গ্রামের বসবাস প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। নিতান্ত ক্রিয়াকর্ম কিংবা আদায়-পত্রের সময়ে বর্তমান বারো-আনী সরিক জহরলাল রায় চৌধুরী গ্রামের বাটিতে পদার্পণ করেন—কিন্তু সে মাত্র দু-দশ দিনের জন্য। গৃহিণী মমতাময়ী সপুত্র-কন্যা কোনোবার সঙ্গে আসেন, কোনো-বার আসেন না। পীরনগরে দশ দিনের বাস কলিকাতার দশ দিনের আয়ু হরণ করে ব'লে তাঁর মনের বিশ্বাস। পীরনগরের ম্যালেরিয়া-দূষিত খোলা হাওয়া কলিকাতার জলের কলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাভব স্বীকার করেছে।

এবারকার দেশে আসা জহরলালের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষ্যে ঘটেছিল। মমতাময়ীর একান্ত ইচ্ছা ছিল কলিকাতার ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, মোটোর কার, কলের জল ইত্যাদির মধ্যে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করেন, কিন্তু জহরলাল তাঁর গ্রামবাসী জ্ঞাতি কুটুম্ব এমন কি নায়েব গোমস্তা প্রজামণ্ডলীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া, দেশের বাড়ির সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁর নিজ বিবাহের যে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আনন্দের নিশ্চিন্ত-অলস মূর্তি স্মরণ ক'রে পুত্রের বিবাহ-উৎসব কলিকাতার দশ কাঠার উপর অবস্থিত বাড়ির মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় নিঃশেষিত করবার কল্পনা তাঁর নিজের কাছেও ভালো লাগে নি। যেখানে কাজের কল চালাতেই সকলে দিবারাত্র ব্যস্ত, সেখানে উৎসবের বাঁশি বাজায়ই বা কে, আর শোনেই বা কে? পীরনগরের বাড়ি থেকে বিবাহের কথায় মমতাময়ী সম্মত হয়েছিলেন এই শর্তে যে, পীরনগরের উৎসব শেষ হবার পর কলিকাতার গৃহে আগমন ক'রে যথোপযুক্ত ভাবে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বধূ পিত্রালয়ে যাবে; তার আগে নয়। সন্ধির প্রলোভনে জহরলাল পত্নীর এই শর্তে সম্মতি দিয়েছিলেন।

বিবাহের পর কয়েকদিন ধ'রে অবিশ্রান্ত যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক, বায়োস্কোপ, আতসবাজি ইত্যাদি চলেছে। ভোজের তো কথাই নেই, চার পাঁচ দিন গ্রামবাসীদের গৃহে হাঁড়ি চড়ে নি। দূর-দেশ থেকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া, পাইক বরকন্দাজদের ছুটোছুটি চাকর চাকরাণীদের হাঁক-ডাক, আমলা প্রজাদের বিধি-ব্যবস্থা—সমস্ত মিলে গ্রামটা যেন আনন্দের যজ্ঞশালায় পরিণত হয়েছে। মানভূম থেকে একজন জমিদার দুটি হাতী নিয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন, বিদায় কালে একটিকে রেখে গেছেন, কাজের বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতের যাওয়া-আসার ব্যাপারে যদি কোনো কাজে লাগে। সেই হাতী জমিদার বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে বড় একটা বটগাছের তলায় শিকল দিয়ে বাঁধা; সর্বক্ষণ তার চতুর্দিকে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে আছে, আর সে মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তার ছোট ছোট চোখের নিরুৎসুক দৃষ্টি তাদের উপর ফেলে সমস্ত দিন একমনে অবিশ্রাম ডালপালা চিবিয়ে চলেছে। উৎসবের উপকরণ-তালিকায় এই হাতীটির স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়, বিশেষতঃ সকাল বিকেলে মাহুতের প্ররোচনায় সে যখন নানাবিধ কৌশল কসরৎ দেখায়।

উৎসব আনন্দ হয়তো আরো কয়েকদিন এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে। দু-তিন ঘণ্টার আগু-পিছু পাশাপাশি দু' বাড়িতে একেবারে দু'জনে ঐ রোগে আক্রান্ত হ'ল, এবং মৃত্যুও হ'ল তাদের অল্পক্ষণের মধ্যে দু-তিন ঘণ্টারই আগু-পিছু। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা নিবিড় আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল,—উৎসবের স্রোতে ভাঁটা দেখা দিলে।

একবাড়ি লোক নিয়ে এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত, জহরলাল তাই মনে মনে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যার পর যখন খবর পাওয়া গেল যে, দু-চার বার ভেদবমির পরই একঘণ্টার মধ্যে কেদার চাটুয্যের নাড়ী ব'সে গেছে, তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, অন্দরে এসে কথাটা মমতাময়ীকে জানালেন।

মমতাময়ী জহরলালের কথা শুনে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, "সকাল থেকে এই কথা শুনে তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত রয়েছ? তখনই বলেছিলাম এমন বিদেশে বিভুঁয়ে কাজকর্ম কোরো না,—শুনলে না তো! গরিবের কথা বাসি হ'লে তবে মিষ্টি লাগে। এখন চল, আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যাক!"

জহরলাল মৃদু হেসে বললেন, "তোমার মতো গরিবের কথা বাসি না হ'লেও মিষ্টি লাগে।—কিন্তু তা ব'লেও আজ রাত্রে বেরিয়ে পড়া যায় না।"

"কেন যায় না? গাড়ি তো রাত দুটোয়, এখন তো সবে সন্ধ্যে। সাত ঘণ্টায় পাঁচ কোশ রাস্তা যাওয়া যায় না?"

জহরলাল মাথা নেড়ে বললেন, "পাঁচ কোশ নয় মমো, পঁচিশ কোশ। মধ্যে কাঁসাই নদী আছে সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। লোকে কথায় বলে একা নদী বিশ কোশ। তা ছাড়া, পাল্কী বেয়ারাদের খবর দেওয়া নেই।"

"খবর দেওয়া নেই তা জানি।—খবর দাও।"

"খবর দিলেই কি এত রাত্রে তারা যেতে রাজি হবে ?"

দৃপ্তস্বরে মমতাময়ী বললেন, "তা যদি না হয় তা হ'লে কিসের জমিদার তুমি ?"

জহরলালের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল ; মমতাময়ীর কলিকাতা-প্রীতিকে ঈষৎ আঘাত দেবার অভিপ্রায়ে বললেন, "কলকাতায় থাকলে কি আর জমিদার আগেকার মতো কেউটে সাপ থাকে ?—ঢোঁড়া সাপ হ'য়ে যায়। তার না থাকে বিষ, না থাকে চক্কোর।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার নায়েবকে ডেকে হুকুম দাও,—সে তো আর কলকাতায় থাকে না।"

জহরলালের মুখে আবার হাসি দেখা দিল ; বললেন, "শুধু নায়েবকে হুকুম দিলেই হবে না, সময়ের স্রোতকে এই সাতটার সময়ে আটকে ফেলবার জন্যে বিধাতাপুরুষকেও হুকুম দিতে হবে। সাত ঘণ্টা থেকে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা খরচ হলেও ঝাড়গ্রামে গিয়ে ট্রেন ফেল ক'রে বারো ঘণ্টা ব'সে থাকতে হবে। তা'তে যদি রাজি থাক তো চলো, আপত্তি নেই। কিন্তু বেশি রাত্রে ষ্টেশনের পথ একেবারে নিরাপদ নয়, মাঝে মাঝে রাহাজানির কথা শোনা যাচ্ছে।"

এই শেষোক্ত কারণটাই মমতাময়ীর মনে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল হ'ল। একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "আচ্ছা তা হ'লে কাল সকালে যাতে আমরা বেলা সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারি তার ব্যবস্থা এখন থেকে কর। কাল আর রাত্রের গাড়ি নয়, কাল বিকালের গাড়িতে যাওয়া ঠিক রইল।"

জহরলাল বললেন, "ব্যবস্থা করবার দিক থেকে ধরলে আজ রাত্রে যাওয়া আর কাল সকালে যাওয়ার বিরুদ্ধে একই রকম আপত্তি দাঁড়ায়। সকালে গিয়ে আর দরকার নেই—কাল সকালে উঠে যাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলে বিকেলের দিকে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে পড়লেই হবে।" তারপর উৎকর্ণ হয়ে কী শোনবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "কে কাঁদে না! তবে এর মধ্যেই কেদার খুড়োর শেষ হ'য়ে গেল না-কি ?"

আশঙ্কাটা যে অমূলক নয় তা একটু পরেই সঠিক জানা গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আবার নূতন ক'রে আতঙ্কের একটা ঘন ছায়া বিস্তার করলে। যাওয়ার ব্যবস্থার কথা পরদিন প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা না ক'রে অবিলম্বে আরম্ভ হ'য়ে গেল। শুভদিন দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে, পরদিন বৈকালের গাড়িতে রওনা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় পৌঁছে গৃহ-প্রবেশের সময়টা জ্যোতিষের মতে অত্যন্ত অশুভ সময় পড়ে—শুভ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হ'লে রাত্রি একটার পূর্বে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না ; কিন্তু রাত্রের গাড়িতে রওনা হ'লে তার পরদিন সকালে গৃহ-প্রবেশের সময়ে একেবারে অমৃত যোগ।

বহুদিন থেকে বহুবার যারা কলিকাতার বাড়িতে যাতায়াত করছে তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে অশুভক্ষণে প্রবেশ করলে তাকে যে গৃহদেবতা কখনই ক্ষমা করবেন না, তদ্বিষয়ে মমতাময়ীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সুতরাং স্থির হ'ল, পরদিন সকালে মমতাময়ী তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাদের নিয়ে কলিকাতা রওনা হবেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে পুত্র এবং পুত্রবধূকে গৃহে বরণ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকবেন; বৈকালে জহরলাল, প্রিয়লাল এবং নববধূ সন্ধ্যা রওনা হবে। পাঁচখানা পাল্কী, আটখানা গোরুর গাড়ি এবং কয়েকটা ডুলির ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। তা ছাড়া, হাতী তো আছেই। সমাগত আত্মীয় কুটুম্বগণকেও পরদিনই নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করবার ভার নায়েবের উপর পড়ল।

রাত্রি তখন এগারোটা। সন্ধ্যা প্রিয়লালের ঘরে পালঙ্কের উপর শুয়ে ছিল, প্রিয়লাল নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যার পাশে ব'সে তার একখানা হাত নিজ হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

পদশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের আগমন বুঝতে পেরেছিল, প্রিয়লাল হাত ধরতে সে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বসল, হাতখানা কিন্তু প্রিয়লালের অধিকারেই রয়ে গেল।

প্রিয়লাল একটু অবনত হ'য়ে ভাল ক'রে সন্ধ্যার মুখখানা দেখবার চেষ্টা ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা একবার মুহূর্তের জন্য প্রিয়লালের প্রতি চকিত দৃষ্টি স্থাপন ক'রে পুনরায় মুখ নত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললে, "কী" ?

ঈষৎ হাসিমুখে প্রিয়লাল বললে, "কি জানি কী। কী মনে হয় জানো সন্ধ্যা ? মনে হয় তুমি উষা তো নওই, সন্ধ্যাও নও,—তুমি গভীর রজনী। সত্যি, এ কয়েকদিনে তোমাকে একটুও বুঝতে পারলাম না। পাঁচজনের মধ্যে দেখলে বোধ হয় চিনতেও পারিনে। আচ্ছা, চাও তো একবার ভালো করে আমার দিকে।" প্রিয়লাল সযত্নে সন্ধ্যার মুখখানি ধ'রে নিজের দিকে ফিরিয়ে দেখলে।

সে মুখে সন্ধ্যার মতোই অনির্বচনীয় স্তিমিত শোভা। এই সুন্দর মুখের জোরেই এত বড় জমিদার গৃহে তার প্রবেশ। সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা, মুখখানি মনের মধ্যে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু তোমার জন্যে আরও একটা সহজ উপায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" পকেট থেকে একটা আংটি বের ক'রে বললে, "এটা প্ল্যাটিনমের আংটি। এটা চোখের কাছে আলোর বিরুদ্ধে ধরলে এর মধ্যে একজনের সন্ধান পাবে। তাতে খুসি হবে কি-না তা অবশ্য বলতে পারিনে।" ব'লে সন্ধ্যার আঙুলে প্রিয়লাল আংটিটি পরিয়ে দিলে।

সন্ধ্যা আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে চোখের নিকট আলোর বিরুদ্ধে

ধ'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সহসা এক সময়ে আরক্ত হ'য়ে উঠল। তারপর সযত্নে সেটি আবার ধীরে ধীরে আঙুলে পরে নিলে।

"খুসি হয়েছ?"

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা শুধু প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। প্রিয়লাল দেখলে সে দৃষ্টির মধ্যে খুসি মূর্তি ধারণ ক'রে হাসছে।

"সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার আঙুলে অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে?"

"আছে।"

"আমিও তোমার আঙুলে সেই রকম অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিলাম।—কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলে যাব না সন্ধ্যা, এ নিশ্চয় জেনো।"

সন্ধ্যা তার ভীতিকাতর দৃষ্টি প্রিয়লালের প্রতি স্থাপিত ক'রে বললে, "তবুও ও-সব কথা বলতে নেই।"

"আমাদের মধ্যে তো কোনো দুর্বাসা মুনিরই শাপ নেই সন্ধ্যা—তবে তোমার অত ভয় কেন?" বলে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

দুই

পরদিন প্রাতে প্রিয়লালের যখন ঘুম ভাঙল তখন ছ'টা বাজে। নববধূর সহিত প্রেমালাপের মত্ততায় অনেকখানি রাত্রিই জাগরণে কেটে গিয়েছিল, সুতরাং যে সময়ে সে সাধারণতঃ শয্যা পরিত্যাগ করে আজ তার চেয়ে কতকটা বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছে। নিদ্রাভঙ্গের পর সন্ধ্যা কখন উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে, টের পায় নি। তার ব্যবহৃত শয্যাংশের কুঞ্চনে দেহভারের ছাপ মুদ্রিত, বালিসে সুগন্ধী তৈলের মৃদু সৌরভ, মাথার একগাছা ছিন্ন চুল দু-তিন পাকে কুঞ্চিত হ'য়ে বাতাসে অল্প-অল্প নড়ছে। সুন্দরী কিশোরী পত্নীর এই চিহ্নগুলি প্রিয়লালের মনে একটি সুমধুর আনন্দের বিলাস জাগিয়ে তুললে। মনে প'ড়ে গেল গত রজনীর কাব্য-জীবন-যাপনের কথা,—দুটি মিলনপ্রয়াসী হৃদয়ের সে কী অধীরোন্মত্ত ব্যাকুলতা, অথচ তারই মধ্যে সঙ্কোচের সে কী সুমিষ্ট অনতিক্রমণীয় বাধা! প্রিয়লাল ক্ষণকাল নিশ্চল ভাবে সেই বিগত সম্ভোগের তরল চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বসে পাশের জানলাটা খুলে দিল।

শ্রাবণ মাস। কিছু পূর্বে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তার প্রমাণ তরু লতা গুল্মে তখনো বর্তমান। গৃহ-প্রাঙ্গণের পরেই সুবৃহৎ ফলের বাগান, তার পরে বিস্তৃত মাঠ, মাঠ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা শড়ক ঝাড়গ্রামের দিকে, মাঠের শেষে শালবনের অনির্বচনীয় শোভা। প্রিয়লাল এ-সকল কিছুই দেখলে না। দৃষ্টি তার একেবারে মেঘলিপ্ত মলিন আকাশের উপর প'ড়ে সমস্ত মন সহসা এক অজ্ঞাত অনির্ণেয় ঔদাস্যে ঘুলিয়ে উঠল। গতরাত্রির সমুজ্জ্বল চিত্রের সকল রঙগুলি যেন একমুহূর্তে সেই বর্ষাদিনের মলিনতার মধ্যে সমাধি লাভ করলে। মনে হ'ল এ যেন শুধু সেই দিনটিরই নয়, তার জীবনেরও এক নূতন অঙ্কের সূচনা, যার সঙ্গে তার পূর্ব জীবনের কোনো মিল নেই।

বিরক্তিভরে জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় রেলিংএর ধারে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলে নিচে প্রবলভাবে কর্মের স্রোত চলেছে—বাঁধাবাঁধি, কষাকষি, হাঁক-ডাকের অন্ত নেই—সুনির্মম ভাঙনের উপদ্রবে সংসারের জমাট অস্তিত্বটি একেবারে খ'সে পড়েছে—সুটকেস, হোল্ড-অল, ট্রাঙ্ক, বাক্স, বিছানা—সংসারের যাবতীয় দ্রব্য—নিরুপায় নিশ্চিন্ততায় চট্ এবং দড়ির কবলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে বুঝলে এই ঐকান্তিক কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে একমাত্র তারই এ-পর্যন্ত কোনো যোগ নেই, কিছুক্ষণ আগেও পরম নির্ভাবনায় সে তার সুখনীড়ের মধ্যে নিদ্রিত ছিল। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে অগ্রসর হ'তেই সিঁড়ির মুখে দেখা হ'ল সুধারাণীর সঙ্গে।

সুধারাণী পাঁচ-পয়সা সরিকদের মেজবউ—সম্পর্কে প্রিয়লালের বউদিদি। তার স্বামী জামসেদপুরে বড় চাকরী করে। বিবাহোপলক্ষ্যে সে পীরনগরে এসেছে এবং জহরলালের গৃহেই বাস করছে। শিক্ষিতা ব'লে সুধারাণীর খ্যাতি এবং অভিমান আছে, তার উপর সে সুরসিকা। প্রিয়লালকে দেখে মৃদু হেসে বললে, "কী ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙল? সন্ধ্যার খাতিরে তুমি যে উষার মুখদর্শন করবে না ব'লে পণ করেছ!"

সুধারাণীর রহস্যের অর্থ উপলব্ধি করে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "প্রেমে যে একনিষ্ঠ সে তো সন্ধ্যার খাতিরে উষা উপস্থিত হ'লে চোখ বুজে থাকবেই বউদিদি। কিন্তু আমার এ সুনাম সকলেরই কাছে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, না একা তুমিই জানতে পেরেছ?"

সুধারাণী সহাস্যমুখে বললে, "তোমাদের দিকে যাদের চোখ-কান খোলা আছে তাদের কারুরই জানতে বাকি নেই।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "সর্বনাশ! আমাদের দিকে চোখ-কান খোলা তো দেখতে পাই বাড়ির বারো-আনা লোকের! কিন্তু কি করি বল বউদি,—সন্ধ্যা যদি তাঁর প্রভাব রাত বারোটা পর্যন্ত বিস্তার করেন তা হ'লে ভোর পাঁচটায় কী ক'রে উষাকে স্বীকার করা যায়?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুধারাণী বললে, "রাত বারোটা কী রকম? রাত দুটো বল!"

কপট বিরক্তির সহিত প্রিয়লাল বললে, "সে গুণও তা হ'লে আছে দেখচি তোমার! আড়িপাতা হয়েছিল?—ছি, ছি, বউদিদি, তুমি সহরের শিক্ষিত মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে এসে তোমার নৈতিক অবনতি ঘটেচে। স্বামী-স্ত্রীর ঘরে তুমি আড়ি পাতো?"

সুধারাণী আরক্তমুখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বললে, "স্বামী-স্ত্রী কী রকম? বিয়ের আটদিন পর্যন্ত তো বর-কনে। তারপর একটা ঘরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে পিছন ফিরে বললে, "শীগ্‌গির নীচে যাও ঠাকুরপো, মেজকাকিমা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

নিচে এসে মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "মা, তুমি আমাকে ডাকছিলে?"

মমতাময়ী বললেন, "ওমা, ডাকব না? আর কি সময় আছে? আমাদের তো বেরিয়ে পড়লেই হয়। তুমি যত শীঘ্র পার তয়ের হয়ে নিয়ে চা-টা খেয়ে বাইরে যাও। কর্তা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,—কোথায় তোমাকে কী মামলা নিষ্পত্তি করতে যেতে হবে।"

প্রিয়লালচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "মামলা নিষ্পত্তি আবার কী মা?"

মমতাময়ী বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বললেন, "কে জানে বাপু! যত হাঙ্গামা উনি বাধাতে পারেন! কোথায় প্রজায়-প্রজায় কী বিবাদ বেধেছে—তা এই পালাই-পালাই গোলযোগের মধ্যেও নিষ্পত্তি ক'রে যেতে হবে। তাও আবার নিজে করবেন না, তোমাকে দিয়ে করাবেন!"

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "সে তো ভালো কথাই, মা, বাবা আমাকে উপযুক্ত পুত্র ব'লে মনে করেন তাই আমাকে মামলা নিষ্পত্তি করতে পাঠাচ্ছেন। তুমি আমাকে উপযুক্ত মনে কর না, তাই কোথাও পাঠাতে চাও না।"

পিছনে পিছনে সুধারাণী এসে কখন নিকটে দাঁড়িয়েছিল। হাসতে হাসতে বললে, "এ তোমার অন্যায় কথা ঠাকুরপো,—মেজকাকিমা বলেই তোমাকে উপযুক্ত মনে করে তো সেদিন বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সেকথা ভুলে গেলে নাকি?"

নিকটে যারা উপস্থিত ছিল সুধারাণীর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল। মমতাময়ী প্রসন্নস্মিতমুখে বললেন, "আমার উকিলের মুখ থেকে উত্তর শুনলে তো?—এখন যাও, তাড়াতাড়ি তয়ের হয়ে নাও।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বললে, "তোমার উকিল নয়, মা—মোক্তার! এ উত্তর উকিলের মুখ থেকে বেরোয় না।"

পুনরায় একটা হাসির কলরব উঠল।

কিছুক্ষণ পরে প্রিয়লাল বহির্বাটীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখলে বৈঠকখানার বারান্দায় টেবিল চেয়ারে ব'সে জহরলাল খাতাপত্র পরিদর্শন করছেন, পাশে একটা বড় তক্তপোষের উপর ব'সে কয়েক ব্যক্তি নীরবে অপেক্ষা করছে।

প্রিয়লাল উপস্থিত হ'তেই তারা সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করলে।

বিবাদ তাদেরই মধ্যে। বিবাদের বস্তু অকিঞ্চিৎকর—দশ বারো কাঠা জমি মাত্র। কিন্তু উভয়পক্ষ প্রবল, এবং সামান্য জমির টুকরা উভয়ের বসত বাটীর মধ্যস্থলে পড়ায় বিবাদের প্রাবল্য বিবাদী বস্তুর মূল্যকে অপরিমিত ভাবে অতিক্রম ক'রে গেছে। ইতিমধ্যেই দু-তিন নম্বর ফৌজদারী হ'য়ে গেছে, পুনরায় একটা খুব জমকালো ভাবে হবার উপক্রম করছিল, এমন সময়ে জমিদার-পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হওয়ায় আপাতত স্থগিত আছে। বিবাদী জমির পূর্ববর্তী প্রজা গ্রাম ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর উভয় পক্ষই এক একটি কোবালা বার ক'রে জমি দখল করতে উদ্যত হয়েছে। প্রত্যেকেই অপরের কোবালাকে জাল ব'লে অভিহিত করছে। বিবাদকে জটিলতর করেছে জহরলালের নায়েব। সে বলে দুটো কোবালাই জাল, প্রকৃতপক্ষে জমিটি পলাতকা জমা, সুতরাং আইনত আপাতত জমিদারের প্রবেশের যোগ্য; তারপর পরে ইচ্ছামতো বা সুবিধামতো বিলি-বন্দোবস্তই করা হোক কিংবা জমিদারের খাস দখলেই থাক। এই নূতন জটিলতার সৃষ্টি কোনো পক্ষকেই কিছুমাত্র শান্ত করতে সক্ষম হয়নি, কিন্তু প্রিয়লালের বিবাহোপলক্ষে জহরলাল গ্রামে আগমন করার পর উভয়পক্ষই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে। জহরলাল এই সর্তে বিবাদ মিটিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন যে, পুত্রবধূর মঙ্গলকামনায় তিনি তাঁর পলাতকা জমার দাবী উপেক্ষা করবেন, কিন্তু বিবাদী জমি তিনি যেভাবে উভয় পক্ষর মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন বিনা আপত্তিতে তাতে উভয় পক্ষকে সম্মত হ'তে হবে; অন্যথা তিনি জমিতে প্রবেশের জন্য কালেক্টারীতে দরখাস্ত দেবার জন্য নায়েবকে আদেশ দিয়ে যাবেন। প্রজারা এ সর্তে সম্মত হ'য়ে যথাবিধি সোলেনামা লিখে দিয়েছে।

প্রিয়লালের নিকট সংক্ষেপে বিবাদের কাহিনী বিবৃত ক'রে জহরলাল বললেন, "সবই প্রায় ঠিক হ'য়ে আছে, তুমি গিয়ে বিবাদী জমিটুকু উভয়ের প্রয়োজন এবং সুবিধামতো উভয়ের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবে।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

"আর দেখ, চকদীঘি এখান থেকে তিন পো রাস্তা। পাল্কী ক'রে যাবে, যেতে আসতে বড় জোর এক ঘণ্টা, সেখানে থাকবে এক ঘণ্টা। দশটার মধ্যে এখানে ফিরে আসা চাই। বারোটার মধ্যে রওনা না হ'লে ঝাড়গ্রামে পৌঁছতে রাত্রি হ'য়ে যাবে। আমিই যেতাম, কিন্তু আমি এখানে না থাকলে অসুবিধা হবে। আরও দু-তিনটে বিবাদ নিষ্পত্তি করবার আছে, যাবার গোছ-গাছ ঠিক করারও অনেক বাকি। তা ছাড়া, তোমার বিয়ে উপলক্ষ্য ক'রে এ বিবাদ মেটানো হচ্ছে, সুতরাং আমার ইচ্ছে তুমিই এ বিবাদ নিষ্পত্তি কর।"

প্রজারা উচ্চ স্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, মহারাজ, আমাদেরও ইচ্ছে যে, ছোটবাবুর হাত থেকেই এবার আমরা বিচার পাই।" তারপর প্রিয়লালকে পাল্কীতে

চড়িয়ে নিয়ে 'জয় ছোটবাবুর জয়' বলতে বলতে তারা পাল্কীর সঙ্গে ছুটে চলল। আটজন বেহারা পাল্কী নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে চকদীঘির অভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

তিন

চকদীঘি থেকে দশটার মধ্যে ফেরা হ'য়ে উঠল না। প্রিয়লাল যখন ফিরে এল তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। গৃহ প্রায় জনশূন্য। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের অভ্যাগতেরা সকলেই ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হয়েছে। জিনিস-পত্র বহু-পূর্বেই গরুর গাড়িতে চালান দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে আছেন শুধু জহরলাল, সন্ধ্যা এবং এমন দু-চার জন আত্মীয় যাঁরা পীরনগরেই থাকবেন।

প্রিয়লালের বিলম্ব দেখে জহরলাল একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, প্রিয়লালকে দেখতে পেয়ে বললেন, "কী, হ'ল প্রিয়,—কাজ মিটল ?

প্রিয়লাল বললে, "মিটেছে।"

"খুসি হয়েছে তারা ?"

প্রিয়লাল অল্প হেসে বললে, "খুসি হয়েচে কি-না বলতে পারিনে, বাবা, রাজি হয়েছে।"

জহরলাল বললেন, "খুসি কেউ হয় না—উভয় পক্ষ তো হয়-ই না, সময়ে সময়ে কোনো পক্ষই হয় না। আচ্ছা যাও, একটু জিরিয়ে নিয়ে আহারাদি ক'রে প্রস্তুত হও ;—একটার মধ্যে রওনা হওয়া চাই-ই, তা হলে সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়-গ্রমের বাসায় পৌঁছে চা-টা খাওয়া চলবে। আমি এখনি রওনা হচ্ছি, ঝাড়গ্রামে পৌঁছে একবার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে, একটা জরুরী পরামর্শ আছে, সেটা সেরে যেতে পারলেই ভালো হয়। যাও, আর দেরি কোরো না।"

প্রিয়লাল অন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল জহরলাল ডাক দিয়ে বললেন, "আর শোন প্রিয়, তোমাদের সঙ্গে জল আর খাবার থাকবে,—বৌমাকে মাঝে মাঝে ক্ষিদে তেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা কোরো। ছেলেমানুষ, এতখানি পথ যেতে দুই-ই প্রয়োজন হবে। জিজ্ঞাসা কোরো।"

প্রিয়লাল মৃদুস্বরে বললে, "করব"। তারপর জহরলালের নিকট এগিয়ে এসে বললে, "বাবা, তুমি কিসে যাবে ?"

"হাতীতে।"

"রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট হবে তো !"

জহরলাল বললেন, "না, তা হবে না। নায়েব মশায়কে তোমাদের সঙ্গে দিলেই ভালো হ'ত—কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি না গেলে উকিলের কাছে অসুবিধায় পড়তে হবে।"

প্রিয়লাল বললে, "না, না, আমাদের সঙ্গে নায়েব মশায়ের যাবার কোনো দরকার নেই, তোমার সঙ্গেই তিনি যান।"

দূরে ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। জহরলাল বললেন, "হাতী আসছে ; এখন নায়েব মশাই এলেই বেরিয়ে পড়া যায়।" সঙ্গে সঙ্গেই হাতী এবং নায়েবকে একযোগে দেখা গেল। জহরলাল বললেন, "পাকা লোক, একেবারে বাহনটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন।" তারপর প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, যাও, তুমি আর দেরি কোরো না, একটার মধ্যে যাত্রা করা চাই। রাত্রে যে-রকম বৃষ্টি হয়েছে, নদীতে যদি ঢল নেমে থাকে তা হ'লে সেখানে পার হ'তে অনেক বিলম্ব হ'য়ে যাবে। সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়গ্রামে পৌছন চাই।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রিয়লাল সজোরে তাড়া লাগিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা হাতে রেখে বললে, "সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরোনো চাই-ই।"

অদূরে বিমলা, প্রিয়লালের খুড়তুত বোন, দাঁড়িয়েছিল : সে নিকটে এসে হাসিমুখে বললে, "নিজে তো গিয়েছিলে চকদীঘিতে হাকিমী করতে, তাড়া দিচ্ছ কাকে দাদা ?—বউকে ? সে তো সেজে-গুজে তৈরি হ'য়ে ব'সে আছে,—শুধু দুটো ভাত মুখে দিয়ে নিলেই হয়।"

বিমলা প্রিয়লালের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, কিন্তু বিবাহ যদি মানুষের নাবালকত্ব মোচন ক'রে একটা নূতন জীবনের সূত্রপাত করে, তা হ'লে সে প্রিয়লালের চেয়ে অন্তত বছর আষ্টেকের বড়। বিবাহিত জীবনের সেই প্রবীণত্বের জোরে সে প্রিয়লালের সহিত পরিহাস করতে সঙ্কুচিত হয় না ; বললে, "এত দেরি করলে কেন দাদা ? বউ-এর তোমার জন্যে ভারি মন-কেমন করছিল।—বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

প্রিয়লাল গম্ভীর-মুখে বললে, "বিশ্বাস না হবার তো কোনো কারণ দেখচিনে : রূপে, গুণে এমন একটি কামনার বস্তুর জন্যে মন না-কেমন করাই ত আশ্চর্য !"

বিমলা বললে, "ঈস, নিজের বিষয়ে গর্বও ত' কম দেখচি নে।"

"গর্বের বনেদ যখন খাঁটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে গর্বকে কী বলে জানো বিমলা ?"

পুলকোজ্জ্বল মুখে বিমলা বললে, "কী বলে ?"

"আত্মোপলব্ধি !"

প্রিয়লালের কথা শুনে বিমলা হেসে ফেললে ; বললে, "আচ্ছা বেশ, পাল্কী চ'ড়ে ঝাড়গ্রাম যেতে যেতে সমস্ত পথ আত্মোপলব্ধি কোরো,—এখন তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নেবার ব্যবস্থা দেখ দেখি। একটার মধ্যে রওনা হ'তে হবে সে কথা মনে আছে ?"

আহারাদি সেরে একটার মধ্যে প্রিয়লাল এবং সন্ধ্যা প্রস্তুত হ'ল বটে, কিন্তু রওনা হ'তে পারলে না। পাল্কীতে উঠতে যাবে এমন সময়ে হুড়তে-পুড়তে এসে পড়ল চকদীঘির সেই দুই দল বিবাদী প্রজা। নিষ্পত্তির কোন্ এক অজ্ঞাত গোপন কোণ থেকে সহসা মতভেদের এমন একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা উঠেছে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল হ'য়ে যাবার উপক্রম করেছে। এ কথাটা তখন ওঠে নি

তা সত্য ; উঠলে হয়ত সেই সময়েই অন্যান্য কথার সঙ্গে এরও একটা মীমাংসা সহজেই হ'য়ে যেতে পারত। তর্ক এবং যুক্তির গোলাগুলি যখন চলছিল তখন এক আঘাতেই যে পরাভূত হ'তে পারত, সন্ধির নিরস্ত্রতার মধ্যে হঠাৎ সে দুর্দান্ত হ'য়ে উঠেছে।

এক ব্যক্তি চকদীঘি থেকে সঙ্গে এসেছিল, ঝাড়গ্রামে তার ভাইপো মোক্তারী করে। নিরপেক্ষতার দাবী তারই সকলের চেয়ে বেশি; সে বললে, "বিপদের কাঁটা রেখে যাবেন না হুজুর! ও আমগাছটা মনিরুদ্দীনকেই দিয়ে যান, নইলে তার ছেলেপিলে বৎসরান্তে একটা আমও খেতে পাবে না।"

মোক্তারের খুড়োর কথা শুনে অপর পক্ষ হাঁ হাঁ ক'রে উঠল ; বললে, "বেশ তো কও মুখুয্যে মশায়! কাঁটা মেরে সড়কি বানাবার সল্লা দিচ্ছ! আমগাছটা মনিরুদ্দীনকে দিলে আম পাড়বার জায়গা তাকে দিতে হবে না ?"

দেখতে দেখতে বিবাদ জমে উঠল এবং প্রিয়লালও ধীরে ধীরে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ক'রে একটা বিরোধকে শান্ত করবার মাদকতা তো আছেই—তা ছাড়া, ছাড়েই বা তাকে কে? মোক্তারের খুড়ো হাতে পৈতা জড়িয়ে বললে, "আদালতে গেলে শুধু পয়সার শ্রাদ্ধ হুজুর,—আপনি গরিবের মা-বাপ, বিবাদটা মিটিয়ে দেয়ে যান। আমগাছটা—"

অপর পক্ষ আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠল ; কথাটা মুখুয্যেকে শেষ করতে না দিয়ে বললে, "ফের আমগাছটা ?—তুমি দেখছি, মুখুয্যে মশায়, এক নম্বর না বাধিয়ে ছাড়বে না!" তারপর প্রিয়লালের দিকে চেয়ে বললে, "হুজুর, ওনার এক ভাইপো ঝাড়গ্রামে মোক্তারী করে।"

শুনে মুখুয্যে প্রশান্তমুখে বললে, "সে তো বাপু, ফেল কড়ি মাখ তেল। সে মনিরুদ্দীনেরও কেনা নয়, তোমারও কেনা নয়। যদি এক নম্বর বাধেই, তুমিই না হয় তাকে নিযুক্ত কোরো, সে তোমারই গুণগান গাইবে।"

হাতের রিস্টওয়াচের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মুখুয্যে মশায়!"

"হুজুর ?"

"আপনি যদি একটু চুপ করেন, তা হ'লে আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

হাত জোড় ক'রে মুখুয্যে বললে, "যে-আজ্ঞে, আমি আর একটি কথাও উচ্চারণ করব না, কিন্তু এ কথা ব'লে রাখলাম হুজুর, আমগাছটা মনিরুদ্দীন না পেলে সুবিচার হবে না।"

বহুক্ষণ বিচার-বিতর্কের পর নবজাত বিবাদের এক-রকম রফা হ'ল এবং আমগাছ সম্বন্ধে এই স্থির হ'ল যে, গাছটা মনিরুদ্দীনের ভাগেই থাকবে, কিন্তু জমি থাকবে পতিতপাবন বিশ্বাসের। যতদিন গাছটা ফলদান করবে ততদিন পতিত-

পাবন কাঁচা এবং পাকা আম মমিরুদ্দীনের বাড়ি পৌঁছে দেবে, গাছ শুকিয়ে গেলে মনিরুদ্দীন গাছ কাটিয়ে নিয়ে যাবে।

মুখুয্যে বললে, "পুকুর সম্বন্ধে বিচার খাশা হয়েছে হুকুর, কিন্তু গাছ সম্বন্ধে হ'ল না, ও জমিও রইল পতিতপাবনের, গাছও রইল পতিতপাবনের, আমও রইল তারই—কাঁচা পাকা দুই-ই। প্রতি বছর আমের মরশুমে দু-তিন নম্বর ফৌজদারী হ'তে থাকবে।"

প্রিয়লাল মৃদু হেসে বললে, "আপনি আছেন, তখন তার ব্যবস্থা আপনি করবেন।" তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "উপস্থিত আমি চললাম, আর একটুও অপেক্ষা করতে পারি নে। দুটো বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ।"

একতলায় একটা বসবার ঘরে সন্ধ্যা প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করছিল, পরিচারিকা এসে বললে, "চলুন বউরাণী, দাদাবাবু পাল্কীতে উঠচেন।"

প্রণম্যদের প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা অন্দরের প্রবেশ-দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল, সেইখানে তার জন্যে পাল্কী অপেক্ষা করছিল। পাল্কীটি সাবেক কালের সম্পদ, সাধারণত ক্রিয়াকর্মেই ব্যবহৃত হয়; সুনির্মিত, প্রশস্ত, প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষ্যে ভাল ক'রে রঙ করা হয়েছে; পাল্লায় পাল্লায় বিবাহের মাঙ্গলিক চিত্র অঙ্কিত, দুই দিকের দরজায় ঘন নীল রঙের আভাময় রেশমের পরদা, তার ধারে ধারে একই রঙের পুরু ক'রে পাকানো রেশমী সুতার সার-গাঁথা স্তবক। এই পাল্কী ক'রেই সে কয়েকদিন আগে ঝাড়গ্রাম রেল-স্টেশন থেকে পীরনগরে এসেছিল।

পাল্কীতে ওঠবার আগে সন্ধ্যা বিমলার হাত ধ'রে মৃদুস্বরে বললে, "চললাম বিমলাদি, মনে রেখো, ভুলো না যেন।"

বিমলার চোখ ভ'রে অশ্রু নেমে এল; হাসি-অশ্রু-মাখা মুখে সে বললে, "তোমার এই চাঁদের মতো সুন্দর মুখখানি কী ক'রে ভুলে যেতে হয় তা হ'লে সে কথাও শিখিয়ে দিয়ে যাও সন্ধ্যা। এ ক'দিন পীরনগরের এ বাড়িখানি আলো ক'রে ছিলে ভাই, আজ সে আলো নিজের হাতে নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছ!"

শুনে সন্ধ্যার লাবণ্যময় মুখমণ্ডল আরক্ত হ'য়ে উঠল, চোখ এল সজল হ'য়ে, বিমলার দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সে পরদা ঠেলে তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলে।

সদর দেউড়ীর মুখে প্রিয়লাল তার পাল্কীতে অপেক্ষা করছিল, সন্ধ্যার পাল্কী সেখানে উপস্থিত হ'তেই উভয় পাল্কী দ্রুতবেগে ঝাড়গ্রামের পথে অগ্রসর হ'ল।

পাল্কীতে পাল্কীতে আটজন ক'রে বেহারা, ছ'জন পাল্কী বহন করছে, বাকি দু'জন হাতে একটা ক'রে কেরোসিন তেলের লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চলেছে, প্রয়োজন হলেই কাঁধ বদল দেবে। সন্ধ্যার পাল্কীর আগে-পিছে দুজন পাইক চলেছে, একজনের কাঁধে বন্দুক, অপরজনের কটিতে তরবার। তার পশ্চাতে প্রিয়লালের

পাল্কী, এবং সর্বশেষে একটা ডুলিতে সন্ধ্যার পরিচারিকা মতি, তারই কাছে খাবার এবং জল।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের পথে পড়তেই সন্ধ্যা দু-দিকের পরদা সরিয়ে দিলে। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে ঘন-নিবদ্ধ শালবন, মাঠের সর্বত্র ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়—অধিকাংশই শিয়াঁকুল আব মনসা কাঁটায় ভরা, পথের ধারে ধারে কত নাম-না-জানা গাছ, তাদের শাখায় শাখায় কত নাম-না-জানা পাখী, কী অপূর্ব তাদের কাকলী! আকাশ মেঘমেদুর, বায়ু সুশীতল, মাঝে মাঝে তাতে অজানা ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। পাল্কী বেহারারা মন্থর দুলকি চালে ছুটে চলেছে, মুখে তাদের পথশ্রান্তিহরা ছড়ার মৃদু ভন্‌ভনানি, পাইকদের কড়া নাগরা জুতার মচ্‌মচানির শব্দ, মাঝে মাঝে তাদের মুখে 'হুঁসিয়ার' 'হুঁসিয়ার' ডাক। পথের বাঁকে বাঁকে প্রিয়লালের পাল্কী নজরে পড়ে, কখনো তার মুখের কিয়দংশ দৃষ্টি-গোচর হয়, কখনো বা চোখে চোখে দৃষ্টি-বিনিময়ও হ'য়ে যায়, মুখে মুখে ফুটে ওঠে একপক্ষে আনন্দের এবং অপর পক্ষে লজ্জার সুমিষ্ট হাসি।

সন্ধ্যার মনে হ'ল সে যেন চলেছে কোন স্বপ্নরাজ্যের অপরিচিত পথে যার সহিত নিত্যকার বাস্তব জীবনের কোনো যোগ নেই। সে ধীরে ধীরে ভুলে গেল যে, সে পীরনগর থেকে আসছে, ভুলে গেল কলকাতায় যাচ্ছে, সে তার বাপ মাকে ভুলে গেল, এমন কি স্বামীকেও। শুধু মনে হ'তে লাগল সে যেন চলেছে কোনো এক স্বপ্নের রাজ্যে, স্বপ্নের নগরে, এক অজানিত স্বপ্ন-পুরীতে। এমনি একটা স্বপ্নের মদিরা তার মনকে সমস্ত পথটাই আচ্ছন্ন ক'রে রইল; সে মোহ ভাঙল যখন পাল্কী এসে নামল কাঁসাই নদীর তীরে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন, পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দিনের চিতা জ্বলে উঠেছে।

প্রিয়লাল সন্ধ্যার পাল্কীর পাশে এসে ডাকলে, "সন্ধ্যা, বেরিয়ে এসো।"

সন্ধ্যা পাল্কী থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে পাইক এবং বেহারারা দূরে এক জায়গায় ব'সে ভাজাভুজি বার ক'রে জল-পানের উদ্যোগ লাগিয়েছে আর মতি জলের কুঁজো এবং খাবারের পাত্র হাতে নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়লাল বললে, "সন্ধ্যা, একটু কিছু খেয়ে নাও।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "এখন দরকার নেই, ঝাড়গ্রাম পৌঁছে খাব।"

"সে অনেক দেরি, এখনো ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।"

"তুমি আগে খাও।"

মতি একটু দূরেই ছিল, তা'কে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে একটু মৃদু গলায় প্রিয়লাল বললে, "আগে কেন?—একসঙ্গেও তো খেতে পারি?"

প্রিয়লালের প্রস্তাবে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বললে, "না।"

"আচ্ছা, তাহ'লে আমিই আগে খেয়ে নিই।" মতির দিকে ফিরে বললে, "মতি, খাবারটা নিয়ে এস।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে মতির হাত থেকে খাবারের পাত্রটা নিয়ে খুলে ফেললে, তারপর একটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে একগ্লাস জল নিয়ে প্রিয়লালের নিকট উপস্থিত হ'ল।

প্রিয়লাল সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের প্লেটটা নিয়ে বললে, "এরই মধ্যে স্বামী-সেবা আরম্ভ ক'রে দিলে সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা এ কথার কিছুই উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডল পুনরায় আরক্ত হ'য়ে উঠল।

আহার শেষ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আমি নদীর ধারে ওই বাবলা-গাছতলায় গিয়ে বসছি, খাওয়া হ'য়ে গেলে তুমি ওখানে এস। জুতো প'রে এসো সন্ধ্যা, বাবলা-গাছের তলায় অনেক সময়ে শুকনো বাবলা-ডালের কাঁটা থাকে।"

প্রিয়লালের প্লেটেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাকি খাবারটা মতিকে খেতে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হল।

প্রিয়লাল সন্ধ্যাকে নিজের পাশে বসিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, "কেমন লাগছে সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বললে, "খুব চমৎকার।"

"নদী পেরিয়ে ওপারে যখন আমরা পৌঁছব তখন কিন্তু এই চমৎকার শোভা একেবারে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাবে।"

শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিলে। বললে, "খুব ঘন কি ?"

"খুব ঘন। কিন্তু তার জন্যে তোমার ভাবনার কোনো কারণ নেই।"

ক্ষণকাল মনে মনে কী চিন্তা করে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ?"

"কী কাজ ?"

একটু অপেক্ষা ক'রে মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা বললে, "এক পাল্কীতে দুজনে গেলে হয় না ?"

বাঁ হাত দিয়ে সন্ধ্যাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে একটু চাপ দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "চমৎকার হয়—কিন্তু তোমার লজ্জা করবে না সন্ধ্যা ? অন্ধকারে অন্ধকারে অত লোকের মধ্যে আমার সঙ্গে যেতে ?"

সন্ধ্যা ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল ; তারপর বললে, "তবে তোমার পাল্কী আমার পাল্কীর পাশে পাশে রেখো।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "পথ সরু, দুটো পাল্কী পাশাপাশি যেতে তো অসুবিধে হবে। এবার পাইক দুজন তোমার পাল্কীর দু'দিকে দরজার পাশে পাশে চলবে, আর আমার পাল্কী তোমার পাল্কীর ঠিক পিছনেই থাকব। কেমন, তা হ'লে হবে তো ?"

সন্ধ্যা কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছিল, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল। প্রিয়লাল

সন্ধ্যাকে নিয়ে উঠে পড়ল। পাইক বেহারারাও তাদের জলপান শেষ ক'রে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

নদী পার হ'তে বেশ একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। এপারে এসে প্রিয়লাল তাদের বাহিনীটি, সন্ধ্যার সহিত যে ভাবে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইমত সাজিয়ে নিলে। তখনো অন্ধকার খুব বেশি হয়নি, তবুও লণ্ঠন চারটি জেলে নিয়ে তারা দ্রুতবেগে রওনা হ'ল।

আধঘণ্টাটাক যাওয়ার পর আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামল, অন্ধকার হ'ল দুশ্ছেদ্য, চারটি লণ্ঠনের ক্ষীণ রশ্মি-রেখা নিজেদের একান্ত অক্ষমতায় অপ্রতিভ হ'য়ে জ্বলতে লাগল অন্ধকারকেই বিশেষভাবে প্রকট ক'রে।

বাহিনীটি ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে একটি শালবনের মধ্যে। এ অরণ্যটি অত্যন্ত ঘন এবং বিস্তৃত। একমাইল পথ যাওয়ার পর বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায়। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, দ্রুতবেগে চলা নিরাপদ নয়, বেহারারা পা চেপে চেপে চলেছে এবং পাইকরা ঘন ঘন "হুঁসিয়ার" 'হুঁসিয়ার' হাঁকছে।

সন্ধ্যা ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে তার পাল্কীর মধ্যে ব'সে ছিল। একবার একটু পরদা সরিয়ে দেখলে বাহিরে মসীর সমুদ্র, আর তার মাঝে মাঝে দু-একটা জোনাকির ঝিকমিকি, তাছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। নদীর ওপার যা ছিল, নদীর এপার ঠিক তার বিপরীত। সে আলো সে ছায়া নেই, সে পাখী সে ফুল নেই, সে আকাশ নেই বাতাস নেই, আছে শুধু ঘন জমাট অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ। কোথায় ওপারের সে স্বপ্নরাজ্য আর স্বপ্নপুরী, এ যেন চলেছে কোন্ পাতালপুরীর পথে। একবার তার একটু কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল, একবার ইচ্ছে হ'ল চিৎকার ক'রে প্রিয়লালকে ডাকে। কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে কান্নাও বেরোলো না, কথাও না।

প্রায় অর্ধেক বন-পথ অতিক্রম করা হ'য়ে গিয়েছে, এমন সময় পথের বাম-দিকে একটা খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। সন্ধ্যার পাল্কীর একজন বেহারা শুনতে পেয়ে চুপি চুপি বললে, "মানুষ না কি গো ?"

শব্দটা একজন পাইকেরও কানে গিয়েছিল, সে সজোরে চিৎকার ক'রে উঠল, "খবরদার !"

কিন্তু তার পরই অকস্মাৎ আরম্ভ হ'য়ে গেল একটা পৈশাচিক নৃশংসতার লীলা। একটা বিকট হল্লায় সমস্ত বন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই দশ বারোজন লোক বড় বড় লাঠি নিয়ে ভীমবেগে এসে পড়ল প্রিয়লালের দলের উপর। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে লেগে গেল একটা ভয়ঙ্কর মারামারি আর চেঁচামেচি, তার মধ্যে একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিকট আর্তনাদ ক'রে বন্দুকধারী পাইক ভূমিশায়ী হ'ল, কোথায় ছিটকে পড়ল তার হাতের অস্ত্র তা কেউ জানলে না। পাল্কী-বেহারাদের পিঠের উপর দু-চার ঘা লাঠি পড়তেই তারা প্রাণ-ভয়ে ভীত হ'য়ে পাল্কী ফেলে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে প্রিয়লাল প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে গেল, তারপর

'সন্ধ্যা' 'সন্ধ্যা' ক'রে চিৎকার করতে করতে পাল্কী থেকে পা বাড়াতেই সজোরে পায়ের উপর এসে পড়ল একটা লাঠি—যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে পাল্কীর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে সে অচৈতন্য হ'য়ে গেল।

তখন দু'জন ভীমকায় লোক সন্ধ্যার পাল্কীর নিকট উপস্থিত হয়ে তার মূর্চ্ছিত শিথিল দেহ পাল্কীর ভিতর থেকে টেনে বার করলে, তারপর মতির ডুলির নিকট উপস্থিত হয়ে মতিকে টেনে বার ক'রে ফেলে দিয়ে তা'তে সন্ধ্যার বিবশ দেহ স্থাপিত করলে। জন পাঁচ সাত লোক লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাকি চারজনে সন্ধ্যার ডুলি কাঁধে নিয়ে দ্রুতপদে অরণ্যের নিবিড় অংশে অন্তর্হিত হ'ল। যারা পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে তারা যখন দেখলে যে বিপক্ষ দলের কোনো ব্যক্তিরই ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই, এবং বুঝলে যে ইত্যবসরে ডুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন তারাও ডুলি যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল।

চার

কিছু পূর্বে যেখানে চলেছিল নিদারুণ নির্মমতার অট্টরোল, সহসা সে স্থান মগ্ন হ'ল সুগভীর স্তব্ধতায় এবং অন্ধকারে। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল, শুধু ফোঁটা ফোঁটা পাতা-ঝরা জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে চারটে লণ্ঠন ছিল তার কোনো অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছিল না। দুটো হাতে নিয়ে দুজন পাল্কী-বেহারা পালিয়ে গিয়েছিল, অপর দুটো দুর্বৃত্তেরা লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছে অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করবার অভিপ্রায়ে।

পাল্কীর ভিতর প্রিয়লালের যখন চৈতন্য হ'ল তখন প্রথমে সে মনে ভাবলে স্বপ্নেরই জের চ'লেছে, ঘুম তখনো সম্পূর্ণ ভাঙেনি—কিন্তু শরীরটাকে একটু নাড়া দিতেই আহত পায়ের তীব্র বেদনার মধ্য দিয়ে ফিরে এল সমস্ত ঘটনার পরিপূর্ণ স্মৃতি। সন্ধ্যার খবর নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পাল্কী থেকে নামতে গিয়েই দেখলে পায়ের বর্তমান অবস্থায় একেবারে তা অসম্ভব। একটা নিদারুণ হতাশা এবং দুশ্চিন্তার তাড়নায় সমস্ত দেহ অবশ হ'য়ে এল। পরক্ষণেই মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় পূর্বক জড়তাকে অতিক্রম ক'রে সে উচ্চ স্বরে চিৎকার ক'রে উঠল—সন্ধ্যা! তমসাবৃত স্তব্ধ অরণ্য সেই সহসা-উচ্চারিত শব্দের আঘাতে চকিত হ'য়ে উঠল,—কিন্তু উত্তরে কোনো দিক থেকেই কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। আরও তিন চার বার সন্ধ্যাকে উচ্চ কণ্ঠে ডেকে কোনো ফল লাভ না ক'রে সে স্থির করলে সন্ধ্যা নিশ্চয় তার পাল্কীতে ভয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে আছে। অতি কষ্টে কোনো রকমে পাল্কী থেকে একটু মুখ বার ক'রে প্রিয়লাল উচ্চ স্বরে চিৎকার ক'রে ডাকলে, "রূপণ সিং!" তলোয়ারধারী পাইকের নাম রূপণ সিং।

নিকটবর্তী ঝোপের মধ্যে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই সে দিক থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—"মহ্‌রাজ!"

"তুম্‌ কী ধার হ্যায়?"

"ঈধর্‌ মহ্‌রাজ!"

নিরর্থক উত্তর। বিরক্তিভরে প্রিয়লাল বললে, "সাম্‌নে আও।"

ঝোপের মধ্যে রূপণ সিং খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর সন্তর্পণে প্রিয়লালের পাল্কীর সামনে এসে করজোড়ে আর্তস্বরে বললে, "হুকুম মহ্‌রাজ!"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "বহুমায়জীকা কিয়া হাল হ্যায়?"

ঝোপের ভিতর থেকে রূপণ সিং সমস্ত ব্যাপারই নিরীক্ষণ করেছিল, কিন্তু নিদারুণ দুঃসংবাদের কথা নিজমুখে প্রকাশ করতে সে ভয় পেলে; বললে, "বেগর বত্তি অব্‌ কা কহা যায় মহ্‌রাজ! সুঝৎ কুছ্‌ নইখে মু!"

উত্তর শুনে প্রিয়লাল ক্রোধে আগুন হয়ে উঠল। কঠিন স্বরে তর্জন ক'রে বললে, "নিকালো ঢুঁড় কর্‌ বত্তি!"

সেই গভীর অন্ধকারে বন জঙ্গলের মধ্যে লণ্ঠন খুঁজে বার করা কঠিন কাজ, কিন্তু প্রভুর কঠোর আদেশে সে-কাজে রূপণ সিংকে প্রবৃত্ত হ'তেই হ'ল। সে ব'সে ব'সে চতুর্দিক হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজতে লাগল।

প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে ডাকলে, "ক্ষীরোধর সিং!" ক্ষীরোধর সিং অপর পাইকের নাম।

ক্ষীরোধর সিং-এর পক্ষ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু উত্তর দিলে রূপণ সিং-ই। বললে, "ক্ষীরোধর সিংকো ডাকুলোগ জান্‌সে মার দিয়া মহ্‌রাজ!"

শুনে প্রিয়লাল দুঃখে এবং আতঙ্কে শিউরে উঠল। অনেকদিনের প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য, অবশেষে এমন ভাবে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ হারালো। সন্ধ্যাই বা এখন কী অবস্থায় কোথায় আছে কে জানে! দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের সমস্ত দেহ-মন আলোড়িত হ'য়ে উঠল, কিন্তু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পাল্কী থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, পায়ে এত অসহ্য বেদনা। সে ব্যগ্রস্বরে রূপণ সিংকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান্‌ সে মার দিয়া সো তুমকো কৈসে মালুম হুয়া?"

রূপণ সিং বললে, "উয়ো খুদ আপ্‌ হি কহা মহ্‌রাজ!"

রূপণ সিংএর কথার অপূর্ব সঙ্গতিতে প্রিয়লাল বিরক্তিতে গর্জন ক'রে উঠল, "মুরদা তুমকো আপসে কহা যো মর্‌ গিয়া?"

প্রিয়লালের বোধশক্তির শোচনীয় অভাব দেখে রূপণ সিংএর বিস্ময় এত বেশি হ'ল যে, তার তাড়নায় সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে উঠে দাঁড়ালো। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল ক'রে বললে, "গিরতেহি ক্ষীরোধর সিংনে কহা, জান্‌ লিয়া; পিছে, পুকারনে সে হরগিজ বোলৎ নৈখন্‌। অব ইস্‌সে দুস্‌রা বিচার ক্যা কিয় যায় মহ্‌রাজ?"

রূপণ সিংএর যুক্তির বিরুদ্ধে প্রিয়লালের কী বলবার ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু তার আর অবসর হ'ল না, অন্ধকারের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক টলতে টলতে এসে তার পাল্কীর সম্মুখে আছড়ে প'ড়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, "সব্বনাশ হয়েছে দাদাবাবু—"

উন্মত্তের মত প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে উঠল, "কী হয়েচে মতি ?"

"ওগো দাদাবাবু, বউরাণীকে ডাকাতরা ডুলি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছে !"

কোথায় রইল প্রিয়লালের আহত পায়ের বেদনা—কোথায়ই বা রইল তার ত্রস্ত মনের জড়তা—একটা বিকট আর্তনাদ ক'রে সে মুহূর্তের মধ্যে পাল্কীর বাইরে এসে দাঁড়াল, তারপর ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ দিকে মতি, কোন্ দিকে তারা গেছে ?"

কাঁদতে কাঁদতে হাত দিয়ে দিক নির্দেশ ক'রে মতি বললে, "ঐ বাঁ দিকে গো দাদাবাবু !"

পাগলের মতো প্রিয়লাল পথ-পার্শ্বের নালী অতিক্রম ক'রে ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলে। মুখে তার 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' ডাক, পায়ে অসংযত অনির্ণীত চপল গতি, বুদ্ধির একটা দিক দিয়ে সে বেশ বুঝতে পারছে যে এই অজানা অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে সন্ধ্যার সন্ধান খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতার আগ্নেয়গিরি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকাও ত' একই রকম অসম্ভব।

পাল্কী-বেহারাদের মধ্যে একজন ছিল, নাম তার মোহন। মাথায় চোট খেয়ে সে অচেতন হ'য়ে পথের পাশে প'ড়ে ছিল, প্রিয়লাল এবং রূপণ সিং-এর কথার শব্দ পেয়ে তার চেতনা ফিরে আসে। বয়স তার ষাট বৎসর অতিক্রম ক'রে গেছে, মাথায় আধাআধি কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু শুধু ঐ পর্যন্তই ;—তার বেশি এক ইঞ্চিও জরা তার শরীরে অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। মোহনের গায়ে পঁচিশ বৎসরের যুবাপুরুষের বল : শরীরের গঠন দীর্ঘ অনবনত, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া ; পাল্কী বইবার সময় লোকাভাব হ'লে স্বেচ্ছায় সে একাই দুজনের কাঁধ দেয়। জাতে সে গয়লা, সাবেককেলে লোক, জহরলালের পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে কুস্তি লড়া ছিল তার যৌবনকালের কাজ। সে দৌড়ে গিয়ে দু-হাত দিয়ে প্রিয়লালকে আটকে ধ'রে দাড়াল ; বললে, "ও কাজ কোরোনা ছোটবাবু, রেতের বেলা মিছিমিছি বনের মধ্যে সেঁধিয়ো না, বর্ষাকালে পোকা-মাকড়ের ভয় আছে। এই পরশুদিন এই পথেই একটা লোক পোকার কামড়ে ম'রে গেছে।"

প্রিয়লাল মোহনকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে বললে, "মোহন, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি যাবই।"

দু'হাতে প্রিয়লালকে জড়িয়ে ধ'রে মোহন বললে, "কোথা যাবে ছোটবাবু, তারা কি এখানে ব'সে আছে ? এতক্ষণে কোশ খানেক রাস্তা চ'লে গেছে।

তাদেরও পাবে না, নিজেও পথ হারাবে। তার চেয়ে তুমি পাল্কীতে বসবে চল, আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি। তা'তে কাজ হবে।"

"কিন্তু সে সময়ে তোমরা অত সহজে পাল্কী ফেলে পালিয়ে গেলে কেন মোহন ?"

"পালাই নি ছোটবাবু। কী করব বল ? পিছন থেকে হঠাৎ এসে মাথায় দিলে চোট, মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়লাম। সমুখ দিক থেকে এলে তাদের নিদেন পাঁচটাকে না নিয়ে মোহন গয়লা ভুঁই নিতো না! কী বলব বল হুজুর, একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চ'লে গেল, মহারাজের কাছে কী ক'রে মুখ দেখাবো জানিনে! এখন চল, তোমাকে পাল্কীতে বসিয়ে একটা সল্লা করে বেরিয়ে পড়ি।"

"শুধু হাতে যাবে ?"

"শুধু হাতে নয়,—সক্কলের লাঠি আছে পাল্কীর নিচে বাঁধা।"

প্রিয়লাল ব্যগ্রস্বরে বললে, "আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব মোহন।"

প্রিয়লালের কথা শুনে মোহন একটু যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ; বললে, "এ সময়ে বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট কোরো না ছোটোবাবু, তুমি কি আমাদের সঙ্গে এই আঁধারে বন-বাদাড় ভেঙে চলতে পারবে ? এখনো ছুটে গেলে যদি কোনো রকমে তাদের ধরতে পারি। এ বন ছেড়ে অন্য বনে ঢুকলে আর কিনারা লাগাতে পারব না।"

মোহনের কথা শুনে প্রিয়লাল আর কোনও কথা না ব'লে তার কাঁধে ভর দিয়ে পাল্কীর কাছে ফিরে এল। এসে দেখলে ক্ষীরোধর সিং মরে নি, পাল্কীর কাছে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রিয়লালকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল ; বললে, "হামি জিন্দা আছি এ বহুৎ শরমের কথা মহ্‌রাজ! বহুরাণীকে হামি রক্‌ছা করতে পারলাম না, হামার জান্ গেলে ভাল ছিল!"

প্রিয়লাল উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে মোহন বললে, "তোমার বন্দুক কোথায় সেপাইজী ?"

বন্দুকটি ক্ষীরোধর সিং খুঁজে বার করেছিল ; বললে, "বন্দুক ঈ কা আছে।"

"বহুরাণীর তল্লাসে আমরা যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে ?"

"বহুরাণীর ওয়াস্তে জান্ দিতে পারে, আর তাল্লাসে যেতে পারবে না ?—আলবাৎ যেতে পারবে।"

তখন মোহন সহসা সমস্ত অরণ্য কম্পিত ক'রে অতিশয় উচ্চ স্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। উত্তরে দূর থেকে মনুষ্যকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল।

তেমনি উচ্চ স্বরে মোহন চিৎকার ক'রে উঠল, "হা—আ—জির!"

দেখতে দেখতে পাল্কী-বেহারারা সকলেই এসে উপস্থিত হ'ল, শুধু রঘু নামে একজনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সে সকলের অগোচরে সোজা ঝাড়গ্রাম চ'লে গিয়েছিল জহরলালকে ডাকাতির সংবাদ দেবার জন্যে।

মিনিট দুই তিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে একটা মোটামুটি পরামর্শ ক'রে নিয়ে ডাকাতরা যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে মোহন সদলে বেরিয়ে পড়ল। সকলের হাতে লাঠি, ক্ষীরোধর সিংএর হাতে বন্দুক। রূপণ সিংকে এবং একজন বেহারাকে তারা রেখে গেল প্রিয়লাল এবং মতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। লণ্ঠনও রেখে গেল তাদেরই নিকট।

লণ্ঠন নিয়ে মতির কাছে রূপণ সিং আর পাল্কী-বেহারাকে বসতে ব'লে প্রিয়লাল ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করলে। কিছুক্ষণ পূর্বেও এই শয্যা সন্ধ্যাকে ধারণ ক'রেছিল! সন্ধ্যা,—তার সুখ-সৌভাগ্যলক্ষ্মী সন্ধ্যা,—তার অন্তরের অমূল্য সম্পদ সন্ধ্যা! এখনো যেন শয্যার মধ্যে তার মধুময় স্পর্শ-টুকু লেগে রয়েছে! উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয়লাল সমস্ত দেহ বিস্তার ক'রে শয্যার উপর শুয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। নিরুপায় দুর্ভাগ্যের এ কী মর্মন্তুদ গ্লানি!—বিগত কয়েক দিনের অপূর্ব সুখসম্ভোগের কথা মনে পড়ল,—মনে পড়ল নদীর ওপারে সুদীর্ঘ পথের কাব্য-যাপনের স্মৃতি! যে অদৃষ্ট-দস্যু নিমেষের মধ্যে সে-সকল এমন করে অপহরণ করলে সমস্ত মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠল!

রাত্রি দশটার সময়ে দূরে মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রিয়লাল পাঁচ সাতটা আলো দেখতে পেলে। অবুঝ মন মনে করলে সন্ধ্যাকে নিয়েই বা তারা ফিরে আসছে। এসে উপস্থিত হ'লেন জহরলাল—পুলিশ আর লোকজন নিয়ে, সঙ্গে রঘু বেহারা।

নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত উদ্বিগ্ন মুখে জহরলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌমার কোনো সন্ধান পেয়েছ প্রিয়?—পাওয়া গেছে তাঁকে?"

মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বললে, "না।"

"লোকজনেরা কোথায়?"

"খুঁজতে বেরিয়েছে।"

নূতন দল অবিলম্বে আর একদিকে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত ধ'রে চলল সারা অরণ্য তোলপাড় ক'রে অধীর অন্বেষণের পালা। দেখতে দেখতে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেল কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন পুনরায় নূতন উদ্যমে তারা চতুর্দিকে সন্ধ্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধারে ধারে, বনের ঝোপে ঝাড়ে, দুতিন মাইল দূরান্তরের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে চলল অন্বেষণ। কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হ'ল।

অবশেষে পুলিশের হাতে অন্বেষণের ভার সমর্পণ ক'রে বধূহীন ভাগ্যহীন অস্নাত অভুক্ত প্রিয়লালকে সঙ্গে নিয়ে জহরলাল হাওড়াগামী দ্বিপ্রহরের রেল-গাড়িতে এসে উঠলেন।

অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা!—পীরনগরের চৌধুরী বংশের অম্লান গৌরব-পটে কলঙ্কের কুৎসিত রেখা!

গাড়ি চলতেই জহরলাল শয্যা গ্রহণ করলেন।

পাঁচ

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গালুডি স্টেশনের মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ শালবনের প্রান্তদেশে তিরোবিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর অধিবাসীর মধ্যে ঘর পাঁচেক মুসলমান ও দুই ঘর হিন্দু গোয়ালা ভিন্ন বাকি সমস্তই কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। চক্রধরপুরের বনে লাক্ষা সংগ্রহ এবং সিংভূমের অভ্র ও লোহার খনিতে কুলিগিরি ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্যে এরা মাঝে মাঝে যে দু-চার রকমের উপায়ন্তর অবলম্বন ক'রে থাকে তার একটি নমুনা পীরনগর থেকে ঝাড়গ্রামের পথে সন্ধ্যা-হরণের দিন দেখা গেছে। অবশ্য সে ব্যাপারে পীরনগর অঞ্চলের বীরগণই প্রধান উদ্যোক্তা; কিন্তু পুলিশের দুরতিক্রম অন্বেষণ থেকে মাল এবং মানুষকে নিরাপদে রাখবার জন্যে সুদূরবাসী সহধর্মীদের সহযোগিতার প্রয়োজনও তাদের কম নয়। সুতরাং সেদিনকার ডাকাতির দলপতি রঘু গয়লা পীরনগরের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী হ'লেও প্রায় মাসাবধিকাল সন্ধ্যা পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী তিরোবিয়া গ্রামের একটি গৃহে অবরুদ্ধ আছে। রঘু বেয়ারারূপী এই রঘু গয়লাই ডাকাতির দিনে ঝাড়গ্রামে উপস্থিত হয়ে জহরলালকে ডাকাতির সন্ধান দিয়েছিল, এবং প্রভুভক্ত ভৃত্যের অবয়ব ধারণ ক'রে পুলিশকে সেদিন সমস্ত রাত এবং পরদিন বৈকাল পর্যন্ত অবিরত ভুল পথে প্রবর্তিত ক'রে পরিশ্রান্ত ক'রে মেরেছিল।

তিরোবিয়া গ্রামে যাদের গৃহে সন্ধ্যা বাস করছে তারা দু' ভাই, গফুর ও মহবুব। ডাকাতির দিনে এরা দুজনেই দলে ছিল, এবং তিন দিন শুধু রাত্রিকালে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে বন বাদাড়, পর্বত প্রান্তর অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যাকে তিরোবিয়ায় নিয়ে আসে। পুলিশের সন্দেহে যাতে না পড়ে সেজন্য রঘু সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সন্ধ্যার দেহে যে সকল অলঙ্কার ছিল তার তালিকা এবং ওজন নির্ধারিত করাবার জন্য তার ভগ্নীপতি নিতাইকে দলের সঙ্গে পাঠিয়েছিল।

ঘটনার দিন সকালবেলা যখন রঘু নিতাইকে তার কর্তব্য-কার্যের বিষয়ে গোপনে উপদেশ দিচ্ছিল তখন কৌতূহলী হয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাগ বাঁটরার কিছু ঠিক হয়েছে রঘু ?"

রঘু বলেছিল, "সে কথা আগে ঠিক না হ'লে, পরে কি আর হয় রে ? পরে ঝগড়াই হয়। ঠিক হয়েছে।"

"কী ঠিক হয়েছে ?"

"ঠিক হয়েছে আধা-আধি। আধা গহনা তারা পাবে, আধা পাব আমি।"

একটু নীরব থেকে কা একটা কথা মনে মনে ভেবে নিতাই বলেছিল, "আর যারা খাটবে তাদের মেহনত-আনা কী দেবে, তাও ঠিক হয়েছে নাকি ?"

"তা-ও হয়েছে। গফুরদের এলাকার লোকেরা গফুরদের হিস্‌সা থেকে

দু-আনা পাবে, আমিও আমার এলাকার লোকদের মধ্যে আমার হিস্‌সা থেকে দু-আনা বেঁটে দোবো।”

“আর মেয়েটার ভাগাভাগি কী রকম হবে রঘু?”

“মেয়েটার আবার ভাগাভাগি কী হবে? সে আমার ভাগে থাকবে।”

“তোমার ভাগে থাকবে? কোথায় রাখবে তাকে? বাড়ীতে রাখলে তো পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।”

নিতাইয়ের কথা শুনে রঘু হেসে উত্তর দিয়েছিল, “সে কি বাড়ির বউ যে বাড়িতে রাখব? কিছুদিন বনে-বাদাড়ে আমার সঙ্গে থাকবে, তারপর ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে কলকাতায় বাগানবাড়িতে চড়া দামে বড়লোকের হাতে বেচে দোবো?”

“গফুরদের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আসবে কবে।”

“মাস দুই তো নয়। পুলিশের তল্লাস জুড়িয়ে গেলে তারপর তাকে বালুডির পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখানে পুলিশ তো পুলিশ, চন্দোর-সুয্যি সেঁদোবার উপায় নেই।”

তিরোবিয়ায় পৌঁছে সন্ধ্যার অলঙ্কারের ফিরিস্তি এবং ওজন ক'রে নিয়ে পরদিন রাত্রেই নিতাই গ্রামে ফিরল। গালুডি হ'য়ে ট্রেনে ফিরে যাবারই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রেলে স্টেশনে স্টেশনে পুলিসের নজর থাকতে পারে সেই আশঙ্কায় গফুর তাকে ট্রেনে যেতে না দিয়ে বনপথেই ফেরৎ পাঠালে—সঙ্গে দিলে মহবুবকে আজানা পথের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবার জন্যে।

যত দিন নিতাই সঙ্গে ছিল, মাত্র শাসনে রাখবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি উৎপীড়ন সন্ধ্যার প্রতি কেউ করেনি। কিন্তু নিতাই চ'লে যাওয়ার পর মহবুবের দিক থেকে নির্যাতনের মাত্রা অল্পে অল্পে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। অবশেষে যেদিন সে গভীর রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার জবরদস্তি ক'রে খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে অর্গল লাগিয়ে দিলে, সেদিন গফুরেরও অসহ্য হ'ল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত ক'রে সে মহবুবকে ডাকতে লাগল।

পাশের একটা ছোট জানালার পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মহবুব বললে, “হল্লা করছিস কেন?”

গফুর বললে, “আমার কথা শোন—দোর খুলে বেরিয়ে আয়।”

গফুরের কথা শুনে মহবুব উচ্চ স্বরে হেসে উঠল—সে হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না। গফুর তার বড় ভাই, কিন্তু তখনকার মতো সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ-ভাবে অগ্রাহ্য ক'রে একটা বিকট সম্বোধন প্রয়োগ ক'রে সে একটা কুৎসিত রসিকতা করলে। তারপর জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সহসা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল, সম্ভবতঃ সন্ধ্যার মনে সন্ত্রাস জাগিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে।

মহবুবের উদ্দেশে একটা গালি বর্ষণ ক'রে গফুর গৃহ-প্রাঙ্গণে তার পরিত্যক্ত

খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ল—কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। বর্ষণহীন মেঘময় শ্রাবণ দিনের ভাপসা গরম, তার উপর সন্ধ্যার ঘরে থেকে-থেকে চাপা কণ্ঠের আর্তনাদ। কিছুক্ষণ শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে মহবুবের উদ্দেশে আবার একটা গালি পেড়ে গফুর খাটিয়াটা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে শয়ন করল।

সকালে মহবুব যখন সন্ধ্যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখনো তার দুই চক্ষু রক্তাভ; খোঁয়াড়ির ঠিক অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা, অপচীয়মান নেশার মৃদু আবেশে মন তখনো ঈষৎ প্রদীপ্ত।

গফুর মহবুবের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "কাজটা ভাল করলি নে মহবুব।"

পিছন ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে মহবুব বললে, "কী মন্দ করলাম শুনি ?"

"সেটা তুই বুঝতে পারছিস নে ?"

সজোরে মাথা নেড়ে মহবুব বললে, "না।"

গফুর বললে "দেখ মহবুব, ইমান শুধু ভালো লোকের জন্যেই নয়, চোর ডাকাতকেও ইমান বাঁচিয়ে চলতে হয়, নইলে তাদের নিজেদেরই সর্বনাশ। চোর ডাকাতেরা যদি নিজেদের মধ্যে ইমান রেখে না চলত তা হ'লে তাদের আর ক'রে খেতে হ'ত না, সকলকেই জেলখানায় ঘানি টানতে হ'ত।"

মহবুব অধীরভাবে তর্জন ক'রে উঠে বললে, "বেশ, তাই যেন হ'ল, কিন্তু বেইমানিটা কী করলাম তাই খুলে বল না ?"

"বেইমানি নয় ? এ কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম এই সর্তে যে, মেয়েটা পড়বে শুধু রঘুগয়লার ভাগে। আর তুই কী ক'রে তার ওপর এ রকম জুলুম করছিস ?"

"জুলুম করছি, না, তার ভালো করছি ? আমি তো তাকে সাদী ক'রে জোরু বানাবো, কিন্তু রঘু কী করবে জানিস ? তাকে কলকাতার বাজারে বিক্রী ক'রে পয়সা করবে। জুলুম তো সে-ই করবে।"

"এ তুই কী ক'রে জান্‌লি ?"

মহবুব বললে, "যাবার পথে নিতাই. আমাকে ব'লে গিয়েছে। তা ছাড়া, দোস্‌রা আর কী হ'তে পারে বলত গফুর ? মেয়েটার জাত আছে, না ইজ্জৎ আছে, না আর কিছু আছে যে, হিঁদুর ঘরে তার ঠাঁই হবে ? এ কি মুসলিমের ঘরের কথা যে, জাত মারতে যেমন জানে, দিতেও তেমনি জানে ?"

মহবুবের এ যুক্তি গফুরকে একটু দমিয়ে দিলে। এ কথা সত্যই অস্বীকার করা চলে না যে, যে-ব্যাপার ঘটে গেল তারপর শ্বশুর গৃহে অথবা পিতৃগৃহে সন্ধ্যার স্থান হওয়া কঠিন হবে। মনে মনে একটু-কি সে চিন্তা করলে, তারপর বললে, "আচ্ছা, রঘু এখানে এলে তখন যা হয় করা যাবে, কিন্তু সে যতদিন না আসছে সবুর ক'রে থাক।"

মাথা নাড়া দিয়ে মহবুব বললে, "কেন সবুর করতে যাব ? রঘুর সঙ্গে

এ কথার কী আছে যে, সে আসা পর্যন্ত সবুর ক'রে থাকতে হবে! এ আমি ব'লে রাখছি গফুর, এ মেয়ে আমার চাই-ই—সে জন্যে যদি আমার জান দিতে হয় সোভি আচ্ছা!" ব'লে সদর্পে বড় বড় পা ফেলে প্রস্থান করলে।

সমস্ত দিনের কাজ সেরে মহবুব যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত্রি প্রায় আটটা। আট নয় মাইল দূরে জোরোবার বনে সে গিয়েছিল লাক্ষা সংগ্রহের কাজে।

গফুর আজ কাজে যায়নি, সমস্ত দিনই বাড়ি আছে। এখন সে তার খাটিয়ায় শুয়ে আকাশ পাতাল অনেক কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল। মনটা তার কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না, বিশেষতঃ গত রাত্রি থেকে একেবারেই না। বয়স তার চল্লিশ উত্তীর্ণ, মাথার বাঁ দিকে জুলফির উপরে একগোছা চুল সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে শক্তি এবং সামর্থ্যের কোন হ্রাস হয়েছে ব'লে মনে হয় না, যৌবন তার সমস্ত সম্পদ প্রৌঢ়ত্বকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা নূতন অজানা হাওয়া প্রবেশ করেছে যে, মন এখন স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়, চিন্তা করে, এমন কি সময়ে সময়ে যেন বিগত জীবনের গতিধারাকে প্রতিবাদ করবারও উপক্রম করে। বিবাহ সে পর পর দুবার করেছিল, কিন্তু দুটি স্ত্রীই তাকে দাম্পত্য-জীবনের সুখ বেশি দিন ভোগ করতে দেয়নি; এমন কি ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে পরলোকে প্রস্থানের পূর্বে উক্ত দাম্পত্য-জীবনের কর্তব্যমোচন স্বরূপ একটি সন্তানও স্বামীকে উপহার দিয়ে যায় নি। মানুষের ভাগ্যলিপিতে পুত্রকলত্রের যেখানে স্থান, সেখানে গফুরের অশুভ গ্রহের দৃষ্টি। জীবনের প্রেরণাই বল আর তাড়নাই বল, কোনো খোঁটাতেই কোথাও সে বাঁধা ছিল না, কিন্তু তবুও একান্ত নিষ্ঠার সহিত সমস্ত সদাসদ্ কার্য বরাবর ক'রে এসেছে। এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, আর কেন!

মহবুব গফুরের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। তার স্ত্রী কিছুদিন থেকে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে বাস করছে। মহবুবের দেহ এবং মন দুই-ই কঠিন। কার্য বিষয়ে সে ঘোরতর সাম্যবাদী, অর্থাৎ কার্যের মধ্যে শ্রেয় হেয় এমন কোনো শ্রেণী-বিভাগ আছে বলে সে একেবারেই মনে করে না। তার মতে এমন কোনো কাজ নেই যার সংস্পর্শে মানুষ দেহে-মনে অশুচি হ'তে পারে। তবে একমাত্র সেই সকল কাজ আভিজাত্যের দাবী করতে পারে যেগুলি সমাধা করবার জন্য অত্যধিক শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন হয়। কাজের মধ্যে জাত ব'লে যদি কিছু মানতে হয় তা হ'লে মানুষের জীবন নেওয়া সকলের চেয়ে বড় জাতের কাজ, কারণ সে বিষয়ে কোনো রকম ত্রুটি ঘটলে নিজের জীবনও দিতে হতে পারে।

মহবুব গিয়েছিল পুকুরে মুখ-হাত-পা ধুতে। সেই অবসরে গফুর তার শয্যা পরিত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার ঘরে সামনে এসে দরজাটা একটু খুলে ধীরে ধীরে ডাকলে "হামিদা।"

সন্ধ্যা তার নিজের নাম গফুরদের কাছে প্রকাশ করতে স্বীকৃত না হওয়ায়

বেশি পীড়াপীড়ি না ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমার নাম দিলাম হামিদা। যতদিন আমাদের বাড়ি থাকবে আমরা তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকব—সাড়া দিয়ো।" সন্ধ্যা কিন্তু কোনোবারেই সে নামে সাড়া দেয় নি—এবারও দিল না।

গফুর বললে "হামিদা, মহবুব বাড়ি এসেছে। জানো তো ওর অসাধ্য কোন কাজই নেই। উঠে এসে কিছু খাও।"

ঘরের মেঝেতে সন্ধ্যা উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ছিল, মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"কিন্তু মহবুব তো সহজে ছাড়বে না, সে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবে।"

এ কথার সন্ধ্যা কোন উত্তর দিল না—যেমন প'ড়ে ছিল তেমনিই প'ড়ে রইল। গফুর অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ি করলে, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অবশেষে পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে মহবুব সেখানে এসেই পড়ল। গফুরকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে ?"

গফুর বললে, "হামিদা সমস্ত দিন কিছু খায় নি—এমন কি জলস্পর্শ পর্যন্ত করে নি। তাকে খাবার জন্যে বলছিলাম।"

"জোর ক'রে খাওয়াস নি কেন ?"

গফুর একটু হেসে বললে, "জোর ক'রে একটা এক বছরের বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় না, আর সতেরো আঠোরো বছরের একটা সমর্ত মেয়েকে জোর ক'রে খাওয়াবি ?"

"কেমন খাওয়ানো যায় না আমি একবার দেখছি।" ব'লে বিকট স্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে মহবুব ছুটে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, তারপর প্রকাণ্ড একটা চক্‌চকে ছোরা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে দ্রুতবেগে প্রবেশ ক'রে পদাঘাতে তাকে চিৎ করে দিয়ে ছোরাটা একেবারে বুকের উপরে ধ'রে বললে, "শীগ্‌গীর উঠে আয়, নইলে সমস্ত ছোরাটা তোর বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে দোব !"

সন্ধ্যার সমস্ত শরীরের মধ্যে কোথাও একটু মৃদু স্পন্দন পর্যন্ত দেখা গেল না—মহবুবের মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "তাই দাও।"

গফুর দৌড়ে এসে মহবুবের হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে টেনে বাহিরে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললে, "তুই কি পাগল হ'লি মহবুব। যে মরবার জন্যে একেবারে পুরোপুরি তৈরী হয়েছে তাকে তুই ছোরা দিয়ে ভয় দেখাতে যাস ?—তোর এতখানা বয়স হ'ল, মরিয়া লোক কখনো চোখে দেখিস নি ? ও যে মরবার জন্যে মরিয়া হয়েছে রে !"

"তা' বলে না খেয়ে মরবে ?"

"তাই ব'লে ছোরা মেরে মারবি ?"

মারবে যে কত তা বুঝতে আর বাকি নেই! ধপ ক'রে মহবুব ভূমির উপর ব'সে পড়ল। তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু এবং পেশীগুলো অকস্মাৎ যেন ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকবার মতোও ক্ষমতা তার ছিল না। মানুষ যখন সহসা তার শক্তির সীমান্তে উপস্থিত হ'য়ে দেখে যে, সেইখানেই শেষ, আর এক ইঞ্চিও

বাড়বার উপায় নেই, তখন তার এমনি অবস্থাই হয়। ভয় দেখিয়ে যখন ভয় পাওয়ানো যায় না তখন সে নিজেই ভয় পেয়ে যায়। সেই জন্য বুদ্ধিমানেরা শেষ অস্ত্র সহজে ছাড়তে চায় না।

সন্ধ্যার উপর মহবুবের ক্রোধ আবার জেগে উঠল। কিন্তু সে ক্রোধের প্রকাশ যে কী ভাবে করবে তা ভেবে পেলে না। বুকের উপর ছোরা বসানো ব্যর্থ হ'লে মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়েও লাভ নেই। সে গফুরের দিকে বিহ্বল-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তা হলে যা হয় একটা উপায় কর।"

"করছি, তুই একটু আড়ালে যা।" ব'লে গফুর সন্ধ্যার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু উপায় তো সেদিন হ'লই না—অধিকন্তু তারপর দু'দিনেও হ'ল না। অথচ অবস্থা এরকম হ'য়ে এল যে, মৃত্যু যেন আসন্ন। হাত পা শীতল, চক্ষু মুদিত, নিঃশ্বাস এত ক্ষীণ যে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ না করলে বোঝাই যায় না যে পড়ছে না বন্ধ হয়েছে। আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, উপরোধ, ভয়প্রদর্শন, বলপ্রকাশ সবই ব্যর্থ হয়েছে। কোনো ঔষধেই কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় নি। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিশে খবর দেওয়া—কিন্তু সে তো একরকম গর্দান দেওয়ারই সামিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর দুই ভাইয়ে ব'সে চিন্তায় আকুল হ'য়ে উঠেছে, এমন সময়ে হাসতে হাসতে প্রবেশ করলে বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী এবং তার পিছনে পিছনে একটি যুবক।

যুবতীকে দেখে গফুরের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল,—বললে, "আমিনা, এলি না কি রে ?—আয় বোন, আয় !"

মহবুবের মুখ কিন্তু কঠিন হয়ে উঠল—বললে, "খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ এ-রকম এসে পড়লি যে ?" কথায় অপ্রসন্নতার সুর।

আমিনা হাসতে হাসতে বললে, "বা রে, বাপের বাড়ি আসব, ভাইয়ের বাড়ি আসব তা আবার খত লিখে খবর পাঠিয়ে আসতে হবে না-কি ?"

গফুর বললে, "না, না, বেশ করেছিস এসেছিস। আমরা ভারি একটা ফ্যাসাদে পড়েছি—দেখি তুই যদি কোনো উপায় করতে পারিস।"

চিন্তিত-মুখে আমিনা বললে, "কী ফ্যাসাদ দাদা ? মা ভাল আছে তো ?"

গফুর বললে, "মা'র আর ভাল থাকা-থাকি কী ? বাতে পঙ্গু হ'য়ে পাথরের মতো প'ড়ে আছে।"

"ছোট বউ ? তার ছেলে পিলে ?"

"তারা সব মহবুবের শ্বশুর-বাড়ি।"

"তবে ফ্যাসাদ কিসের ?"

গফুর বললে, "বলছি। ইয়াসিন ভাই, পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এস, তোমাকেও সব কথা বলব।"

গফুর এবং মহবুবের আমিনা সহোদরা ভগ্নী, এবং ইয়াসিন তার স্বামী। মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামে ইয়াসিনরা সম্পন্ন গৃহস্থ।

ইয়াসিন প্রস্থান করলে গফুরের সম্মুখে ব'সে প'ড়ে আমিনা বললে," কী বল শুনি।"

গফুর সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা ব'লে বললে, "তুই একটু বিশেষ রকম চেষ্টা ক'রে দেখ যদি তাকে কিছু খাওয়াতে পারিস। একটু গরম দুধ খেলে এখনো বোধ হয় বাঁচে।"

আমিনা সব শুনে স্তব্ধ হ'য়ে একটু ব'সে রইল, তারপর বললে, "আমি এখনি চললাম—কিন্তু এ সব ব্যাপার তোমরা ছেড়ে দাও দাদা!"

মহবুব বললে, "তা হ'লে মরদের পোষাকও ছাড়তে হয়—ঘাগরা আর ওড়না পরতে হয়।"

আমিনা বললে, "ঘাগরা ওড়না না পরলে যদি এ সব ছাড়তে না পারো তা হ'লে ঘাগরা ওড়নাই পোরো।" ব'লে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলে।

ছয়

পরদিনের কথা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে লঘু মেঘের হালকা বর্ষণ হ'য়ে গেছে—অপরাহ্নের দিকে আকাশ নির্মল, বায়ুতে মৃদু শৈত্যের স্পর্শ। আমিনা গফুরের অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাকে তার কারাকক্ষ থেকে বার ক'রে বাড়ির পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে এসে বসেছে। তিরোবিয়ায় এসে পর্যন্ত সন্ধ্যার এই প্রথম বায়ু সেবন করবার জন্য বাইরে এসে বসা। গফুর বারংবার আমিনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে, সন্ধ্যা যেন কোনো গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে না পড়ে,—আর একান্তই যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে তো তার দূরসম্পর্কীয়া ননদ ব'লে যেন পরিচয় দেয়—দু'দিনের জন্য তিবোবিয়ায় বেড়াতে এসেছে।

সন্ধ্যাকে লক্ষ্য ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমাকে ভাল মেয়ে ব'লেই জানি হামিদা, কিন্তু তবু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, হঠাৎ যদি কোনো লোকজনের সামনে পড় তো চেঁচামেচি ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না। তাতে কোনো ফল হবে না, লাভের মধ্যে আমি তোমাকে মহবুবের হাতে একেবারে ছেড়ে দোবো—তারপর সে তোমাকে বনের মধ্যেই নিয়ে যাক বা আর কোথাও লুকিয়ে রাখুক। চেঁচামেচি ক'রলে ফল হবে না কেন বলছি জানো? আমাদের এ গাঁয়ে যে কয়েকজন লোক বাস করে সব এক বাড়ির মতো—সকলেরই এক পেশা, এক পরামর্শ। কেউ কারোর শত্রুতা করবে সে উপায় নেই।"

অন্যদিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমি তো বাইরে যেতে চাচ্ছিনে।"

"চাচ্ছ না, কিন্তু যাচ্ছ তো? সেই জন্যে হুঁসিয়ার ক'রে দিলাম।"

উত্তরে আমিনা ব'লেছিল, "তুমি মিছে ভয় করছ ভাইজান, হামিদা ভারি ভালো মেয়ে।"

গফুর হেসে উত্তর দিয়েছিল "আমিই কি হামিদাকে মন্দ বলছি। বাঘের মুখ থেকে হঠাৎ ছাড়ান পেলে হরিণ তড়বড়িয়ে পালিয়েই থাকে—তাই ব'লে কি তাকে মন্দ বলবি আমিনা। আচ্ছা তোরা যা, একটু ফাঁকে গিয়ে বোস,—আমি এখানে আছি, কোনো ভয় নেই।"

দূরে তালবনের পাশে ঘন নীল বর্ণের গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছিল—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা সন্ধ্যার দুইটি চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে টপ্ টপ্ ক'রে দু'-চার ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ল।

ব্যস্ত হ'য়ে আমিনা বললে; "তুমি কাঁদছো হামিদা? কাঁদছো কেন তুমি?"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে সন্ধ্যা বললে, "কেন তুমি আমাকে অমন ক'রে কাল বাঁচালে আমিনা? কাল যদি আমাকে না বাঁচাতে তা হ'লে আজ হয়তো এতক্ষণে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে আমিনা বললে, "নিশ্চিন্তই যে হ'তে তা কী ক'রে বলছো হামিদা? তোমাদের হিন্দুদের শাস্তরে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ। পাপীরা মারা গেলে কোথায় যায় তা জান তো?"

"জানি, নরকে। কিন্তু সে কি এর চেয়েও খারাপ?"

"কিন্তু এখানেই যে চিরকাল তুমি থাকবে তা কেমন ক'রে জানলে?"

সন্ধ্যা আমিনার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সজোরে তার দু-হাত চেপে ধরলে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "এখান থেকে আমি উদ্ধার হবো আমিনা? বল, বল, সত্যি ক'রে বল—হবো?"

"খোদাতালার মর্জি হ'লে হ'তে পারো।"

এবার দুই হাত দিয়ে সন্ধ্যা আমিনার দেহ জড়িয়ে ধরলে—বললে, "কে আমাকে উদ্ধার করবে ভাই? তুমি?"

সন্ধ্যার আকুলতা দেখে আমিনার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল, মুখে কিন্তু মৃদু হাসিও দেখা দিলে—বললে, "আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে কী ক'রে উদ্ধার করব হামিদা?"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "না আমিনা, তুমি সামান্য মেয়েমানুষ নও—একমাত্র তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পার! তোমার দাদারা তো দস্যু—জানোয়ারের মতো—তাদের কাছ থেকে কখনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারি নে।"

কপট কোপ প্রকাশ ক'রে আমিনা বললে, "বেশ মেয়ে তো তুমি?—আমার

দাদাদের দস্যু জানোয়ার ব'লে গালি দেবে আর আমি তোমাকে উদ্ধার করব ?" তারপর সহসা কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে নিয়ে বললে, "মহবুবের কথা তুমি যাই বলতে চাও বল, কিন্তু গফুর তো একেবারে নির্দয় নয় হামিদা ?"

তা যে নয়, সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। নিমেষের মধ্যে গত মাস খানেকের ঘটনাবলী মনে মনে ভেবে নিয়ে সন্ধ্যা দেখলে গফুর তার প্রতি মাঝে মাঝে সদয় ব্যবহারও করেছে। মহবুবের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে মহবুবের সঙ্গে সে বচসা করেছে, অনশন-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে বলপ্রয়োগ না ক'রে সুমিষ্ট বচনেই তাকে আহার করাতে চেষ্টা করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত আমিনার নির্বন্ধে সে যে আহার করতে বাধ্য হয়েছিল তার মূলে যে গফুরের আগ্রহই বর্তমান ছিল সে কথা জানতেও তার বাকি নেই। মাঝে মাঝে গফুর প্রয়োজনের অনুরোধে বজ্রনাদ করেছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বজ্রপাত করেনি।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আমাকে মাপ করো আমিনা, গফুরের বিষয়ে আমার ও কথা বলা অন্যায় হয়েছে।" তারপর হঠাৎ মনের মধ্যে একটা কথা উদয় হ'তে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আমিনা, কখনো যদি তেমন দরকার হয় তো গফুরকে আমার কী ব'লে ডাকা উচিত ?"

একটু ভেবে আমিনা বললে, "গফুর ব'লেই ডাকতে পারো, আর, বয়সের জন্যে কিংবা অন্য কোনো কারণে বুড়োমানুষকে যদি একটু খাতির করতে ইচ্ছে হয় তা হ'লে গফুর মিঞা ব'লে ডেকো।"

"গফুর মিঞা ? মিঞা মানে কি ?"

"তোমাদের যেমন বাবু, আমাদের তেমনি মিঞা।"

মিঞা কথাটা সন্ধ্যার একেবারে অপরিচিত না হ'লে তার যথার্থ প্রয়োগ সে জানত না। আমিনার মুখ থেকে শোনবার পর বার পাঁচ-সাত মনে মনে আবৃত্তি ক'রে রাখলে।

আমিনা বললে, "হামিদা, আমার একটি অনুরোধ রাখবে ভাই ?"

"কী বল ?"

"তোমার নাম আমাকে বলবে ?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল, বললে, "কী হবে ভাই, আমার নাম জেনে ? সে মানুষও আমি এখন নই, সে নামেও আর দরকার নেই। এখন আমার হামিদা নামই ভালো।"

"কিন্তু হামিদা তো আর তোমার আসল নাম নয়—জোর ক'রে দেওয়া নাম। তোমার আসল নাম তুমি আর-কাউকে না বলতে চাও—শুধু আমাকে বল। আমি শপথ ক'রে বলছি, কাউকে আমি তোমার সে নাম বলব না। কাল থেকে যতবারই তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকছি, মনে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছি নে।"

"তৃপ্তি পাচ্ছ না ? কেন, আমি তো হামিদা ব'লে ডাকলেই সাড়া দিচ্ছি ?"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "তা দেবে না কেন। এই ধর, আমার নাম তো আমিনা, কিন্তু আমার আসল নাম জানতে না পেরে তুমি যদি আমাকে যশোদা ব'লে ডাকতে তা হ'লে আমিও হয়তো সাড়া দিতুম, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যা-তা একটা নামে ডেকে পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে কি ? তা'ছাড়া হামিদা, তোমার আসল নাম বলতে ভয়ের তো কোনো কারণ নেই। আমরা তো আর তোমার নাম টের পেলে পুলিশে গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসছিনে। বরং সে ভয় আমাদেরই আছে যে তুমি কোনোদিন ছাড়া পেলে আমাদের নাম পুলিশে লিখিয়ে দিতেও পারো। অথচ আমরা তো তোমার কাছে আমাদের আসল নাম লুকোচ্ছি নে।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ পুনরায় আরক্ত হ'য়ে উঠল। ম্লান হাসি হেসে সে বললে, "ভয়-টয় কিছু নয় আমিনা, তোমাকে এখনি বললাম তো ভাই, মনে হয়, যখন আগেকার জীবনে আর আমার অধিকার নেই, তখন আগেকার নামেও নেই। তোমাদের এই জেলখানায় আমাকে সে নামে তুমি নাই ডাকলে ভাই!" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার দুই চক্ষু থেকে টপ্ টপ্ ক'রে পুনরায় কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর সযত্নে একটি হাত রেখে আমিনা বললে, "কষ্ট যদি হয়, থাক ব'লে কাজ নেই।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সন্ধ্যা বললে, "না, তুমি যখন জানতে চাইছ তখন বলছি। আমার নাম সন্ধ্যা।"

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সহাস্য মুখে বললে, "সন্ধ্যা ? চমৎকার নাম তো! ও মা, যেমন স্বভাব, তেমনি নাম!"

আমিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে সন্ধ্যা বললে, "তা নয় ভাই, যেমন অদৃষ্ট তেমনি নাম।"

এ কথাও সত্য। আমিনার দুই চক্ষু সজল হ'য়ে এল। সেও দুই হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে নীরবে ব'সে রইল। দূরে গিরিমালা এবং তালবন ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ধূসর হ'য়ে আসছিল, একদল গো-মহিষ অন্য গ্রাম থেকে এ অঞ্চলে চরতে এসেছিল, গলায় বাঁধা ঘণ্টায় সন্ধ্যার আগমনী বাজিয়ে তারা ফিরে চলেছিল গৃহাভিমুখে, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছিল দুটি ভীল বালক মিঠি সুরের বাঁশি বাজিয়ে। বহুক্ষণ কেটে গেল—বেদনা-সমবেদনার যুক্ত ক্রিয়ায় সম্মিলিত দুইটি নারী ভাষা হারিয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ হ'য়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

মৌন ভঙ্গ করলে সন্ধ্যা। আমিনার বাহুবন্ধন থেকে সহসা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমিন', একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে ?"

"দোবো—কী কথা বল ?"

"তুমি আমাকে ভালোবেসেছো—না ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা যেন ধপ্ ক'রে আকাশ থেকে পড়ল ;—সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, "শোন কথা। দেখা তো মোটে কাল থেকে, এর মধ্যে ভালবাসলাম কখন ?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল—অধীর কণ্ঠে বললে, "বাস নি ? সত্যি বলছ, বাস নি ?"

"রোসো, একটু ভেবে দেখি।" ব'লে ক্ষণকাল মনে মনে কী যেন তলিয়ে দেখে আমিনা বললে, "তোমার দুরবস্থা দেখে মনের মধ্যে একটু দয়া হয়েছে বটে—কিন্তু ভালোবাসা ?—কই, না !"

সন্ধ্যার চোখ মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল। সবলে মাথা নেড়ে সে বললে, "দয়া নয়, দয়া নয়। সে যদি হ'য়ে থাকে তো তোমাদের ঐ গফুর মিঞার হয়েছে !" তারপর সহসা আমিনার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বক্ষের মধ্যে মুখ ঘসতে ঘসতে বললে, "আমাকে শুধু দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না আমিনা, কখনই পারবে না ; ভালবেসে হয়তো পারবে !"

আমিনা দুহাতে সন্ধ্যার মুখ তুলে ধ'রে বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় ভালবাসাই যাবে। এখন চল, তোমাকে, ঘরে পুরে তালা দিই,—মহবুব কখন এসে পড়ে কিছু বলা যায় না তো !" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "বেসেছি সন্ধ্যা খোদা-কশম তোমাকে ভালোবেসেছি !"

সাত

রাত্রে যখন মহবুব ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখলে আমিনা তার জন্য আহার্য সাজিয়ে ব'সে রয়েছে। টপ্ ক'রে খাবারের সামনে ব'সে প'ড়ে বললে, "এ-সব খাবার তুই রেঁধেছিস না-কি রে আমিনা ?"

আমিনা বললে, "আমি দু'দিনের জন্য এসে তোমাদের ব্যবস্থায় গোল বাধাব কেন ? রহিমের মা খাবার দিয়ে গেছে—আমি শুধু বেড়ে দিয়েছি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে মহবুব আহারে নিবিষ্ট হ'ল। প্রথমে সে ক্ষুধার্ত পশুর মতো এক রাশ খাদ্য উদরসাৎ করলে, তারপর জঠরাগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে আমিনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হালচাল আমিনা ?"

"কিসের হালচাল ?"

মহবুবের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হ'য়ে উঠল—"কিসের আবার ? হামিদার।"

সহজভাবে আমিনা বললে, "হামিদার আবার হালচাল কী ?—যেমন আমরা রেখেছি তেমনই আছে। খাওয়া-দাওয়া করছে— ।"

"সে কথা জিজ্ঞেস করছিনে—পোষ-টোষ মানল কি-না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আমিনার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিলে—বললে, "তোমার বয়স হ'ল কিন্তু বুদ্ধি হলো না মহবুব ভাই, কী যে বলো তার ঠিক নেই!"

মহবুব গর্জন ক'রে উঠল—"চুপ কর, চুপ কর। ভারি কাজিল হয়েছিস! ছেলেবেলায় শ্বশুরের কাছে ছাই পাঁশ কী দুখানা বই পড়েছিলি, তাই তোর বুদ্ধির শেষ নেই—আর আমরা সব মুখ্খু!"

আমিনা পূর্বের মতই হাসতে হাসতে বললে, "মুখ্খু তো নও, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কথা বল না কেন? আচ্ছা একটা জঙ্গলের জানোয়ারকে পোষ মানাতে কত দিন লেগে যায়, আর একটা মেয়েমানুষ একদিনে পোষ মানবে?"

মহবুব তর্জন ক'রে উঠল, "তা ব'লে পাঁচ দিনের বেশি আমি সবুর মানব না তা ব'লে রাখছি। তার মধ্যে তোর চিড়িয়া পোষ মানলে তো ভাল, নইলে আমি তার সুরুয়া ক'রে তবে ছাড়ব!"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "একবার তো সুরুয়া করতে গিয়েছিলে,—পেরেছিলে কি? ওই তো তোমাকে কাবাব ক'রে ছেড়েছিল। আমি যদি হঠাৎ না আসতাম, এতদিন পুলিশের হাতে পড়তে।" তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে গাঢ় স্বরে বললে, "না, না, ভাইজান, ছেলেমানুষি কোরো না। তুমি হামিদাকে চেনো না—ও একেবারে কেউটে সাপের জাত—সব ভালো মেয়েই তাই—ওকে ভয় দেখিয়ে তুমি বশে আনতে পারবে না। তুমি যদি ওকে সাদি করতে চাও—বেশ তো ওকে খুসি করো, রাজি করো, আমার ওজোর নেই। কিন্তু জুলুম ক'রে তুমি ওকে পাবে না।"

মনে মনে আমিনার মুণ্ডপাত ক'রে মহবুব বাকি আহারটা শেষ করলে। তারপর অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "গফুরকে দেখছিনে যে? গফুর কোথায় গেল?"

"তার তবিয়ৎ ভাল নেই, ঘরের ভিতর শুয়েচে।"

"হামিদার ঘরের চাবি কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহবুব বললে, "কই দে আমাকে।"

আমিনা ঈষৎ দৃঢ় স্বরে বললে, "চাবি নিয়ে এখন কী করবে?"

মহবুব উষ্ণ হ'য়ে উঠল; বললে, "সে কৈফিয়ৎও তোকে দিতে হবে না-কি?"

"কৈফিয়ৎ আবার কী? এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

"হামিদাকে রাজি করব।"

সজোরে মাথা নেড়ে আমিনা বললে, "কখনো না। তুমি হামিদাকে রাজি করবে, আর আমি সমস্ত রাত সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবো, তা কিছুতে পারব না। দেখ, ভাইজান, সমস্ত দিন খেটেখুটে এলে এখন সারা রাত আঙ্গনে শুয়ে

ঘুমোও গে। শরীরটাকে রাখতে হবে তো? কাল সমস্ত রাত হামিদাকে নিয়ে কেটেছে; আমার নিজের শরীর ভাল নেই—আমি আজ সমস্ত রাত ঘুমোতে চাই।"

"তুই ঘুমো গে, মর গে, যা ইচ্ছে হয় কর গে। কিন্তু পাহারা দিবি কেন শুনি?"

সহাস্যমুখে আমিনা বললে, "শোন কথা। বাঘ যাবে হরিণকে রাজি করাতে আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবো?—পাহারা দোবো না?"

মহবুব তার ডান পা'টা সজোরে মাটিতে ঠুকে একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বললে, "খালি পেটে বাড়ি ফিরেচি ব'লে তোর ভারি সাহস হয়েচে দেখচি! চললুম খেয়ে আসতে। আগে তোকে খুন ক'রে তারপর তালা ভেঙে হামিদাকে খুন করব।"

আমিনা আবার হাসতে লাগল। বললে, "বেশ তো, আমিও চললাম হামিদার ঘরের দরজার সামনে শুতে। তুমি এসে দেখবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি ঘুমিয়ে আছি। দেখি, কত বড় মুরোদ তোমার, কেমন তুমি আমাদের খুন কর! কেন, মহবুব ভাই, খালি পেটে বোনের উপর তোমার ছোরা চলে না না-কি? ব'লে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

আমিনার মুখের সম্মুখে ডান হাতের বদ্ধ-মুষ্টি একবার আস্ফালিত ক'রে বিড়-বিড় ক'রে কী বলতে বলতে মহবুব প্রস্থান করলে; তারপর হাত মুখ ধুয়ে একটা বড় লাঠি কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনাও তাড়াতাড়ি আহার সমাপন ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। একবার ভাবলে সন্ধ্যাকে ডেকে একটু তার সাড়া নেয়, কিন্তু ঘর একেবারে নিঃশব্দ; নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ভেবে আর তাকে বিরক্ত করলে না।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনো ঘুমোয় নি; স্তব্ধ হ'য়ে ঘরের মেঝেয় ব'সে একটি গবাক্ষের দিকে চেয়ে ছিল। তার অন্ধকার কক্ষের সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে বহির্জগতের সামান্য একটি অংশ দেখা যাচ্ছিল—একখণ্ড আকাশ, এবং তার মধ্যে জ্যোৎস্না-কিরণে মৃদু-হিল্লোলিত কয়েক গাছি তরুশির। গবাক্ষটি উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং পাশে ব'সে বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করবার সুবিধা ছিল না, ঘরের মেঝেয় ব'সে যতটুকু দেখা যায় নির্নিমেষ নেত্রে সন্ধ্যা তাই দেখছিল। তার মনের ভিতরকার অবস্থাও আজ কতকটা সেই ধরণের। সেখানেও আজ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটি আলোকের রেখা নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে আশা জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে ছিল শুধু অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতিত মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা—মৃত্যু ভিন্ন যা থেকে উদ্ধারের উপায়ান্তর ছিল না—সেখানে আমিনা এনেছে মুক্তির কল্পনা। স্পষ্ট ক'রে সে কিছু বলেনি, কোন অঙ্গীকার করেনি, ত মনে হয় সে তাকে উদ্ধার করবে, কেন না সে তাকে ভালোবেসেছে।

জীবন-ধারার একটা অতি আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্তনে হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল, পূর্ব জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আজ আবার তারা ধীরে ধীরে জেগে উঠল। আবার নূতন ক'রে নূতন ভাবে মনে পড়ল বাপ-মাকে, মনে পড়ল ভাই-বোনকে, মনে পড়ল শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে। তারপর যাকে মনে পড়ল তার কথা মনে করতে তার অঙ্গ বিকল হ'য়ে এল, চক্ষে বইল অশ্রু-ধারা। তার বিরহ-পীড়িত চিত্ত বলতে লাগল—ওগো, তুমি অত অল্প সময়ের মধ্যে এত যাকে ভালোবেসেছিলে তাকে হারিয়ে কী ক'রে দিনাতিপাত করছ? ঘুরে বেড়াচ্ছ কি 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' ক'রে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদীর তীরে-তীরে? রাত্রি কাটছে কি জেগে জেগে তার কথা স্মরণ ক'রে? দিন কাটছে কি সে অভাগিনীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায়, আকুল অন্বেষণে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিবিড়তর ভাবে সেটা চিন্তা করবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। চিন্তাবিলাসে সে তখন আত্মহারা! মনে হ'ল যেন মুক্তি লাভ ক'রে কলিকাতায় উপস্থিত হয়েছে, সমস্ত দিন কাটল বাইরে বাইরে আকুল প্রতীক্ষায়, রাত্রে প্রিয়লালের সহিত দেখা! ঘরে প্রবেশ করতেই দুটি উদ্যত-ব্যাকুল বাহুর মধ্যে সহসা বন্দী! উঃ! অত উগ্র উল্লাসের প্রকোপ সহ্য হবে কি? দু'হাত দিয়ে সন্ধ্যা তার দ্রুতস্পন্দিত বুকটা সজোরে চেপে ধরলে।

তারপর সহসা কোন্-এক মুহূর্তে অতর্কিতে নিদ্রা এসে জাগ্রৎ স্বপ্নকে টেনে নিয়ে গেল স্বপ্নেরই বাস্তব জগতে।

আট

মনের মধ্যে একটা লঘু সুখের হিল্লোল বহন ক'রে প্রত্যূষে সন্ধ্যার ঘুম ভাঙল। নিদ্রায় দেখা সুখস্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির চেয়ে খুব যে এমন কিছু বেশি তার মূল্য, তা নয়; কিন্তু তবু যেন জমাট দুঃখের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে ঝির্-ঝিরে একটু হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে—যেন ঈষদুন্মুক্ত কারাদ্বারের ফাঁক দিয়ে বাহিরের লতাপুষ্পময়ী প্রকৃতির সামান্য একটু অংশ দেখা গিয়েছে। তালা খুলে আমিনা যখন আহ্বান করলে, 'বেরিয়ে এসো সন্ধ্যা', তখন সে লঘুপদে আমিনার নিকট উপস্থিত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে তাকে জড়িয়ে ধরলে; বললে, "রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল আমিনা?" অর্থাৎ যে প্রশ্নটা আমিনারই তাকে করবার কথা, মনের প্রসন্নতায় সে প্রশ্ন সে নিজেই আমিনাকে ক'রে বসল।

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "কোথায় হয়েছিল? তোমার ভাবনায় সমস্ত রাত ঠায় জেগে ব'সে ছিলাম।"

কথাটা যে রসিকতা তা অনুমান ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হেসে বললে, "রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল—না?"

"সে ছিল তোমার ঘরে, বাইরে তো বিষম গুমোট ছিল।"

এটাও যে রসিকতাই হতে পারে অতখানি ভাববার সাহস না পেয়ে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, "সে রকমও হয় না কি ?"

সন্ধ্যার হৃদয়ের এই অকুণ্ঠিত সরলতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমিনার চক্ষু সজল হ'য়ে এল ; বললে, "সব হয়! এখন এসো, তোমার কাজ কর্ম সেরে দিয়ে এক রাশ বাসন নিয়ে আমাকে আবার পুকুরে যেতে হবে। কাল রাত থেকে দবিরের জ্বর হয়েছে, কাজে আসে নি।"

আগ্রহান্বিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "আমাকেও নিয়ে চল না আমিনা, আমরা দু'জনে মিলে বাসনাগুলো মেজে ফেলি!"

একটু কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে আমিনা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বিস্ময়ের স্বরে বললে, "শোন কথা! হিঁদু ঘরের মেয়ে হ'য়ে তুমি মুসলমানের এঁটো বাসন মাজবে কী গো ?"

আমিনার ধমকে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় শুধু আমার আর তোমার বাসনগুলো আমাকে দিয়ো—আমি সেইগুলোই মাজব।"

এবার আমিনা সজোরে হেসে উঠল ; বললে, "এ কিন্তু বেশ কথা বলেছ সন্ধ্যা! তুমি আমি এক জাত, সেই জন্যে আমাদের দু'জনের বাসন তুমি মাজবে— আর মহবুব গফুর এরা সব অন্য জাত, তাই তাদের বাসন মাজব আমি—না ?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্মিতমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললে, "তুমি বিশ্বাস করবে কি না বলতে পারিনে আমিনা, তোমার বাসন মাজতে আমার মনে কিন্তু একটুও বাধা নেই।"

আমিনা বললে, "আচ্ছা, তা হয়তো নেই, কিন্তু তাই ব'লে আমি তোমাকে বাসন মাজতে দোবো কেন। ও কি তোমার কাজ ? তুমি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ—তুমি কি ও কাজ কখনো করেছ ? তার চেয়ে চল, পুকুরঘাটে ব'সে তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে, আর আমি তোমার গল্প শুনতে শুনতে বাসনাগুলো মেজে ফেলব। বলতো আমি গফুর ভাইয়ের মত নিয়ে আসি।"

অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে চল।"

"কিন্তু কেউ তোমাকে পুকুরঘাটে দেখে ফেললে তুমি আমার কে হও বলবে, বল তো ?"

সলজ্জ হাস্যের সহিত সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "ননদ ?"

"ননদ কেন ? ননদ তো পর হ'য়ে অন্য বাড়ি চ'লে যায়। তার চেয়ে জা বোলো। তবু পাতানো সম্পর্কে মনে-মনেও এক সঙ্গে থাকা যাবে।"

ক্ষণকাল একটু কী চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু জা তো বিয়ে না হ'লে হয় না—ননদ আইবড়োও হ'তে পারে।"

জা কথাটা সন্ধ্যার মনে কোন্‌খানে বাধছে বুঝতে পেরে আমিনা বললে,

"কিন্তু তোমার স্বামীকে আমার স্বামীর ছোট ভাই ব'লে ধরলেও তো কোনো ক্ষতি হয় না সন্ধ্যা।"

আমিনার কথায় সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; মৃদু স্বরে বললে, "না, তা হয় না।"

হাসিমুখে আমিনা বললে, "বেশ, তা হ'লে কারো সামনে প'ড়ে গেলে দু'জনেই দু'জনের জা হব—কেমন?" তারপর সন্ধ্যার সীমান্তের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ননদ হ'লেও তো তুমি আইবড়ো ননদ হ'তে পারতে না সন্ধ্যা? সিঁতেয় সিঁদুর রয়েছে যে।"

অপহৃত হবার পর থেকে কোন দিনই সন্ধ্যা নূতন ক'রে সীমন্তে সিঁদুর দিতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু সিঁদুর তার মাথায় ছিল সেটুকুকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। ধুয়ে যাবার আশঙ্কায় স্নান করবার সময়ে মাথার সম্মুখ দিক জলে ভিজতে দেয় নি, ঝ'রে যাবার ভয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ায় নি, তা ছাড়া কেশগুচ্ছের মধ্যে সর্বদা তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্বপ্রকার বাহিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। এই সিঁদুরের বিন্দুটি তার বিবাহিত জীবনের পরিচিত—তার দাম্পত্য-দলিলপত্রের শীলমোহর, তার আয়তির সঙ্কেত।

আমিনার কথা শুনে নিরুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "এখনো দেখা যায়?"

সন্ধ্যার সীমন্তে পুনরায় দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা বললে, "ঠাওর ক'রে দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে। সিঁদুর পরবে সন্ধ্যা? জোগাড় ক'রে দেবো?"

শুনে সন্ধ্যার চোখে জল দেখা দিলে; বল'ল, "যদি কোন দিন এখান থেকে মুক্তির জোগাড় ক'রে দিতে পার সেদিন সিঁদুরও জোগাড় ক'রে দিয়ো ভাই, এখন থাক।"

গফুরের অনুমতি পেতে বিলম্ব হ'ল না, বাসন-পত্র নিয়ে আমিনা ও সন্ধ্যা পুকুর-ঘাটে গিয়ে বসল। সন্ধ্যার নির্বন্ধ সত্বেও আমিনা কিছুতেই তাকে বাসন স্পর্শ করতে দিলে না;—বল্লে, "বেশি যদি দুষ্টমি করো, ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে আসব। আমার পাশে ব'সে লক্ষ্মী হ'য়ে গল্প কর।"

বাসন মাজার কাজে অংশীদার হবার কোনো আশা নেই দেখে অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে তুমিই গল্প বল আমিনা।"

"কিসের গল্প বলব বল?"

"তোমার স্বামীর গল্প।"

বিস্ময়ের সুর টেনে আমিনা বললে, "স্বামীর গল্প? স্বামী বাঘ না ভালুক, ভূত না প্রেত যে স্বামীর গল্প করব? তার চেয়ে একটা ভূতের গল্প বলি।"

সন্ধ্যা বললে, "ভূতের গল্প রাত্রে বোলো, ভালো লাগবে।"

"তা হলে রাজকুমারীর গল্প বলি শোন।" ব'লে সন্ধ্যার মতামতের জন্য অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, "এক ছিল পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, তার বিয়ে

হ'ল এক দেশের এক রাজকুমারের সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হ'য়ে গেল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার তার বাড়ি ফিরে চলেছে, এমন সময়ে পথে ডাকাতের দল প'ড়ে রাজকুমারীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরের দেশে। সেখানে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে দুঃখে-কষ্টে রাজকুমারী একদিন প্রাণ দিতে তৈরি হয়েছে, এমন সময়ে সে বাড়িতে অন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির।—"

আমিনাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "সে মেয়েটির নাম আমিনা। আর সেই হরণ ক'রে আনা হতভাগিনী রাজকন্যার নাম সন্ধ্যা। প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে সন্ধ্যা একেবারে দৃঢ় সঙ্কল্প, এমন সময় যাদুকরী আমিনা তার কানে এমন সব মন্ত্র ঝাড়লে যে, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখে বড় একবাটি দুধ একেবারে শেষ হ'য়ে গেল। তারপর এক নিশীথ রাত্রে কী রকম অদ্ভুত উপায়ে ডাকাতের বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আমিনা সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠালে সে গল্প শুনবে ভাই?"

সকৌতুকে আমিনা বললে, "বেশ তো বল, শুনব।"

বলা কিন্তু হ'য়ে উঠল না, পদশব্দে উভয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখলে মহবুব আসছে। মহবুবকে দেখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি দেহের বস্ত্র সংযত ক'রে নিয়ে পুষ্করিণীর জলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্নরাজ্যের আলো গেল মিলিয়ে—চোখে-মুখে ফুটে উঠল অকরুণ কাঠিন্য।

নিকটে এসে মহবুর বললে, "হামিদাকে এখানে এনেছিস যে আমিনা?"

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "তা হামিদা চিরকালই তালাচাবির মধ্যে বন্ধ থাকবে না-কি?"

আমিনার কথায় আশ্বাস পেয়ে খুসি হ'য়ে মহবুব বললে, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" তারপর একটু কেশে আমিনার মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে মুখ-চক্ষুর বিশেষ ভঙ্গি এবং মস্তকের বিশেষ সঞ্চালনের দ্বারা আমিনাকে যে নিঃশব্দে প্রশ্ন করলে, তার অর্থ, পোষ মেনে এল?

উত্তরে আমিনা তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর একটুখানি অগ্রভাগ দেখিয়ে যে কথা ব্যক্ত করলে, তার অর্থ, সামান্য একটু।

তর্জনীর অতটুকু অংশ দেখে মহবুবের পিত্ত উঠল জ্বলে। মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল মুখের প্রসন্ন কোমল ভাব। দক্ষিণ পদ সজোরে মাটিতে ঠুকে কঠোরস্বরে গর্জন ক'রে উঠল, "তোর বদমায়সী আমি সব বুঝতে পেরেছি, তুই আসল শয়তান।"

আমিনার চক্ষু-কণিকা জ্বলে উঠল। হাতের বাসনটা একটু ঠেলে দিয়ে পিছন ফিরে ব'সে বললে, "তোমার যখন বোন, তখন ও কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মনে রেখো মহবুব ভাই, আমি আমার শ্বশুরের পুত্রবধূ।"

মহবুব ব্যঙ্গভরে বললে, "ওঃ! ভারী শ্বশুর! একেবারে দবীপুরের নবাব!"

"না, দবীপুরের নবাব নয়, কিন্তু দবীপুরের ডাকাতও নয়,—ভদ্রলোক!"

"খানদানি বংশ !"

আমিনা কঠোরস্বরে উত্তর করলে, "খানদানি বংশ তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর ইজ্জতের জ্ঞান এত বেশি যে, আমাকে শয়তান বলেছ শুনলে তাঁর বাড়িতে তোমার তলব পড়বে !"

আমিনার অগ্নিমূর্তি দেখে মহবুব তার সঙ্গে আর কোনও কথা না ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "হামিদা !"

সন্ধ্যা বিবর্ণমুখে ফিরে দেখলে।

মহবুব বললে, "আজ রাতে আমি দারু পিয়ে বাড়ি ফিরব ! তুমি তৈয়ার হ'য়ে থাকবে। সেদিনের মতো আজ আমি তোমার ঘরে শোব। দরজা খুলতে গোল করলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দোবো। বুঝলে ?"

উত্তর দিলে আমিনা। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বুঝলাম !" তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললে, "তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ো হামিদা, আমি সারারাত তোমার দরজায় পাহারা দোবো। দেখি কে কী করে !"

মহবুব গর্জন ক'রে উঠল, "আচ্ছা, আমিও দেখব তুই কত বড়—" সেই শয়তান কথাটাই পুনরায় মুখে আসছিল—কিন্তু ও কথাটা উচ্চারণ করলে আমিনার শ্বশুরবাড়িতে তলব পড়বার কথা উঠেছে—সুতরাং ওটা মুখেই আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনো কথাও মনে এল না যাতে উষ্মা প্রকাশ হয় অথচ আমিনার শ্বশুরবাড়িতে তলব পড়বার কথা ওঠে না। অগত্যা আমিনার প্রতি তীব্র দৃষ্টির একটা অগ্নিবর্ষণ ক'রে বকতে বকতে মহবুব প্রস্থান করলে।

আমিনা আবার পূর্বস্থানে উপবেশন ক'রে বাসন হাতে নিয়ে সহজ কণ্ঠে বললে, "নাও সন্ধ্যা, এবার তোমার মুক্তির গল্প আরম্ভ কর।"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখে একটা বিশীর্ণ হাসি ফুটে উঠল। আমিনা বুঝতে পারলে যে-স্বপ্ন নিষ্ঠুর আঘাতে বিলুপ্ত হয়েছে সে আর শীঘ্র ফিরে আসবে না।

নয়

দ্বিপ্রহর। মহবুব সকাল সকাল খেয়ে কাজে বেরিয়েছে, আমিনাও তার কোন্ এক বাল্য সঙ্গিনীর বাড়ি বেড়াতে গেছে ; যাবার সময়ে সন্ধ্যাকে ব'লে গেছে, ফিরতে বিলম্ব হবে না, ফিরে এসে তাকে নিয়ে পুকুর-ঘাটে গিয়ে বসবে।

সন্ধ্যার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল টানা। ঘরের ভিতর ভূমির উপর শুয়ে সে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, কলিকাতার কমলা গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী, ধনী ও বনেদী বংশের বধূ—এ কী তার দুর্দশা। চিরদিন আদরে যত্নে পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ—পিতামাতার আদরিণী কন্যা, স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়তমা ছাত্রী, শ্বশুর-গৃহে সকলের আদরের বউ—

সহসা কোন্ মহাপাপে সে বন্দিনী হ'ল ডাকাতের ঘরে ?—সেখানে তার সদ্য-বিকশিত নারীত্ব কি ঘৃণিতভাবে অপমানিত হ'ল, বিমর্দিত হ'ল। কিন্তু, কেন ? কোন্ অপরাধে ? যে প্রায়শ্চিত্ত এত ভীষণ ভাবে প্রকট হ'য়ে উঠল, চোখে তার পাপ দেখা যায় না কেন ? সহসা অন্তরের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে অতিক্রম ক'রে একটা তীব্র ক্রোধ জাগল, অভিমানে সমস্ত শরীরটা যেন ঝিঁঝিয়ে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হ'ল।

আচ্ছা, মৃত্যু হয় না কেন ? প্রাণটা কি এতই কঠিন বস্তু যে, কিছুতেই দেহ ছেড়ে বার হবে না ? এত দুঃখ অপমান বেদনাতেও না ? একজন সন্ধ্যা ম'রে গেলে পৃথিবীর কি এমন ক্ষতি হবে ?—কিছুই না। কিন্তু সে নিজে একেবারে বেঁচে যাবে। দুঃখ লাঞ্ছনার এই কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার কি কোন অর্থ আছে ? কিছু না। একবার তো সে জীবনটাকে শেষ করবার পথে যাত্রা করেছিল, কিন্তু আমিনা তার মধ্যে এসে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াল। সে যদি না আসত তা হ'লে এতদিনে হয়ত সন্ধ্যা এই অপবিত্র কারাগার হ'তে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করতে পারত। আমিনা বলে বটে সে সন্ধ্যাকে হয়ত একদিন মুক্ত করবে, কিন্তু সে তার মনের সদিচ্ছা মাত্র। হরিণী হ'য়ে বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার কোথায় ? এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত সে তাকে অনেকখানি আশ্রয় দিয়েছে সত্য, কিন্তু কতদিন এমন ক'রে আমিনা তাকে আগলে থাকবে ? একদিন হয়তো হঠাৎ তাকে শ্বশুরবাড়ি চ'লে যেতে হবে। সেইদিনই সন্ধ্যার আশ্রয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং যে আশ্রয় পাকা, যে আশ্রয় কোনো অবস্থাতে ভেঙে পড়বার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই, সেই আশ্রয়ের শরণ নিতে হবে। সে মৃত্যু।

আচ্ছা, দুঃখ বেদনার পীড়ন সহ্য করতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করে তাদের দুঃখ কি সন্ধ্যার দুঃখের চেয়েও বেশি ? কখনই নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কী হ'তে পারে। এই ঘরের মধ্যেই এমন কোনো উপায় আছে কিনা, যার সাহায্যে জীবনটাকে শেষ ক'রে ফেলা যেতে পারে তা দেখবার জন্যে উঠে ব'সে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করতেই সন্ধ্যা দেখলে বাহিরের বারান্দায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গফুর।

গফুর বললে, "এ সময়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন হামিদা ? রাত্রে তো নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমতে পার না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলে কেন ? শরীর ভাল আছে তো ?"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও।" ব'লে গফুর পিছন ফিরতেই শুনতে পেলে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর, "গফুর মিঞা।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিপাত ক'রে গফুর বললে, "গফুর মিঞা ! এ ডাক তোমাকে কে শেখালে ? আমিনা ?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর না দিয়ে আরক্তমুখে দৃষ্টি নত করলে।

গফুর বললে, "আচ্ছা, কী বলবে বল ?"

সন্ধ্যা গফুরের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "একবার ভিতরে এস।"

"ভিতরে ?"

"হ্যাঁ।"

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও গফুরের কৌতূহলও কম হ'ল না। ভিতরে কেন ? সে কথা তো জানলা দিয়েও অনায়াসে বলা যেতে পারত। শিকল খুলে ভিতরে গিয়ে সন্ধ্যার নিকট দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে গফুরের মত শক্ত লোকেরও বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হ'ল না। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রী ঠিক যেমন ক'রে দ্রুতবেগে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, তেমনি ক'রে সন্ধ্যা গফুরের উপর লাফিয়ে প'ড়ে দুই বাহু দিয়ে সজোরে তার দুই পা এমন জড়িয়ে ধরলে যে সাধ্য কি তার সেই সুদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে সহজে পা মুক্ত ক'রে নেয়। তারপর গফুরের পদদ্বয়ের উপর বিস্রস্তকেশ মাথা আকুলভাবে ঘসতে ঘসতে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলতে লাগল, "আমাকে বাঁচাও গফুর মিঞা!—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও! আমি জানি তোমার মনের মধ্যে দয়া আছে, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! আমি এমন ক'রে বেশিদিন বাঁচব না—গফুর মিঞা, আমাকে ছেড়ে দাও!"

জীবনে গফুর অনেককে বিপন্ন করেছে কিন্তু এমন বিপন্ন নিজে কখনো হয়নি। পা টেনে নিয়ে নিতে গিয়ে দেখলে বজ্রের মতো দৃঢ়। বললে, "ছি হামিদা, পা ছাড়, ছেলেমানুষি কোরো না!"

গফুরের পায়ের উপর মাথাটা আর একটু জোরে ঘসে সন্ধ্যা বললে, "তুমি আগে বল আমাকে ছেড়ে দেবে ?"

"সে কথা আমি কি ক'রে বলব হামিদা ? আমার তো সে এখ্তিয়ার নেই।"

"আছে, আছে, গফুর মিঞা, তোমার সব আছে। তোমার দয়া আছে, মায়া আছে। আমি তোমার মেয়ের মতন, বাঁচাও আমাকে।" বলে আরো দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা গফুরের পা আঁকড়ে ধরলে। যে শক্তি সে প্রয়োগ করলে তা স্বাভাবিক শক্তি নয়, উত্তেজিত স্নায়ুর শক্তি।

"আরে টেনো না, টেনো না! ফেলে দেবে না-কি ?" ব'লে গফুর পেছিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু দেখলে এমন দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা তার পদদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন যে, পেছিয়ে গেলে সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়েই পেছিয়ে যেতে হয়। তখন অগত্যা ভূমির উপর ব'সে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দুই হাত বলপূর্বক ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "ভালো ফ্যাসাদ দেখতে পাই! এমন জানলে কোন আহাম্মক তোমার ঘরে ঢুকত!"

ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদতে লাগল। "তা হ'লে আমাকে মেরে ফেল গফুর মিঞা, বিষ খাইয়ে হোক, ছোরা মেরে হোক, যেমন ক'রে পার

মেরে ফেল। তাতেও তোমার পুণ্য হবে। মেরে ফেলতে তো তোমার কোনো বাধা নেই গফুর মিঞা?"

গফুর বললে, "তুমি অবুঝ হ'য়ে যদি খালি গফুর মিঞা গফুর মিঞাই করতে থাক তা হ'লে আমি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাই বল? আমার কথা শোন হামিদা, তোমাকে মেরে ফেলবার এখ্‌তিয়ারও আমার নেই। তুমি আমার কাছে গচ্ছিত আছ। রঘু তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তুমি তার জিনিস, সে ইচ্ছে করলে তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মেরেও ফেলতে পারে। আমি পারিনে, আমি শুধু পারি যতদিন আমার বাড়িতে তুমি আছ সাধ্যমত তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে, জুলুম-জবরদস্তির হাত থেকে তোমাকে রক্ষে করতে।"

উঠে ব'সে সন্ধ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "রঘু কে?"

"তোমার উপর যে ডাকাতি হয়েছে, রঘু সে ডাকাতির সর্দার। চুক্তিমতো তুমি তার হিস্‌সায় পড়েছ।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে আমাকে রঘুর কাছেই নিয়ে চল না?"

"রঘুর কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে, তাই রঘুকেই আমি খবর পাঠিয়েছি; সে দু'-তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার হাঙ্গামা আমি জল্‌দি জল্‌দি চুকিয়ে ফেলতে চাই। রঘু আসা পর্যন্ত আমিনা শ্বশুরবাড়ি যাবে না সে কথা আমাদের হয়েছে, কিন্তু সেও বেশি দিন এখানে থাকতে পারবে না, তার শ্বশুরের কাছে দিন আষ্টেকের কথা ব'লে এসেছে। আমিনা থাকতে থাকতে আমি তোমার যা হয় কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে চাই।"

গফুরের কথা শুনে সন্ধ্যা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ব্যবস্থা করবে গফুর মিঞা? তুমি যে ব্যবস্থাই করবে তা'তে আমার ভালো হবে তা আমি জানি!"

শুনে গফুর হাসতে লাগল। বললে, "এ বেশ কথা! এই দেখ না, তোমাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসে বন্দী ক'রে রেখেছি, তাতে তোমার কত ভালো হচ্ছে!"

"সে তুমি দলে প'ড়ে করেছ। আমার জন্যে একা তুমি যা করবে তা'তে আমার কখনই মন্দ হবে না।"

"এ বিশ্বাস তোমার কী ক'রে হ'ল হামিদা?"

"তা বলতে পারিনে, কিন্তু এ আমার বিশ্বাস। এখন তুমি বল গফুর মিঞা, রঘু এলে তুমি কি উপায় করবে।"

পুনরায় গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "সে কথাও তোমাকে বলতে হবে নাকি?—এই ধর, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে রঘুকে খুব বেশি রকম পীড়াপীড়ি করব।"

চিন্তিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু সে যদি না ছাড়ে?"

"তখন কিছু টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নেবার চেষ্টা দেখব।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "যদি না বেচে—তখন?"

"তখন আর কী? তখন তোমার তক্‌দির—অদৃষ্ট!" বলে গফুর তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী নিজের কপালে ঠেকালে।

সন্ধ্যার মুখে উৎকট বিহ্বলতার গ্লানি ফুটে উঠল। বললে, "অদৃষ্ট? অদৃষ্ট আমার ভালো নয় গফুর মিঞা! তার চেয়ে তুমি আমাকে রঘু আসবার আগে ছেড়ে দাও। আমাকে দয়া কর! আমি তোমার মেয়ের মতন!"

অসম্মতিসূচক ভাবে গফুর একবার মাথা নাড়লে, তারপর ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "বুঝলাম তুমি আমার মেয়ের মতন, কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়েই হ'তে তা হ'লেও তোমাকে ছাড়তে পারতাম না। এ যে আমাদের পেশার ইমান হামিদা! আমার শরিকদার তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, আর আমি তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেড়ে দোবো! এটা কি বেইমানি হবে না? যে কাজ এতটা বয়সে একদিনের জন্যেও করিনি সে কাজ আজ করব? যা হবার নয় হামিদা, তার জন্যে অনুরোধ করো না।"

"বুঝেছি, তা হ'লে মরণ ভিন্ন আমারও আর উপায় নেই।" ব'লে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অপরূপ শোভা! বর্ষাধারায় সিক্ত অবনমিত শ্বেতকমল কখনো দেখেছ? কিংবা ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙ্গে-পড়া করবীগুচ্ছ? তা হ'লে সন্ধ্যার এ সময়কার কমনীয় সৌন্দর্য কতকটা উপলব্ধি করতে পারবে। সুন্দরী স্ত্রীলোক যখন হাসে তখন তাতে বসন্তের শোভা, যখন কাঁদে তখন বর্ষার মাধুরী!

মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে গফুর ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সদয়কণ্ঠে বললে, "অত অস্থির হয়ো না হামিদা। দেখ না রঘু এলে কী দাঁড়ায়। সে আমার অনেক দিনের দোস্ত্, আমার কথা সহজে টালতে পারবে না। এখন তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ, আমি চললাম।" তারপর দু পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললে, "তুমি আমার মেয়ে হ'লে যা করতাম হামিদা, রঘুর কাছে তোমার জন্যে ঠিক তাই-ই করব।"

সন্ধ্যার মুখ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে হয়ে উঠল, সে নিঃশব্দে যুক্তকরে গফুরকে নমস্কার জানালে।

বাইরে গিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে জানলার সম্মুখে এসে গফুর বললে, "আমার কথা শোন, এখন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

সকালে মহবুব যে কথা শাসিয়ে গিয়েছিল আমিনার মুখে গফুর তা শুনেছিল। নেশায় উন্মত্ত মহবুবের উপদ্রবে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'তে পারে সেই আশঙ্কায় সে সন্ধ্যাকে ঘুমিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করছিল। রাত্রি কিন্তু নিরুপদ্রবেই কেটে

গেল। মহবুব ফিরল নেশা ক'রেই বটে, কিন্তু এত বেশি রাত্রে এবং নেশায় এত বেশি বিবশ হ'য়ে যে গফুর এবং আমিনাকে দু'চারটে গালিগালাজ ক'রেই সেই যে শয্যাগ্রহণ করল ঘুম ভাঙল একেবারে সূর্যোদয়ের পরে।

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই তৎক্ষণাৎ সে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। দ্রুতপদে গফুরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে চিৎকার করে ডাকলে, "গফুর!"

শান্তভাবে মহবুবের দিকে তাকিয়ে গফুর বললে, "কী!"

"রঘুকে আসবার জন্যে তুই খবর পাঠিয়েছিস?"

"পাঠিয়েছি।"

"কেন?"

"আমি কিছুদিন বেনোডিতে গিয়ে থাকব। তার আগে রঘুর সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নিতে চাই।" বেনোডিতে গফুরের প্রথম পক্ষের শ্বশুর-বাড়ি।

মহবুব হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "তুই বেনোডিতেই যাস আর জাহান্নমেই যাস, কিন্তু আমাকে না ব'লে রঘুর কাছে লোক পাঠিয়েছিস কেন তার জবাব দে!"

"আমার খুসি।"

"খুসি? দেখাচ্ছি খুসি। যত সব শয়তান আর শয়তানী মিলে সল্লা চলেছে। দিচ্ছি সব এক সঙ্গে শেষ ক'রে!"

গফুর ধীরে ধীরে তার শয্যার উপর উঠে বসল; তারপর মহবুবের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা দিস শেষ ক'রে কিন্তু তার আগে একটা কথা শোন। কয়েকগাছা চুলে পাক ধরেছে ব'লে মনে করেছিস বুঝি, হাতের তাকৎ কিছু কমেছে? একবার তাকতের পরখটা হ'য়ে যাবে নাকি?" তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ভুলে গেছিস যে, সব রকম কসরৎ আমার কাছেই শিখেছিলি। একবার হাতভাঙ্গা কসরৎটা মনে পড়িয়ে দোবো নাকি?—চিরদিনের জন্যে ডান হাতটা জখম ক'রে দিয়ে? বাঁদর কোথাকার, তুই আমাকে শয়তান বলতে সাহস পাস?—বেরো আমার সামনে থেকে!—"

মহবুবের মুখে এতক্ষণ চলেছিল পটপটির আওয়াজ, তার কাছে এ যেন বোমা। তবু তো এখনো ফাটে নি, ফাটবার উপক্রম করেছে মাত্র। গফুরের জলনোন্মত ক্রোধের ভূমিকা দেখে তাকে আর অপমান করতে মহবুবের সাহস হ'ল না; বললে, "আজ রাতে একটা ভারি কাজ গ'ছে ফেলেছি, তাই আজ আর কিছু হ'ল না,—কাল সকালে এসে হামিদাকে কলমা পড়িয়ে সাদি করব। সঙ্গে থাকবে বৈজু মাঝির আটজন তীরন্দাজ, কেউ বাধা দিতে এলে, লুট ক'রে নিয়ে যাব হামিদাকে।"

গফুর হাঁক দিলে, "আমিনা!" স্বর কী গভীর! যেন শ্রাবণ মাসের আকাশের মেঘ গর্জন!

আমিনা নিকটে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সামনে এসে বললে, "ভাইজান?"

"আমার ঘর থেকে ইস্পাতের তার জড়ানো লাঠিখানা এনে দে তো।"

"কেন?—কী করবে?" আমিনার মুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া।

গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "ভয় নেই তোর। লাঠি আজকে ব্যবহারের জন্যে নয়। কাল তীর ধনুক নিয়ে আটজন অতিথ্ আসবে, তাদের খাতিরের জন্যে লাঠিটা একটু ঘুরিয়ে ঘারিয়ে রাখতে হবে তো।"

মহবুব বললে, "কিন্তু হুঁসিয়ার গফুর! সাদা তীর নয়—তাতে জহর মেশানো থাকবে।"

গফুর বললে, "তা হ'লে তো আরো জবর! আমিনা একটু খাট্টা-টাট্টা কিছু যোগাড় ক'রে দে, লাঠির তারগুলো চক্‌চকে ক'রে ফেলতে হবে।"

গফুরের এই বেপরোয়া লঘু ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে মহবুব বিরক্ত হ'য়ে সেস্থান পরিত্যাগ করলে। যাবার সময়ে আরক্ত নয়নে ফিরে তাকিয়ে ব'লে গেল, "এর জবাব কাল সকালে দোবো।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর আমিনার নিকট উপস্থিত হ'য়ে গফুর বললে, "আমি একটু বেরোচ্ছি আমিনা, ফিরতে হয়ত দেরী হ'তে পারে। তুই একটু হামিদার উপর নজর রাখিস।"

এ সময়টা সাধারণত গফুর বাড়িতে থেকেই বিশ্রাম করে, বাইরে যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে সে প্রায় সর্বদাই বাড়িতে থাকছে। তাই একটু কৌতূহলী হ'য়ে আমিনা জিজ্ঞাসা করলে, "এমন সময়ে কোথায় যাচ্ছ ভাইজান?"

গফুর মৃদু হেসে বললে, "শুনলি তো কাল সকালে মহবুব লোকজন নিয়ে আসছে। আমিও একটু ব্যবস্থা ক'রে রাখি। একা একা আটজনের সঙ্গে হয়ত এখনও আমি পারি, কিন্তু এক সঙ্গে আটজনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তাই দু-চার জনকে ব'লে আসচি—কাছে কাছে থাকবে, দরকার হ'লে মদদ্ দেবে।"

চিন্তিত মুখে আমিনা বললে, "কাল তোমরা সত্যি সত্যিই একটা খুনোখুনি কাণ্ড করবে নাকি ভাইজান?"

"তা কী করব বল? সে যে আমার সামনে হামিদার উপর জুলুম করবে, কিংবা তাকে লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে, এ তো আমি হ'তে দিতে পারিনে। এ জুলুম তো শুধু হামিদার উপরই নয়—এ আমার উপরও জুলুম।"

"আর কোনো উপায়ই কী এর নেই?"

মাথা নেড়ে গফুর বললে, "আর কোনো উপায়ই নেই।"

এ 'আর-কোনো-উপায়ের' অর্থ যে কী তা মনে মনে উভয়েই বুঝলে, এবং এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক হবে তা-ও বুঝতে পেরে উভয়েই সে আলোচনায় নিরস্ত হ'ল।

গফুর প্রস্থান করলে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে আমিনা বললে, "সন্ধ্যা, কী করছ?"

সন্ধ্যা বললে, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

উদ্বেগে কণ্ঠস্বর কম্পিত নয়, দুশ্চিন্তায় মুখ বিরস নয়। লক্ষ্য ক'রে আমিনা বিস্মিত হ'য়ে গেল। বললে, "সকালে বাড়িতে যে-সব কথা হ'য়ে গেল শুনেছ সন্ধ্যা ?"

"শুনেছি।"

"তবে ?"

"তবে কী বল ?"

সন্ধ্যার এ প্রতি-প্রশ্নে আমিনা মনে মনে অপ্রতিভ হ'ল। সত্যিই তো 'তবে' বলবার কথা তো আমিনারই, সন্ধ্যার নয়। যে বন্দিনী, যে সম্পূর্ণভাবে অসহায় সে 'তবের' কী জানে ? কথাটা ঘুরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বললে, "কাল সকালে বাড়িতে একটা খুনোখুনি ব্যাপার হবে, কী ক'রে যে সামলাব, তা ভেবে পাচ্ছিনে।"

শান্ত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, এই সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্যে তোমাদের বাড়িতে খুনোখুনি হবে, তা আমি কিছুতেই হ'তে দোবো না। কালকের ব্যাপার আমি সামলে নোবো।"

সবিস্ময়ে আমিনা বললে, "তুমি সামলে নেবে ? কী ক'রে সন্ধ্যা ?"

"যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, কাল সকালে মহবুব এলে তার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করব। বাবার মুখে প্রায়ই শুনতাম, যে-অবস্থাকে কিছুতেই আটকানো যায় না তাকে জীবনের মধ্যে সহজভাবে গ্রহণ করতে হয়। আমিও ঠিক করেছি অদৃষ্টের সঙ্গে আর যুদ্ধ করব না।"

চকিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে আমিনা মনে মনে শিউরে উঠল। জানালায় উঠে একটা নীচু বাঁশের আড়ায় শাড়ি বেঁধে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই উদ্বন্ধনের আর কোন আটক নেই। উদ্বিগ্ন মুখে বললে, "অন্য কোনো উপায়ের কথা কী বলছিলে সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বললে, "ও কথার কথা। বন্দী ক'রে যাকে একেবারে নিরুপায় ক'রে রেখেছ সে অন্য উপায় আর কী করবে ভাই। আচ্ছা আমিনা, আমাকে বাঁচাবার তো অনেক চেষ্টা করলে, পারলে না; এখন মরবার জন্যে একটু সাহায্য করতে পার না ? এমন একটু বিষ এনে দিতে পার না, যা খেলে তখনি মৃত্যু; তেমন উগ্র বিষ তো কোল ভীলরা সঞ্চয় ক'রে রাখে শুনেছি।"

আমিনা একটু বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বললে, "যা-তা কথা বোলো না সন্ধ্যা।"

নির্বন্ধসহকারে সন্ধ্যা বললে, "যা-তা কথা কেন ভাই। একজন পুরুষমানুষকে একথা বললে সে হয়ত যা-তা কথা বলতে পারত—কিন্তু, আমিনা, তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝবে না ভাই ? জীবন কি এতই মূল্যবান জিনিস যে, যে-কোনো অবস্থাতেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ? তবে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এত লোক আত্মহত্যা করেছে কেন ?"

আমিনা অন্যমনস্ক হয়ে মনে মনে কী ভাবছিল, হয়ত সন্ধ্যার সমস্ত কথা

শুনতেই পায় নি, হঠাৎ তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে বললে, "শোন সন্ধ্যা, আজ রাত্রে তোমাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করব মনে করছি। শুধু মনে করছি কেন, সে বিষয়ে অনেকটা ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু তার আগে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা সর্ত আছে।"

হায় রে জীবন-মরীচিকার মোহময় দীপ্তি। কোথায় গেল নিজের দুরাবস্থার প্রতি দুর্জয় অভিমান, কোথায় গেল দৃঢ়নিবদ্ধ সঙ্কল্পের অবিচল স্থৈর্য। অধীরভাবে আমিনার দুই হাত দৃঢ়ভাবে ধ'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি রাজি ভাই, তোমার সর্তে রাজি। আমি জানি তোমার সর্ত আমার পক্ষে অমঙ্গলের হবে না। এখন বল, আমার উদ্ধারের কী উপায় করেছ।"

আমিনা বললে, "উদ্ধারের উপায় জেনে তোমার বিশেষ কোনো লাভ নেই, আমি তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দোবোই। কিন্তু সর্তটা তোমার জানা উচিত।"

কী সর্ত বল?"

"তোমার স্বামী, বাপ-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, তোমাকে ফিরিয়ে নিলে আমি যে কত খুসি হব তা তোমাকে বলবার দরকার নেই সন্ধ্যা—কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে ফিরিয়ে না নেন, বাড়িতে স্থান না দেন, তা হ'লে তোমাকে আমার কাছে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। পিঁজরেপোলে যেতে পারবে না।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার হাসি পেলে। এই সর্ত! সে ফিরে গেলে যারা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়তে চাইবে না, তাদের সম্বন্ধে এই সর্ত! সন্ধ্যা আনন্দের সঙ্গে বললে, "আমি তোমার সর্তে রাজি আমিনা, কিন্তু পিঁজরেপোল বলছ কাকে?"

আমিনা বললে, "গরু, মোষ, ঘোড়া—এই সব গৃহপালিত প্রাণীরা বুড়ো হ'য়ে অচল হ'য়ে গেলে তাদের পিঁজরেপোলে দেওয়া হয় তা তো জান?"

"হ্যাঁ, তা জানি।"

"সেখানে তারা যতদিন বেঁচে থাকে জীবন-ধারণের মতো দানা-পানি পায়। আমার শ্বশুর বলেন, তোমাদের হিঁদুদের মাতৃমন্দির অবলা-আশ্রম নামে যে-সব ব্যাপার আছে সবই ঐ সব হিন্দু মেয়েদের পক্ষে পিঁজরেপোলের মতন। যারা কোনো-না-কোনো কারণে সমাজের মধ্যে আশ্রয় পায় না, যত দিন বেঁচে থাকে সেখানে তারা ভাত-কাপড় পায়, হয়তো কিছু লেখাপড়া শেখে, হয়তো কিছু কাজ-কর্মও করে, কিন্তু তা ছাড়া তাদের ও-জীবন মরণেরই সমান। মেয়েমানুষ যদি ছেলেপিলের মা হ'য়ে সংসার না করলে—তা হ'লে কী করলে বল তো?"

অন্যমনস্ক হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "তা সত্যি!"

আমিনা বললে, "আমার সর্তের কথা আর একবার তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা। ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়িতে কিংবা বাপের বাড়িতে যদি তুমি স্থান

না পাও তা হ'লে তোমাকে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। আমার শ্বশুরকে তুমি জান না, অমন উদার লোক আমি আর-একটি দেখিনি। তুমি সেখানে একেবারে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামত থাকতে পারবে। যদি সে-বাড়িতে একটা পাকাপাকি ঠাঁই ক'রে নিতে ইচ্ছা কর, আমি আমার দেওর নাসীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইয়ে তাও ক'রে দিতে পারব। ভারী ভালো ছেলে, কলকাতায় কলেজে পড়ে, একটি রত্ন। কিন্তু এ-সবই তোমার ইচ্ছে মতো হবে। এখন বল তুমি রাজি কি-না।"

সন্ধ্যার মন তখন মুক্তির স্বপ্নে তন্দ্রিত ; বললে, "রাজি।"

"তা হ'লে তোমার উদ্ধারের জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা শোন। মহবুবের কথা শুনে তখনি আমি একটি বিশ্বাসী লোককে আমার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছি। রাত্রে গরুর গাড়ি নিয়ে আমার স্বামী আসবেন। কোনো রকমে গফুরের চোখ এড়িয়ে তোমাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দোবো, আপাতত আমার শ্বশুরবাড়ি। তারপর সেখান থেকে ব্যবস্থা ক'রে তোমাকে তোমার নিজের শ্বশুর-বাড়ি পাঠাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আর তুমি সঙ্গে যাবে না আমিনা ?"

আমিনা হেসে বললে, "আমি কাল সকালে দুই ভায়ের লড়াই দেখে সন্ধ্যার সময়ে যাব। মহবুব এসে যখন দেখবে চিড়িয়া পালিয়েছে তখন আমি না থাকলে গফুরকে মহবুবের রাগ থেকে বাঁচাবে কে ?"

"আর তোমাকে কে বাঁচাবে ?"

"আমাকে যে বাঁচাবে সে সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে পৌঁছে তোমাকে দুই ভাইয়ের লড়ায়ের গল্প শোনাবে।" ব'লে আমিনা হাসতে লাগল।

রাত্রি তখন দশটা, পঞ্চা মাঝি এসে আমিনাকে জানালে যে, ইয়াসিন গাড়ি নিয়ে এসে ধুরিয়ার মোড়ে অর্থাৎ আমিনাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে অপেক্ষা করছে। আমিনা দেখলে গফুর আহার ক'রে তার খাটিয়ায় শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল নিদ্রিত। তখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে ত্বরিত পদে সে ইয়াসিনের নিকট উপস্থিত হ'ল।

ইয়াসিন বললে, "কী হুকুম আমিনা বিবি ?"

আমিনা মৃদু হেসে বললে, "হুকুম, আমাদের বাড়ি হামিদা নামে যে মেয়েটি আছে আপাতত তাকে নিয়ে বাড়ি যাও।"

"তা'তো আন্দাজে বুঝেছি, কিন্তু তোমার দাদাদের লাঠি মাথায় পড়বে না তো ?"

"লাঠির ভয় করতে গেলে বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায় না।"

"তা যেন হ'ল, তুমি ?"

"আমি ? আমার জন্যে কাল গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি ঠিক বেলা এগারোটার সময়ে রওনা-হবো।"

"তোমার নিজের মাথার কথা মনে আছে ?"

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "আছে। সে-বিষয়ে কোন ভয় নেই, কাল সন্ধ্যাবেলা আস্ত মাথাই পাবে। আমি চললাম, এখনি হামিদাকে নিয়ে আসছি।"

আধঘণ্টাটাক পরে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফিরে এসে আমিনা বললে, "হামিদা ইনি আমার স্বামী। এঁর সঙ্গে নির্ভয়ে যাও, কোনো অসুবিধা হবে না।"

সন্ধ্যা যুক্ত করে ইয়াসিনকে নমস্কার করলে।

ইয়াসিন প্রতি-নমস্কার ক'রে বললে, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন।"

আমিনা বললে, "ও-সব আদব-কায়দা তোমরা গাড়িতে উঠে কোরো। আমি এখন ফিরে চললাম। গফুরভাই জেগে ওঠবার আগে তোমাদের খুব খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার।" ব'লে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড ঘটল যে, যে যেখানে ছিল বিস্ময়ে এবং ত্রাসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের বনের ঘন অন্ধকারের ভিতর থেকে মনুষ্য কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল, "গফুরভাই জেগেই আছে।" এবং পর মুহূর্তেই এক দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এসে আমিনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললে, "কিরে আমিনা, এ যে চুরির উপর বাটপাড়ি দেখতে পাই।" কণ্ঠস্বরে এবং আকৃতিতে সকলেই গফুরকে চিনতে পারলে।

প্রথমে আমিনার গলা ভয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল ; তারপর কতকটা সাহস সঞ্চিত ক'রে সে বললে, "আমাকে মাপ কর গফুর ভাই।"

গফুর একটু হাসলে, তারপর মৃদুস্বরে বললে, "মাফ আর কী করব। যা করেছিস এক রকম ভালোই করেছিস, অনেকগুলো ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিলি। কিন্তু তুই যে এদের সঙ্গে যাচ্ছিসনে, ফিরে চলেছিস ?"

আমিনা বললে, "কাল সকালে মহবুব যখন আসবে তখন আমি তোমার কাছে থাকতে চাই ভাইজান।"

"কেন ? আমার হেফাজতে নাকি ?"

আমিনা কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল।

এক ধমক দিয়ে গফুর বললে, "ভারি জ্যাঠা হয়েছিস দেখতে পাই। শীগ্‌গির ওঠ গাড়িতে। এতটা কাল লাঠি ছোরা চালিয়ে এসে এখন ছোট ভাইয়ের ভয়ে বোনের আঁচলের আড়ালে লুকোতে হবে!" তারপর ইয়াসিনকে লক্ষ্য ক'রে বললে, "তুমিও তো আচ্ছা লোক ইয়াসিন ভাই, নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে স্ত্রীকে পিছনে ফেলে পালাচ্ছ!"

ইয়াসিন হাসতে হাসতে বললে, "কী করি বলুন, বাগ মানে কি ? আপনাদের বাড়িরই মেয়ে তো!"

আমিনার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে গফুর বললে, "আমার জন্যে কোনো ভয় নেই। যা, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।" তারপর সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্য ক'রে

বললে, "অনেক কষ্ট পেয়েছ হামিদা, সে-সব ভুলে যেয়ো, কিন্তু গফুর মিঞাকে একেবারে ভুলো না।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে নত হ'য়ে গফুরের পদধূলি গ্রহণ করলে। কেউ তাকে আটকাতে পারলে না, গফুরও নয়, আমিনাও নয়। তারপর সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললে, "তোমার দয়ার কথা জীবনে কখনো ভুলব না গফুর মিঞা!"

গফুর সন্ধ্যার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বললে, "দয়া নয়, দয়া নয় বেটি! খোদা তোমার ভালো করবে। এখন যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।"

আরও দু'চারটা কথার পর ইয়াসিন, আমিনা ও সন্ধ্যা গরুর গাড়িতে উঠে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ভেঙে দবীপুরের দিকে অগ্রসর হ'ল। গাড়ি অদৃশ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু চাকার কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ বহুক্ষণ ধ'রে শোনা যেতে লাগল। অবশেষে তাও যখন মিলিয়ে এল, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গফুর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। অনেকগুলো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার মনে হ'ল বাড়িটা যেন কোনো একটা সম্পদ থেকে সহসা রিক্ত হয়েছে। মনে মনে ভাবলে, জীবনে সে এই প্রথম দুর্বলতার বশীভূত হ'ল। হয়ত বা এ কোনো নবতর পথেরই সূচনা!

দশ

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সকাতর কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ ধ্বনি কানে প্রবেশ করতেই সন্ধ্যার মনে পড়ল গরুর গাড়ি ক'রে সে আমিনার শ্বশুরবাড়ি চলেছে এবং সুদীর্ঘ পথের এখনোও শেষ হয়নি। গাড়ি ছাড়ার পর চাকার শব্দের এবং গাড়ির ঝাঁকানির তাড়নায় কথাবার্তা বেশি কিছু আর হ'তে পারে নি, তারপর আদি-অন্তহীন চিন্তার মধ্যে মগ্ন থাকতে থাকতে কখন অতর্কিতে নিদ্রাকে আশ্রয় ক'রে অচেতন দেহ শয্যার উপর লুটিয়ে পড়েছে সে কথাও মনে পড়ে না। বিচালি, তোষক এবং চাদর দিয়ে রচিত শয্যা নরমই ছিল এবং বায়ুও ছিল সুশীতল। সুতরাং ঘুমটা এমনই প্রগাঢ় হয়েছিল যে, এর আগে আর একবারও ভেঙেছিল কিনা তাও মনে পড়ে না। আকাশে প্রত্যূষের স্তিমিত আলোক, প্রভাতের সুশীতল জোলো বায়ু ঝির ঝির ক'রে বইছে। ছইয়ের জন্যে গাড়ির দু'পাশ দিয়ে দৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু সম্মুখের ফাঁক দিয়ে পথপার্শ্বের গাছ-পালা বন-জঙ্গল পাহাড়-প্রান্তর সবই কিছু-কিছু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছে গাছে যেন দু'চারটে পাখীর কাকলীও শোনা যাচ্ছে।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সন্ধ্যা সহসা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে মুক্তির যে পরিপূর্ণ মূর্তি সে দেখতে পায় নি, প্রত্যূষের আলোকে গাছ-পালা পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি

করলে! এ-ই-তো মুক্তি! একেই তো বলে মুক্তি! এ তো মহবুবের শিকল-লাগানো কারাকক্ষ নয়, এ যে বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণ! এখানে পশু-পক্ষীর সঙ্গে তার মিতালী, তরু-পল্লবের সঙ্গে আত্মীয়তা! ইচ্ছা করলেই সে যে-কোনো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যে-কোনো লতা থেকে ফুল তুলতে পারে, যে-কোনো পাখীর গান শুনতে পারে। ঐ যে দূরে বন্ধুর প্রান্তরে একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়ে সে কাঁটাগাছে দু'পা ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। এমন কি কাছাকাছি যদি-কোনো বন্যা-উদ্বেল পার্বত্য নদী থাকে, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেও পারে। এ-ই তো মুক্তি! একেই তো বলে মুক্তি! মুক্তি যে এত মধুর আগে কে তা জানত!

কী আশ্চর্য! সে গতি লাভ করেছে! অবিরত চলেছে সে—বাধা নেই, আটক নেই! এ চলার শেষ হবে কলকাতায়, যেখানে তার বাপ মা আছে, স্বামী আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা হ'ল লাফ দিয়ে পথের উপর প'ড়ে একটা ছুট দেয়। এমনই মন্থর গতি এই গরুর গাড়ির, যেন চলতেই চায় না।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে আমিনা তখনো শুয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ইয়াসিন গাড়ির ভিতরে নেই। আমিনার গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে সন্ধ্যা ডাকলে, "আমিনা! আমিনা!"

নিদ্রালস চক্ষু উন্মীলিত ক'রে আমিনা বললে, "কী?"

সন্ধ্যা বললে, "এবার ওঠ। সকাল হয়েছে।"

আমিনা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে ব'সে সহাস্য মুখে বললে, "তাতো হয়েছে, কিন্তু তোমার সকাল কখন হয়েছে শুনি? একটু আগেও তো তোমাকে ঘুমন্ত দেখেছি।"

অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "সত্যি ভাই, এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এক ঘুমে রাত কাবার হ'য়ে গেছে। কিন্তু ইনি কোথায়?"

"কিনি?"

সন্ধ্যা ইয়াসিনের নাম ভুলে গিয়েছিল, স্মিতমুখে বললে, "কেন বুঝতে পারছ না না-কি?"

"না, পাচ্ছিনে।"

"তোমার—তোমার স্বামী?" বলেই সন্ধ্যার মুখ লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠল।

নিষ্প্রভ আলোকেও আমিনা তা লক্ষ্য ক'রে বললে, "আমার স্বামী, তা তোমার এত লজ্জা কেন?" রাত্রে গাড়িতে উঠে ইয়াসিন গাড়ির পিছন দিকে পা ঝুলিয়ে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে বসে ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা ব'লে উঠল, "ওমা তাই তো। আমার স্বামী কোথায় গেল? ডাকাতে হরণ ক'রে নিয়ে গেল না তো?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বললে, "সবাই কি

হতভাগিনী সন্ধ্যা যে ডাকাতে হরণ করে নিয়ে যাবে।" তারপর সাগ্রহে আমিনার হাত চেপে ধ'রে বললে, "না ভাই, সত্যি ক'রে বল, কোথায় গেলেন তিনি।"

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "তিনি ? তিনি লাফ দিয়ে রাস্তায় গেলেন।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, কাল রাত্রে ঢুলতে ঢুলতে তুমি যেই শুয়ে পড়লে, উনিও ওদিকে একটি পরিষ্কার লাফ মেরে রাস্তায় প'ড়ে গাড়ির পিছনে পিছনে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

"তা হ'লে তোমার শোবার জায়গার আর একটু সুবিধা হয়—বোধ হয় সেই ভেবে। তা ছাড়া—"

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কী ?"

"তা ছাড়া, তুমি ঘুমিয়ে থাকলে একগাড়িতে ওঁর জেগে ব'সে থাকা উচিত হয় না, বোধ হয় সে কথাও ভেবে।"

দুঃখিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তাতে কী হয়েছিল ? না, না, এ ভারী অন্যায় ! আচ্ছা, তাই যদি, তুমি আমাকে তুলে দিলে না কেন আমিনা ?"

হাসতে হাসতে আমিনা বললে, "তা বটে, সেইটেই ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, এখন তো ওঁকে উঠে আসতে বল !"

"কেন, তুমি নিজে বল না ?—ভদ্রতা তো তুমিই করতে চাচ্ছ।"

"ভদ্রতা নয় আমিনা—করুণা। আহা, দেখ দিকিনি, সমস্ত রাতটা মুখ বুজে পথ হাঁটছেন !" তারপর আমিনার হাত চেপে ধ'রে বললে, "নাও, গাড়ি থামাও !"

আমিনার আদেশে গাড়ি স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। ইয়াসিন গাড়ির পাশে পাশেই চলছিল, গাড়ি থামতে পিছন দিকে এসে দেখলে গাড়ির ভিতর আমিনা এবং সন্ধ্যা দু'জনেই জেগে ব'সে রয়েছে। সন্ধ্যাকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে বললে, "উঠে পড়েছেন ? রাত্তিরে ঘুম বোধ হয় একটুও হয়নি।"

সন্ধ্যা প্রতি-নমস্কার ক'রে লজ্জিত মুখে বললে, "আপনি সমস্ত রাত হেঁটে এসেছেন, আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছি। ছি ছি, কী লজ্জার কথা ! আপনি উঠে আসুন।"

সন্ধ্যার অপ্রতিভ ভাব দেখে ব্যস্ত হ'য়ে ইয়াসিন বললে, "না, না, তার জন্যে আপনি একটুও লজ্জিত হবেন না। এ সব রাস্তা তো আমরা মরদেরা হেঁটেই শেষ করি। শুধু আপনাদের জন্যেই গাড়ি আনা।"

"আচ্ছা, এখন উঠে আসুন !"

স্মিতমুখে ইয়াসিন বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। আর তো সবে পোন ক্রোশটাক পথ বাকি। একেবারে কাছে এসে পড়েছি ; ঐ যে দবীপুরের গাছপালা মালুম দিচ্ছে।"

আমিনা বললে, "মালুম দিলেই কি কাছে হ'তে হয়? এই তো আমিও এখান থেকে মালুম দিচ্ছি, তাই ব'লে কি তোমার খুব কাছে আছি বলতে চাও?"

আমিনার পরিহাসে ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ইয়াসিন দেখলে নিঃশব্দ হাস্যে সন্ধ্যার মুখ উচ্ছলিত। বললে, "একটু না হয় শুয়ে পড়ুন, এখনো খানিকটা ঘুমুতে পারবেন।"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "না, আর ঘুমোবার দরকার নেই।"

"ঘুম একটু হয়েছিল কি?"

"বেশ ভালই হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আমি পাশেই রইলাম। আপনারা ততক্ষণ কথাবার্তা করুন।" ব'লে ইয়াসিন গাড়ির পাশে গিয়ে গাড়ি চালাবার আদেশ দিলে।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই সন্ধ্যা আমিনাকে দুই বাহুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ক'রে ধরলে, তারপর মিনতি-করুণ স্বরে বললে, "ভাই আমিনা, আজই আমাকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করো।—কেমন, করবে তো?"

আমিনা সন্ধ্যার ব্যাকুলতা দেখে মনে মনে দুঃখিত হ'লেও হাসিমুখে বললে, "কেন, সবুর সইছে না না-কি?"

কাতরস্বরে সন্ধ্যা বললে, "সয় কি? তুমিই ভেবে দেখ আমিনা! বন্দী যখন ছিলাম তখন একরকম ছিলাম, এখন তোমার দয়ায় মুক্তি পেয়ে সত্যিই সবুর সইছে না। মনে হচ্ছে কী জানো, গাড়ি থেকে নেবে প'ড়ে ছুট দিই! আজই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো ভাই।—কেমন? লক্ষ্মীটি!"

আমিনা বললে, "আমি কি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছিনে সন্ধ্যা? খুবই বুঝছি। আজকেই তোমাকে পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা করব, তবে আমার শ্বশুর সব দিক বিবেচনা ক'রে যেমন করবেন তাই হবে তো ভাই। তোমাকে পাঠাবার মধ্যে ভাববার অনেক কথা আছে, শুধু তোমার দিক দিয়েই নয়, আমাদের দিক দিয়েও।"

আগ্রহ সহকারে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের দিক দিয়ে আবার কী?"

"আমাদের দিক দিয়ে পুলিস। তোমার শ্বশুর বড়মানুষ, পুলিসের পাহারা চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। যে তোমাকে নিয়ে যাবে সে যদি ধরা পড়ে তা হ'লে শেষ পর্যন্ত গফুর মহবুবরাও ধরা পড়বে। জান তো ভাই, কান টানলে মাথাও আসে।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস তো আছে আমিনা, আমার দ্বারা তোমাদের কখনোও কোনোও বিপদ হবে না? আমার মুখ দিয়ে কেউ কখনো কিছু বলিয়ে নিতে পারবে না—এ বিশ্বাস তো করো?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা হেসে ফেললে; বললে, "এ বিশ্বাস না করলে তোমাকে কি ঘরে এনে ঢোকাতাম সন্ধ্যা? তোমার কোনো ভাবনা নেই, যত

শীঘ্র তোমাকে কলকাতা পাঠানো সম্ভব তার চেয়ে এক মিনিটও দেরী হবে না। আমার শ্বশুর অত্যন্ত দয়ালু লোক।"

"তা তো তাঁর ছেলেকে দিয়েই বুঝতে পারছি ভাই। তোমার শাশুড়ী আছেন আমিনা?"

"না।"

"বাড়িতে আর কে কে মেয়েমানুষ আছেন?"

আমিনা হেসে বললে, "আর কেউ না। আমিই একমাত্র।"

সন্ধ্যা হেসে উত্তর দিলে, "তাই এত আদরের বউ!"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "হ্যাঁ গো, তাই এত!"

কিছুক্ষণ পরে একটা বাড়ির প্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ করল। আমিনা বললে, "এইটে আমাদের বাড়ি, আর ঐ দেখ বারান্দায় আমার শ্বশুর ব'সে রয়েছেন।"

সন্ধ্যা আগ্রহভরে তাকিয়ে দেখলে একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ বৃদ্ধলোক লুঙ্গি প'রে অনাবৃত দেহে মোড়ায় ব'সে তামাক খাচ্চেন।

গাড়ি নিকটে উপস্থিত হ'তে আমিনার শ্বশুর মহীউদ্দিন গাত্রোত্থান ক'রে নেমে এসে বললেন, "কী বউমা এলে না-কি?"

গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে অবনত হ'য়ে শ্বশুরকে সেলাম ক'রে হাসি-মুখে আমিনা বললে, "হাঁ আব্বা, এলুম।"

আমিনার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও নেমে এসে আমিনার মতো মহীউদ্দিনকে সেলাম ক'রে নতমুখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যাকে দেখে মহীউদ্দিন বিস্মিত হ'য়ে বললেন, "এ মেয়েটি কে বউমা?"

"এটি আমার একটি বন্ধু আব্বা। বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছে।"

"তোমার বন্ধুর যখন বিপদ তখন তোমারো বিপদ বউমা। আর তোমার যখন বিপদ তখন আমিও দেখচি বিপদে পড়েচি।" ব'লে মহীউদ্দিন হাসতে লাগলেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন, "এস, মা, এস। বউমার যখন সুপারিশ, তখন তোমার এ বুড়ো চাচার দ্বারা যা কিছু হবার সবই হবে। পরে সব কথা শুনব, এখন বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমে একটু ঠাণ্ডা হও। লজ্জা কোরো না, এ তোমার আপন বাড়ি।"

এবার হিন্দু প্রথায় যুক্তকরে মহীউদ্দিনকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা আমিনার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করল।

এগার

বেলা তখন আটটা। স্নান এবং কিছু জলযোগ সমাপন ক'রে সন্ধ্যা আমিনার ঘরে ব'সে ছিল। একদল কৌতূহলী বালক-বালিকা দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যূষের এই সহসা-আবির্ভূত অপরিচিত অতিথিটিকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। অতিথির নাম হামিদা এবং সে আমিনার বাপের বাড়ির দিক দিয়ে তার একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া, সে কথা সহজেই জানা গিয়েছিল; কিন্তু এ গৃহের সহিত তার কী সম্পর্ক, কী জন্যে এখানে সে এসেছে, কতদিন এখানে অবস্থান করবে, এই সব অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের কিছুই জানা যাচ্ছিল না। এজন্যে তাদের মনে ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু আমিনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ধমক দেয়, বলে, "ও আমার বহিন, সব দিন এখানে থাকবে। যা, এখন পালাঃ!"

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কী ক'রে একটু আলাপ আরম্ভ করবে সন্ধ্যা মনে মনে তাই জল্পনা করছিল এমন সময় সেখানে আমিনা উপস্থিত হওয়ায় ছেলের দল দুদ্দাড় ক'রে স'রে পড়ল। আমিনা ঘরে প্রবেশ করল, এবং তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করল তার দেবর নাসীর—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, কান্তিমান যুবক।

সহাস্যমুখে আমিনা বললে, "ভাই হামিদা, এটি আমার দেওর নাসীরউদ্দিন, যার কথা তোমাকে বলছিলাম।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্তকরে তাকে নমস্কার করলে।

তাড়াতাড়ি সম্মুখে এগিয়ে এসে সন্ধ্যাকে প্রত্যভিবাদন ক'রে স্মিতমুখে নাসীর বললে, "আপনার বহুৎ মেহেরবানি যে, আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। সত্যিই আমাদের এ সৌভাগ্যের কথা।"

মাস দুই পূর্বে হ'লে একজন অপরিচিত যুবকের মুখ থেকে উচ্চারিত এই ভদ্রতার বাক্যের উত্তরে সন্ধ্যা হয়ত একটি কথাও বলতে পারত না, আরক্তমুখে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে থাকত; কিন্তু জীবনধারার নিদারুণ বিপর্যয়ের কাছে তালিম নিয়ে নিয়ে তার প্রকৃতিও অনেকটা পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে; বললে, "সৌভাগ্যের কথা আমারই বলতে হবে। আপনারা তো আমাকে আশ্রয় দান করেছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীরের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, অল্প একটু মাথা নেড়ে বললে, "আশ্রয়দানের কথা আমরা জানিনে, সে আপনার বন্ধু বলতে পারেন, কিন্তু আপনি দয়া ক'রে আসায় সত্যিই আমরা খুসি হয়েছি।"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "আশ্রয় পাওয়ার কথাটা একেবারে বাজে মেজ মিঞা। আচ্ছা, আশ্রয় পেয়ে সেই দিনই যদি আশ্রয় ভেঙে কলকাতায় পালাবার জন্যে কেউ ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে তো সে কী-রকম আশ্রয় পাওয়া তা তুমিই বিচার কর!"

নাসীর হাসতে হাসতে বললে, "না, তাকে কিছুতেই আশ্রয় পাওয়া বলা যায় না।"

এক মুহূর্তের জন্য নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু কলকাতায় যদি যেতে পাই তো সে আপনাদের দয়াতেই যাব। কলকাতার আশ্রয়ও তো আপনাদেরই আশ্রয় হবে।"

শুনে আমিনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল; বললে, "এ ঠিক কী রকম কথা হ'ল জানো হামিদা?—একটা খাঁচার পাখী যদি বলে, দয়া ক'রে যদি খাঁচার দোরটা খুলে দেন তো দেশান্তরে উড়ে যাই—দেশান্তরের আশ্রয় তো আপনাদেরই আশ্রয় হবে!—অনেকটা সেই রকম।"

আমিনার উপমার যৌক্তিকতায় খুসি হ'য়ে নাসীর মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কিন্তু আশঙ্কায় সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে উঠল। শ্বশুর কিম্বা পিতৃগৃহের আশ্রয় অবিলম্বে ফিরে পাবার জন্য তার মনে এমন একটা দুর্বার উত্তেজনা জেগে উঠেছে যে, তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পরিহাসের মিথ্যা কথাও যেন সে বরদাস্ত করতে পারে না। মহবুবের গৃহে প্রথম দিকে যখন পরিত্রাণের বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন উত্তেজনাও এতটা ছিল না; কিন্তু সম্ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের চাঞ্চল্য বহুগুণিত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। দুস্তর সাগরের প্রায় সবটাই পেরিয়ে এসে এখন অতি অল্পের জন্য মন ধৈর্য মানছে না, মনে হচ্ছে তরী ভেড়বার পূর্বেই তীরে লাফিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার মুখে চিন্তার কুজ্ঝটিকা লক্ষ্য ক'রে আমিনা তার মনের উদ্বেগ বুঝতে পারলে। বললে, "ভয় নেই তোমার হামিদা, খাঁচার দোর তো খুলে দোবোই, তা ছাড়া দেশান্তরে তোমার সত্যিকার আশ্রয়ে তোমাকে রেখে আসব। এখন একটু ধৈর্য ধ'রে মেজ মিঞার সঙ্গে গল্প-টল্প কর, আমি ততক্ষণে একটু-কিছু মুখে দিয়ে আসি।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "তুমি এখনো কিছু খাওনি ভাই আমিনা?—যাও, যাও, আর দেরি কোরো না।"

"এই এখনি এলুম—বেশি দেরি হবে না।" ব'লে আমিনা লঘু ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তাকে মধ্যস্থ ক'রে সন্ধ্যা এবং নাসীরের মধ্যে এক-আধটা কথাবার্তা চলছিল, কিন্তু সে চ'লে যাওয়ার পর এই সদ্যপরিচিত দু'টি তরুণ-তরুণীর পক্ষে কথাবার্তা চালানো কঠিন হ'য়ে উঠল। নবপরিচয়ের সঙ্কোচ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তরল হ'য়ে ভেসে চ'লে যায়, নীরবতা তার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং একটা মামুলি কথোপকথনের সূত্রপাত ক'রে নাসীর এই অস্বস্তিকর মৌনের অবসান করবার চেষ্টা করলে। বললে, "কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে আসতে আপনার খুবই কষ্ট হ'য়ে থাকবে।"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললে, "মোটেই না, আমি খুবই আরামে

এসেছিলাম। কষ্ট হয়েছিল আপনার দাদার; তিনি প্রায় সমস্ত রাতই গাড়ির পিছনে পিছনে হেঁটে এসেছিলেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীর হাসতে লাগল; বললে, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, এটুকু পথ হাঁটতে, বিশেষত রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়, আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। গাড়ি-পাল্কী জেনানাদের জন্যই ব্যবহার হয়। আমরা পুরুষেরা গাড়ির আগে পিছে তো চলি-ই, আবার সময়ে সময়ে গাড়ির ওপর উঠে গরুর ল্যাজ মলতে মলতেও চলি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনারা বড়-মানুষ, জুড়ি গাড়ি মোটরকার চড়া অভ্যেস,—গরুর গাড়ি চড়তে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হয়।"

শুনে সন্ধ্যা অবরুদ্ধ বেদনার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে। হায় রে! কোথায় বা জুড়ি গাড়ি, আর কোথায়ই বা মোটরকার! সে-সব তো একরকম ভুলেই গেছে। সম্পদে-সম্মানে নন্দিত তার পূর্বকার সহজ সুন্দর জীবন, সে তো এখন অতীতের স্মৃতি! যে কলুষিত গ্লানিকর অস্তিত্বের মধ্যে তার দেহ-মন পলে পলে গলিত হ'য়ে উঠছিল, গরুর গাড়ি ক'রে তা থেকে দূরে পলায়ন, সে তো একটা অচিন্তিত সৌভাগ্যের কথা! আমিনা যদি তার হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে বন-বাদাড় কাঁটা-কাঁকরের মধ্য দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসত তা হ'লেও দুঃখ ছিল না। মুখে তার কাতরতার ছায়া ঘনিয়ে এল; দুঃখার্ত কণ্ঠে বললে, "আমি বড়মানুষই নই—অতি দুর্ভাগিনী!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এবং আকৃতির আকস্মিক পরিবর্তন দেখে নাসীর গভীর ঔৎসুক্যের সহিত বললে, "কিন্তু আপনি বড়লোকের মেয়ে, বড়-ঘরের বউ, এ কথা তো আমি ভাবীর মুখে শুনেছি।"

"শুধু সেই কথাই শুনেছেন, না আরও কিছু শুনেছেন?"

"আর বিশেষ-কিছু শুনিনি, তবে আপনার বিষয়ে সব কথা আমাকে পরে বলবেন বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "যখন সব কথা শুনবেন তখন বুঝতে পারবেন আমি তখন পরিহাস করছিলাম না—সত্যিই আমি আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের শরণাগত।" একটু চুপ ক'রে থেকে কতকটা যেন আপন মনে অন্যমনস্কভাবে বললে, "যে গরুর গাড়ি ক'রে আমিনা আমাকে উদ্ধার ক'রে আনলে সে গরুর গাড়ি তো চিরদিনের জন্যে আমার পক্ষে পুষ্পকরথ হ'য়ে রইল।" কথাটা ব'লে ফেলে নাসীরের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে। ঠিক যেন সূর্যকিরণের মধ্যে শরৎকালের অতর্কিত লঘুমেঘের বর্ষণ-লীলা।

নিজের এই আকস্মিক বিচলতার অভিনয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে পুনরায় একবার নাসীরের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করলে।

নাসীর দুঃখিত স্বরে বললে, "আমি বড়ই অন্যায় করেছি এ সব কথা তুলে। আমি আগে জানতাম না—"

নাসীরকে আর অধিক কথা বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "আপনি তো কোনো কথাই তোলেন নি। এ কথা আপনিই ওঠে—আমার জীবনে উপস্থিত এর চেয়ে বড় কোনো কথাই আর নেই—সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়।"

কী সে এমন কথা যার চেয়ে এই সুন্দরী তরুণী নারীর উপস্থিত আর কোনো কথাই বড় নেই, তা শুনতে ইচ্ছা করে; কী সে এমন বিপদ যা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আমিনা এ বাড়িতে নিয়ে আসার ফলে সামান্য গরুর গাড়ি পুষ্পক-রথ হ'য়ে রইল, তা জানবার আগ্রহও মনে কম নয়; কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্রেই এক পশলা চোখের জলের বর্ষণ হ'য়ে যায় সে প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে সহৃদয়তায় বাধে। পিছনদিকের বাগানে বহুক্ষণ থেকে একটা কাঠ-ঠোকরা পাখী সমানে শব্দ ক'রে চলেছিল, সেই একটানা শব্দের মদিরতায় নিজের কল্পনাবৃত্তিকে নিমজ্জিত ক'রে নাসীর তার সম্মুখে উপবিষ্ট এই অপরূপ রূপসী নারীর রহস্যাবৃত জীবনের সুখদুঃখের সমস্যা অনুমানে প্রবৃত্ত হ'ল। কোথা থেকে সে এসেছে, কোথায় সে যাবে, কী তার অভিপ্রায়, কিছুই সে আমিনার কাছ থেকে জানতে পারেনি, শুধু এইটুকু মাত্র জেনেছে যে, সে তাদের গৃহে ক্ষণস্থায়ী অতিথি এবং জাতিতে হিন্দু। বিবাহিত কি অবিবাহিত, সে কথা জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হয় নি। চোখে দেখে ঠাহর করবার কয়েকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাও ঠিক বোঝা যায় না। সীমন্তের প্রান্তভাগে রক্তাভ দাগটুকু সিঁদুরের, কি সিঁদুরের নয়, তাও যেন একটা রহস্য! এ যেন ঠিক রূপকথার অলৌকিক ব্যাপার! রূপকথার নায়িকার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ এক-সময়ে আবির্ভূত হয়েছে, আবার রূপার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ কখন অদৃশ্য হবে! রূপকথা নয় তো কী? দবীপুরের মতো অজ পাড়াগাঁ জায়গায় তাদের বাড়িতে এমন একটি অভিজাত বংশের রূপসী মেয়ে, রূপকথার পরীর মতোই বিস্ময়ের বস্তু!

"নাসীর মিঞা!"

সহসা নিদ্রোত্থিতের মতো চকিত হ'য়ে নাসীর বললে, "জী আজ্ঞে!"

"আপনি তো কলকাতায় পড়েন?"

"জী।"

"এখন আপনি এখানে রয়েছেন, কলেজ কি বন্ধ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের একটা পরব পড়েছে, সেই জন্য কলেজ পাঁচ দিন বন্ধ।"

"কবে আপনি কলকাতায় ফিরবেন?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নাসীর বললে, "দিন তিনেক পরে।"

নাসীরের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিলে; বললে, "আজ তবে আমাকে কে কলকাতায় নিয়ে যাবে? বোধ হয় আপনার দাদা?"

"তা তো বলতে পারলাম না। আপনার যাওয়ার কোনো কথাই আমি শুনিনি।"

উৎকণ্ঠিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আজ আমাকে কলকাতা যেতেই হবে। আপনি যদি দয়া ক'রে সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে আপনার বাবাকে একটু অনুরোধ করেন!"

নাসীর বললে, "আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন হবে না, সে বিষয়ে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা বৌদিদি, আমার ভাবী, করবেন। বাবার কাছে তাঁর কথার চেয়ে বেশি জোর আর কারো কথার নেই, আমারও নয় দাদারও নয়। কিন্তু আজই আপনার কলকাতায় যেতে হবে? দু-চার দিন পরে গেলে হত না? দিন তিনেক পরে আমিও তো আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে সন্ধ্যা বললে, "আজ আমাকে যেতেই হবে। সব কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আজ আমার না গেলেই নয়।" একটু অপেক্ষা ক'রে নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এখান থেকে রেল স্টেশন কত দূরে?"

নাসীর বললে, "বেশি নয়, মাইল চারেক।"

"যেতে কতক্ষণ সময় লাগে?"

"তাও বেশি নয়, ঘণ্টা দেড়েক।"

"স্টেশনের নাম কি?"

"গালুডি।"

"গালুডি!" সন্ধ্যার মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। অবশেষে একটা পরিচিত জায়গার কাছাকাছি উপনীত হয়েছে তা হ'লে! বছর চারেক আগে মাস খানেকের জন্যে গালুডিতে সে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে আসে। স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তার মেসোমশাই গালুডিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

নাসীর বললে, "গালুডি তা হ'লে আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি। পাশেই বোধ হয় জামসেদপুর?"

"ঠিক পাশেই নয়, গোটা দুই স্টেশন পরে। জামসেদপুর গেছেন না কি কখনো?"

"হ্যাঁ, গেছি।"

"আত্মীয় কেউ সেখানে আছেন?"

গালুডিতে অবস্থানকালে লোহার কারখানা দেখবার জন্যে সন্ধ্যারা একবার জামসেদপুর গিয়েছিল। সেখানে তার মাসিমার বড় জামাই কারখানায় বড় চাকরি করেন। তিনিই আগ্রহ ক'রে সকলকে নিয়ে গিয়ে চার পাঁচ দিন নিজের গৃহে রেখেছিলেন। তাঁর কথা মনে ক'রে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, আছেন। আমার মাসিমার জামাই সেখানে চাকরি করেন।" বিবাহের সময়ে পীরনগরে পরিচিত সুধারাণীর স্বামীও জামসেদপুরে চাকরি করে এ কথা সে শুনেছিল। কিন্তু সুধারাণীর স্বামীর নাম তার মনে পড়ল না, হয় তো কখনো শোনেইনি।

নাসীর বললে, "বোনের বাড়ির এত কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার জামসেদপুরে গিয়ে দেখাটা ক'রে এলে ভাল হোত না? না গেলে, পরে শুনলে তিনি হয় তো দুঃখ করতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, মহীউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে আমিনা সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে, "বেশি দেরি হয়েছে কি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললে, "একটুও না, খুব শীগগির এসেছ।"

মহীউদ্দিন বললেন, "বোসো মা, বোসো। তুমিও ব'সে পড় বউ মা, এখন অনেকক্ষণ কথাবার্তা করবার দরকার হবে।" তারপর নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "নাসীর, তুমি গিয়ে ইয়াসিনকে ডেকে নিয়ে এস—পরামর্শের মধ্যে আমাদের সকলেরই থাকা দরকার।"

ইয়াসিন উপস্থিত হ'লে অবিলম্বে কথাটার আলোচনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা পুত্রদের কাছে বিবৃত ক'রে মহীউদ্দিন সন্ধ্যাকে বললেন, "এ কথাতে কোনো ভুল নেই মা যে, যত শীঘ্র সম্ভব তোমার এখান থেকে চ'লে যাওয়া দরকার, তা তো তোমার পক্ষেও মঙ্গল আমাদের পক্ষেও মঙ্গল। কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কলকাতায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যে খুব সহজ হবে তা আমার মনে হয় না, কারণ কলকাতার দিকে, বিশেষত হাওড়া স্টেশনে, তারা ওৎ পেতে ব'সে আছেই। এ কথা তারা খুবই জানে যে এ সব ব্যাপারের বদমাইশেরা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়; আর ধরা পড়বার ভয়ে টাট্‌কা-টাট্‌কি যায় না, দু-চার মাস পরেই গিয়ে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমার ছেলেরা যদি ধরা পড়ে তা হ'লে বৌমার ভাইদের ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না—আর তা হ'লে তার চোটটা শেষ পর্য্যন্ত বউমার ওপরই গিয়ে পড়বে তা বুঝতেই পারছ। শুনেছি বউমার খাতিরে তুমি তাঁর ভাইদের এইটুকু ক্ষমা করেছ যে, তাদের আর অনিষ্ট কামনা কর না। এ কথা সত্যি কি মা?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা তার সম্মতি জানালে; বললে, "সত্যি।"

মহীউদ্দিন বললেন, "ভালো কথা। ক্ষমার উপর কোনো শিকায়েৎ চলে না, বিশেষত যেখানে ক্ষমা একটা উপকারের প্রত্যুপকার। তা হ'লে কাছাকাছি কোনো জায়গায় যদি তোমার এমন কোনো আত্মীয় স্বজনের বাস থাকে যেখানে রাতারাতি তোমাকে রেখে আসা যেতে পারে তা হ'লে গফুর-মহবুবের সঙ্গে নেতুড়টা কেটে যায়। তারপর সেখান থেকে তুমি অনায়াসে কাউকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চ'লে যেতে পারো। এমন কেউ আছেন কি মা? তা যদি থাকেন তো আজই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

নাসীর উৎসুকনেত্রে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করল। সন্ধ্যাও একবার নাসীরের

প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আছেন। জামসেদপুরে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, টাটা আয়রন ওয়ার্কসে চাকরি করেন।"

মহীউদ্দিন উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন, "আল্লা। তা হ'লে তো সুবিধেই হয়েছে। নাম কী মা, তাঁর ?"

"প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"ঠিকানা কী জানো ?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "বোধ হয় নর্দার্‌ন্ টাউন।"

"তা হ'লে বড় চাকরি করেন ?"

"হ্যাঁ, বড় চাকরিই করেন।"

"সেখানে তোমার যেতে কোনো আপত্তি নেই তো মা ? তা যদি না থাকে তো আজ রাত্রেই তোমাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিই। কলকাতা পৌঁছতে তাতে তোমার একটা দিন বিলম্ব হ'য়ে যাবে, কিন্তু উপায় কী ?"

সন্ধ্যা সকৃতজ্ঞনেত্রে মহীউদ্দিনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না। কী ব'লে আপনাকে যে আমি—" সে আর অধিক কিছুই বলতে পারলে না, অশ্রুতে চক্ষু আচ্ছন্ন হ'য়ে এল, কণ্ঠস্বর গেল জড়িয়ে।

মহীউদ্দিন স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "কিছুই তোমাকে বলতে হবে না মা, আমি সব বুঝতে পাচ্ছি ; অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি, এবার খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

তারপর কী ক'রে সন্ধ্যাকে জামসেদপুরে পাঠানো হবে তার আলোচনা হ'য়ে গেল। স্থির হ'ল বেলা আড়াইটার গাড়িতে ইয়াসিন জামসেদপুর গিয়ে প্রথমে সন্ধ্যার ভগ্নীপতির গৃহের সন্ধান ক'রে রাখবে, তারপর কাসেম নামে তাদের একজন পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির ট্যাক্সি নিয়ে রাত্রি চারটার সময়ে স্টেশনে অপেক্ষা করবে। রাত্রি তিনটার গাড়িতে গালুড়ি থেকে সন্ধ্যা ও নাসীর রওনা হ'য়ে জামসেদপুর পৌঁছলে ইয়াসিন সন্ধ্যাকে নামিয়ে নিয়ে প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পৌঁছে দেবে। নাসীর সেই গাড়িতেই চক্রধরপুর চ'লে গিয়ে দিন দুই তিন তার এক মাসির বাড়িতে অবস্থান করবে, এবং ইয়াসিন মধ্যাহ্নের গাড়িতে দবীপুর ফিরে আসবে।

মহীউদ্দিন আমিনাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তাহ'লে বউমা, বারোটার সময়ে তোমার বন্ধুকে নাসীরের সঙ্গে রওনা করিয়ে দিয়ো। তার আগে যেটুকু সময় হাতে আছে গরিবের ঘরে যতটুকু সম্ভব তাঁর খাতির-যত্ন কর।" তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "যে সর্তে তোমার বন্ধুকে মুক্তি দিচ্ছ বউমা, সে সর্ত কিন্তু তুমি তুলে নিয়ো। খাঁচার দরোজা যখন খুলে দিচ্ছ তখন পাখীর পায়ে আর জিঞ্জির বেঁধে রেখো না।"

সহাস্যমুখে মৃদুকণ্ঠে আমিনা বললে, "আপনার যখন হুকুম আব্বা, তখন তাই হবে।"

"হুকুম নয় বেটি, অনুরোধ।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মহীউদ্দিন বললেন, "খোদার কৃপায় সে প্রয়োজন যেন না হয়, কিন্তু যদিই হয়, তা হ'লে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে তুমি ফিরে এসো মা। যখনি তুমি আসবে তখনি বউমার এ বাড়ির দরোজা তোমার জন্যে খোলা পাবে—এ জেনে রেখো।"

শুনে সন্ধ্যার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল ; বললে, "তা আমি জানি আব্বা!

মহীউদ্দিন কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আরো একটা কথা ব'লে রাখি। বি-এ পাশ করলেই আমি নাসীরের সাদি দোবো। তোমার কাছে নেওতা যাবে, জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার একটি মেয়ের মতো তখন তোমাকে আসতে হবে।"

সন্ধ্যার গৌরবর্ণ মুখে লজ্জার একটা গোলাপী আভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ; মৃদুকণ্ঠে বললে, "নিশ্চয় আসব।

বার

বেড সুইচ টিপে ঘর আলোকিত ক'রে পার্শ্ববর্তী নিদ্রিত স্বামীর গা নাড়া দিয়ে সবিতা ডাকলে, "ওগো, ওগো, শুনছ?

ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রকাশ বললে, "কী?

অবরুদ্ধ স্বরে সবিতা বললে, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? চোর ডাকাত নয়। তুরৎ সিং বলছে, কে একজন মেয়েমানুষ কলকাতা থেকে এসেছে।"

"মেয়েমানুষ? কোথায়?"

"কী আশ্চর্য! কোথায় আবার? আমাদের বাড়ি।"

তুরৎ সিং বাহিরে বারান্দা থেকে প্রভু এবং প্রভুপত্নীর কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়ে প্রকাশ জাগ্রত হয়েছে বুঝতে পেরে কপট কাশির শব্দ ক'রে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলে।

প্রকাশ ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, "তুরৎ সিং!"

"হুজুর!"

"কিয়া হ্যায়?"

"হুজুর, একঠো মায়ী লোক কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ।"

"কাঁহা হৈ?"

"বরন্দে পর খড়ী হৈঁ।"

'কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ'—এ তুরৎ সিং-এর অনুমানের কথা, কেউ তাকে বলে নি। বহুদর্শিতার ফলে সে জানে যে, রাত চারটার সময় রেল থেকে কেউ এলে কলকাতা থেকেই এসে থাকে ;—এ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে হল ঘর পেরিয়ে এসে ঔৎসুক্যের সহিত দোর

খুলে প্রকাশ দেখলে সিঁড়ির নিকট বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক, এবং তার নিকটেই নিম্নে গাড়ি-বারান্দায় একজন পুরুষ। কম্পাউণ্ডের প্রান্তে রাজপথে একটা মোটরের অস্তিত্ব এঞ্জিন চলার মৃদু ধক্ ধক্ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রকাশ এবং সবিতা আবির্ভূত হ'তেই ইয়াসিন সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক চিনতে পাচ্ছেন ? এঁরাই তো ?"

তুরৎ সিং পূর্বেই বারান্দার বিজলী-বাতি জ্বেলে দিয়েছিল, সুতরাং ভালো ক'রে দেখতে পাওয়ার পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি,—নমস্কার।" ব'লে যুক্ত করে সন্ধ্যাকে নমস্কার ক'রে ইয়াসিন ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হ'ল এবং পর মুহূর্তে বিকট শব্দ ক'রে রাজপথের মোটারকার দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

সবিতা সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসে বললে, "আপনি কে, চিনতে পারছিনে তো।"

"চিনতে পারছ না সবি দিদি, পোড়ারমুখীকে চিনতে পারছ না।" ব'লে সন্ধ্যা একেবারে ঝাঁপ দিয়ে সবিতার দেহের উপর প'ড়ে দু' হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

তাড়াতাড়ি এক হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে অপর হাত দিয়ে তার মুখ আলোয় তুলে ধ'রে দেখে গভীর বিস্ময়ে সবিতা ব'লে উঠল, "ওমা, ওমা, সন্ধ্যা যে! তুই কোথা থেকে এলি রে সন্ধ্যা ? তুই কোথা থেকে এলি ?"

কিন্তু সন্ধ্যার তখন সবিতার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো অবস্থা একেবারেই ছিল না—তার মুখ হ'য়ে গিয়েছিল পাংশু, চোখ আসছিল বুজে, দেহ আসছিল এলিয়ে।

"ওগো, ওগো, শীগগির ধর, সন্ধ্যা প'ড়ে যাচ্ছে।" ব'লে সবিতা সন্ধ্যাকে সজোরে চেপে ধরলে।

দ্রুতপদে এগিয়ে প্রকাশ দুই বাহুর উপর সন্ধ্যার বিবশ দেহ তুলে নিলে, তারপর ধীর পদক্ষেপে হল ঘর অতিক্রম ক'রে শয়ন-কক্ষে পৌঁছে তাদের শয্যার উপর সন্তর্পণে তাকে শুইয়ে দিলে।

সবিতা ভয়ার্তকণ্ঠে বললে, "ওমা, কী হবে গো! শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকতে পাঠাও!"

প্রকাশ বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই, মানসিক উত্তেজনায় এরকম হয়েছে। তুমি শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এস—আর তোমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা।"

মুখে চক্ষে কিছুক্ষণ জল হাত বুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ স্মেলিং সল্টের শিশিটা নেড়ে নিয়ে ছিপি খুলে সন্ধ্যার নাকের কাছে ধরলে। তীব্র এ্যামোনিয়ার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা পাশ ফিরে শুলো।

প্রকাশ বললে, "আর ভাবনা নেই, খানিকটা ঘুম হ'লে শরীর ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি পাশে শুয়ে পড়, আমি ততক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে একটা শোফা-টোফায় আশ্রয় নিই।"

কিন্তু হল ঘরে গিয়ে সোফার মধ্যে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হ'ল না। পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার তরল হ'য়ে এসেছে, খোলা দোর-জানলার মধ্য দিয়ে ঝির ঝির ক'রে যে বায়ু প্রবেশ করছে তার মধ্যে প্রত্যূষের লঘুতা, দূরে কম্পাউণ্ডের সীমানায় একটা কিংশুক গাছের ভিতর পাখীর ঝাপট শোনা যাচ্ছে। অতি-প্রত্যূষের এই কমনীয় শোভা উপভোগ করবার সুযোগ কদাচিৎ ঘটে থাকে। ঘটনাচক্রে যদিই বা সে সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রকাশের ইচ্ছা হ'ল না। সিগারেটকেশ, অ্যাশ-ট্রে এবং দেশলাই নিয়ে সে বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসল। তারপর কেসের ভিতর থেকে একটা মোটা চুরুট বার ক'রে ভাল ক'রে ধরিয়ে নিয়ে সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিদ্রার খানিকটা প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়, কারণ মামুলি বরাদ্দ পূর্ণ হ'তে তখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল। কিন্তু রাত্রিশেষের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় মনকে তখনো এমন নাড়া দিচ্ছিল যে, নিদ্রা তাকে পরাজিত করতে পারলে না। দস্যু-অপহৃতা এই মেয়েটি তার গৃহে সহসা এসে উপস্থিত হ'ল কেন, কোথা থেকে সে এখন আসছে, কে তাকে রেখে গেল, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ত্বরিত বেগে সে কেনই বা প্রস্থান করলে—ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দে প্রকাশ বুঝতে পারলে সন্ধ্যা সুস্থ হ'য়ে জেগে উঠেছে, কিন্তু সেখানে না গিয়ে চুপ ক'রে চেয়ারেই প'ড়ে রইল। মনে মনে ভাবলে, নারীর মনের গভীর দুঃখের এবং লজ্জার কথা একজন নারীরই কাছে প্রথমে ব্যক্ত হ'য়ে কতকটা সহজ হ'য়ে যায়, সেই ভালো। এ কথাও সে মনে মনে স্থির করলে যে, সন্ধ্যার বিগত দুঃখময় জীবনের বিষয়ে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্যই সে তার কাছে কখনো প্রকাশ করবে না—যেটুকু সে নিজে বলবে অথবা সবিতার কাছে শুনতে পাবে তাই যথেষ্ট।

মূর্চ্ছিতা সুন্দরী সন্ধ্যার অপূর্ব স্তিমিত শ্রী মনে ক'রে প্রকাশের মন সমবেদনায় সিক্ত হ'য়ে উঠল। নিজের শয্যার উপর সে যখন তাকে শুইয়ে দিয়েছিল তখন তাকে কমলেরই মতো সুন্দর মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কমলের উপর যেন গন্ধক-ধূমের মলিন পীতাভ অবলেপ।

"এখানে রয়েছ তুমি? আমি ভেবেছিলাম হল ঘরে হয়তো ঘুমচ্ছ।"

প্রকাশ চেয়ারে উঠে ব'সে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে সবিতা আসছে এবং তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে স্নিগ্ধকণ্ঠে সন্ধ্যাকে আহ্বান করলে। "এস সন্ধ্যা, এস!" একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে "ব'স এখানে।"

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে নত হ'য়ে প্রকাশের পদধূলি গ্রহণ করলে। শশব্যস্তে স'রে গিয়ে প্রকাশ বললে, "আহা হা, পায়ে হাত দিয়ো না। আমার পা'টা এমন কিছু অপূর্ব বস্তু নয় যে, তার ধুলো কারো মাথায় চড়তে পারে। আচ্ছা, তোমরা এক-একটা চেয়ার নিয়ে ব'সে পড়।"

সন্ধ্যা এবং সবিতা উপবেশন করলে প্রকাশ নিজের আসন গ্রহণ ক'রে বললে, "একটু ঘুমোলে না কেন সন্ধ্যা ? শরীরটা সুস্থ হয়ে যেত।"

সবিতা বললে, "ঘুমোবে কি, কেঁদে কেঁদেই ত প্রাণটা বার করলে। তুমি চ'লে এলে, তার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে উঠে বসল, সেই থেকে কান্না! আহা, ওর কষ্টের কথা শুনলে পাষাণও বোধ হয় গ'লে যায়। কিন্তু ওকে যে শেষ পর্যন্ত ফিরে পাওয়া গেল, এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে হবে।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সন্ধ্যা যে মুক্তি পেয়েছে সে খবর কলকাতায় সকলে জেনেছেন কি ?"

সবিতা মাথা নেড়ে বললে, "কেউ জানে না, মুক্তি পেয়ে প্রথমে ও তোমার কাছেই ছুটে এসেছে।"

প্রফুল্ল মুখে প্রকাশ বললে, "সে আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের বোধনটি যে আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হ'ল, এ সত্যই আমার সৌভাগ্যের কথা, সন্ধ্যা! এখন আজকের দিনের উৎসবটি কী ক'রে জাগিয়ে তুলতে হবে তাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।"

সবিতা বললে, "উৎসব তুমি কী বলছ ? সন্ধ্যা তো আজই কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে ; যদি সম্ভব হয় আজ সকালের গাড়িতেই।"

একটু বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ বললে, "আজ সকালের গাড়িতেই ? কেন, এত তাড়া কিসের ? আমি কলকাতায় তার ক'রে খবর দিচ্ছি, তাঁরা এসে সন্ধ্যাকে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তাঁরা এসে নিয়ে যান, সেইটেই ঠিক।"

প্রকাশের কথার শেষাংশ শুনে সন্ধ্যার মুখ দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। আমিনা তার মনের মধ্যে যে আশঙ্কার বীজ নিক্ষেপ করেছিল তা থেকে উৎপন্ন কাঁটা মুক্তির আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে বিদ্ধ করেছে। মনে হয়েছে আমিনা যা বলেছিল তা যদি মিথ্যে না হয় ? তা ছাড়া সে নিজেও তো কতকটা সেই হিন্দু সমাজকে চেনে যে সমাজ শুধু দ্বার রুদ্ধ করতেই জানে, খুলতে জানে না ; যে শুধু বলতে পারে 'যাও',—'এস' বলবার শক্তি যার নেই। যে অবস্থা থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। সেই অবস্থা ফিরে পাওয়া ছাড়া সন্ধ্যার জীবনের আর কোনো কাম্য কোনো চিন্তাই নেই, তাই অসঙ্কোচে সে আর্তস্বরে প্রকাশকে বললে, "কেন মুখুয্যে মশাই, আমি নিজে গেলে কী-এমন ক্ষতি হ'তে পারে ? আপনি কি মনে করেন তাঁরা আমাকে না নিতেও পারেন ?"

সে আশঙ্কা যে প্রকাশের মনে একেবারে ছিল না তা নয়, এমন কি সেই কথারই ইঙ্গিত বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল—কিন্তু

সন্ধ্যাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "না, না, আমি সে সব কিছুই মনে করছিনে সন্ধ্যা। আমার বলবার অর্থ, তুমি গিয়ে এখন কোথায় উঠবে বল ?—বাপের বাড়িতে, না শ্বশুরবাড়িতে ? শ্বশুরবাড়ি যদি যাও, মেশোমশাই, মাসিমা হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হবেন ; বাপের বাড়ি যদি যাও, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী হয়তো অপমানিত বোধ করবেন। তার চেয়ে খবর দিয়ে গেলে তোমার আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তাঁরা সেখান থেকে একটা যা হয় স্থির ক'রে এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যান সেই তো ভালো ?"

"কিন্তু তাঁরা যদি এখানে না আসেন ?"

প্রকাশ বললে, "তা হ'লে অবশ্য তোমাকেই যেতে হবে। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না আসে তো মহম্মদ পাহাড়ের কাছে যাবে—এ আপ্ত বাক্য।"

অনুনয়ের করুণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "সেই যদি যেতেই হয় মুখুয্যে মশাই, তা হ'লে আগেই যাইনে কেন ?"

প্রকাশ স্মিতমুখে বললে, "যুক্তি চালাবার তোমার ক্ষমতা আছে সন্ধ্যা, কিন্তু আমার যুক্তিটাও নেহাৎ বাজে ব'লে মনে হচ্চে না।"

"কিন্তু আমি যে আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনে।"

সবিতা বললে, "আহা, সত্যি, ওর কষ্ট আর দেখতে পারা যায় না। তুমি আজকেই ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থা আর কী করবে, নিজে গিয়ে রেখে এস।"

প্রকাশ বললে "তথাস্তু। আজই তোমার যাওয়া স্থির। তুপুরের গাড়িতে সম্ভব হবে না, কারণ অফিসে কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে হবে। রাত তুটোয় বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে কাল সকালে কলকাতায় পৌছোনো।—কেমন ? খুসি তো ?"

সন্ধ্যার মুখে মৃদুহাস্যের দীপ্তি ফুটে উঠল , ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

"বেশ কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখনি তু' জায়গায় তুটো জবাবি তার ক'রে দিচ্ছি ; তার ফলে যদি এই উত্তর আসে যে, বৈকালে বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে তাঁরা রাত্রি দশটার সময়ে এখানে এসে পৌছবেন, তা হ'লে অন্তত পাঁচ দিন এখানে তুমি বন্দী থাকবে। অবশ্য, সে কারাগার সুখের আগারই হবে।"

সন্ধ্যার মুখে পুনরায় একটা ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিলে। সবিতা বললে, "তা প্রিয়লাল যদি ওকে নিতে আসে তা হ'লে কি সহজে ওদের ছাড়ব ? সম্পর্ক তো আর একটা নয়—তুটো।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ওরে সন্ধ্যা, তোর শ্বশুর দূর-সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হ'ন তা জানিস ?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"তোর শ্বশুর আমার শাশুড়ীর দূর সম্পর্কের পিসতুত ভাই। অনেক দূর হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু তবু সম্পর্ক তো ?" তারপর হঠাৎ প্রকাশের দিকে চেয়ে সবিতা

ব'লে উঠল, "ও মা, তুমি সন্ধ্যার সঙ্গে কথা কচ্ছ কী গো। সন্ধ্যা যে তোমার ভাদ্র-বউ হল।" ব'লে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

প্রকাশ হাসিমুখে বললে, "ক্ষেপেছো? শালী কখনো ভাদ্র আশ্বিন হয় না—চিরকালই ফাগুন। সোনা কখনো তামা হয় না, যতই তাকে পয়সার হিসাবে গুনতে চেষ্টা কর না কেন। কী বল সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা কোনো কথা না ব'লে মৃদু হাসতে লাগল।

সবিতা চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললে, "সোনা কখনো তামা হয় কি না সে হিসেব পরে করা যাবে, এখন চল সন্ধ্যা, খানিকটা শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক। তোর যাবার ব্যবস্থা তো ঠিক হ'য়ে গেল।"

প্রকাশ বললে, "সেই ঠিক, আমিও ততক্ষণ দুটো তার লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিই। শুভ সংবাদটা যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভালো। তারপর সাতটার সময়ে সকলে মিলে ভালো ক'রে চা খাওয়া যাবে—তোমরা তার মধ্যে তয়ের হ'য়ে নিয়ো।"

সন্ধ্যা ও সবিতা চ'লে যাচ্ছিল, প্রকাশ ডেকে বললে, "সন্ধ্যা, তোমার শ্বশুর-বাড়ির নম্বরটা মনে আছে? রাস্তা আমি জানি, কিন্তু নম্বরটা ঠিক মনে নেই।"

সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এগারো নম্বর।"

"দেখ, সুস্থ সবল চিত্তে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি, কিন্তু তুমি এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও ঠিক মনে রেখেছ। সাধে কি আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের পতিগত প্রাণ ব'লে থাকে!" ব'লে প্রকাশ হাসতে লাগল।

সবিতা বললে, "তবুও তো তোমরা কথায় কথায় আমাদের সীতা-সাবিত্রী ব'লে ঠাট্টা করতে ছাড় না!"

প্রকাশ বললে, "সেটা কী জানো?—কবির ভাষায় যাকে বলে 'তরল সুরে ঠাট্টা ক'রে শুনিয়ে দিতে চাই, আসল কথাটাই'—আমাদের ঠাট্টাও তাই!"

প্রকাশের কথা শুনে সহাস্যমুখে সবিতা ও সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে বাকিটা অ্যাশ-ট্রের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে প্রকাশ উঠে পড়ল। অফিস-রুমে গিয়ে সন্ধ্যার পিতাকে এবং শ্বশুরকে দুটো টেলিগ্রাম লিখে ফেললে। দুটোরই এক মর্ম, এক শব্দ,—'শুভ সংবাদ। সন্ধ্যা আজ হঠাৎ টাটানগরে উপস্থিত হয়েছে। সে আপনাদের কাছে যাবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। আমি নিয়ে যাব, অথবা আপনারা নিতে আসবেন, সে কথা তার ক'রে জানাবেন।' তারপর বেল বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে টেলিগ্রাম দুটো ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে।

বেলা তখন প্রায় দশটা, অফিস যাবার জন্যে প্রকাশ প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় সন্ধ্যার পিতার তারের জবাব এল,—'শুভ সংবাদে সকলেই সুখী। সন্ধ্যার শ্বশুরকে যদি সংবাদ না দিয়ে থাক তো অবিলম্বে দেবে। তাঁর ঠিকানা ১১নং দত্তপুকুর রোড। চিঠি যাচ্ছে।'

নিকটে সবিতা এবং সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, প্রকাশের পড়া হ'য়ে গেলে তারা তার হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে একে একে প'ড়ে দেখে ফিরিয়ে দিলে। সন্ধ্যাকে নিতে আসার অথবা আনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে টেলিগ্রামে একটিও কথা নেই—সে বিষয়ে প্রকাশের যে প্রশ্ন ছিল সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। তা ছাড়া নেই, শুভ সংবাদের পরিমাণের হিসাবে আনন্দ প্রকাশের সচ্ছলতা। নেহাৎ যে আনন্দটুকু প্রকাশ না করলে সাধারণ সহৃদয়তার ব্যতিক্রম ঘটে, শুধু সেইটুকু। সন্ধ্যার প্রতি নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা লক্ষ্য করলে নৈরাশ্যের আঘাতে তার মুখ কঠোর হ'য়ে উঠেছে। যতটা সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "যতই হোক, মেয়ের বাপ তো, সব দিক বিবেচনা ক'রে না চললে চলে না। পাছে কোনো কথা ওঠে সেই জন্যে নিজের তরফ থেকে কোনো-কিছু না ক'রে আগে শ্বশুরকে খবর দিতে বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে অনুমতি দিলেও কি কোনো কথা উঠত সবিদি? মুখুয্যে মশাই তো লিখেছিলেন যে তিনি পৌঁছে দিতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রকাশ; বললে, "বাঙ্গালী মেয়ের বাপ সন্ধ্যা, ভয়ে আধমরা হ'য়েই থাকে। তোমাকে দেখবার জন্যে ছুটে আসবার সাহস যাঁর হয় নি, তোমাকে যাবার জন্যে কেমন ক'রে তিনি লেখেন বল? সে যে আরো বেশি দায়িত্বের কথা হতো।"

দৃঢ়স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু দায়িত্ব কেন, তা আমি একটুও বুঝতে পারছিনে মুখুয্যে মশাই! কিসের দায়িত্ব?"

সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ দেখলে তার দুই চোখের মধ্যে অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হয়েছে। সে ভয় পেয়ে গেল; শান্ত স্বরে বললে, "এ সব আলোচনা এখন বন্ধ থাক সন্ধ্যা। হয়তো এ সমস্ত কথাই নিরর্থক হচ্চে। আর একটু পরে তোমার শ্বশুরের তার এলে তখন হয়তো এ সব কথা আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না। এখন তোমরা যাও, খেয়ে নাও গে।"

সন্ধ্যার শ্বশুরের কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাম এল তখন বেলা দুটো। একটা শীট-মিল-এ প্রকাশ ব'সে মিলের একটা বেমেরামৎ অংশ পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে তার একজন আরদালী গিয়ে তাকে তারখানা দিলে। খাম খুলে তাড়াতাড়ি তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে প্রকাশের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল। এক মুহূর্ত কী ভাবলে, তারপর টেলিগ্রামটা ভাঁজ ক'রে খামের মধ্যে পুরে জামার বুক পকেটে রাখলে। খানিকটা কাজ করবার পর দেখলে একটা সম্ভাবিত দুরূহ সমস্যার চিন্তায় কাজে মন বসছে না। বিরক্ত হ'য়ে সেদিনের মতো সেইখানে শেষ ক'রে নিজের অফিস-রুমে চ'লে গেল।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। প্রশস্ত বারান্দার এক প্রান্তে একটা মারবল পাথরের গোল টেবিল ঘিরে আট দশখানা চেয়ার ছিল, তারই দু'খানা অধিকার

ক'রে সবিতা ও সন্ধ্যা গল্প করছিল। সন্ধ্যার চক্ষু রক্তাভ,—বোধ হয় একটু পূর্বেই কেঁদেছিল, তারই চিহ্ন।

সবিতা বললে, "ও-সব চিন্তা তুই ছেড়ে দে সন্ধ্যা। কোথাকার কে এক আমিনা তোর মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়েছে দেখছি।"

ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, "শুধু আমিনার কথা কেন বলচ সবিদি, তুমি নিজেই কি হিন্দু সমাজের কথা জানো না? গল্পে উপন্যাসে পড়োনি? খবরের কাগজে দেখোনি?"

"গল্প উপন্যাসের কথা এখন ছাড়, উপন্যাসে সব-কথা একটু বাড়িয়ে না বললে লোকের ভালো লাগবে কেন? এখন লোকের মতি গতি অনেক বদলে গেছে।"

সন্ধ্যা বললে, "মতি বদলে থাকতে পারে, কিন্তু গতি বদলায়নি। আর তাও যদি বদলে থাকে তো সে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে, বনেদী বংশে নয়। আমার শ্বশুররা যে বনেদী বংশ।"

"আচ্ছা, দেখনা তোর শ্বশুরের কাছ থেকে কী জবাব আসে, তারপর যা বলতে হয় বলিস। আগে থেকেই খাঁড়া উঁচিয়ে রাখছিস কেন?"

"আমি আর খাঁড়া উঁচিয়ে কী রাখব সবিদি। কিন্তু আমার কী মনে হচ্চে জানো? বাবার কাছ থেকে তবু যা হোক একটা উত্তর এসেছে, শ্বশুরের কাছ থেকে কোনো উত্তরই আসবে না। বেলা চারটে বাজতে চলল এখনো জবাবি এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের উত্তর এল না—এ তুমি বুঝতে পারছ না?"

"হয়তো অফিসে এসেছে।"

"তা যদি এসে থাকে তো খারাপ খবরই এসেছে, ভালো খবর হ'লে মুখুয্যে মশাই তখনি পাঠিয়ে দিতেন।"

দূরে একটা মোটরকারের হর্ণ শুনে সবিতা বললে, "ঐ উনি আসছেন। সকাল সকাল যখন ফিরছেন তখন নিশ্চয়ই ভালো খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে।"

কিন্তু গাড়িবারান্দায় যখন মোটর এসে দাঁড়াল তখন ভিতরে প্রকাশের উৎসাহহীন মুখ দেখে শুভসংবাদের ভরসা আর কিছু রইল না।

প্রকাশ গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "টেলিগ্রাম এসেছে?"

"এসেছে।"

"কী খবর?—ভালো?"

"ঐ একই রকম!" মুখখানা একটু কুঞ্চিত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেল। সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বললে, "কই দেখি?"

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার ক'রে প্রকাশ সবিতার হাতে দিলে। সবিতা প'ড়ে সন্ধ্যার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিলে। স্পর্শ না ক'রেই সন্ধ্যা টেলিগ্রামটা ধীরে ধীরে প'ড়ে নিলে।

টেলিগ্রামের মর্ম এইরূপ,—'শুভসংবাদের জন্য ধন্যবাদ। বৌমা উপস্থিত এখন কিছুদিন তাঁর বাপের কাছে থাকেন সেইটেই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে যদি এখনো খবর না দেওয়া হ'য়ে থাকে তো অবিলম্বে যেন হয়। চিঠি যাচ্ছে।'

টেলিগ্রামের মধ্যে যে কঠোর কথা মৌন হ'য়ে বর্তমান রয়েছে তার আঘাতে তিনটি প্রাণী ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। কেউ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে সাহস করলে না। এ যেন ঠিক বিদ্যুৎপূর্ণ তামার তার, চোখে দেখতে নিরাপদ, কিন্তু স্পর্শ করলেই ভিতরে মৃত্যুদায়ী প্রবাহ।

মৌনভঙ্গ করলে প্রকাশ; বললে, "আমি তো অফিসের কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। কিন্তু তুমি কি আজ রাত্রে কলকাতা যেতে চাও সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল; মৃদুস্বরে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "সেই কথাই ভালো। কাল দু'জনেরই চিঠি আসবে, সেই দেখে যেমন ভালো হয় সেইরকম ব্যবস্থা করলেই হবে।"

"কিন্তু চিঠিতেও যদি আমাকে নিয়ে তাঁরা এমনি ছোঁড়াছুঁড়ি করেন, তখন আমি কোথায় যাব মুখুয্যে মশাই!" ব'লে দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে সন্ধ্যা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর দক্ষিণ বাহু রেখে সমবেদনার করুণকণ্ঠে সবিতা বললে, "তাই যদি হয়, তা হ'লে কোথায় আবার যাবি ভাই? আমাদের কাছেই থাকবি। যতদিন দরকার, যতদিন ইচ্ছে। আমাদের তো আর ছেলেপিলে নেই যে, সমাজের ভয় করতে হবে।"

প্রকাশ বললে, "আমার আবার বোনও নেই সন্ধ্যা, সুতরাং আমি মনে করব এতদিনে আমি একটি বোন লাভ করলাম। কিন্তু এ সব বাজে কথার কোনো দরকার নেই, কাল চিঠি এলে দেখবে আজ তুমি যা ভয় করছ তার কোনো কারণই ছিল না।"

কিন্তু পরদিন যখন চিঠি এল তখন দেখা গেল, কারণ যথেষ্টই ছিল। দুটি চিঠিই দু'খানি টেলিগ্রামের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত সংস্করণ মাত্র,—বাহুল্য-বর্জিত, উচ্ছ্বাসবিহীন, যুক্তির সারবত্তায় সুনিবিড়। উভয় চিঠিরই প্রতিপাদ্য, সন্ধ্যা এখন কিছুদিন অপর পক্ষের কাছে থাকে সেইটেই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ অথবা সমবেদনার বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র নেই, পাছে তদ্দ্বারা বিবেচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উভয়পক্ষের সহিত উভয়পক্ষের দেখাশুনার পর চিঠি লেখা, তার ইঙ্গিত চিঠির মধ্যে বর্তমান।

চিঠি পড়ার পর মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে সন্ধ্যা উঠে ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। কাল টেলিগ্রাম এলে সে কেঁদে আকুল হয়েছিল, আজ তাকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা গেল না।

ভয়ার্তকণ্ঠে সবিতা বললে, "কী হবে গো! শেষ পর্যন্ত মেয়েটা ভেসে যাবে নাকি?"

প্রকাশ বললে, "বাঙলা দেশ তো। ভেসেও যেতে পারে, ডুবেও যেতে পারে —কিছুই আশ্চর্য নয়।"

"তারপর ?"

"তারপর যা তাকেই বলে অদৃষ্ট—এখন কেমন ক'রে বলব বল ?"

তের

সেদিন সন্ধ্যা কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করলে না, জলস্পর্শ করলে না; বৈকাল থেকে সেই যে শয্যা গ্রহণ ক'রেছিল তারপর সে-রাত্রি তাকে কেউ একবারও ঘরের বাইরে আসতে দেখেনি। যতবারই সবিতা তাকে ওঠাবার খাওয়াবার চেষ্টায় গেছে, প্রতিবারই একই সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে ফিরেছে—'আজ আমাকে ছেড়ে দাও ভাই সবিদিদি, একেবারে একলা। কিচ্ছু ভালো লাগচে না, ভারি ক্লান্ত!' সবিতা তাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে কথাটা উত্থাপিত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সন্ধ্যা সে কথায় কোনো দিক দিয়েই যোগ দেয়নি, না অনুযোগ অভিযোগের দিক দিয়ে, না দুঃখ অভিমানের দিক দিয়ে। কান্নাকাটির তো ধার দিয়েও যায়নি।

রাত্রি দশটার সময়ে সবিতা গিয়ে যখন দেখলে ভিতর থেকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধ, তখন প্রকাশ বললে, "আর ডাকাডাকি কোরো না সবু, একরাত্রি আহার না করলে কোনো অনিষ্ট হবে না, কিন্তু একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ে তা হ'লে ওর দেহ মন দুই-ই কিছু সুস্থ হ'তে পারবে।"

কিন্তু কোনো উপায়ে প্রকাশ যদি অবরুদ্ধ দ্বারের ভিতরকার অবস্থা একটুখানি দেখতে পেত তা হলে বুঝতে পারত, যে-দুটি চক্ষের মধ্যে অশ্রুর পরিবর্তে অগ্নির রুদ্রলীলা চলেছিল সেখানে ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যে বস্তুর উপর বৃষ্টিপাত হ'ল না, শুধু বজ্রপাতই হ'ল, সে জ্বলবে না তো আর কী হবে ?

তিরোবিয়া থেকে দবীপুর এবং দবীপুর থেকে টাটানগর সে এই সুনিশ্চিত ধারণা বহন ক'রে ছুটে এসেছিল যে, ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে শোনবামাত্র তার পিতা-মাতা, শ্বশুর, স্বামী সকলেই বাহু প্রসারিত ক'রে ছুটে আসবে ;—বলবে, ওরে আয়, আয়, আমাদের হারানো ধন, আমাদের হারানো মানিক, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আমাদের বুকে ফিরে আয়! তোকে হারিয়ে আমরা জীবন্মৃত হ'য়েছিলাম, ফিরে পেয়ে মৃতদেহে প্রাণ পেলাম! কিন্তু কোথায় বা ছুটে আসা, কোথায়ই বা বাহু প্রসারণ! স্বপ্ন-মরীচিকা চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হ'ল। যা এল, তা জড় নিশ্চল, তার মধ্যে পাষাণের স্থাবরতা! তার মধ্যে স্নেহ নেই, প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, দুঃখ নেই, সমবেদনা নেই; আছে শুধু শুভ-বুদ্ধি। পিতৃপক্ষ এবং শ্বশুরপক্ষ, উভয়পক্ষের মুখে একই বাক্য—অন্যত্র, অন্যত্র!

কিন্তু উভয়পক্ষই যদি অন্যত্র বলে, তা হ'লে সে 'অন্যত্র' কোথায় ? পথে কি ?

না নদীগর্ভে, না অগ্নিকুণ্ডে? সবিতা বলে তাদের গৃহে। কিন্তু কিছুতেই নয়। কুটুম্ববাড়িতে আশ্রিতা হ'য়ে করুণার উপর নির্ভর ক'রে জীবন-যাপন কোনো-মতেই না। প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে সবিতা এবং প্রকাশের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সেই সুরে সুর মিলিয়ে দিন আরম্ভ কোরতে হবে, তার চেয়ে ভিক্ষা ভালো, দাস্যবৃত্তি ভালো। ঘর ঝাঁট দিয়ে, উঠান পরিষ্কার ক'রে, বাসন মেজে জীবিকা অর্জনের মধ্যে দৈন্য থাকতে পারে, কিন্তু হীনতা নেই। কিন্তু গলগ্রহ হ'য়ে থাকা?—না, কিছুতেই নয়।

আচ্ছা, স্কুলে মেয়েদের গান শিখিয়ে কোনো প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না কি? সে তো স্কুলের মধ্যে তার সময়ে গানে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিল। সভা-সমিতি, পুরস্কার-বিতরণ, অভিনয়, সবতাতেই গানের প্রধান ভার পড়ত তার উপর।

মনে পড়ল তার সঙ্গীত-শিক্ষক যতীন চাটুয্যের কথা। গান শেখাতে শেখাতে যতীন চাটুয্যে একদিন তাকে ব'লেছিলেন, সন্ধ্যা, তোমার গলায় মালকোশের কোমল গান্ধার শুনে আমার মনে হয়, এমন কোনো রাগিণীই নেই যা তুমি ডাকলে তোমার কাছে সম্পূর্ণ মূর্তিতে এসে ধরা না দেয়। সেদিন যতীনবাবু সন্ধ্যাকে অদারঙ্গের বিখ্যাত খেয়াল 'আজু মোরে ঘর আইলা সুমত প্যারে' শেখাচ্ছিলেন। গান শেখানো শেষ হ'লে তিনি বলেছিলেন, শুনছি তোমার খুব বড় বনেদী ঘরে বিয়ের কথা হচ্ছে, আশীর্বাদ করি তাই যেন হয়। সে ভারি আনন্দের কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ভয় হচ্ছে মা, বনেদী বংশের ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্যন্ত তোমার গলায় না ছিপি পড়ে। তা যদি হয়, তা হ'লে আমি বুঝব বাংলা দেশের একটি সুরেলা পাপিয়ার কণ্ঠরোধ হ'ল। সে, অন্ততঃ আমার পক্ষে, ভারি পরিতাপের কথা হবে। আর যদি দুটো বৎসর তোমাকে শেখাতে পারতাম সন্ধ্যা, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্ণৌ দিল্লীর মুখে চুণকালি দিয়ে আসতে পারতাম। বাংলা দেশের একটা অপবাদ দূর হতো।

ওস্তাদের মুখে এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাণী শুনে সেদিন সন্ধ্যারও মনে তার বিবাহ-প্রস্তাবের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল। সঙ্গীতের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বশতঃ মনে হয়েছিল বিবাহটা আরও দুটো বৎসর পেছিয়ে গেলে সত্যই মন্দ হতো না; তাতে দিল্লী লক্ষ্ণৌর মুখে চুণকালি দেওয়া না হোক, যে জিনিস থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আসন্ন হ'য়ে উঠেছে, তার মেয়াদ আরও দুটো বৎসর বেড়ে যেত। আজ তার মনে হ'ল হয়তো গুরু-শিষ্যার মনের গোপনতম যুক্ত-কামনার প্রভাবেই তার বিবাহ-বন্ধনে এত বড় একটা চোট এসে পৌছেছে,—হয়তো যতীন চাটুয্যের শরণাপন্ন হ'য়েই গানবাজনার সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ সন্ধ্যা চকিত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল। ছি, ছি, এমন সব অশুভ কথা কেন সে এমন ক'রে চিন্তা করছে। কী এমন হয়েছে যে,

চরম দুর্দশার কথা ভেবে নিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে ? নিদ্রাভঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো হয়তো কালই এ সব অলীক হ'য়ে যাবে। তবে সে কেন মিছিমিছি এমন ক'রে আত্মনিপীড়ন করে।

কিন্তু এ ক্ষণজাগ্রত সান্ত্বনা পাঁচ মিনিটের জন্যও সন্ধ্যার মনের মধ্যে অবস্থান করলে না। নিষ্প্রভ রামধনুর মত এক মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। যে বিপুল প্রত্যাশা প্রথমেই এই নির্জীব অভ্যর্থনা লাভ করলে তার মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু-কীট বাসা বেঁধেছে। কোনো রকমেই তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে না।

পুনরায় সন্ধ্যার মন দুশ্চিন্তার চিতানলে পুড়ে পুড়ে ছাই হ'তে লাগল।

ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি গেল কেটে। ঘুম হওয়া তো দূরের কথা, চোখের পাতাও একবার মুদিত হ'ল না। এক সময়ে জানলার ভিতর দিয়ে দেখা গেল আকাশের ঘন তমিস্রের মধ্যে হঠাৎ কখন অতি ক্ষীণ আলোকের নিষ্প্রভ প্রলেপ পড়েছে। উঃ, দুশ্চিতার দীর্ঘ রাত্রি কোনো রকমে কাটল তা হ'লে। শয্যাত্যাগ ক'রে সন্ধ্যা দ্বার খুলে বাহিরে বারান্দায় এসে তার অবসন্ন দেহ একটা ইজি-চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে দিলে।

তখন বাড়িতে কেউ তো জাগেইনি, রাজপথেও লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। উষার শীতল বাতাস লেগে তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যেন একটু স্নিগ্ধ হ'ল। বিশ্বপ্রকৃতির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনের অসহায় ভাবটা একটু তরল হ'য়ে গেল—মনে হ'ল একেবারেই হয়তো সে নিঃসহায় নয়, এত বড় জগতের মাঝে কোনো এক কোণে তার জন্যও হয়তো একটু স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে স্থানের কোনো সীমানা আপাতত দেখা যাচ্ছে না,—একেবারে অজ্ঞাত, অনিশ্চিত।

খস্‌খস্‌ শব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে সবিতা আসছে।

সবিতা কাছে এসে সন্ধ্যার মাথায় হাত রেখে বললে, "কী রে সন্ধ্যা, কখন এখেনে উঠে এসেছিস ? ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি তোর ঘরের দোর খোলা। তখনি বুঝলাম এখানে এসে বসেছিস।"

সন্ধ্যা বললে, "বেশিক্ষণ নয় সবিদি, আধঘণ্টাটাক হবে।"

সন্ধ্যার চোখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সবিতা বললে, "চোখ অত লাল কেন রে ? সমস্ত রাত কেঁদেছিস বুঝি ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, কাঁদিনি তো।"

"তবে অত লাল হ'ল কেন ?"

"ঘুম হয়নি, বোধ হয় সেইজন্যে।"

"সমস্ত রাত ঘুমোসনি বুঝি ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যার পাশে উপবেশন ক'রে সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "এর মধ্যে এমনই কী হয়েচে সন্ধ্যা, যে, তুই এতটা উতলা হ'য়ে পড়লি ?

কাল জলস্পর্শ করলিনে, সারারাত ভেবে ভেবে জেগে কাটালি! এতটা ব্যস্ত হ'য়ে পড়বার মতো কী হয়েচে?"

দুঃখার্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "কা হয়েচে তা কি তুমিই বুঝতে পারছ না সবিদি? তুমিই কি নিশ্চিন্ত আছ? তোমার মুখ দেখেও তো মনে হয় তোমার মনেও ভাবনা কম নেই।"

সবিতা বললে, "কিন্তু ব্যবস্থাও তো সবই হচ্ছে ভাই। তোর মুখুয্যে মশাই কাল রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে মেসোমশাইকে আর তোর শ্বশুরকে বড় বড় চিঠি লিখেচেন। তিনিও কাল কিছু খাননি, শুধু এক পেয়ালা চা আর দু'খানা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।"

"আর তুমি?"

"তুই খেলিনে, তোর মুখুয্যে মশাই খেলেন না…আর আমার গলা দিয়ে খাবার পেটে নামত?"

সন্ধ্যার মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা দিলে; বললে, "কত কষ্টই তোমাদের দিচ্ছি সবিদি। কত পাপই পূর্বজন্মে করেছিলাম যার জন্যে এই সব অপরাধ করতে হচ্চে।"

সবিতা সন্ধ্যাকে একটা ধমক দিয়ে বললে, "তুই চুপ কর, সন্ধ্যা, তোকে আর ভদ্রতা প্রকাশ করতে হবে না! যে কষ্ট তুই নিজে ভোগ করছিস, যেদিন তোকে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারব সেদিন এ দুঃখ যাবে।"

"সেদিন কি কোনো দিন হবে, সবিদি?"

"হবে, হবে, নিশ্চয় হবে। তুই মনের জোর একেবারেই হারিয়েছিস দেখচি।" তারপর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ঐ উনি আসছেন।"

প্রকাশ নিকটে আসতেই সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। বললে, "আপনি এইটেতে বসুন মুখুয্যে মশাই।"

প্রকাশ বললে, "ক্ষেপেচ? আমার বাড়িতে শ্যালিকার আসন সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি আসনচ্যুত হয়ো না। আমি এইটেতে বসছি।" ব'লে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। তারপর স্মিতমুখে বললে, "কাল রাত থেকে তপস্যা আরম্ভ করলে নাকি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা প্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আপনারাও তো করেচেন।"

"কি করি বল? একজন আরম্ভ করলে যোগ না দিতে লজ্জা বোধ করে। তবে আমি প্রায়োপবেশন করেছিলাম প্রায়, সম্পূর্ণ নয়। তোমার দিদি বোধ হয় সম্পূর্ণই করেছিলেন। সেই প্রায়োপবেশনের শুভলগ্নে দু'খানি লম্বা চিঠি লিখেছি, একখানি তোমার শ্বশুরকে আর একখানি মেসোমশাইকে। তুমি দেখবে?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "না। যা লিখেছেন, ভালোই লিখেছেন, আমার দেখবার কোনো দরকার নেই।"

"মন্দ লিখেছি, তা বলছিনে, কিন্তু ভালো জিনিস দেখাও মন্দ নয়।"

সন্ধ্যা পুনরায় ঘাড় নেড়ে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "আচ্ছা তা হ'লে আমাদের বাগানে সন্ধ্যার কুঁড়িগুলি সকালের ফুলে কী রকম পরিণত হয়েছে দেখে আসা যাক চল। আশা করি তা'তে কোনো আপত্তি নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "তা নেই, চলুন।"

"বেশ কথা। তারপর সাতটার সময় চা ইত্যাদির দ্বারা ভালো ক'রে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করা যাবে—কেমন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "তাই হবে।"

প্রসন্নমুখে প্রকাশ বললে, "চল সবু, কাঁচি আর সাজিটা নিয়ে একবার তা হ'লে বাগানটা ঘুরে আসা যাক।"

উপকরণ দু'টি সংগ্রহ ক'রে তিনজনে বাগানের দিকে অগ্রসর হ'ল।

চৌদ্দ

অফিস থেকে গৃহে ফিরে প্রকাশ দেখলে প্রতিদিবসের নিয়মিত অপেক্ষায় আজ সবিতা ও সন্ধ্যা তার জন্যে বারান্দায় ব'সে নেই। যেখানে যে কাজেই থাকুক না কেন, প্রকাশের গৃহে ফেরবার সময় হ'লে তারা বারান্দায় ব'সে গল্পগুজব করে।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে দেখতে পেলে আয়াকে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে কানিয়া সাহেবের মেম এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছে নিজেদের বাড়ি। সেখানে 'তামাসা-টামাসা' ঐরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে।

"মাসিমা?"

"মাসিমা তাঁর নিজের ঘরে আছেন।"

সন্ধ্যার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রকাশ বাইরে থেকে ডাকলে, "সন্ধ্যা?"

ঘরের ভিতর থেকে সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "আজ্ঞে?" তারপর তাড়াতাড়ি পর্দা ঠেলে বাইরে এসে বললে, "আপনার আসবার সময় হ'য়ে গেছে মুখুয্যে মশাই?"

"তা তো হ'য়ে গেছে, কিন্তু তোমার চোখ দেখে সন্দেহ হয় কিছু আগে ওখানেও একটা কোনো ব্যাপার হ'য়ে গেছে। বোধ হয় বর্ষা-ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল?"

অপ্রতিভমুখে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে সন্ধ্যা বললে, "কৈ, না!"

হাসিমুখে প্রকাশ বললে, "না-ই যদি, তা হ'লে ও-রকম ব্যস্ত হ'য়ে খপ্ ক'রে চোখ না মুছলেও তো চলত। তা ছাড়া, চোখ মুছলে জলই না-হয় যায়, চোখের লালচে রঙও কি তাতে যায়?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, শুধু তার মুখে অল্প একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে।

প্রকাশ বললে, "বাড়িতে সবিতা নেই, সুবিধা পেয়ে অদৃষ্টের পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছিলে বুঝি ?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, কিন্তু এবার আর তার মুখে দুঃখের হাসির আভাসটুকু পাওয়া গেল না, তৎপরিবর্তে চোখ দুটো সহসা চকচকিয়ে উঠল। বিপদ দেখে প্রকাশ অন্য কথা পাড়লে। বললে, "মিসেস কানিয়া এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছেন ?"

সঞ্চীয়মান অশ্রুকে বিন্দুতে পরিণত হ'তে না দেওয়ার জন্য সন্ধ্যাকে আর একবার চোখে আঁচল দিতেই হ'ল। তারপর প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, বোধহয় সেই নামই।"

"কী আছে সেখানে ?"

"কে একজন এসেছে ওঁদের দেশ থেকে, সে না-কি খুব ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারে।"

"তুমি গেলে না কেন ?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে দু'জনেই পেড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু—", না যাওয়ার প্রকৃত কারণটা কী ভাবে বলবে সে বিষয়ে সন্ধ্যা ইতস্তত করতে লাগল।

প্রকাশ বললে, "কিন্তু যেতে ইচ্ছে হ'ল না ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না।"

মুখের উপর একটা কপট গাম্ভীর্যের ছায়া বিস্তার ক'রে প্রকাশ বললে, "ম্যাজিক দেখতে যেতে যখন ইচ্ছে হয় না তখন বুঝতেই হবে মনের আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন! শুকনো ডালে পাতা গজাবে, ফুল ফুটবে, ফল ফলবে, একটা আস্ত বেগুন কাটবে আর তার ভিতর থেকে ফুড়ুৎ ক'রে বুলবুলি পাখী উড়ে যাবে —এ-সব কি সহজ কথা? এ দেখবার জন্যে আমি অফিস কামাই করতেও পেছপাও হইনে। চা খেয়েছ ?"

"না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার আর আমার দু'জনের চা দিতে হুকুম ক'রে দাও, আমি ততক্ষণে মুখ হাত ধুয়ে তয়ের হ'য়ে নিই।" ব'লে প্রকাশ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

সন্ধ্যা বললে, মুখুয্যে মশাই, শুধু আপনার চা-ই দিতে বলি। সবিদিদি এলে আমি তাঁর সঙ্গে খাব অখন।"

প্রকাশ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "সে কার্য তোমার সবিদিদি কানিয়া সাহেবের বাড়িতে উত্তমরূপে শেষ না ক'রে ফিরবেন, তা মনেও কোরো না। সুতরাং তাঁর ভাগের খাবারটাও যদি আমরা দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে ফেলি তা হ'লেও এমন কিছু অপরাধ হবে না।"

প্রকাশের দু'টি মন্তব্যের মধ্যে অন্ততঃ প্রথমোক্তটা এমনই সমীচীন যে তার বিরুদ্ধে আর কোনো কথা বলা চলল না। অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আপনি তা হ'লে তয়ের হ'য়ে নিন।—আমি চা দিতে বলছি।"

"দু'জনেরই ত ?"

"হ্যাঁ, দু'জনেরই।"

"বেশ কথা।" ব'লে প্রকাশ প্রসন্নমুখে প্রস্থান করল।

ভিতরের একটা বারান্দার একপ্রান্তে চা পানের জন্য টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে চা এবং খাবারের বিবিধ উপকরণ সাজিয়ে রেখে সন্ধ্যা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছিল। যথা সময়ে প্রকাশ তথায় এসে উপস্থিত হ'ল, এবং নানাবিধ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পানাহার চলতে লাগল।

খাওয়া শেষ হ'লে চেয়ার ত্যাগ ক'রে উঠে প্রকাশ বললে, "চল সন্ধ্যা, একটু খড়কাই নদীর দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "সবিদিদি হয়তো একটু পরেই এসে পড়বেন। সবিদিদি এলে তারপর গেলে ভালো হয় না ?"

প্রকাশ বললে, "তাতো হয়-ই। কিন্তু আসতে তাঁর যে অনেক দেরী হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।"

অপ্রতিভমুখে সন্ধ্যা বললে, "শুধু তাই নয়, মুখুয্যে মশাই, সবিদিদি অনেক পেড়াপিড়ি করেছিলেন, তবু আমি তাঁর সঙ্গে যাইনি, পাছে তিনি মনে করেন—"

সন্ধ্যার অসমাপ্ত কথার মধ্যে প্রকাশ উচ্চৈঃস্বরে হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "পাছে তিনি মনে করেন তাঁর কথার চেয়ে তুমি আমার কথার বেশি বাধ্য'—এই তো ? তা তো তুমি নিশ্চয়ই বাধ্য। বোনের ওপর বোনের কথার চেয়ে শালীর ওপর ভগ্নিপতির কথার জোর বেশি, এ সনাতন সত্য সকলেরই জানা আছে। বরং এখনও তিনি যদি রাগ না ক'রে থাকেন তো তাঁর কথা না শুনে আবার আমার কথাও শোননি জানতে পারলে হয়তো রেগে যেতে পারেন। জান তো প্রত্যেক পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক নিজের অপমানের চেয়ে স্বামীর অপমানে বেশি আহত হয়। সতীর কথা মনে আছে তো ?"

প্রকাশের কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেললে; বললে, "কথায় আপনার সঙ্গে পেরে ওঠবার শক্তি তো আমার নেই, কাজেই চলুন।"

প্রসন্ন হ'য়ে প্রকাশ সন্ধ্যার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বেশ পরিবর্তনের কোনো দরকার আছে কি ?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "কিচ্ছু না।"

"তবে এসো, মোটর তৈরিই আছে।"

প্রকাশের মোটর অন্তর্হিত হওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই কানিয়া সাহেবের গাড়ি ক'রে সবিতা গৃহে এসে উপস্থিত হ'ল। তখনো ম্যাজিক শেষ হয়নি, প্রধান দুটো খেলা তখনো বাকি। ম্যাজিকের শেষে লঘু জলপানের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু

প্রকাশ অফিস থেকে এসে হয়তো অপেক্ষা ক'রে থাকবে এই কথা মনে ভেবে সে অতি কষ্টে মিসেস কানিয়ার নির্বন্ধাতিশয্য এড়িয়ে শুধু তুই তিন চুমুক চা এবং আধখানা বিস্কুট খেয়েই চ'লে এসেছে, কতটা পরিশ্রান্ত ক্ষুধিত অবস্থায়। দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ ক'রে সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলে, "আয়া, আয়া!"

মোটরের শব্দ পেয়ে আয়া আপনিই আসছিল, সবিতার আহ্বানে তাড়াতাড়ি সম্মুখে এসে বললে, "মেম সাহেব!"

"সাহেব অফিস থেকে আসেন নি?"

আয়া বললে, "হ্যাঁ মেমসাহেব, সাহেব অফিস থেকে এসে চা খেয়ে মাসিমাকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন।"

সবিস্ময়ে সবিতা বললে, "এরি মধ্যে এসে বেরিয়ে গেছেন?" পরমুহূর্তেই ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। "কতক্ষণ গেছেন?"

"কতক্ষণ?—এই পাঁচ মিনিট। ব্যস।"

একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কতক্ষণ সাহেব এসেছিলেন?"

মনে মনে একটু হিসাব ক'রে আয়া বললে, "আধ ঘণ্টার কিছু বেশি হবে।"

"মাসিমা চা খেয়েচেন?"

"হ্যাঁ, মাসিমাও সাহেবের সঙ্গে চা খেয়েচেন।"

"আচ্ছা, তুই যা।" ব'লে সবিতা প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

আয়া জিজ্ঞাসা করলে, "মেমসাহেব, চা দোবো আপনাকে?"

মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "না, কিচ্ছু দিতে হবে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

আক্ষরিক হিসাবে সত্য হ'লেও বস্তুত কথাটা মিথ্যাই; কারণ দেহের মধ্যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়েরই তাগিদ ছিল তখন যথেষ্ট। কিন্তু মনটা হঠাৎ কেমন গেল বেঁকে, মনে হ'ল দূর হোকগে ছাই, খেয়ে-টেয়ে আর কাজ নেই, চুপচাপ একটু শুয়ে পড়া যাক। কিন্তু বেশ পরিবর্তন ক'রে শুতে গিয়ে শুতে ইচ্ছা হ'ল না। বাঁ দিকের কপালের একটা শির দপ্ দপ্ করছিল—বোধহয় পিত্ত পড়ারই জন্য। স্মেলিংসল্টের শিশিটা হাতে নিয়ে সবিতা পিছনদিকের বাগানে একটা সান-বাঁধানো চাতালে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এ জায়গাটা তার ভারি প্রিয়। এর আশপাশের প্রায় সমস্ত গাছগুলোই তার নিজের হাতে পোঁতা এবং নিজের যত্নে বর্ধিত। তাই সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই এ জায়গাটা তার ভালো লাগে। কিন্তু আজ আজ তা-ও লাগল না। মনের ভিতরকার তারটা সহসা একটু চ'ড়ে গিয়ে এমন একটা বেসুরোয় বেঁধেছে যে, কোনো বস্তুরই সঙ্গে এখন আর সুর মিলছে না। উঠে প'ড়ে একটু ঘুরে-ফিরে অবশেষে শয়নকক্ষে গিয়ে শয্যাশ্রয় করলে। আলো নিভিয়ে চোখ বুজে স্থির হ'য়ে প'ড়ে রইল, কিন্তু ঘুম এল না।

প্রকাশের মোটরের হর্ণের শব্দ যখন শোনা গেল তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা উত্তীর্ণ হয়েছে। কিছু পরেই প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করলে। সুইচ খুলে দিয়ে সবিতাকে শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হ'য়ে নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েচে সবু?—অসুখ করেছে না-কি?"

সবিতা অন্যদিকে ফিরে শুয়ে ছিল, প্রকাশের প্রশ্নে তার দিকে ফিরে বললে, "না।"

"তবে এ সময়ে শুয়ে রয়েছে কেন?"

"মাথাটা সামান্য ধরেছে।"

"কী আশ্চর্য! সেটা কি অসুখ নয়?" তারপর সবিতার পাশে শয্যাপ্রান্তে ব'সে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোমার মাথাধরা তো সহজ ব্যাপার নয় সবু। একটু ফুটবাথ নিলে না কেন?"

"দরকার নেই, চুপ ক'রে শুয়ে থাকলেই ক'মে যাবে অখন।"

"ম্যাজিক কেমন দেখলে?"

"ভালই।"

"ম্যাজিশিয়ান কি কানিয়াদের আত্মীয় কেউ?"

"না, ব্যবসাদার; ওদের দেশের লোক।"

"বুঝেচি। ওদের বাড়ি প্রথম একদিন দেখিয়ে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে বাড়ি বাড়ি দেখিয়ে বেড়াবার ফন্দী।"

একথার উত্তরে সবিতা কোন কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে ব'সে থেকে প্রকাশ বললে, "আজ একটা ভারি চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি, সবু। তুমি তো কোনদিন আমাকে বলনি যে, সন্ধ্যা এত ভালো গান গাইতে পারে।"

"আমি ছেলেবেলায় ওর গান শুনেছিলাম, তারপর অনেকদিন শুনিনি। কেন, তুমি ওর গান আজ শুনলে না কি?"

"শুনলাম বই কি, তা নইলে বলছি কেমন ক'রে? আহা, চমৎকার গাইলে। গিটকিরির দানাগুলো কী পরিষ্কার, ছোট ছোট তানগুলো দেয় এমন অদ্ভুত মিষ্টি ক'রে। আমি তো মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি!"

সন্ধ্যার গান যে বাড়িতে হয়নি, অন্য কোথাও হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে নিতে সবিতার বিলম্ব হ'ল না। চা-পান সহ আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে গানের অবসর কোথায়? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওকে কাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে? কোথায় ও গান গাইলে?"

অল্প একটু হেসে প্রকাশ বললে, "কারুর বাড়িতে নয়, খড়কাইয়ের ধারে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানেই শুনলাম।"

"সেই খোলা জায়গায় লোকজনের সামনে তান গিটকিরি দিয়ে ও গান গাইলে?"

"লোকজন কোথায় ? একেবারে নির্জন। যেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে জনমানবের সাড়া নেই।"

"তা যেন নেই, কিন্তু তুমি তো ছিলে,—তোমার সামনে অমন তান-টান দিয়ে গান করবার মতো ওর মনের অবস্থা হয়েচে তা হ'লে ?"

প্রকাশ বললে, "তুমি একটু ভুল করছ সবু। ও কি সহজে গেয়েছে ? কত সাধ্যসাধনা ফন্দী-কৌশল ক'রে তবে আমি ওকে গাইয়েচি। আজ অফিস থেকে এসে দেখি কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি রক্তজবা ক'রে রেখেছে। ওর মনের দুরবস্থার কথা ভেবে জোর ক'রে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। তাই কি যেতে চায়, বলে সবিদিদি এলে তারপর যাব। তুমি যে কখন আসতে পারবে তার তো স্থিরতা ছিল না, তাই আমি একলাই ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে ওর নিজের কথা উঠতে বললে, মুখুয্যে মশাই, আমার শ্বশুর আর বাবা ভাবুন না কিছুদিন আমাকে তাঁরা ঘরে নেবেন কি নেবেন না, আমি কিন্তু ততদিন অকর্মণ্য হ'য়ে বসে থাকি কেন, দিন-না আমাকে কোন স্কুলে কিংবা ভদ্রলোকের বাড়ি ভর্ত্তি ক'রে, মেয়েদের লেখাপড়া শিল্পকর্ম গানবাজনা শিখিয়ে নিজের যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করি। আমি বললাম, লেখাপড়া শিল্পকর্মের কথা আমি তোমাকে এখনি বলতে পারছিনে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা শেখবার তাগিদটা আজকাল হঠাৎ এমন বেড়ে উঠেছে যে আমি চেষ্টা করলে এই টাটানগরেই অন্তত টাকা পঞ্চাশের মতো কাজ তোমাকে সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তুমি কি ভালো ক'রে গান শেখাতে পারবে ? সন্ধ্যা বললে, ছোট ছেলেমেয়েদের যা হোক এক রকম শেখাতে পারব ব'লেই তো মনে করি। উত্তরে আমি বললাম, কিন্তু সেটা তো শুধু তোমার মুখের সার্টিফিকেট শুনলেই হবে না, তোমার গানও শুনতে হবে, তা নইলে আমি অন্য লোককে জোর ক'রে বলব কেমন ক'রে যে, তুমি ভাল গাও তা আমি জানি। এই কৌশলেই অবশ্য কার্যোদ্ধার হ'ল, তবে ঠিক এমনি ভাবে এই কথাগুলিতেই হয়নি, অনেক বাক্যের জাল ফেঁদে কৌশলকে যুক্তির আবরণে ঢাকতে হয়েছিল। এখন বুঝলে তো সমস্ত ব্যাপারটা ?"

মাথার বালিসটা একটু সরিয়ে নিয়ে সবিতা বললে, "বুঝলাম।"

প্রকাশ বললে, "তোমাকেও আজই গান শোনাতে হবে, সন্ধ্যাকে দিয়ে সে কড়ার করিয়ে নিয়েছি। দেখো না, কী সুন্দর গায়, বোনের গুণের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে যাবে।"

ঠিক এমনি সময়ে পর্দার বাহিরে মৃদু পদধ্বনি শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই শব্দ এল, "আসতে পারি ?"

সবিতাকে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যা আসছে।" তারপর উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলে, "এস, সন্ধ্যা, এস !"

পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে সবিতাকে শায়িত দেখে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'য়ে নিকটে গিয়ে বললে, "শুয়ে আছ কেন, সবিদিদি ? অঃ ং করেছে না কি ?"

সবিতা বললে, "কিছু হয়নি, সামান্য একটু মাথা ধরেছে। বোস সন্ধ্যা, ওই চেয়ারটায় বোস।"

চেয়ারে না ব'সে সবিতার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "একটু মাথা টিপে দোব, সবিদিদি?"

সবিতা বললে, "না, না, মাথা টিপে দিতে হবে না, তুই চুপ ক'রে বোস।"

"বাড়ি এসে মাথা ধরল, না আগেই ধরেছিল?"

"বাড়ি এসে।"

"এসে চা-টা কিছু খেয়েছিলে?"

মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "না।"

সবিতার মুখের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে সন্ধ্যা বললে, "একটু চা খেলে মাথাটা ছেড়ে যাবে অখন। চা দিতে বলব, সবিদিদি?"

ক্ষুধা এবং পিপাসা কিছুরই অভাব ছিল না। একটু চুপ ক'রে থেকে সবিতা মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, আয়াকে না হয় ব'লে দিয়ে আয়।"

চা এবং কিছু খাবার দেবার জন্য সন্ধ্যা আয়াকে আদেশ ক'রে ফিরে এলে প্রকাশ বললে, "এইখানে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ের তফাৎ সন্ধ্যা। পুরুষ যদি ওষুধ তো মেয়ে আহার। সবিতার মাথাধরা দেখে আমার মনে হয়েছিল ফুটবাথের কথা, কিন্তু তোমার মনে পড়ল চায়ের কথা; অথচ দুটো প্রস্তাবের মধ্যে তোমারটাই যে অধিকতর সমীচীন হয়েছিল, তার প্রমাণ তো হাতে হাতে পাওয়া গেল। অনাদি কাল থেকে লালন-পালনের ভার বহন ক'রে ক'রে সেবা-ধর্মটা তোমাদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে।"

সবিতা বললে, "আজ গান গেয়ে তোর মুখুয্যেমশাইকে খুব খুসি করেছিস দেখচি সন্ধ্যা।"

শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "এরি মধ্যে সে কথাও হ'য়ে গেছে না কি?"

সহাস্যমুখে প্রকাশ বললে, "সবিস্তারে। তুমি যখন এলে তখনো সেই কথাই হচ্ছিল। এবার তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর, সবিতাকে গান শোনাও।"

সন্ধ্যা বললে, "আজ সবিদিদির মাথা ধরেছে, আজ আর গান-টান থাক মুখুয্যে-মশাই, আর একদিন শোনালেই হবে।"

প্রকাশ বললে, "সর্বনাশ। ও-রকম কথা মুখেও এনো না। সবিদিদিকে গান শোনাবার আগে আমাকে গান শুনিয়েছ তাইতে সবিদিদির মাথা ধ'রেছে, তার ওপর আজ যদি তাঁকে একেবারে গান না-ই শোনাও তা হ'লে একটু পরে জ্বর আসবে; তখন চায়ের পরিবর্তে তোমাকে দুধসাবুর ব্যবস্থা করতে হবে।"

প্রকাশের কথায় সবিতা তর্জন ক'রে উঠল; বললে, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তুমি অন্তর্যামী সব বুঝতে পারো। জ্বর আসবে, না আরো কিছু।"

প্রকাশ বললে, "আহা হা, তুমি জানো না, সবু, আসবে। আসতে, বাধ্য।

কোন স্ত্রীলোকের ছোটবোন যদি দিদির চেয়ে দিদির স্বামীর প্রতি বেশি মনোযোগ দেখাতে আরম্ভ করে তখন ঈর্ষা নামক যে বস্তু সুপ্ত অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকের অবচেতন মনে—"

সবিতা গর্জন ক'রে উঠে বললে, "রেখে দাও তোমার অবচেতন মনের গাঁজাখুরী।"

প্রকাশ তার অসমাপ্ত বাক্য অনুসরণ ক'রে বলতে আরম্ভ করলে—"সেই স্ত্রীলোকের অবচেতন মনে অবস্থান করছিল—"

বাধা দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সবিতা বললে, "ফের যদি অবচেতন মনের কথা মুখে আনবে তা হ'লে সচেতন মন দিয়ে ভীষণ ঝগড়া বাধাব।"

কপট নৈরাশ্যের সুরে প্রকাশ বললে, "কী আশ্চর্য! স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাকবে—তা সে যত লেখাপড়াই শিখুক না কেন। বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠা কিছুতেই হবে না। ওগো, ফ্রয়েডের মেণ্টাল টপোগ্রাফি, সুপার এগো, এ-সকলের বিষয়ে গবেষণা যদি একটু ভালো ক'রে করতে তা হ'লে চট ক'রে কথাটা উড়িয়ে দিতে পারতে না।"

সবিতা বললে, "চুলোয় যাক ফ্রয়েড! আমি ফ্রয়েডের কথা শুনতে চাইনে! তার চেয়ে চল্, সন্ধ্যা, তোর গান গোটাকয়েক শুনি।"

হাস্য-কৌতুকের প্রসাদে ঘরের আবহাওয়া লঘু হ'য়ে গেল—স্মিতমুখে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার চা?"

"চা ও-ঘরেই দেবে অখন।"

শয্যা ত্যাগ ক'রে সবিতা লাউঞ্জ ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। পিছনে পিছনে আসছিল প্রকাশ—ফিরে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, "তুমি যে কত বড় ধূর্ত লোক তা আমিই জানি! তোমার হাতে প'ড়ে জ্বলে পুড়ে মরলুম।" মনে মনে বললে, মিথ্যে কথা। তোমার হাতে প'ড়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে! কিন্তু সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি—একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কিছু দিয়ে তো তোমাকে বাঁধতে পারলাম না!

পনের

প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন একটা-না-একটা অবলম্বনের বস্তু থাকেই যার সন্ধান খুঁজে বার করতে পারলে সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থাতেই তার মধ্যে সে আশ্রয় লাভ করতে সমর্থ হয়। কতকটা সমুদ্র উপকূলের বন্দরের মতো—সুখের দিনে মৃদু-মন্দ সমীরণে সেখান থেকে সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি জমানোও চলে, আবার ঝড়-ঝাপটার দিনে তার আশ্রয়ে ফিরে এসে নোঙর ফেলে আত্মরক্ষা করাও সম্ভবপর হয়। সেই অবলম্বনের বস্তু কারো জীবনে সাহিত্য, কারো জীবনে শিল্প, কারো জীবনে ধর্ম। সন্ধ্যার জীবনে হয় তো তা সঙ্গীত, সে কথা যেন সে

সেদিন লাউঞ্জ ঘরে গান গাইতে গাইতে সহসা কোন এক মুহূর্তে উপলব্ধি ক'রে বসল। দেখতে দেখতে গান হ'য়ে উঠল সজীব,—তার সুরের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে আশ্রয় লাভ ক'রে বিগত দুঃখময় জীবনের সকল গ্লানি সকল বেদনা ফিকে হ'য়ে এল। প্রত্যেকটি গান, প্রত্যেকটি রাগিণী যেন নব নব চেতনার প্রকাশ, সুখ-দুঃখের মিশ্রণের উদাস বৈরাগ্যে স্তিমিত।

বিমুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতা দুটিও সঙ্গীতের এই অনন্যসুলভ স্পর্শ লাভ ক'রে আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিল। একটির পর আর একটি ক'রে দশ বারো খানা গানের মধ্য দিয়ে কখন যে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল তা কেউ বুঝতেই পারেনি। একটা গানের শেষে সন্ধ্যা যখন হারমোনিয়মের ডালা বন্ধ ক'রে মৃদুস্বরে বললে, আজ আর থাক, তখন তাকে আর গাইবার জন্যে কেউ অনুরোধ করতে পারলে না। ও জিনিস শেষ হওয়ার পর আর ফরমায়েস চলে না, উপরোধ অনুরোধের দ্বারা তার মেয়াদ বাড়ানো যায় না। সে তো শুধু গানই নয়, সে যেন কতকগুলো সুরকে আশ্রয় ক'রে একটা অবরুদ্ধ জমাট ক্ষোভের বিমুক্তি,—গানের ভাষায় সে যেন প্রাণের মর্মন্তুদ কাহিনী!

সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা বললে, "কী চমৎকার গাস্‌রে তুই সন্ধ্যা! কী অদ্ভুত তো গলা!"

সন্ধ্যার তখন চোখ ফেটে অশ্রুপাতের উপক্রম হয়েছিল, কোনো রকমে একটা হাসির দ্বারা সবিতার কথার উত্তর দিয়ে সে আসন ত্যাগ ক'রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুঃখার্ত কণ্ঠে সবিতা বললে, "এমন রূপ, এত গুণ, কিন্তু অদৃষ্টে কী আছে কে জানে। হয়তো কিছুই কাজে আসবে না, সবই অসার্থক হবে।"

প্রকাশ বললে, "মানুষের জীবন কিসে সার্থক হয়, অথবা হয় না, আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না সবু। কোনো জিনিসকে রূপ দিয়ে সার্থক করতে হ'লে আঘাত তার একটা প্রধান উপায়। যত মর্মরমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছ সবগুলিরই উপরে ছেনি আর হাতুড়ির নির্মম আঘাত পড়েছে। রূপ দেবার জন্যে আমাদের কারখানায় আগুন আর আঘাতের কী ভীষণ রুদ্রলীলা চলে দেখেছ তো। সন্ধ্যার মনের উপর এই যে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে, এর জন্যে তার জীবন অসার্থক হবে এ-কথা জোর ক'রে বলা চলে না,—হয়তো তার মনের উপর এই হাতুড়ির আঘাত তার জীবনকে সার্থকতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

মতভেদের শিরশ্চালনা ক'রে সবিতা বললে, "তা কী ক'রে হবে? স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে ওর জীবন সার্থক হ'তেই পারে না।" দাম্পত্য গণ্ডির বাইরে নারী-জীবনের যে কোথাও সার্থকতা থাকতে পারে এ কথা সবিতা বিশ্বাসই করে না। বললে, "বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়েদের স্বামীর ঘর ছাড়া আর উপায় নেই।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু মীরার কথা ভেবে দেখ। জীবনকে সফল করবার জন্যে তাকে স্বামীর ঘরই ছাড়তে হয়েছিল।"

"স্বামীর ঘর নয়,—শ্বশুরের ঘর।"

প্রকাশ বললে, "সে একই কথা। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রেও শ্বশুরেরই ঘর।"

প্রকাশের এই একান্ত অযৌক্তিক প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সবিতা বললে, "আচ্ছা, সে হ'ল পরের কথা। আপাতত আজ গান গেয়ে বেচারা যেন সত্যিই একটু তৃপ্তি পেয়েছে। কী আগ্রহ ভরে গান গাচ্ছিল দেখলে? মনে হচ্ছিল প্রত্যেক গান দিয়ে যেন ওর দুঃখের বোঝা একটু একটু ক'রে হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছে। শেষকালে প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিল; দেখেছিলে?"

প্রকাশ বললে, "দেখেছিলাম। ওটা-শুভ লক্ষণ। বর্ষণের দ্বারা আকাশ আর মন দুই-ই পরিষ্কার হয়।"

সবিতা বললে, "রোজ সন্ধ্যাবেলা ওকে একটু করে গানে বসালে হয়,—গান গেয়ে তবু যদি নিজেকে খানিকটা ভোলাতে পারে।"

প্রকাশ প্রফুল্লমুখে বললে, "বেশতো, বসালেই হবে,—তাতে আমাদের নিজের লাভও তো নিতান্ত কম হবে না।"

এই পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা খুব উৎসাহ ভরে সন্ধ্যার গান-বাজনা চলল। প্রথম কয়েকদিন এ বিষয়ে সবিতার যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখলে যে গানের দ্বারা সন্ধ্যা নিজেকে কতটা ভোলাতে পেরেছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার স্বামীকে যে বিশেষ রূপে ভুলিয়েছে তা নিঃসন্দেহ, তখন থেকে তার উৎসাহ দ্রুত গতিতে ক'মে আসতে লাগল। গান শোনবার আগ্রহে প্রকাশ বৈকালে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছে, রাত্রে বই পড়া কমিয়ে দিয়েছে, ছুটির দিনে একমাত্র গান শোনা ছাড়া আর সব-কিছুকেই ছুটি দিতে পারলে ভালো হয় এমনই মতলব। সন্ধ্যা যখন গান গায় তখন প্রকাশ এমন বিভোর হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, দাম্পত্য জীবনের আদিতম যুগেও কোনও আবেগ-মদির মুহূর্তে সে এমনি ক'রে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না। সন্ধ্যার গানের প্রতি প্রকাশের এই অনির্ণেয় আসক্তির মধ্যে সবিতা বিপদের রক্তপতাকা দেখতে পেলে। এ বিষয়ে অগ্নি ও ঘৃতের প্রাচীন উপদেশ মনে পড়ল। মনে মনে স্থির করলে এ বিপদ থেকে অচিরে উদ্ধার পেতেই হবে; সহজে যদি হয় তো ভালোই, নচেৎ যেন তেন প্রকারেণ।

সন্ধ্যা তার মাসতুত বোন সত্য, কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে সবিতা এতই শক্ত যে, সন্ধ্যা সহোদরা বোন হ'লেও সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করত না। যে মহলে প্রজাবিলি চলে না সেখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ মানেই বেদখল হওয়া, এবং বেদখল হওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক দৃষ্টিকে নিন্দুক ব্যক্তিরা যদি ঈর্ষা অভিহিত করে তো করুক,—তা'তে সবিতার চক্ষুলজ্জা নেই।

প্রকাশ তখন অফিসে। সন্ধ্যা নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন ক'রে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সবিতা এসে প্রবেশ করলে।

সবিতাকে দেখে সন্ধ্যা শয্যার উপর উঠে বসল। সন্ধ্যার পালঙ্কের নিকটে

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে সবিতা বললে, "কী বই পড়ছিলি রে সন্ধ্যা? উপন্যাস না কি?" তারপর বইখানা টেনে নিয়ে খুলে দেখে বললে, "কবিতার বই। ভালো?"

"মন্দ না।"

"কোথায় পেলি?"

সন্ধ্যা বললে,-"মুখুয্যে মশায়ের টেবিলে ছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।"

ছুই একটা অবান্তর কথার পর সবিতা আসল কথা উত্থাপিত করলে; বললে, "তোর বিষয়ে একটা ভালো রকম পরামর্শের দরকার হয়েছে সন্ধ্যা।"

সবিতার প্রতি উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কী পরামর্শ, সবিদিদি?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে সবিতা বললে, "তোর শ্বশুরকে আর মেসোমশাইকে উনি কত ভালো ক'রে বড় বড় চিঠি লিখলেন, তার উত্তর যা এল তাতো জানিস। তুই এখানে আমাদের কাছে আছিস সেই জন্যে উভয় পক্ষই একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভেবে-চিন্তে কাজ করবার সুবিধে পেয়েছেন। হঠাৎ ওঁদের মধ্যে কেউ এসে তোকে নিয়ে যাবেন, তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, তুই যদি একেবারে হুড়মুড় ক'রে সেখানে গিয়ে পড়িস তা হ'লে তোকে কখনই ফেরাতে পারবেন না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততঃ সহকারে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু ও-রকম চিঠি পাওয়ার পর আর কি তাঁদের দোরে গিয়ে দাঁড়ানো চলে সবিদিদি?"

একটু কঠিন স্বরে সবিতা বললে, "চলে। ও তোদের আজকালকার মেয়েদের বাজে সেন্টিমেণ্ট শিকেয় তুলে রাখ সন্ধ্যা। অভিমান যদি করতে হয় তো নিজের জায়গায় কায়েম হ'য়ে ব'সে তার পর করিস, এখন যেমন ক'রে পারিস দিন কিনে নে। পরের উপর রাগ ক'রে নিজের চিরদিনকার আশ্রয়ের স্থল চিরদিনের মতো বন্ধ করিসনে।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তাঁরা যদি আমাকে স্থান না দেন? আশ্রয় যদি না পাই?"

সবিতা ব্যস্ত হ'য়ে মাথা নেড়ে বললে, "তাঁরা তো স্থান দিচ্ছেনই না। আশ্রয় তোকে যে-রকম ক'রে হোক ক'রে নিতে হবে। সাধ্য-সাধনা ক'রে, মাথামুড় খুঁড়ে, তাঁদের পা জড়িয়ে ধ'রে সেখানকার মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাকবি। এতে যদি আত্মসম্মানের হানি হয় তো এ ছাড়া যা করবি তা'তে এর শত গুণ হানি, তা জেনে রাখিস। একথা কখনও ভুলিসনে সন্ধ্যা,—স্বামীর আশ্রয় ছাড়া সধবা মেয়েমানুষের আর দ্বিতীয় আশ্রয় নেই।"

অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর আশ্রয়ের প্রতি সন্ধ্যার শ্রদ্ধার এবং লোভের অন্ত ছিল না। এখনো যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু ঘটনার জটিলতায় অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে আজকাল

উদয় হয়, প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ অট্টালিকা যেন সময়ে সময়ে ন'ড়ে ওঠে। তবুও সে-সব নিয়ে এখন আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না, জিজ্ঞাসা করলে, "মুখুয্যে মশাইয়েরও কি এই মত ?"

সবিতা বললে, "হাজার হোক তিনি পুরুষমানুষ, তাঁদের মতের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মত সব সময়েই যে এক হ'তে হবে এর কোনো মানে নেই সন্ধ্যা। আমাদের শুভাশুভ আমরা যতটা বুঝব তাঁরা ততটা কখনই বুঝবেন না—হয়তো একটা সাধারণ উদার নীতির দোহাই দিয়ে সমস্ত জিনিসটার ভুল বিচার ক'রে বসবেন। হয় তো বলবেন, 'কেন ? কী এমন তাড়া পড়েছে যে আশ্রয় ভিক্ষের জন্যে ছুটতেই হবে এখন কলকাতায় ? থাকনা ও আমাদের কাছে, যতদিন না ওরা নিজে এসে ওকে নিয়ে যায়।' এমন কথা তো আমিও প্রথম দিন আকস্মিক দুঃখের মুখে বলেছিলাম, কিন্তু মনে মনে তখন একথাও জানতাম যে, আদতে ওটা প্রবোধ বাক্য, ওতে তোর প্রকৃত মঙ্গল নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "আজকালের মধ্যে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে মুখুয্যে মশাইয়ের কোনো কথা হয়েচে কি সবিদিদি ?"

সবিতা বললে, "না, তা হয়নি। আমি প্রথমে তোর সঙ্গেই পরামর্শটা ক'রে নিতে চাইছিলাম। তবে আমার মনে হয়, কথা উঠলে তিনি আমার মতেই মত দেবেন, কারণ এ কথা নিশ্চয় যে, বেশিদিন এ রকম ছাড়াছাড়ি থাকার ফলে চক্ষু-লজ্জাটা ক্রমশঃ কেটে গেলে তখন হয়তো তাঁরা আর সহজে তোকে ফিরে নিতে চাইবেন না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আমি তোর মঙ্গলের জন্যে খুব স্পষ্ট ক'রেই বলছি, তুই অন্য কোনো রকমই কিছু মনে করিসনে ভাই। আমার এ বাড়িও তোর পক্ষে পুরোপুরি পাকা আশ্রয় নয়। এ সংসারে একমাত্র স্ত্রীলোক আমি ; আমার সঙ্গে একত্রে তুই যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু জীবনের কথা তো কিছু বলা যায় না ভাই, ধর, হঠাৎ যদি ম'রেই গেলাম,—সে কথা ছেড়ে দিলেও, বাপের বাড়িও তো দু-চার মাসের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে পারি,—তখন তোর একা এ বাড়িতে ওঁর সঙ্গে থাকা চলবে কি ? আমি তোর বোন, কিন্তু উনি তো সত্যিই তোর ভাই নন।"

বিচার-বিবেচনার দিক থেকে দেখলে সবিতার কথার মধ্যে হয় তো রূঢ় কিছুই ছিল না, কিন্তু তবু একটা কোন্ অনির্ণেয় কারণে আঘাত পেয়ে সন্ধ্যার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে ফেলে বললে, "আমার নিজের মত যাই হোক না কেন সবিদিদি, তোমার উপদেশেই আমি চলব। তুমি আমার আপনার জন, বয়সে বড়, তুমি যা আদেশ করবে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই তা শুভ হবে,—কলকাতায় আমি যাব। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ,—তোমার স্নেহের কথা, মুখুয্যে মশাইয়ের দয়ার কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার অন্ধকার মনের একটা দিক আলো ক'রে থাকবে। কিন্তু আমার অন্তরের একটা অকপট কথা শোনার পরও যদি আমাকে ক্ষমা করো তা হলে

আমি বলি যে, তোমাদের এ আশ্রয়ও আমি ঠিক সহ্য করতে পারছিনে, এর মধ্যে আমি কিছুতেই সহজ হ'তে পারছিনে, এ-কে ছেড়ে যাবার জন্যে মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠেছি। এ যে কেন, তা হয়তো আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু একে অকৃতজ্ঞতা ব'লে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুল কোরো না সবিদিদি, এ অপরিসীম কৃতজ্ঞতারই একটা রূপ। অযাচিত দানের ঋণ বাড়িয়ে চলবার ক্ষমতা হয়তো আমার নেই, এ হয়তো তাই; সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল, দুই চক্ষু হ'তে ঝর ঝর ক'রে এক রাশ অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

চেয়ার থেকে উঠে এসে সন্ধ্যার পাশে ব'সে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সবিতা দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বললে "আমি তোকে কষ্ট দিয়েছি সন্ধ্যা, আমাকে তুই ক্ষমা কর।"

অঞ্চলে চক্ষু মার্জিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না সবিদিদি, তুমি সহানুভূতি দিয়ে আমার মনকে আলগা ক'রে দিয়েছ, তাই কাঁদছি। তুমি আমাকে কষ্ট দাও নি।"

"তা হ'লে তোর কলকাতা যাওয়ার কথা তাঁকে বলব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবে। আজই বোলো,—আর, যত শীঘ্র যাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তা কোরো। তোমার সুপরামর্শে আবার আমার মনকে জাগিয়ে দিয়েছ, সবিদিদি!"

প্রসন্ন কণ্ঠে সবিতা বললে, "সেখানে গিয়ে তোর নিজের অধিকারের জায়গা জোর ক'রে দখল করবি; কিছুতে ছাড়বিনে। নিজে শক্ত না হ'লে কেউ সহজ হবে না। জীবনের এত বড় গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভালোমানুষি ক'রে কোনো লাভ নেই সন্ধ্যা,—চিরজীবন তার ফলে দুঃখের বোঝা বইতে হবে।"

"কবে তা হ'লে আমার কলকাতা যাওয়া হবে সবিদিদি?"

"দিন দুই পরে অফিসের কাজে ওঁর তিন চার দিনের জন্যে কলকাতায় যাবার দরকার আছে, সেই সঙ্গে তুই যেতে পারবি।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

সেই দিন রাত্রেই আহারের পর শয়ন কক্ষে প্রবেশ ক'রে সবিতা কথাটা প্রকাশের কাছে উত্থাপন করলে। সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনে প্রকাশ বললে, "এ পরামর্শ যে ভালো নয় তা বলছিনে, কিন্তু এতে সন্ধ্যা সত্যিসত্যিই রাজি হয়েছে তো?"

"তার মানে?"

"তার মানে, চক্ষু লজ্জায় প'ড়ে শুধু মুখের কথায় রাজি হয়েছে কি-না তাই জানতে চাইছি। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কথা আছে সবু। তোমার বাড়িতে যদি কোনো লোক কতকটা আশ্রিতরূপে বাস করে, যার মনে আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব নেই, তার কাছে তুমি যদি এমন কোনো প্রস্তাব কর যেটা পালন করলে তোমার বাড়ি ত্যাগ ক'রে তাকে যেতেই হয়, তা হ'লে সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়া তার পক্ষে একটু কঠিন।"

প্রকাশের কথা শুনে সবিতা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল; একটু তীব্রকণ্ঠে বললে,

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমার একেবারে পর নয়, সে আমার বোন; তার মঙ্গলের জন্যে তাকে যেমন আমি বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারি, তেমনিই বাড়ি ছাড়া করতেও পারি।"

প্রকাশ বললে, "তুমিও ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমারও একেবারে পর নয়, সে আমার শালী, সুতরাং তার নিজের আন্তরিক ইচ্ছার অভাবে তাকে বাড়ি ছাড়া করতে আমার মনের মধ্যে আপত্তি হ'তে পারে ?"

সবিতা একেবারে উষ্ণ হ'য়ে উঠল। বললে, "তবে কি তুমি বলতে চাও যে, চিরকালই সে তোমার ভাত কাপড়ে মানুষ হ'য়ে তোমাকে গান শুনিয়ে এখানে প'ড়ে থাকবে ?—আর তা হ'লেই তার জীবন সার্থক হবে।"

প্রকাশ বললে, "না, তা আমি বলতে চাইনে। কিন্তু এ কথাও বলতে চাইনে যে, কলকাতায় তাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি অপমানিত করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেই তার জীবন সার্থক হবে।

সবিতা সজোরে গর্জন ক'রে উঠল, "ফিরিয়ে তুমি তাকে আনবে না!"

বিস্মিত নেত্রে ক্ষণকাল সবিতার দিকে চেয়ে থেকে প্রকাশ বললে, "কিন্তু ওর বাপ-শ্বশুরের মধ্যে কেউ যদি ওকে না নেয় তো কোথায় ওকে রেখে আসব ?"

"যেখানে হয় সেখানে। কোথাও না হয়, পথে। ওর বাপ-শ্বশুরেরা যদি ওর ভার না নেয় তো তোমারই বা কি এমন মাথাব্যথা পড়েছে শুনি ?"

"কিন্তু, আমি যদি ঠিক ওর বাপ-শ্বশুরের শ্রেণীর লোক না হই সবিতা ?

"না, না, তুমি নিজেকে অত অসাধারণ ব'লে মনে কোরো না! তোমারও সমাজ আছে, সংসার আছে,—শুধু তাদেরই নেই!"

আলোচনাটা কলহে রূপান্তরিত হ'য়ে আসছে দেখে প্রকাশ বললে, "রাত অনেক হয়েছে, এখন এস শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে উঠে যখন দেখা যাবে যে, বিশ্রাম ক'রে দু'জনেরই বুদ্ধি পরিষ্কার হয়েচে, তখন আবার পরামর্শটা ভালো ক'রে চালানো যাবে। তখন মীমাংসা হ'তেও বিলম্ব হবে না।"

সকালে উঠে সত্যই দেখা গেল, গতরাত্রের কলহটা দাম্পত্য কলহের পরিণতিই লাভ করেছে। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের অভিমত দ্রুতগতিতে নিকটবর্তী হ'য়ে আসতে লাগল এবং অচিরকালের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল যে, সন্ধ্যার কলকাতা যাওয়াই সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

তিন দিন পরে রাত্রি এগারটার সময়ে প্রকাশ ও সন্ধ্যা নাগপুর প্যাসেঞ্জারের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা অধিকার ক'রে বসল। সে কামরায় অন্য কোনো আরোহী ছিল না।

গাড়ি ছাড়লে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যা, কাল সকালে তো রীতিমত যুদ্ধং দেহির মতো একটা ব্যাপার আছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, বিশ্রাম নিয়ে কালকের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে।"

উত্তরে সন্ধ্যা কিছু বললে না, শুধু একটু হাসলে। মন তার তখন সেই

অবস্থায় যেখানে ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ উৎসাহ-আলস্তের সব অনুভূতি আসন্ন অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। বাহিরের গাঢ়নিবদ্ধ তমিস্রের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সে শুয়ে পড়ল।

প্রত্যুষে যখন ঘুম ভাঙল তখন গাড়ি কোলাঘাট ষ্টেশন ছাড়িয়ে রূপনারায়ণের পুলের উপর দিয়ে গভীর শব্দ করতে করতে চলেছে।

প্রকাশ বললে, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বললে, "একরকম হয়েছিল।"

"প্রথমে কোথায় যাবে ? শ্বশুর বাড়িতে, না বাপের বাড়িতে ?"

"আপনি কোথায় বলেন ?"

"আমি বলি, প্রথমে মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়াই ভালো।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তবে তাই।"

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে প্রকাশ যখন সন্ধ্যাকে নিয়ে তার পিত্রালয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল তখন বেলা সাড়ে সাতটা।

ষোল

শেষরাত্রি থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, কিছুক্ষণ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিন মাসের প্রথম, সুতরাং আসল বর্ষাকাল অনেকদিন হ'ল শেষ হ'য়ে গিয়েছে,—এ অসময়ের বাদল, আশ্বিন কার্তিক মাসে দু'চার দিনের জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই এক-আধবার দেখা দিয়ে থাকে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে প্রকাশ বললে, "এস সন্ধ্যা, নেমে এস।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "প্রথমে একবার খবর দিলে ভালো হয় না ?"

মাথা নেড়ে প্রকাশ বললে, "আরে না, না,—এ তোমার নিজের বাড়ি,—এখানে আবার খবর দেবে কিসের জন্যে। এস, নেমে এস।"

প্রকাশের কথায় আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সন্ধ্যা ট্যাক্সি হ'তে অবতরণ করল। গৃহদ্বারে একটি দশ, বারো বৎসরের বালক দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সন্ধ্যাকে একবার ভালো ক'রে দেখেই "ওমা, মেজদিদি, এসেছে।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যার জননী সুবর্ণলতা নীচের তলায় নিকটেই গৃহকর্মে রত ছিলেন, পুত্র পরেশের কথা শুনে যুগপৎ আনন্দে এবং উদ্বেগে চকিত হ'য়ে উঠলেন। "কই সে, কই ?" ব'লে ফিরে তাকাতেই প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন হ'ল না,—দেখলেন পর্দা সরিয়ে সন্ধ্যা প্রবেশ করছে, মুখ আরক্ত দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। সুবর্ণলতার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়া মাত্র কিন্তু নিমেষের মধ্যে মুখের সমস্ত রক্তিমা অন্তর্হিত হ'য়ে মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলে, চক্ষুর দৃষ্টি স্তিমিত হ'য়ে এলো, একবার

অস্ফুট স্বরে 'মাগো' ব'লে সন্ধ্যা পাশের বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল।

ক্ষিপ্র বেগে সন্ধ্যার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার পাশে ব'সে প'ড়ে সুবর্ণলতা ব্যাকুলভাবে দুই হস্তে সন্ধ্যার তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহ কোলের উপর তুলে নিলেন। তারপর উপর দিকে তাকিয়ে কন্যা সাধনার উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "সাধন, শিগ্‌গির একবার নীচে নেমে আয়।"

মাতার আহ্বান কানে যেতেই সাধনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে এল। সুবর্ণলতা তখন সন্ধ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে নিঃশব্দে রোদন করছিলেন; বললেন, "শিগ্‌গির একটু জল আর একখানা হাত-পাখা নিয়ে আয়।"

কিন্তু ততক্ষণ সন্ধ্যা তার অসংবৃত অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছিল; বললে, "দরকার নেই মা, আমি উঠছি। তারপরে সহসা দুই বাহু দিয়ে সুবর্ণলতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগল। চাপা কান্নার উগ্র তাড়নায় তার সমস্ত দেহ আলোড়িত হ'য়ে উঠল।

দুষ্পরাজেয় অভিমানের দ্বারা মনকে কঠিন ক'রে সন্ধ্যা জামসেদপুর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত সমস্ত পথটা প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিল। মনে মনে এই সঙ্কল্প সে বার বার স্পষ্ট ক'রে নির্ণীত ক'রে নিয়েছিল যে, যে-প্রতিশ্রুতি সে সবিতার কাছে জামসেদপুরে দিয়ে এসেছে সংযত মনের সমস্ত শক্তির সাহায্যে তা পালন করবে; কিন্তু তাই ব'লে নিজের মধ্যে নিজে কখনই ভেঙে পড়বে না, সকল সময়ে সর্বাবস্থায় চিত্তকে সে নিজের বশীভূত রাখবে। কিন্তু পিতৃগৃহে পদার্পণ করবামাত্র এক নিমেষে কী রকম ক'রে সমস্তই ওলট-পালট হ'য়ে গেল! যে অভিমানকে শিখিয়ে পড়িয়ে প্রহরীরূপে সে আত্মরক্ষার্থে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল মাতৃমূর্তির যাদুর সম্মুখে সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে যে, জননীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে গভীর অভিমানের স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কী ক'রে মা, তোমরা এমন ক'রে আমাকে ভুলে ছিলে? কী ক'রে এতদিন আমাকে জামসেদপুরে ফেলে রেখেছিলে?"

অভাগিনী কন্যার এই সকরুণ অনুযোগে সুবর্ণলতার অন্তর বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। গভীর আবেগের সহিত প্রবলতর বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "ওরে সন্ধ্যা, এ কথা তুই আমাকে—তোর নির্বোধ মাকে জিজ্ঞেস করিসনে। ইচ্ছে হয় তোর বাপকে জিজ্ঞেস করিস, তিনি জ্ঞানী মানুষ, অনেক বুদ্ধি বিবেচনা আছে, তিনি হয়তো তোকে এ কথার উত্তর দিতে পারবেন।"

জননীর এই বাক্যের মধ্যে বেদনার যে মর্মন্তুদ পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল সে কথা সন্ধ্যার কাছে ধরা পড়ল কি-না বলা কঠিন। মনে মনে একটু কী চিন্তা ক'রে সে বললে, "মা, বাবা কোথায়? বাবা কি বাড়ি নেই?"

সুবর্ণ বললেন, "তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। আজ তিন দিন শয্যাগত। বসতেও পারেন না। কাঁধের কাছে একটা বড় ফোড়া অস্ত্র হয়েচে।"

পিতার অসুখের কথা শুনে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'ল ; বললে, "এত অসুখ ? চল মা, বাবাকে দেখি গে।" ব'লে উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে ভেবে বললে, "মা, আমাকে দেখে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন না তো ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে সুবর্ণলতার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠল ; দুঃখার্ত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রে সন্ধ্যা, আমরা কি তোর পর হ'য়ে গেছি ব'লে মনে করিস্ ?"

সন্ধ্যার দুই চক্ষু আবার সজল হ'য়ে এল ; বললে, "আমার মনের মধ্যে কত দুঃখ কত ভয় তা তো তোমরা জানো না মা। তা যদি জানতে তা হ'লে আমার কথা শুনে তুমি কখনই রাগ করতে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে সুবর্ণলতা বললেন, "তোর ওপর রাগ কেন করব, সন্ধ্যা ? রাগ করি আমার অদৃষ্টের ওপর, আর পোড়া সমাজের ওপর।"

চলতে চলতে সাধনা এবং পরেশের সঙ্গে এক আধটা কথা কইতে কইতে দ্বিতলে এসে সন্ধ্যা তার পিতা বেণীমাধবের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে। সন্ধ্যার আগমন সংবাদ বেণীমাধব পরেশের মুখে পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। সন্ধ্যাকে দেখে তিনি শয্যার উপর উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

"তুমি উঠো না, বাবা, শুয়ে থাকো।" ব'লে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে বেণীমাধবের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হ'ল, তারপর সহসা হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে মুখখানা বেণীমাধবের পায়ের উপর গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বেণীমাধব ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন ; দুই বাহু প্রসারিত ক'রে অধীর কণ্ঠে বললেন, "সন্ধ্যা, আয় মা, আয় মা, আমার কাছে আয়। শান্ত হ, কাঁদিস নে।" তারপর অর্দ্ধোত্থিত হ'য়ে কোনরূপে সন্ধ্যার বাম বাহু ধারণ ক'রে তাকে নিকটে টেনে নিলেন। মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে সহসা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

চোখে চোখে জল, মুখে মুখে বাষ্পাবরুদ্ধ অসম্বদ্ধ দু-চারটে বাক্য। এমনি ভাবে পাঁচ সাত মিনিটে অশ্রু বর্ষণের পালা শেষ হ'ল। তখন হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা যা পূর্বেই মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ গুরুতর অবস্থার আকস্মিকত্বে প্রথমটা প্রায়ই ভুল হ'য়ে যায়। মনে পড়ল বেণীমাধবেরই ; ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "তুমি কার সঙ্গে এলে, সন্ধ্যা ? প্রকাশেরই সঙ্গে বোধ হয় ?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, মুখুয্যে মশায়ই আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

সুবর্ণলতা অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন, "ওমা। ওঁর কথা আমরা একেবারে ভুলে আছি। কাউকে দেখতে না পেয়ে চ'লে গেলেন না তো ?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বলল, "না, তা যাবেন না। বোধ হয় জিনিষপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতেই ব'সে আছেন।" মনে মনে একথা সে ভালো ক'রেই জানে যে, অভাগিনী সন্ধ্যার গতি কী হ'ল তা সঠিক না জেনে চ'লে যাবার পাত্র প্রকাশ নয়।

সাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বেণীমাধব বললেন, "সাধন, তুমি গিয়ে প্রকাশকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

সাধনার সঙ্গে প্রকাশ যখন কক্ষে প্রবেশ করল তখন সকলের চোখে চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্বে সে বিষয়ে যে একটা অভিনয় হ'য়ে গিয়েছে তার পরিচয় চক্ষুপল্লবাদি থেকে তখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। বেণীমাধব এবং স্বর্ণলতাকে প্রণাম ক'রে প্রকাশ একটা চেয়ারে উপবেশন করল। প্রথমে বেণীমাধবের অসুস্থতা এবং অপরাপর বিষয়ে দু'-চারটা মামুলি কথা হবার পর আসল কথা উঠল।

বেণীমাধব বললেন, "সন্ধ্যার আমরা বাপ-মা, কিন্তু তুমি যে আমাদের চেয়েও তার আত্মীয়, তুমি তার প্রমাণ দিয়েছ প্রকাশ।"

শুনে প্রকাশ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ; বললে, "প্রমাণটা কিন্তু খুব পাকা নয়, মেসোমশাই। সের দুই তিন চাল, সের খানেক ডাল, আর কিছু মাছ তরকারী। এর বেশি এমন কিছু নয়,—তুমি কী বল, সন্ধ্যা ?" ব'লে প্রকাশ সকৌতুকে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

উত্তরে সন্ধ্যা শুধু একটু হাসলে,—কিছু বললে না।

বেণীমাধব বললেন, "কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাও, বাবাজি। তুমি যে তাকে কয়েকদিন আহার দিয়েছ সে কথা আমি মোটেই বলতে চাচ্ছিনে। অমন বিপদের দিনে তুমি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি সেই কথাই বলছি।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু আশ্রয় না দিয়েই বা কী করি বলুন ? বলা নেই কওয়া নেই রাত দুটোর সময়ে এসে দোর ঠেলাঠেলি ক'রে ঘুম ভাঙালে। সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। সেও একটি কথা কইবার অবসর দিলে না, সন্ধ্যাকে দিয়ে আমাদের সনাক্ত করিয়ে নিয়ে অমনি মুহূর্তের মধ্যে মোটর ক'রে ছুটে পালাল। এখন সে রকম অবস্থায় বাড়ির বার ক'রে গেট বন্ধ না ক'রে দিয়ে বেশি কিছু বাহাদুরী করেছি কি ? তা যদি করতাম তাহ'লে তো আমাকে পাষণ্ড বলতে পারতেন।"

বেণীমাধব বললেন, "কিন্তু তাহলে তো আমাকে তুমি পাষণ্ড বলতে পার প্রকাশ। আমি তো তাকে জামসেদপুর থেকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিইনি।"

প্রকাশ বললে, "ও কথা কেন বলছেন, মেসোমশায় ?—আপনার আশ্রয় না দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার ;—তার যুক্তি আছে, সদুদ্দেশ্য আছে। গুণ্ডার ছুরি আর ডাক্তারের ছুরি দুই-ই এক বস্তু, দুই-ই মানুষের দেহে রক্তপাত করে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। গুণ্ডার ছুরি মানুষের জীবন নেবার চেষ্টা করে, আর ডাক্তারের ছুরি মানুষের জীবন দেবার চেষ্টা করে।"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে বেণীমাধব বললেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমার এ বাড়িতে একটি লোক আছেন যিনি আমার ছুরিকে গুণ্ডার ছুরি ব'লেই মনে করেন। তাঁর ধারণা বাপ-শ্রেণীর জীবেরা প্রধানতঃ পাষণ্ড প্রকৃতির, সঙ্গে সঙ্গে মা-শ্রেণীর জীবেরা যদি না থাকতেন তাহলে ছেলে-মেয়েদের জীবনধারণ সঙ্কটাপন্ন হ'ত।"

বেণীমাধবের কথা শুনে প্রকাশ স্মিতমুখে বললে, "এ কথার মধ্যে সত্যি মিথ্যে দুই-ই আছে, মেসোমশায়। আসলে এ হ'ল স্নেহ আর বিবেকের চিরকেলে ঝগড়া। আমার মনে হয় ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য এ দুয়েরই প্রয়োজন আছে। এই দুটি বিভিন্নমুখী শক্তির টানে তাদের জীবন একটি শুভ মধ্য-পথ অবলম্বন ক'রে চলে। মায়ের স্নেহের নদীকে সামলাবার জন্যে বাপের বিবেচনার বাঁধের দরকার আছে বইকি।"

প্রকাশের কথায় বেণীমাধবের মুখে হাসি দেখা দিল; বললেন, "তাহলে বাপ-শ্রেণীর জীবেরা সত্যিসত্যিই পাষণ্ড নয়!"

এ কথার উত্তর দিলেন সুবর্ণলতা; বললেন, "কে তোমাকে কবে পাষণ্ড বলেছে যে, তুমি ও-কথা বলছ। আমি কোনোদিন বলেছি কি?"

বেণীমাধব স্বীকার করলেন যে, উক্ত বাক্য-বিশেষটি সত্য-সত্যই কোনোদিন তাঁর প্রতি প্রয়োগ করা হয়নি, কিন্তু একথাও বললেন যে, সন্ধ্যা সম্পর্কে তাঁর আচরণাদির বিষয়ে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েচে যাতে উক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করলে এমন কিছু অপপ্রয়োগ হ'ত না। কিন্তু তা'তে কিছু যায় আসে না, কারণ সন্ধ্যার প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোন কার্য করার ফলে পাষণ্ড আখ্যাটি যদি সত্যসত্যই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়তো কোন দুঃখ নেই, কারণ তাঁর যশ-অপযশের কথা মুখ্য বস্তু নয়, মুখ্য বস্তু সন্ধ্যার হিতাহিতের কথা। এবং একমাত্র সেই মুখ্য বস্তুরই প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে অবিলম্বে যে কার্য করবার আভাস দিলেন তা'তে শুধু সুবর্ণলতাই নয়, প্রকাশ পর্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন।

বিবর্ণমুখে সুবর্ণলতা বললেন, "তুমি এখনি সন্ধ্যাকে বিদেয় করতে চাও না কি?"

"বিদেয় করতে চাই বললে ভুল বলা হবে, রাখতে চাইনে।"

"তার মানে?

বেণীমাধব একটা তাকিয়ার সাহায্যে অতি কষ্টে কোনো-রকমে উঠে ব'সে বললেন, "তার মানে তুমি অনেকবারই আমার কাছে শুনেছ, কিন্তু সন্ধ্যা আর প্রকাশের সামনে আর একবার ভালো ক'রে শুনলে মন্দ হয় না।" সাধনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাধনা, তুমি আর পরেশ এখন এখান থেকে একটু যাও।" তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বললেন, "সন্ধ্যা, তুমি মা আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনো, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখুয্যে মশায়ের ডাক্তারের ছুরির চমৎকার উপমাটি মনে রেখো, সুবিধে হবে।" তারপর প্রকাশকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তোমার কাছে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ার পর এই সতের-আঠার দিনের মধ্যে অন্ততঃ বার দশেক আমি জহরলালের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কিছুতে তাকে রাজি করাতে পারিনি। ভারি চাপা লোক, কোনো কথাই স্পষ্ট ক'রে খুলে বলে না। মুখে প্রতি-বারই একটি বাঁধা গৎ—'আপনি নিয়ে এসে কিছুদিন রাখুন—আমি একটু ভেবে দেখি।' আমি কিন্তু হলফ ক'রে তোমাকে বলতে পারি প্রকাশ, যেদিন জহরলাল

শুনবে আমি সন্ধ্যাকে নিয়ে এসেছি সেইদিনই তার সব ভাবনার শেষ হবে,—আর কোনোদিনই আমার সঙ্গে সে দেখা পর্যন্ত করবে না। এখন এ রকম অবস্থায় তুমি আমাকে কী করতে বল ?—সন্ধ্যাকে এ বাড়িতে রেখে তোমার মাসিমাকে খুসি করতে বল ?—না, সন্ধ্যাকে তোমার সঙ্গে জহরলালের বাড়িতে এখনি পাঠিয়ে তার একটা গতি করতে বল ? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান,—তুমি যা পরামর্শ দেবে তাই আমি করব,—এখন পরামর্শ দাও,—বল, কী করা উচিত।"

গভীর ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে প্রকাশ বললে, "মাসিমা, আপনি কী বলেন ? আপনার কী মত ?"

ব্যথিত কণ্ঠে সুবর্ণলতা বললেন, "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না বাবা, আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি, থাকবার মধ্যে আছে একটা পোড়া অবুঝ মন, যা নিয়ে জ্ব'লে পুড়ে মরছি। তোমরা যা ভালো বোঝ তাই কর।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ বললে, "তোমার কিছু বলবার আছে, সন্ধ্যা ?"

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা জানালে বলবার তার কিছুই নেই।

প্রকাশ বললে, "তাহলে সন্ধ্যাকে জহরমামার বাড়িই নিয়ে যাই।"

তাকিয়াতে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উঠে বেণীমাধব বললেন, "এখনি। জহরলাল তোমার তো আত্মীয়—যেরকম ক'রে পার, মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়ো প্রকাশ,—তোমার পুণ্য হবে। এখানে এসেছিলে সে কথা যেন জানতে না পারে, যদি জিজ্ঞাসা করে অসময়ে কেন, ব'লো ট্রেণ লেট্ ছিল।"

হাতঘড়িতে সময় দেখে প্রকাশ বললে, "আর আধ ঘণ্টাটাক পরে গেলে অসময় হবে না, মেসোমশায়। ও লাইনের গাড়ির সময় মামার খুব জানা আছে, মনে করবেন বম্বে মেলে আমরা এলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করব না, তা সত্ত্বেও যদি ওঁরা সন্ধ্যাকে রাখতে রাজি না হন তাহ'লে আপনাদের কাছেই তাকে রেখে যাব তো ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বেণীমাধব বললেন, "আমার যে কত বিপদ তা আর কী বলব, বাবা। সন্ধ্যার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার একটি ভালো পাত্র পাওয়া গেছে—ছেলেটি ইম্পীরিয়াল সারভিসে চাকরি করছে—বাপের এক পয়সার কামড় নেই। আমার মতো দরিদ্র লোকে এ সুযোগ ছাড়ে কী ক'রে, বল ? তাই মনে করছি অগ্রাণ মাসে দায় থেকে উদ্ধার হ'য়ে যাই। ততদিন সন্ধ্যা যদি তোমার কাছে থাকে তাহ'লে বড় ভালো হয়। তারপর সাধনার বিয়ে হ'য়ে গেলে আমি আর কাউকে গ্রাহ্য করি নে। খুকির বিয়ে ? সে ভাবনা আমার নেই —ততদিনে আমি ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাব।"

কঠোর নেত্রে প্রকাশ ক্ষণকাল বেণীমাধবের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "দরকার হ'লে সন্ধ্যা চিরদিনই আমার কাছে থাকবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, —কিন্তু এ বিষয়ে পাত্রপক্ষ কী কোনো রকম সর্ত করেছে ?"

"একরকম করেছে বই-কি ?"

"আর, সেই সর্তে আপনাকে রাজি হ'তে হয়েছে ?"

প্রকাশের কথার ভঙ্গি দেখে বেণীমাধবের মুখ শুকিয়ে উঠল ; বললেন, "রাজি না হ'য়ে কী করি বল ? সমাজের যে কী জুলুম তাতো তোমরা ঠিক জানো না, বাবা" এই ব'লে তিনি হিন্দু-সমাজের একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্যত হ'লেন।

প্রকাশ সহসা আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ-সব আলোচনা এখন থাক, মেসোমশায়—এ ভারি Painful ! আমি রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সির চেষ্টা দেখি—সে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছি।" ব'লে প্রস্থান করলে।

"ওমা, একটু চা-জলখাবার না খেয়ে কেমন ক'রে যাবে !" ব'লে স্বর্ণলতা ব্যস্ত হ'য়ে প্রকাশের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা মেঝে থেকে বেণীমাধবের পদপ্রান্তে উঠে বসল। পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোমার এত অসুখ বাবা, ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছ তো ?"

বেণীমাধব বললেন, "সে ভয় নেই মা, এখনো অনেক দুঃখ ভোগ করবার বাকি আছে। ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করালেও কোনো ক্ষতি হবে না।" তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সন্ধ্যা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, মা !"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "তুমিও মাকে ভুল বুঝো না, বাবা। মা সবই বোঝেন, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ তো ?"

সন্ধ্যার মনটাও মেয়েমানুষেরই মন, এ কথা বেণীমাধবের মনে পড়ল কি-না, তা তাঁর আকৃতি থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

ট্যাক্সি এনে জিনিস উঠিয়ে প্রকাশ ভিতরে এসে বললে, "আর দেরি ক'রে কাজ নেই, সন্ধ্যাকে ডেকে দিন, মাসিমা।"

স্বর্ণলতা বললেন, "মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে নাও প্রকাশ।"

প্রকাশ সজোরে মাথা নেড়ে বললে, "ওরে বাসরে ! আমার এখন অনেক হাঙ্গামা বাকি। আমি তো এখনি হোটেলে গিয়ে উঠব,—আপনি বরং সন্ধ্যাকে কিছু খাইয়ে দিন।"

সন্ধ্যা কিন্তু কিছুতেই রাজি হ'ল না ; বললে, "এবার যেদিন আসব সেদিন তুমি নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিয়ো, মা। আজ কিন্তু একটু জল পর্যন্ত আমার গলা দিয়ে তলাবে না।"

মলিনমুখে স্বর্ণলতা বললেন, "তুই আমাদের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছিস সন্ধ্যা !"

সন্ধ্যার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে ; বললে, "তোমাদের ওপর বলছ কেন, মা ? আমারও তো একটা অদৃষ্ট আছে—তার ওপর তো রাগ করতে পারি।" ব'লে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে প্রকাশের পাশে বসল।

জহরলালের বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত পথে একটা কথাও হোল না—উভয়েরই মনের অবস্থা চিন্তায় স্তব্ধ হ'য়ে ছিল। গৃহদ্বারে ট্যাক্সি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে গৃহরক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু ঘরমে হ্যায় ?"

"বড়া মহারাজ তো কোই দশ মিনিট নিকল গয়ে।"

"কব আবেঙ্গে মালুম হ্যায় ?"

"দশ বজে।"

"মাই লোক ভিতর হ্যায় ?"

"হ্যাঁয় হজুর।"

মুখ ফিরিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ চিন্তিত হ'য়ে উঠল। তার মুখ জবাফুলের মতো আরক্ত, দৃষ্টি অর্থহীন কঠোর,—যেন সাধারণ চৈতন্যের সীমা হঠাৎ অতিক্রম করেছে। ভয়ে ভয়ে প্রকাশ বললে, "তা হ'লে কী করা যায়, সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বললে, "কী আর করা যাবে ? আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু দশটা পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা তো চলবে না,—কাউলি সাহেবের সঙ্গে বেলা ১১টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট!"

"আপনি পরে বেলা দুটো তিনটের সময়ে আসবেন।"

"মাসিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব ?"

"তাড়াতাড়ি দরকার নেই, পরে দেখা করবেন।"

"তোমার সুটকেসটা ?"

"নামিয়ে দিয়ে যান।"

সন্ধ্যা ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যাকে কোনও রকম পরামর্শাদি দেবার সময় পাওয়া গেল না, পাওয়া গেলেও পরামর্শ গ্রহণ করবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। সুটকেসটা দারোয়ানের জিম্মা ক'রে দিয়ে চিন্তিত মনে প্রকাশ বললে, "ক্যালকাটা হোটেল।"

ট্যাক্সি ক্যালক্যাটা হোটেল অভিমুখে ধাবিত হ'ল।

সতের

সদর মহলে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা অন্তঃপুরে যাবার পথটা ঠিক নির্ণয় করতে পারছিল না, দূর থেকে দেখতে পেয়ে একজন ভৃত্য ছুটে এল; বললে, "আসুন আমার সঙ্গে, আমি গিন্নী-মা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" অভ্যাগতা যে সেই বাড়িরই বধূ, তা অবশ্য সে বুঝতে পারেনি।

অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তে উপরে উঠবার প্রশস্ত সোপান। ভৃত্যের পিছনে পিছনে সোপান অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা দ্বিতলের বারান্দায় উপনীত

হ'য়ে দেখলে ঠিক যেন তারই অপেক্ষায় প্রিয়লাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল, চক্ষে যেন একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এল; সিঁড়ির রেলিং-প্রান্তের মোটা থামের মাথাটা তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেলে সে ভাবটা সে সামলে নিলে।

কথাটা মিথ্যা নয়। মোটরের শব্দ শুনতে পেয়ে প্রিয়লাল বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করতে দেখতে পেয়েছিল। কী যে করা উচিত তা সে প্রথমটা ভেবেই ঠিক করতে পারে নি, তারপর শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা উপরেই আসবে অনুমান ক'রে সিঁড়ির নিকটে গিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মা এখন পূজো করছেন, হয় তো একটু দেরি হবে,—ততক্ষণ অন্য ঘরে একটু অপেক্ষা করলে ভালো হয়।" তারপর ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললে, "হরি, তুই তোর কাজে যা, আর দরকার নেই।"

হরি চ'লে গেলে প্রিয়লাল বললে, "এস আমার সঙ্গে।"

প্রিয়লালের পিছনে পিছনে গিয়ে সন্ধ্যা যে ঘরে প্রবেশ করল সেটা প্রিয়লালের পাঠাগার। চার পাঁচটা বই-ভরা আলমারি, একটা বড় সেক্রেটেরিয়েট্ টেবল্ গোটা দুই তিন হোয়াট্‌নট্, সাধারণ ও কুশন-মোড়া পাঁচ সাতটা চেয়ার,—অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পাঠাগারে যেমন থাকা উচিত সবই তেমনি, অধিকন্তু ঘরের একপাশে একটা গদী-মোড়া অপ্রশস্ত খাট, সম্ভবতঃ পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য।

ঘরে প্রবেশ ক'রে ভালো ক'রে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "ওই চেয়ারটায় বসো।"

সন্ধ্যা একবার নিমেষের জন্য প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে আঁচলটা গলায় দিয়ে নত হ'য়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে, তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে ব'সে চেয়ারের বাহুর উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে রোদন করতে লাগল।

প্রিয়লালেরও চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল, মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। মিনিট খানেক নীরবে অবস্থান করার পর ভগ্নকণ্ঠে সে ডাকলে, "সন্ধ্যা?"

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে মুখ তুলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

প্রিয়লাল বললে, "সন্ধ্যা, আমাদের প্রাণের যা কথা, তা বলবার সময় এখন হয় তো হবে না, মা অনেকক্ষণ পূজোয় বসেচেন, এখনি উঠবেন। তার আগেই দু'-চারটে কাজের কথা সেরে নিতে হবে।"

প্রিয়লালের ভূমিকা শুনে সন্ধ্যার মুখ আশঙ্কায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। স্খলিতকণ্ঠে বললে, "কাজের কথা? আমার সঙ্গে কী কাজের কথা?"

প্রিয়লাল বললে, "কাজের কথা আর কিছু নয়, আমরা যে বিপদে পড়েছি তার কথা।"

"তার কী কথা ?"

"তুমি আজ যে এখানে এসেছ, সে কি বাবাকে জানিয়ে এসেছ ?"

"না।"

"প্রকাশদাদা তোমাদের আসবার কথা চিঠি লিখে কিছু জানান নি ?"

"যতদূর জানি, জানান নি।"

সন্ধ্যার উত্তর শুনে প্রিয়লালের মুখে চিন্তা দেখা দিলে ; বললে, "বোধহয় ভালো করনি, হঠাৎ এসে পড়া হয়তো ঠিক হয় নি।"

সন্ধ্যার চক্ষের মধ্যে সহসা বিদ্যুৎ-কণিকা জ্ব'লে উঠল। আরক্ত মুখে ঋজু হ'য়ে ব'সে সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলে, তারপর সোজাসুজি প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর পনেরো ষোলো দিন আমি জামসেদপুরে প'চে মরছি,—একে তুমি হঠাৎ এসে পড়া বল ? তুমি পারতে এতদিন অপেক্ষা করতে ?" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললে, "তুমি তো তোমার কাজের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, এবার আমি একটা কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, আমাকে তাহ'লে পরিত্যাগ করবে ব'লেই কি তোমরা স্থির করেছ ? বল ? সত্যি ক'রে বল ?"

এই আকস্মিক কঠিন প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে সহসা তা স্থির করতে না পেরে প্রিয়লাল ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিরুত্তরে রইল, তারপর বললে, "এক কথায় তো এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না সন্ধ্যা ! এর উত্তর হ্যাঁ-ও নয়, না-ও নয়।"

"তবে কী এর উত্তর ? বল ?"

"এর উত্তর—বাবা যতদিন পর্যন্ত মন স্থির করতে না পারছেন ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে বাদ-বিসংবাদ করলে তাঁর জেদটা মিছিমিছি বাড়িয়ে দেওয়া হবে—হয়তো তাতে তাঁর মতকে আমাদের বিরুদ্ধে পাকা ক'রেই তোলা হবে। তার চেয়ে কিছুদিন তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে অপেক্ষা করাই উচিত নয় কি সন্ধ্যা ? বুঝে দেখ।"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, একথা তা হ'লে না-হয় তাঁর সঙ্গেই হবে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে না নেওয়াই স্থির করেন, তখন তুমি কী করবে ? তখন তুমি আমাকে গ্রহণ করবে তো ?"

সন্ধ্যার এই সুকঠিন প্রশ্নে প্রিয়লালের মুখ শুকিয়ে উঠল ; বললে; "এ কথা এখন কেন সন্ধ্যা ? পরের কথা আগে কেন ?"

সন্ধ্যার মুখে গভীর দুঃখের মৃদু হাসি স্ফুরিত হ'ল। বললে, "কেন, তা তুমি বুঝবে না। যে আশ্রয়হীন তার যে কত দুঃখ কত ভয় তা তুমি কী ক'রে বুঝবে বল ?—তোমার তো আশ্রয় ভাঙেনি।" এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে বললে, "তুমি বলতে পারলে না, কিন্তু আমি হ'লে কী করতাম জান ? দরকার হ'লে তোমার জন্যে সমাজ সংস্কার অবুঝ বাপ-মা সমস্ত ত্যাগ করতাম, কিন্তু বিনা অপরাধে এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে থাকতাম না। এ তোমাকে আমি স্পষ্ট ক'রে

ব'লে রাখলাম, একমাত্র বাঙলাদেশের হিন্দু ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মানো ছাড়া আর আমি কোনো অপরাধ করি নি,—পাল্কী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ডাকাতদের সঙ্গে পালিয়ে যাই নি, আমি তাদের লুঠ করতে আসবার জন্যে ব'লে পাঠাই নি! তাদের হাতে প'ড়ে আমার যে নিগ্রহ হয়েচে তার জন্যে একমাত্র তোমরা দায়ী। কেন তোমরা আমাকে অমন বিপদ-ভরা পথ দিয়ে রাত্রে নিয়ে এসেছিলে? কেন তোমরা আমার রক্ষার জন্যে যথেষ্ট লোক-জন সঙ্গে আনো নি? কেন তোমরা ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় সেখানে প্রাণ দিলে না? অপরাধ করবে তোমরা, আর শাস্তি ভোগ করব আমি?" দীর্ঘ উত্তেজিত অভিভাষণের পর সন্ধ্যা ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

প্রিয়লালের পায়ে তখনো লাঠির আঘাতের বেদনা ছিল, তখনো আহত পায়ের চিকিৎসা শেষ হয় নি। একবার মনে করলে বলে যে, পা যদি সেদিন না ভাঙতো তা হ'লে প্রাণ হয় তো দিতেই হ'ত। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না; বললে, "অপরাধ স্বীকার করছি সন্ধ্যা, কিন্তু তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ, —একটু শান্ত হও।"

সন্ধ্যা বললে, "উত্তেজিত হয় তো কিছু হয়েছি, কিন্তু যতটা তুমি মনে ভাবছ, ততটা ঠিক নয়। মনে কোরো না এ-সব কথা এখনি আমি বানিয়ে বানিয়ে তোমাকে বলছি। এ সব আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে! দিনের মধ্যে কতবার যে এই সব কথা নিয়ে মনে মনে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করি তা তুমি কী ক'রে জানবে! তুমি ভাবছ, এ মেয়েটা যে এমন মুখরা তা আগে কখনো জানতাম না!"

দুঃখার্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "আমি ভাবছি সন্ধ্যা, কত দুঃখই না-জানি তুমি পেয়েছ যা তোমার মতো লাজুক মেয়েকে এতটা মুখরা ক'রে তুলেছে!"

শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু সজল হ'য়ে এল; সে বললে, "সত্যিই তাই। ভেবে ছাখো, পঁয়ত্রিশ দিন আমি ডাকাতদের বাড়ি ছিলাম। সেখানে কী ঝড় আমার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তারা যে দুর্গতি আমার করেছিল তার চেয়ে যদি আমাকে প্রাণে মারত তো আমি তাদের সদয় বলতাম। জানো?—আমার মনে হয় আমার বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে। সময়ে সময়ে মনে হয়, সে সন্ধ্যাকে বোধ হয় ডাকাতেরা মেরেই ফেলেছে, আমি তার প্রেত-দেহ।"

এ কথার উত্তরে প্রিয়লালের মুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হ'ল না,—একটা মর্মান্তিক মনস্তাপে তার দেহ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সমস্ত ঘরটা বেদনার সকরুণ ব্যঞ্জনায় থম্‌থম্ করতে লাগল। একটা ক্লক্ ঘড়ি ঠক্ ঠক্ ক'রে একটানা শব্দ ক'রে চলেছিল, ঢং ক'রে তাতে সাড়ে নটার প্রহর বাজল। সেই শব্দে যেন উভয়ের অনুভূতি ফিরে এল।

কাতরস্বরে প্রিয়লাল বললে, "সময় আমাদের বেশি নেই সন্ধ্যা। বাবা ছেলে-

মেয়েদের নিয়ে দমদমার বাগানে বেড়াতে গেছেন, সাড়ে নটা দশটার সময়ে তাঁর আসবার কথা; মা'র পূজো এতক্ষণে বোধ হয় শেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার অক্ষম স্বামীকে যদি ক্ষমা করতে পার তো কোরো, কিন্তু সব দিক বিবেচনা ক'রে, সব কথা সব রকমে ভেবে দেখে আমি যা উচিত ব'লে স্থির করেছি আর একবার তোমাকে তা বলতে বাধ্য হ'লাম,—বাবার মত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

সন্ধ্যা দৃপ্তস্বরে বললে, "কিন্তু তোমার এ কথার উত্তরে তোমাকে যে কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর একবার তা জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে না নেন, তুমি নেবে তো?"

প্রিয়লালের মুখ সহসা কালো হ'য়ে উঠল, গভীরস্বরে সে বললে, "এ কথারও উত্তরের জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যা!"

ঘৃণা ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "অপেক্ষা করতে হবে?—কত-দিন অপেক্ষা করতে হবে শুনি? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কি?"

"তা বলতে পারিনে,—কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে!"

রুষ্ট মুখে এক মুহূর্তে প্রিয়লালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সন্ধ্যা বললে, "তা যেন বলতে পার না,—কিন্তু কোথায় অপেক্ষা করতে হবে তাও বলতে পার, না কি? কোন দেশে, কোন্ সহরে, কাদের বাড়ি?"

"ধর, তোমার বাপের বাড়ি।"

"আমার বাপের বাড়ি? কেন, তোমাদেরই সমাজ আছে, জাত আছে, ধর্ম আছে,—আর আমার বাপের বাড়ির লোকদের সে সব কিছু থাকতে নেই? তারা তো টাকা-কড়ি আসবাব-পত্র দিয়ে আমাকে দান ক'রে দিয়েছে—তুমি তো ধর্ম-সাক্ষী ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছ,—এখন তুমি আমাকে একটা অনিশ্চিত সময়ের জন্যে বাপের বাড়িতে অপেক্ষা করতে বলছ। দৈবক্রমে তুমি পুরুষ হ'য়ে জন্মেছ আর আমি জন্মেছি মেয়েমানুষ হ'য়ে,—এরই বলে তুমি আমার ওপর এত বড় অত্যাচার করতে পারছ। এই কি তোমার ধর্ম? এই তোমার কর্তব্য?"

"আমার কর্তব্য তা হ'লে কী বল তুমি?

সন্ধ্যা স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রিয়লালের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললে, "আমি যা বলি তা পারবে তুমি করতে? আমি বলি তোমার কর্তব্য, তোমার বাপ-মা আমাকে নিতে রাজি না হ'লে আজই তোমার আমার সঙ্গে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরে কোনো দিন যদি তাঁদের মত আমাদের সপক্ষে বদলায় সেদিন আমরা দু'জনে আবার এ বাড়িতে ফিরে আসব। দুটো পেটের জন্যে ভেবো না। তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি যদি চালাতে না পার, মেয়েস্কুলে মাষ্টারী ক'রে, বড়লোকের মেয়েদের গান শিখিয়ে আমি চালিয়ে নোবো। এ তুমি পারবে করতে? আমি হ'লে কিন্তু নিশ্চয় পারতুম!"

আর্তস্বরে প্রিয়লাল বললে, "আমি দুর্বল, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো সন্ধ্যা।"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রবলভাবে সন্ধ্যা বললে, "না, না, দুর্বলকে আমি ক্ষমা করিনে ; দুর্বলকে আমি ঘৃণা করি।"

"তবে তাই কোরো।"

সন্ধ্যা তেমনিভাবে বলতে লাগল, "শোন। খবরের কাগজে আমার মতো হতভাগিনীদের কাহিনী পড়তে পড়তে যখন দেখতাম যে, বিনা অপরাধে তাদের বাপ-মা শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্বামী তাদের অনায়াসে ত্যাগ করলে, তখন কী ঘৃণা যে তাদের ওপর হ'ত তা তোমাকে কী বলব। গুণ্ডাদের চেয়েও তাদের ওপর আমার বেশি ঘৃণা হ'ত। তখন কি জানতাম, আমি নিজেই একদিন তাদেরই একটা দলের হাতে পড়ব!"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল ধীরস্বরে বললে, "সেই ঘৃণিত দলের কাছে আজ তুমি বিনা আহ্বানে কী প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ বলবে ?"

"কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি, একটা বোঝাপড়া করতে এসেছি।"

"কী বোঝাপড়া ?"

"বোঝাপড়া এই যে, আমার আর একটুও ধৈর্য নেই, আর আমি একদিনও অপেক্ষা করতে পারব না। আজ তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে তো ভাল, নইলে আমিও তোমাদের আজ ত্যাগ ক'রে যাব। তারপর আর ফিরে আসবার পথ থাকবে না, তোমরা নিজে সাধ্য-সাধনা ক'রে নিয়ে আসতে গেলেও নয়!"

"এত বড় অপরাধ আমরা করেছি ব'লে মনে ক'রো তুমি যে, এই শাস্তি আমাদের দিতে পার ?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এ কি তুমি পরিহাস ক'রে বলছ ?"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বললে, "না, না, সন্ধ্যা, আমি এমন ইতর নই যে তোমার সঙ্গে এ অবস্থায় পরিহাস করব,—আমার মনের অবস্থা পরিহাসের মতো নয়। আমি সত্যিই জানতে চাই, আমরা কী এমন অপরাধ করেছি যে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললে তুমি আমাদের চিরদিনের মতো পরিত্যাগ ক'রে যাবে ? আমরাও তো ডাকাতদের লেলিয়ে দিই নি ?"

সন্ধ্যা বললে, "না, তা দাও নি ; সে অপরাধ তোমাদের নয়। কিন্তু এক কথা কতবার বলব বল ? তুমি তো বুঝবে না। তুমি এত বড় প্রাসাদে বাস কর, খাওয়া পরার ব্যবস্থা তোমার ঠিক মতো আছে, নিরাশ্রয়ের দুঃখ তুমি কেমন ক'রে বুঝবে ? একদিনও ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ কি আমার কথাটা ? কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে মুক্তি পেলাম, অধীর আগ্রহে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম সংবাদ পেয়েই তোমরা জামসেদপুরে গিয়ে বুকে ক'রে আমাকে নিয়ে আসবে। এই প্রত্যাশার বদলে কী পেলাম জান ? দু'-চারটে শুকনো ছোট ছোট টেলিগ্রাম আর দু'-চারটে ছোট ছোট চিঠি। তাও আমাকে নয়। তারপর পনের ষোল দিন অপেক্ষা

ক'রে এখানে ছুটে এলাম। বাপের বাড়ি গেলাম, তারা বললে এখানে নয়, শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাড়ি এলাম, তুমি বলছ এখানে নয়, বাপের বাড়ি যাও। আচ্ছা, কোথায় যাই বল দেখি ? আছি তো প'ড়ে দূর-সম্পর্কের এক ভগ্নিপতির বাড়ি। সবিতা দিদি তা'তে ঠিক সন্তুষ্ট নয় তাও বুঝতে পারি। এ'তে কি অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য থাকে ?"

ম্লান মুখে প্রিয়লাল বললে, "সত্যি।"

সন্ধ্যা বলতে লাগল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে, এখন চল মা'র সঙ্গে একবার দেখা করি, তাঁর হয়ত এতক্ষণে পুজো শেষ হয়েছে। তোমাকে অনেক দুর্বাক্য, অনেক কটু কথা বলেছি,—তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি আমার স্বামী, তোমাকে না ব'লে, তোমার কাছে নালিশ না ক'রে আমার উপায় নেই। তা ছাড়া, একটা কথা কি জানো ? বেশ বুঝতে পারছি এ আমার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এত কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়,—কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছিনে। ঠিক মনে হচ্চে আর কোন লোকের আত্মা যেন আমার উপর ভর ক'রে এসব বলাচ্ছে করাচ্ছে।" তারপর আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হয়তো এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই আর একবার তোমার পায়ের ধূলো দাও।" ব'লে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে।

উচ্ছল অশ্রু রোধ করতে করতে উঠে দাঁড়াতেই প্রিয়লাল বাহুবন্ধনে সন্ধ্যাকে আবদ্ধ করতে উদ্যত হ'ল। সন্ধ্যা প্রিয়লালের বাহুপাশ কাটিয়ে ত্বরিত পদে দূরে স'রে গিয়ে বললে, "না, না, ও-সব এখন নয়! আমি এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে। আশ্রয় পেলে তারপর তোমার কাছ থেকে আদর যত্ন সবই নোবো,—তার আগে কিছু নয়। এখন মা'র কাছে চল।"

বিষণ্ণ মুখে প্রিয়লাল বললে, "চল।"

মমতাময়ী তখন পূজার্চনাদি সমাপন ক'রে একটা ঘরে ব'সে ধর্মগ্রন্থে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রবেশ না ক'রেই প্রিয়লাল বললে, "মা, সন্ধ্যা এসেছে।"

মমতাময়ী কথাটা ঠিক শুনতে পেলেন না কিংবা বুঝতে পারলেন না, বই থেকে চক্ষু উত্থিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছে ?"

অন্তরাল থেকে সম্মুখে এসে সন্ধ্যা নিমেষের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নত হ'য়ে দুই হস্তে মমতাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করতে গিয়ে দুই পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। বললে, "মা, তোমরা না-কি আমাকে ঘরে স্থান দেবে না স্থির করেছ ?—তোমরা না-কি আমাকে ত্যাগ করবে ?"

মমতাময়ী সযত্নে সন্ধ্যাকে তুলে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, "স্থির হও বউ-মা, শান্ত হও! বিপদে উতলা হ'য়ো না।"

"কিন্তু এমন বিপদে কী ক'রে স্থির হ'য়ে থাকি মা ? তোমার পদসেবার দাসী হ'য়েও কি এ বাড়িতে থাকতে পাব না ?"

মমতাময়ী বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বললেন, "দাসী হ'য়ে থাকবে কেন বউ-মা, তুমি তো এ বাড়িতে রাজরাণী হ'য়ে থাকবে তাই জানি। কিন্তু অদৃষ্ট আমার এমনই মন্দ যে, এমন সোনার চাঁদের মতো বউ পেলাম তা ভোগে এল না। সংসারটা একেবারে ভেঙ্গে চুরে গেল !" ব'লে কাঁদতে লাগলেন। তারপর অঞ্চলে চক্ষু মুছে বলতে লাগলেন, "আমার কি অসাধ যে তোমাকে নিয়ে ঘর করি ? কিন্তু কী করব বলো, কর্তাকে তো কিছুতেই রাজি করাতে পারছিনে, কেবল বংশ-মর্যাদা আর বংশ-মর্যাদা। বেশি চাপাচাপি ক'রে ধরলে বলেন, কাশীবাসী হব।"

মমতাময়ীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সন্ত্রাসে কালো হ'য়ে উঠল। আর্তস্বরে সে বললে, "তুমি তো মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝবে মা। তুমি বল, তা হলে আমার কী গতি হবে !"

তখন শ্বাশুড়ী বধূতে অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক কথাবার্তা অনেক পরামর্শ হ'ল। মমতাময়ী বললেন, "আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে তুমি কথা কইবে বউ-মা। তারপর তোমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জহরলাল গৃহে প্রত্যাগমন করলে মমতাময়ী যখন নানাপ্রকার ভূমিকাদির পর বধূর আগমন সংবাদ তাঁর নিকট জ্ঞাপন করলেন তখন হ'তেই অদৃষ্ট বিরূপ মূর্তিতে দেখা দিলে। ক্রুদ্ধস্বরে তর্জন ক'রে জহরলাল বললেন, "না, সে কিছুতেই হ'তে পারে না, তুমি এখনি ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

মমতাময়ীর চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে অভাগিনী বধূর জন্য অকৃত্রিম সমবেদনা ছিল, সেজন্য ইতিপূর্বে কয়েকবারই তিনি বধূর সপক্ষে স্বামীর নিকট দরবার করেছেন, কিন্তু কখনো তর্ক অথবা বচসা করেন নি। আজ সূচনাতেই স্বামীর কাছ থেকে রূঢ় প্রতিবাদ পেয়ে তাঁর মনটা বিগড়ে গেল। তিক্তকণ্ঠে বললেন, "দেখ, অত কঠিন হয়ো না। সে তোমার ছেলের বউ, এত বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছে আশ্রয় ভিক্ষে করতে, আর তুমি তার সঙ্গে একটা কথা না ক'য়ে আমাকে বলছ পাঠিয়ে দাও তাকে বাপের বাড়ি ? একটা মিষ্টি কথাও তোমার কাছ থেকে সে পেতে পারে না ? আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি তার অপরাধটা কী ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে জহরলাল বললেন, "কিন্তু আমার অপরাধটাই বা কী শুনি যে, আমি সমাজের কাছে অত বড় একটা অপরাধ করব ?"

মমতাময়ী বললেন, "বউমার সঙ্গে দুটো কথা কইলেই সমাজের কাছে তোমার অপরাধ করা হবে ? সমাজ তা হ'লে একটা দত্যি-দানবের মতো কিছু বল ?"

জহরলাল মনে করলেন, উকিলের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে আসামীর সঙ্গে কথাবার্তা করলে মামলা সহজে নিষ্পত্তি হ'তে পারে। বললেন, "আচ্ছা, নিয়ে এস তা হ'লে। আমি কিন্তু দশ মিনিটের বেশি কথা কইব না।"

কথা কইতে গিয়ে কিন্তু বহু বহু দশ মিনিট হ'য়ে গেল তবু কথা শেষ হয় না। প্রথমে জহরলাল বিনা অনুমতিতে এবং না জানিয়ে হঠাৎ আসার অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য সন্ধ্যাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে আর বাজে দুই একটা উপদেশ দিয়ে ব্যাপারটা শেষ করবার চেষ্টায় ছিলেন ; কিন্তু ভৎর্সনা-উপদেশের লাঠি-সোঁটা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিক থেকে যখন বিচার-বিতর্কের গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল তখন আত্মরক্ষা করতে করতে তিনি বিব্রত হ'য়ে উঠলেন ; বুঝলেন বিবাহ-কালের বউমা আর নেই তখনকার কেঁচো এখন হয়েছে কেউটে।

জহরলালের কাছে আসবার পূর্বে সন্ধ্যা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল,—মনে মনে সে স্থির করেছিল যে, জহরলালের নিকট কোনো অবস্থাতেই সংযম হারাবে না। তাই যুদ্ধের বিশৃঙ্খল গোলযোগের মধ্যে একজন পাকা গোলন্দাজ যেমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চতুর্দিক দেখে দেখে গোলা-গুলি ছোঁড়ে সেও তেমনিভাবে জহরলালের প্রতি প্রশ্ন বর্ষণ করছিল। উত্তর দিতে দিতে জহরলাল অস্থির হ'য়ে উঠছিলেন ;—বারে বারে তাঁর সাক্ষী মানতে হচ্ছিল হিন্দুজাতির সনাতন সমাজ-বৃদ্ধকে, কিন্তু জেরার বাণে বাণে বৃদ্ধের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে জহরলাল বললেন, "তোমার তর্কের কাছে আমি হার মানলাম। এবার তুমি থাম !"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি তো শুধু তর্কই করিনি বাবা, আমি তো আমার মহাদুঃখের কথা নিরাশ্রয়তার কথাও আপনার কাছে নিবেদন করেছিলাম। আমার তো মনে হয় তার কাছেই আপনার হারা উচিত ছিল।"

তীব্রকণ্ঠে জহরলাল বললেন, "না, তার কাছে আমার হারবার কোনো কারণ নেই। তোমার দুরদৃষ্টের ফল তুমি যদি ভোগ কর তার জন্যে আমি দায়ী নই। সুতরাং এ-কথা তুমি জেনে রাখ যে, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে স্পষ্ট কথায় গ্রহণ না করছি ততদিন পর্যন্ত এ বাড়িতে আর এমন ক'রে হঠাৎ এসে উত্যক্ত করবার কোনো অধিকার তোমার রইল না। এ কথা এমন রূঢ়ভাবে বলার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমি আজ অতিশয় নির্লজ্জভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, তাই বলতে বাধ্য হ'লাম। আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি, তোমার ভরণপোষণের জন্যে একটা অর্থের ব্যবস্থা আমি করব, সে বিবেচনা আমার আছে। সে কথাটা তোমার বাবাকে জানিয়ে দিয়ো, ফল হবে।"

এর পর কিছুক্ষণ ধ'রে এমন একটা ব্যাপার চলল যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে বেয়নেট্ চার্জ। মনের রক্ত থাকলে নিশ্চয় দেখা যেত উভয় পক্ষেই রক্তপাত ঘটেছে!

বেলা তিনটার সময় প্রকাশ যখন এসে উপস্থিত হলো জহরলাল তখন

বৈঠকখানায় ব'সে তারই অপেক্ষা করছিলেন। প্রকাশকে দেখে তিনি ক্রোধে আগুন হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু যতটা সম্ভব তার বাহ্য অভিব্যক্তি প্রচ্ছন্ন রেখে বললেন, "প্রকাশ, তুমি আজ বিনা সংবাদে একটা hysteric মেয়েকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে ভারী অন্যায় করেছিলে। এমন সব ভীষণ scene যে ঐ একটা অল্প বয়সের মেয়ে করতে পারে তা আমার এর আগে ধারণাই ছিল না।"

প্রকাশ বললে, "তার কারণ, এর আগে আর কখনো আপনার ও-রকম ভীষণ-অবস্থায়-পড়া মেয়ের সঙ্গে কথবার্তা করবার কারণ ঘটেনি। ভেবে দেখুন দিকি কা নিদারুণ অবস্থায় ও দিনযাপন করছে, মাথা ঠিক রাখা সম্ভব কি ?—কিন্তু সে কথা যাক, ওর সম্বন্ধে আপনি কী সাব্যস্ত করলেন ? ও আপনার এখানেই রইল তো ?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জহরলাল বললে, "না, না, নিশ্চয়ই সে আমার এখানে থাকবে না। কিন্তু সে বিষয়ে শুধু আমিই সাব্যস্ত করিনি, সে নিজেও সাব্যস্ত করেছে আজ থেকে আমাদের ত্যাগ করবে !" ব'লে কথাটার একান্ত হাস্যকরতার প্রমাণ স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

প্রকাশ বললে, "এ কথা সে নিশ্চয় তখন বলেছে যখন দেখেছে আপনার কাছে তার বিশেষ কিছু আশা-ভরসা নেই, আপনি তাকে ত্যাগ করবেনই।"

জহরলাল বললেন, "কিন্তু ত্যাগ না ক'রে কী করি বল ? তাকে ত্যাগ না করলে সমাজকে আমার ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে সমাজকে ত্যাগ করতে যাব তা বলো ?"

"সেই বা কী অপরাধ করেছে বলুন ?"

"অদৃষ্ট তার মন্দ, এই তার অপরাধ। এ নিশ্চয় জেনো প্রকাশ, দুরদৃষ্টের মতো দ্বিতীয় অপরাধ আর নেই। তা নইলে এত সাধুলোকে যে এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার কোনো অর্থই হয় না।"

উভয়পক্ষে বহুক্ষণ ধ'রে এই ভাবে তর্ক-বিতর্ক চলল, কিন্তু কোনো ফল হলো না। অবশেষে হতাশ হ'য়ে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যাকে গ্রহণ করতে কিছুতেই যখন আপনি রাজি নন তখন তর্ক ক'রে কোনো ফল নেই, ওকে ডেকে পাঠান, বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

জহরলাল বললেন, "তুমি মনে করো না প্রকাশ, আমি এমনই একটা ভীষণ রকম নিষ্ঠুর লোক যে, আমার মনে কোনো কষ্টই হচ্ছে না। এ ব্যাপারটা আমার জীবনেও একটা বড় রকম দুর্ঘটনা হ'য়ে রইল। আমি বেঁচে থাকতে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করবে না এই কথা দেওয়াতে আমিও প্রিয়কে কথা দিতে বাধ্য হয়েছি যে, পুনর্বার বিয়ে করবার জন্যে আমি কোনদিন তাকে অনুরোধ করব না। সংসার আমার ভেঙে গেছে। তোমার মামীমা হাসেন না, আমার সঙ্গে ভালো ক'রে কথা কন না, দিবারাত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়েই সময় কাটান। আমি যদি সেই রাত্রেই সন্ধ্যাকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারতাম তাহলে তো তাকে

একেবারে বাড়িতেই নিয়ে আসতাম। কিন্তু একমাসের ওপর সে ডাকাতদের বাড়ী বাস ক'রে এসেছে, এখন, ধরো কিছুদিন পরে যদি প্রকাশ পায়—" অদূরে একব্যক্তি ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল, হয়ত আত্মীয়ই কেউ হবে, তার দিকে তাকিয়ে প্রকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথাটা মৃদু চাপা কণ্ঠে শেষ করলেন।

শুনে প্রকাশের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। ডাকাতদের সন্ধ্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়াতে সন্ধ্যার নিজের কোনো অপরাধ হয় না স্বীকার করতে হ'লে ও-কথাতেও হয় না স্বীকার করতে হয়।"

"তুমি স্বীকার করতে পারতে?"

"আমরা দুর্বৃত্ত লোক, আমাদের কথা ছেড়ে দিন মামাবাবু, আমরা কিছু কিছু দুষ্কর্ম ক'রে থাকি,—হয়তো পারতাম।"

"বলা সহজ, করা শক্ত!"

মৃদু হেসে প্রকাশ বললে, "এখন এ কথা থাক, কিন্তু পরীক্ষা যদি আসে তাহ'লে পাশ হব, এ কথাও ব'লে গেলাম।"

জহরলাল বললেন, "ভালো কথাই! আমরা সামান্য লোক, বড় কথার মাহাত্ম্য বুঝতে পারিনে। কিন্তু আর দেরি ক'রে কাজ নেই, ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াও।"

"ও কি এখানে এখন পর্যন্ত কিছু খায় নি।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে জহরলাল বললেন, "কত বড় ওর দর্প! কেউ ওকে জলস্পর্শ করাতে পারেনি।"

দুঃখিত স্বরে প্রকাশ বললে, "আহা, সেই কাল রাত্রে সামান্য একটু খেয়েছিল! এখন পর্যন্ত উপোস ক'রে আছে!" তারপরই কিন্তু তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; বললে, "তা ভালোই করেছে,—এখানে খেলে হজম হত না, বমি হ'য়ে যেত!"

রুষ্ট কণ্ঠে জহরলাল বললেন, "কেন শুনি?"

প্রকাশ বললে, "তা নয় মামাবাবু? এরকম অবস্থায় আপনি হ'লে এক পেট খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে ফিরে যেতে পারতেন? পারতেন না, আপনারও বমি হ'য়ে যেত।"

কী উত্তর দেবেন ভেবে না পেয়ে জহরলাল আরক্ত মুখে ব'সে রইলেন। কিছুতেই বলতে পারলেন না, তাঁর বমি হতো না, হজম করতেন।

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বললে, "মুখুয্যে মশায়, আমিনার দেওর নাসীরউদ্দিন এখানে বোধ হয় ইসলামিয়া কলেজে পড়ে। তার সন্ধান পাওয়া শক্ত হবে না, তার সঙ্গে আমাকে আমিনার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু আমি কী অপরাধ করলাম সন্ধ্যা? আমার সঙ্গে যাবে না কেন?"

সন্ধ্যার দুই চোখের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল; বললে, "আপনিও তো হিন্দু সমাজের লোক, আপনাকেই বা বিশ্বাস কী? আমি কিছুতেই জামসেদপুরে ফিরে যাব না।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রকাশ বললে, "হোটেলে গিয়ে আগে কিছু খাবে চল সন্ধ্যা, তারপর এসব কথা হবে।"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রকাশের কাছে সন্ধ্যাকে হার মানতেই হলো, সেই দিন রাত্রের ট্রেনেই উভয়ে জামসেদপুর ফিরে চলল।

আঠার

প্রত্যুষে যখন প্রকাশের মোটর গেট পার হ'য়ে গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করল তখন সবিতা বারান্দায় স্বামীর প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল। দূর থেকে প্রকাশের পার্শ্বে সন্ধ্যাকে উপবিষ্ট দেখে মনটা একেবারে তিক্ত হ'য়ে উঠল। একবার ভাবলে তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির ভিতর চ'লে যায়,—কিন্তু ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা এত কাছে এসে পড়ল যে তার আর উপায় রইল না।

অতি কষ্টে কোনো প্রকারে সন্ধ্যাকে কলিকাতায় চালান ক'রে মনে মনে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার উপর কাল সন্ধ্যার পর স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার জন্য যখন প্রকাশের টেলিগ্রাম এল তখন সবিতা মনে মনে এই কথাই স্থির ক'রে নিয়েছিল যে, সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরেরা সহজে গ্রহণ ক'রেছে ব'লেই এত শীঘ্র প্রকাশের ফিরে আসা সম্ভবপর হচ্ছে। আজ সন্ধ্যাকে প্রকাশের সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে মনের সমস্ত স্থৈর্য অন্তর্হিত হলো। মনে হোল, এ আপদ সংসারের শান্তি একেবারে নষ্ট না ক'রে দিয়ে বিদায় হবে না।

গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে বারান্দার উপর উঠে প্রকাশ সবিতার মুখমণ্ডলে যে বস্তু সুপরিস্ফুট দেখলে তার সহিত ধূম মেঘ মসী প্রভৃতি দ্রব্যের উপমা দেওয়া চলে। সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের ফলে এই ধরণের ঘটনাদির সম্ভাবনা আছে মনে মনে সে আশঙ্কা বরাবরই ছিল। আসন্ন অপ্রীতিকর অবস্থার দুশ্চিন্তায় মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল, কিন্তু তথাপি মুখে একটু ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত ক'রে বললে, "কী সবু? খবর সব ভালো তো?"

সবিতা বললে, "সবের মধ্যে তো আমি। বেঁচে যখন আছি তখন ভালোই।"

অদূরে একটা চেয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে প্রকাশ বললে, "কিন্তু ঐ চেয়ারের পিঠে ঝোলানো ও সৌখীন জামাটি নিশ্চয়ই আমার নয়,—সুতরাং আরও কিছু খবর থাকতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে।"

সবিতা বললে, "ও! ওটা প্রমথ ঠাকুরপোর। প্রমথ ঠাকুরপো কাল কলকাতা থেকে এসেছেন।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ ভিন্ন কবে তিনি নোটিস দিয়ে আসেন ?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বললে, "এ কথা অকাট্য। কিন্তু কোট ঝুলছে, দেহ কোথায় ?"

সুবিতা সংক্ষেপে বললে, "বাথরুমে।"

"বোঝা গেল।" ব'লে প্রকাশ ভিতরের দিকে প্রস্থান করলে।

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে, কিন্তু গ্রামের সহিত সম্পর্ক একরকম বিচ্ছিন্নই। ক্বচিৎ কদাচিৎ সেখানে পদার্পণ ক'রে, বাস করে কলিকাতার গৃহে। বহুদূর সম্পর্কে সে প্রকাশের পিসতুত ভাই। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় আত্মীয়তার স্বীকার-স্বীকৃতি আদান-প্রদান থাকে না, এ ক্ষেত্রেও ছিল না; কিন্তু প্রকাশ এবং সবিতা একবার লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়ে ঘটনাক্রমে দুই এক দিনের জন্য প্রমথর অতিথি হ'তে বাধ্য হয়। প্রমথ তখন দীর্ঘকাল যাবৎ তার লক্ষ্ণৌয়ের বাড়িতে বাস করছিল। সেই সময়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে আত্মীয়তার ক্ষীণ ধারাটুকু অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে পড়ে। তারপর থেকে প্রমথ পশ্চিমযাত্রার পথে মাঝে মাঝে দু'-চার দিনের জন্য জামসেদপুরে প্রকাশের গৃহে অবস্থান ক'রে যায়। প্রমথর প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্র তার নিষ্কলুষ নয়, এ সব কতকটা জানা এবং বোঝা থাকলেও তার সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতার গুণে প্রকাশ এবং সবিতা উভয়েই তাকে ভালবাসত এবং সে এলে খুসি হতো।

সন্ধ্যা প্রকাশের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে নত হ'য়ে সবিতাকে প্রণাম ক'রে ভগ্নকণ্ঠে বললে, "আবার ফিরে এলাম সবিদিদি।"

গম্ভীরমুখে সবিতা বললে, "ফিরে যে আসবে তা কতকটা জানাই ছিল।"

কথাটা নিতান্ত সহজ নয়। এই ফিরে আসার অপরাধের জন্য সবিতা কোন্ পক্ষকে দায়ী করতে চায়—সন্ধ্যাকে, না সন্ধ্যার পিতামাতা শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্বামীকে—তা ঠিক বোঝা যায় না,—কিন্তু তার মুখের ভাব এবং কথার স্বর থেকে মনে হয় সন্ধ্যার প্রতি তার সন্দেহ কম নয়। বিশেষতঃ নিত্যকার 'তুই' সম্বোধনের পরিবর্তে আকস্মিক 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ বিদ্রূপ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাবেরই পরিচায়ক। আত্মাবমাননার গ্লানিতে সন্ধ্যার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল; বললে, "তোমার কতকটা জানা ছিল, আমার কিন্তু পুরোপুরিই জানা ছিল।"

সবিতা রুক্ষস্বরে বললে, "তাই যদি ছিল তা হ'লে যাবার দরকারই বা কী ছিল শুনি ?"

কার নির্বন্ধে কলিকাতা গিয়েছিল সে কথা না তুলে সন্ধ্যা বললে, "অদৃষ্টের ভোগ ছিল, ভুগে এলাম।"

দৃঢ়স্বরে সবিতা বললে, "এ কথা আমি মানিনে;—অদৃষ্ট গাছে ফলে না, আমরা নিজের হাতেই গ'ড়ে তুলি। কিন্তু সে কথা যাক, তোমার মুখুয্যে মশাই সেখানে তোমার বিষয়ে চেষ্টা-চরিত্র কিছু করেছিলেন, না শুধু তোমাকে এক-দিনের জন্যে বেড়িয়েই নিয়ে এলেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "এ কথা তুমি মুখুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা কোরো সবিদি, তিনি ঠিক বলতে পারবেন; তবে আমার বিশ্বাস সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি।"

"কিন্তু তাঁর সাধ্য কি একদিনেই শেষ হ'ল? আর দিন দুই সেখানে থেকে চেষ্টা করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হতো কি?"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে যে, প্রশ্নের আকারে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এ-সকল কথা প্রশ্ন নয়, পরন্তু দোষারোপেরই রূপান্তর, এবং নামতঃ প্রকাশের প্রতি প্রযুক্ত হ'লেও সে নিজেও লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়;—সুতরাং এ সকল কথার যথাযথ উত্তর দিতে হ'লে এমন সব কথা বলবার প্রয়োজন হ'তে পারে যাতে কথোপ-কথনটা ক্রমশঃ বচসার রূপ ধারণ করতে পারে। আপাততঃ কী উপায়ে আলোচনাটা বন্ধ করবে মনে মনে সেই কথা সে চিন্তা করছিল এমন সময়ে অদূরে প্রমথ আবির্ভূত হ'লো। সন্ধ্যাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আসতে পারি?"

সবিতা বললে, "নিশ্চয় পারো, এসো প্রমথ ঠাকুরপো।"

নিকটে এসে চেয়ার থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দিতে দিতে প্রমথ বললে, "প্রকাশদাদা এসেছেন তা গাড়ির আওয়াজে আর তাঁর গলার শব্দে টের পেয়েছি, কিন্তু এত দেরি হ'ল কেন? গাড়ি লেট্ ছিল না কি?"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ইনি?"

সবিতা বললে, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যার কথা সবিতার মুখে প্রমথ প্রায় সবটাই শুনেছিল। এত শীঘ্র প্রকাশের সহিত তার প্রত্যাবর্তনে মনে কৌতূহলের উদয় হলো, কিন্তু সন্ধ্যা-প্রসঙ্গের অনালোচ্যতা স্মরণ ক'রে তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সে অসমীচীন বিবেচনা করলে। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "এত সংক্ষেপে বউদিদি আপনার পরিচয় দিলেন তা থেকে বুঝতে পারছেন আপনার পরিচয় আমার অজানা নয়; যদিও আপনাকে দেখছি আজ প্রথম, কিন্তু নাম করলেই বুঝতে পারি। আপনার দিদি আমার বউদিদি, সুতরাং এ বাড়িতে আমার কী সম্পর্ক তাও বুঝতেই পারছেন।"

সবিতা বললে, "কিন্তু সে সম্পর্কের হিসেবে তোমার ওকে আপনি ব'লে সম্বোধন না করলেও চলে।"

সবিতার কথা শুনে প্রমথর মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "শুধু সম্পর্কের হিসেবেই নয় বৌদিদি, বয়সের হিসেবেও আপনি ব'লে সম্বোধন না করলে চলে, কিন্তু আজকালকার যুগরীতির হিসেবে বিনা অনুমতিতে হঠাৎ তুমি ব'লে সম্বোধন করলে বর্বরতার পরিচয় দেওয়া হবে।"

প্রমথর কথা শুনে একটু সঙ্কোচের সহিত তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "অনুমতির দরকার নেই, আমাকে তুমি ব'লেই ডাকবেন।"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে ডাকব।"

সন্ধ্যা গৃহমধ্যে প্রস্থান করলে প্রমথ বললে, "ভারী সুন্দর দেখতে ত! তোমার বোনের মতো সুন্দরী মেয়ে বাঙালীর ঘরে খুব বেশি নেই বউদিদি!"

প্রকৃতপক্ষে সে বিষয়ে সবিতারও বিশেষ কিছু মতভেদ ছিল না, কিন্তু যে বস্তু তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো তার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে ব'লে মনে মনে সে আশঙ্কা করে, সুস্পষ্ট বচনে তার প্রশংসায় যোগ দিতে প্রবৃত্তি হলো না, নিস্পৃহ উদাস কণ্ঠে বললে, "তা হবে।"

প্রমথ বললে, "তা হবে' না, বৌদি, সত্যি-সত্যিই তাই। কিন্তু সে কথা যাক, এঁরা তো কলকাতা গেছলেন মাত্র পরশুদিন রাত্রে, এর মধ্যেই ফিরে এলেন কেন? সেখানে কি তাঁরা সন্ধ্যাকে ঘরে নিতে রাজি হলেন না?"

সবিতার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল; ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, "এখনো শুনিনি তো কিছু, কী ক'রে বলবো বলো তাঁরাই রাজি হলেন না, না এঁরাই রাজি হ'লেন না।"

বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "এঁরাই রাজি হলেন না?—এঁদের রাজি না হবার কারণ কী হ'তে পারে বৌদিদি?"

অন্তরের যত্নিরুদ্ধ ক্রোধ এবং দুঃখ যে-কোনো একটা পথ দিয়ে নির্গত হবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে সবিতা কথাটা এড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে বললে, "তা ধরো তাঁরা যদি ঠিক এঁদের পছন্দ মত কথাবার্তা না ক'য়ে থাকেন তা হ'লে এঁরাই বা হঠাৎ রাজি হন কী ক'রে?"

সবিতার পূর্ব কথা এবং এ কথা বলবার ভঙ্গীতে স্বরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে প্রমথ মনে মনে মাথা নাড়লে। কথার টোপ ফেলে কথা তোলবার উদ্দেশ্যে শান্ত স্বরে বললে, "সে কথা ঠিকই বউদিদি, এখন তো তোমাদের আর সে 'পতি পরম গুরু'র দিন নেই, এখন মেয়েদের মধ্যে 'মানুষ' জেগে উঠচে, সুতরাং এখন আর এমন শর্তে স্বামীর ঘরে বাস করা চলে না যাতে আত্মসম্মানে আঘাত লেগে মাথা হেঁট হয়।"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে সবিতা বললে, "স্বামীর ঘরে বাস করতেই আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, কিন্তু—" কথাটা শেষ না ক'রেই সে চেপে গেল। অন্তরের গ্লানিটা পুনরায় প্রকাশ পাবার চেষ্টায় ছিল।

প্রমথ বললে, "কিন্তু কী বউদিদি?"

মৃদু হেসে সবিতা বললে, "কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক, মুখটুক ধুয়ে চা খাবার জন্যে তয়ের হও।"

এ 'কিন্তু' দিয়ে পূর্বের 'কিন্তুকে' ঠিক চাপা দেওয়া গেল না। সামান্য একটি ছিদ্রের উপর চক্ষু স্থাপিত ক'রে যেমন পৃথিবীর অর্ধেকখানা দেখে নেওয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে একটি মাত্র 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা চতুর প্রমথ সবিতার অন্তরের

অনেকখানি অংশের সন্ধান লাভ করলে। মুখে বললে, "প্রকাশ দাদার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি ; আগে চলো তাঁর সঙ্গে দেখা করি।"

প্রকাশের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ হ'তে সবিতা বললে, "তুমি আবার ওকে ঘাড়ে ক'রে এখানে নিয়ে এলে কেন ?"

প্রকাশ বললে, "খুব সরল কারণে। আর কেউ নিলে না, তাই নিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।"

সবিতার মুখে বিদ্রূপের হাসি স্ফুরিত হলো ; বললে, "খুব সরল তো! আর কেউ না নিলে তুমি নিয়ে আসতে বাধ্য হও ?"

প্রকাশ বললে, "হুই, তাতো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কি মনে করো যে, এর মধ্যে একটা জটিল কারণও কিছু আছে ?"

প্রকাশের অধর প্রান্তে কৌতুকের মৃদু হাসির রেখা দেখে সবিতার পিত্ত জলে উঠল ; তীব্রকণ্ঠে বললে, "দেখ, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা কোরো না !"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রকাশ বললে, "বিশ্বাস করো সবু, এ পর্যন্ত ও চেষ্টা করিনি! কারণ এ ক্ষেত্রে শাকই বা কী আর মাছই বা কে তা যখন জানা নেই, তখন অজানা জিনিস দিয়ে অজানা জিনিস ঢাকবার চেষ্টা ভারি কঠিন কর্ম !"

প্রকাশের রসিকতাকে সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাহ্য ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সবিতা বললে, "তুমি যে ওকে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলে তাতে কার উপকার হ'ল শুনি ?"

মনে মনে একটু চিন্তা করে প্রকাশ বললে, "তোমার যে হয়নি তাতো বুঝতেই পাচ্ছি, কিন্তু সন্ধ্যা ছাড়া আর কোনো লোকের হয়েছে ব'লে কি তোমার সন্দেহ হয় ?"

আরক্ত মুখে সবিতা বললে, "ঠাট্টা এখন তুলে রাখো! ফিরিয়ে নিয়ে এসে মনে করোনা সন্ধ্যার তুমি বিশেষ কিছু উপকার করেছ।"

"কিন্তু ফিরিয়ে না এনে আর কী করতে পারতাম তা বলো ?"

"কেন, ফেলে এলে না কেন ?"

সবিস্ময়ে প্রকাশ বললে, "ফেলে এলাম না কেন? কোথায় ফেলে আসতাম তাকে ?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সবিতা বললে, "তার বাপের বাড়িতে,—শ্বশুর বাড়িতে। তা না পারতে, কলকাতায় তো ফুটপাথের অভাব ছিল না, ফুটপাথে।"

এবার কিন্তু প্রকাশের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল ; বললে, "ওটা মনে পড়ে নি, ভুল হ'য়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা বলি তোমাকে, এখানেও তো ফুটপাথের অভাব নেই, দাও না ওকে ফুটপাথে বার ক'রে। আমার কুটুম্ব, কিন্তু তোমার তো আত্মীয়—তুমি ঢের সহজে ও কাজটা পারবে।"

অকস্মাৎ কথাটার মোড় ফিরে গেল। ছিল রঙিন, হ'য়ে উঠল সঙ্গীণ। ঈর্ষার মত্ততায় বচসা করা চলে, কিন্তু যুক্তি-হেতু দিয়ে তর্ক করা চলে না, সুতরাং এর

পর থেকে তর্কটা যে-ভাবে অগ্রসর হলো তাতে শেষ পর্যন্ত সবিতাকেই পরাস্ত হ'তে হলো। সে যখন বুঝতে পারলে যে বাক্য তার প্রকৃত অস্ত্র নয়, তখন বাক্য পরিত্যাগ ক'রে সহসা এমন একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা অবলম্বন করলে যে তার চাপে সংসারের দম আটকাবার উপক্রম হলো। যে দু'-চারটে কথা না কইলে আতিথ্য-ধর্ম নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয় শুধু প্রমথর সহিত কথোপথন সেই শীর্ণ ধারায় চলল, বাকি লোকের সহিত একরকম পরিপূর্ণভাবেই বন্ধ হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে অতি সংক্ষিপ্ত যে এক-আধটা কথাবার্তা হয় তাকে কোনো মতেই সদালাপ বলা চলে না। দেখতে দেখতে দু'-তিন দিনের মধ্যে সংসারের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠল।

ঐক্যতানের মধ্যে একটা যন্ত্র যখন বেসুরো বাজতে থাকে তখন বাকি যন্ত্রগুলির মধ্যে যথার্থ মিলও ব্যর্থ হ'য়ে যায়। প্রকাশ প্রমথ আর সন্ধ্যার হলো সেই দশা। একটা অস্বাস্থ্যকর নীরবতার মধ্যে কিছুতেই তারা সহজ ভাবে আলাপ জমাতে পারলে না। ফলে, অফিসের কাজের অত্যধিক চাপাচাপির অছিলায় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ ফাইলের অন্তরালে প্রকাশ আত্মগোপন করলে, প্রমথ একটা অত্যন্ত মোটা ইংরাজী নভেল সংগ্রহ ক'রে তার মধ্যে ডুব মারলে, আর সন্ধ্যা নিরবশেষ দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার পথ দিয়ে ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় উপনীত হলো যে অবস্থার অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থায় মানুষ জীবনের কোনো আকর্ষণ অথবা সমাজের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, যে অবস্থায় সে সুযোগ পেলে প্রাণত্যাগ করতে পারে, প্ররোচনা পেলে কুলত্যাগ করতে পারে।

প্রত্যূষের ক্ষীণ আভা সবেমাত্র পূর্বদিকে ফুটে উঠেছে, গৃহ মধ্যে সকলেই তখনো নিদ্রাগত, সন্ধ্যা শয্যাত্যাগ ক'রে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে উপবেশন করলে। সমস্ত রাত্রিটাই নিদ্রিত অবস্থায় দুঃস্বপ্নে, এবং জাগ্রত অবস্থায় দুশ্চিন্তায় কেটেছে;—মনটা হ'য়ে রয়েছে একটা অতি বেগবান সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো স্পন্দিত। সংসারের এই গ্লানিকর অবস্থার জন্য মুখ্যতঃ যে সে-ই দায়ী এবং গৌণতঃ প্রকাশ, এ কথা তার বুঝতে বাকি নেই, এবং যৌবন-প্রবৃত্তির সহজ অনুভূতির বশে এমন সংশয়ও তার মনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে যে, সে নারী এবং প্রকাশ পুরুষ এই যোগাযোগই অবস্থাটাকে বিশেষভাবে জটিল ক'রে তুলেছে। কথাটা ভেবে এক-এক সময়ে তার হাসি পায়; মনে মনে বলে, হায় রে মানুষের ক্ষুদ্র মন! এত অকারণ পাপও তোমার মধ্যে বাস করতে পারে!

কলিকাতা যাওয়ার পূর্বে সন্ধ্যা প্রকাশকে মাঝে মাঝে অনুরোধ করত গার্লস স্কুলের একটা মাস্টারী অথবা কোনও ধনী ব্যক্তির কন্যাকে গান শেখানোর কাজ জুটিয়ে দেবার জন্যে। এবার কলিকাতা থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত একবারও সে-রকম অনুরোধ সে করেনি। সে স্থির করেছে এবার তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে, তার সঙ্গে অপর কোনো ব্যক্তিকেই জড়িত রাখবে না। কিন্তু কী যে সে ব্যবস্থা গত রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা ক'রেও তা স্থির করতে পারে নি। মাঝে মাঝে আমিনার কথা মনে হয়েছে,—বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী তাকে যে জিনিস

দেয় নি, সেই নিরতিপ্রয়োজনীয় আশ্রয় আমিনা তাকে দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হ'লেই দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে।

আশ্রয় যে কত বড় বস্তু, তা যার নেই সেই জানে! অনাহারে দেহত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সেই দেহটার অবস্থিতির জন্য এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে এক হাত ভূমি অধিকারে না থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই! আমিনা তাকে শুধু সেই আশ্রয়ই দেয় নি, মর্যাদাও দিয়েছিল; এবং সেই মর্যাদা যাতে চিরস্থায়ী হয় তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করবার প্রস্তাবও করেছিল। হায় রে! যে গৃহবধূকে এক সমাজ বিনা অপরাধে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দেয়, আর-এক সমাজ সেই হতভাগিনীকেই গৃহের বধূ করবার জন্য প্রস্তাব করে! তবে?—একটা নির্মম আক্রোশে সন্ধ্যার চিত্ত আহত বিষধর সর্পের মতো পাক খেতে লাগল।

চটি জুতার শব্দ পেয়ে সন্ধ্যা ফিরে দেখলে প্রমথ আসছে। এ কয়েকদিনের মধ্যে প্রমথর সঙ্গে তার দু-চারবার মামুলি কথা হয়েছে মাত্র, আলাপ পরিচয় বিশেষ কিছু হয়নি।

প্রমথ একেবারে সোজা সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, "তুমি যদি কিছু মনে না কর সন্ধ্যা, তা হ'লে আমি তোমার কাছে সহজভাবে একটা প্রস্তাব করি।"

প্রমথ সহসা এত নিকটে এসে বসাতেই সন্ধ্যা একটু বিস্মিত হয়েছিল, তারপর কোনপ্রকার ভূমিকা ব্যতিরেকে অকস্মাৎ এমন একটা অদ্ভুত ধরনের কথা বলায় সে আরও বিস্মিত হলো। প্রমথর প্রতি সকৌতূহল দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললে, "কী প্রস্তাব বলুন।"

প্রমথ বললে, "বলছি। কিন্তু কথাটা যখন একান্ত তোমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে, তখন বলতে গিয়ে কোনদিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় তো আমাকে ক্ষমা কোরো,—কারণ বাস্তবিকই একটা sporting spirit নিয়ে এ কথা বলতে আমি উদ্যত হয়েছি।"

প্রমথর প্রতি তেমনি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "বলুন?"

মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে প্রমথ বললে, "ঘুম ভেঙে কেউ উঠে এলে অসুবিধে হবে, তাই কথাটা সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো যে, যে কঠিন সমস্যা আর দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমার জীবন এখন চলছে তার প্রায় সব কথাই আমি জানি;—সে বিষয়ে যেটুকু শোনবার তা শুনেছি,—তারপর যতটুকু বোঝাবার তাও বুঝেছি। আমি যা জানি তাতে এই বুঝেছি যে, একমাত্র প্রকাশ দাদা ছাড়া তোমাকে আশ্রয় দেবার উপস্থিত আর কোনো লোক নেই, কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়েছে তা হয় তো তুমি নিজেও কিছু কিছু বুঝতে পারো। তোমাকে যতটা আদর-যত্ন করবার জন্যে তাঁর মন ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে তার কিছুই তিনি করতে পারছেন না, অথচ অপর দিকে বউদিদি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। বউদিদির এ মনোভাবের

কারণ কী, তুমি ঠিক তা অনুমান করতে পেরেছ কি না জানি নে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু খুলে বলি। মেয়েমানুষ সব জিনিসই ভাগ ক'রে ভোগ করতে পারে, শুধু পারে না স্বামী। অবস্থা বিশেষে হয়তো স্বামীর সমস্তটাই ছাড়তে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই খানিকটা ছাড়তে পারে না। তোমার প্রতি প্রকাশ দাদার স্নেহ দেখে সম্ভবতঃ বউদিদি মনে মনে ভয় পেয়েছেন, ভাবচেন ও শুধু স্নেহই নয়, তার চেয়েও এমন কিছু ধারালো জোরালো বস্তু যার দ্বারা তাঁর ষোল আনা পত্নীস্বত্বের খানিকটা কেটে বেরিয়ে তোমার এলাকায় গিয়ে মিলতে পারে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এ বিষয়ে বউদিদিকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। তোমার মতো এমন একটি অপরূপ পদার্থকে পাশে রেখে স্বামীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাস করতে পারে এমন মনের জোর অল্প মেয়েমানুষেরই আছে। বউদিদির তুমি মাসতুত বোন, সে জন্যে মনে কোরোনা এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হবার কথা। একটা কথা আছে জানো তো?—আন্-সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে বোন ব'লে কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য নেই। সেই জন্যে ভয় পেয়ে বউদিদি এমন একটা রুক্ষ মূর্তি ধারণ করেছেন যে সংসার থেকে আমোদ-আহ্লাদ হাসিখুশি এমন কী কথাবার্তা পর্যন্ত উবে গেছে। প্রকাশ দাদার মতো সদানন্দ প্রকৃতি লোকের পক্ষে এ অবস্থা হয়েছে জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। কিন্তু ওঁর মতো অতবড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমি তো আর একটিও দেখেচি ব'লে মনে পড়ে না, ভদ্রলোক বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় সত্যিই তিনি তাই। তাই এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাকে বলতে পারি যে, বউদিদি যদি কোনো দিন রাগ বা অভিমান ক'রে এ বাড়ি ছেড়ে চ'লেও যান তা হ'লেও প্রকাশদাদা মুখ ফুটে কোনো কথা তোমাকে বলতে পারবেন না, একবার আশ্রয় দিয়ে কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু যার মনে কিছুমাত্র আত্মসম্মানের বোধ আছে তার পক্ষে এরকম আশ্রয়ে জীবন যাপন যে কত বড় শাস্তি তা বলবার আবশ্যক করে না;—তুমি যে সেই শাস্তি প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে ভোগ করছ এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। কেমন?—যতটা বললাম মোটামুটি ঠিক কি-না?"

অবনত মস্তকে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, ঠিক।"

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমার দিকের কথা একটু বলি। আমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, এ পর্যন্ত বিয়ে করিনি কাজেই স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই। থাকবার মধ্যে আমার কী আছে জান?—প্রভূত অর্থ আছে। গর্ব করছি নে, সত্যিই যে অর্থ আমার আছে তাকে লোকে প্রভূত অর্থ-ই বলে। এই অর্থ হচ্ছে একটা মস্ত বড় শক্তি। তা ছাড়া. সমাজের কাছে কোনো দিক দিয়েই আমার কান বাঁধন নেই ব'লে সমাজকে আমি অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারি। যাবে তুমি আমার সঙ্গে? থাকবে তুমি আমার কাছে? তোমারও আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, আমারও সে আশ্রয় দেবার মতো অর্থ আর সামর্থ্য

আছে। চিরদিনের জন্যেই আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি, কোনো দিনই তা এক মুহূর্তের জন্যেও অনিশ্চিত হবে না।" একটু চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বলতে লাগল, "মনে কোরোনা আমি তোমার আছে এ প্রস্তাব করছি তোমার প্রতি কোনো মোহ অথবা আকর্ষণের বশীভূত হ'য়ে—অন্ততঃ এ পর্যন্ত তো ও-সব জিনিসের কোনো লক্ষণ টের পাই নি। এ আমি করছি নিতান্ত তোমার যে জিনিসটার প্রয়োজন হয়েচে সেই জিনিসটার যোগান দেবার লোভে,—সমাজের কষাইখানা থেকে উদ্ধার ক'রে একজন অসামাজিকের ঘরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষায়। এ আমার ভারি ভাল লাগছে।—মনে হচ্চে তা যদি করতে পারি তা হ'লে আমার টাকার সবটাই অপথে-কুপথে নষ্ট না হ'য়ে পুণ্যকাজেও লাগে। কিছু দিন আগে অমলা নামে একজন মেয়েকে কতকটা এই রকম অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভারি ধাক্কা খেয়েছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কখনো কোনো মেয়ের উপকার করতে যাব না, কিন্তু তোমার দুর্গতি দেখে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না। আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি আছ, সন্ধ্যা? যাবে আমার সঙ্গে?"

প্রমথর সুদীর্ঘ বাক্যের সমস্তটাই সন্ধ্যার কর্ণে প্রবেশ করেছিল কি-না বলা কঠিন, শেষ কালের পর পর দুইটা প্রশ্নে সহসা যেন তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে সে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, "যাব।"

নিরতিবিস্ময়ে প্রমথ বললো, "যাবে?—বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে বলছ তো?"

সন্ধ্যা এ কথার কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বললে, "তাড়াতাড়ি নেই, দুই-এক দিন ভালো ক'রে ভেবে তারপর না হয় আমাকে বোলো।"

চকিত হ'য়ে ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "না, না, ভাববার দরকার হবে না, আজই চলুন!"

উৎফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "তা বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু দেখ সন্ধ্যা, জানিয়ে যাওয়া কিছুতেই চলবে না,—তাতে শেষ পর্যন্ত যাওয়াও হবে না, অথচ মিছে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া প্রকাশদাদা ভারি একটা অসুবিধার অবস্থায় পড়বেন। রাত্রের গাড়িতে যাওয়াও সুবিধা হবে না, চাকরদের নজরে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা ছাড়া গেটে তালা দেওয়া থাকে, সে এক বিপদ। যেতে হবে দুপুরের গাড়িতে, সে সময়ে প্রকাশদাদা থাকবেন অফিসে আর বউদিদি থাকবেন ঘুমিয়ে। বাগানের একেবারে শেষের দিকে কোণে মালীদের যে ছোট গেট আছে, তুমি বেড়াতে বেড়াতে সেখানে ঠিক বেলা দুটোর সময়ে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি তখনি এসে তোমাকে তুলে নিয়ে স্টেশনে চ'লে যাব।

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ।"

"আর দেখ জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেওয়া চলবে না। পথে একটা বড়

শহরে দুই-এক দিনের জন্যে নেবে একেবারে গুছিয়ে দু'জনের মতো সমস্ত জিনিস কিনে নোবো,—তারপর পৌঁছে লিখে দিলেই হবে আমাদের জিনিসগুলো এখানকার চাকর-বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে।"

কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা চুপ ক'রে ব'সে রইল।

প্রমথ বললে, "আর একটা কথা। দু-চার কথায় প্রকাশদাদাকে একখানা চিঠি লিখে রেখে যেয়ো,—এ ব্যবস্থা যে প্রধানতঃ তাঁদের কথা ভেবেই আমরা করলাম এ কথা বুঝিয়ে দিয়ো। এ বাড়িতে তুমি থাকলে যদি কোন রকম অশান্তির উৎপত্তি না হতো, তা হ'লে আমার সঙ্গে তোমার এমন ক'রে চ'লে যাবার তো কোন প্রয়োজনই হত না। এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো। বুঝলে ?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না। প্রমথ লক্ষ্য ক'রে দেখলে সন্ধ্যার চক্ষুর মধ্যে অশ্রুর আড়ম্বর হয়েছে; তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বললে, "আমি চললাম। দোর খোলার শব্দ পেলাম, কেউ হয়তো উঠেছে,—এ দিকে আসতে পারে।" যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়ে বললে, "সময়টা ভুলো না যেন, ঠিক দুটো।"

প্রমথ চ'লে যেতেই সন্ধ্যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রুর রাশি ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়ল। তপ্ত অশ্রু—এর মধ্যে যে কত দুঃখ কত বেদনা কত গ্লানি সঞ্চিত, তা একমাত্র তার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহই জানে না। কিন্তু আজ যে নূতন ক'রে তার প্রাণে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা উদ্বেল হ'য়ে উঠল, তার হেতু কী ?—উৎপত্তি কোথায় ?—যে সমাজের শেষ সীমা আজ সে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে ব'লে মনে করছে, সে সমাজের কাছ থেকে তো নির্বাসন-পত্র কয়েকদিন পূর্বেই পেয়েছে,—সে সমাজের মধ্যে এ কয়েকদিনের বাস তো অধিকারের বাস নয়, অনুগ্রহের বাস। তবে নূতন ক'রে কী এমন বস্তু সে আজ হারাতে চলেছে যে, সব-হারানোর করুণ রাগিণীতে তার প্রাণ সহসা আকুল হ'য়ে উঠল। হায় সংস্কার! হায় মোহ! এমন নির্দয়ভাবে পদাহত হ'য়েও পদলগ্ন হ'য়ে থাকতে চাও কিসের লোভে!

পদশব্দে সন্ধ্যা দেখলে প্রকাশ আসছে। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে দুই চক্ষু ভালো ক'রে মুছে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নিকটে এসে প্রকাশ বললে, "উঠ্‌লে কেন সন্ধ্যা ? বোসো না।"

সন্ধ্যা বললে, "অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার বাড়ির ভিতর যাই।"

"প্রমথর সঙ্গে গল্প করছিলে ?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ।"

"খুব ভালো কথা। প্রমথ একজন চমৎকার গল্প-বলিয়ে। তা ছাড়া, বিশ্বের এত খবরও ওর সংগ্রহে আছে। আমি তো অফিসের কাজের জন্যে একটুও সময় পাইনে, তুমি প্রমথর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প-টল্প কোরো, তবু একটু অন্যমনস্ক

থাকতে পারবে। কিন্তু ও-ই বা আর কদিন এখানে আছে,—যে খেয়ালী মানুষ, কখন যে তল্পিতল্পা নিয়ে স'রে পড়ে তার ঠিক নেই।"

"মুখুয্যে মশাই ?"

প্রকাশ বললে, "কি ?"

"আপনি আমাকে কখনো ভুল বুঝবেন না মুখুয্যে মশায়।"

স্মিতমুখে প্রকাশ বললে, "তা হ'লে তুমিও কখনো আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা কোরো না।"

"আর, যত অপরাধই আমি করিনে কেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করতেও কখনো ভুলবেন না।"

প্রকাশ বললে, "সর্বনাশ! সে তিতিক্ষা আমার আছে নাকি সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বললে, "আছে। একমাত্র আপনারই আছে। আচ্ছা, মুখুয্যে মশায়, দেবতারা খুব বড় শুনেছি, কিন্তু তারা কি আপনার চেয়েও বড় ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রকাশ মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকট ক'রে বললে, "মাথায়, না বহরে ?"

সন্ধ্যা বললে, "সে আপনি যাই বলুন, আমার বিশ্বাস তারা আপনার চেয়ে সব দিকেই ছোট।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রকাশ বললে "ব্যাপারটা কী, বল দেখি সন্ধ্যা ? দেবতা আর মানুষ নিয়ে হঠাৎ এ রকম মাপজোক আরম্ভ করলে কেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "তা জানিনে, কিন্তু আপনি একটু দাঁড়ান মুখুয্যে মশায়, আপনার পায়ের ধুলো নিই।"

দুই পা পিছিয়ে গিয়ে প্রকাশ বললে, "হঠাৎ ?"

এগিয়ে গিয়ে নত হ'য়ে প্রকাশের পদধূলি নিয়ে সন্ধ্যা বললে, "হঠাৎ নয়। ভারি ইচ্ছে হলো নিতে, তাই নিলাম।"

"সন্ধ্যা!"

চক্ষে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে সন্ধ্যা মুখ তুলে বললে, "কী ?"

"লুকিয়ো না, আসল ব্যাপারটা কী খুলে বলো।"

সন্ধ্যা নীরবে একটু হাসলে ; তারপর বললে, "আচ্ছা, আপনি অফিস থেকে এলে ও-বেলা বলব অখন।" ব'লে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে উদ্গত অশ্রু রোধ করতে করতে বাড়ির ভিতর চ'লে গেল। যেতে যেতে মনে মনে বলতে লাগল, হে ভগবান্, তুমি আমার এইটুকু মিথ্যা বলার অপরাধ ক্ষমা কোরো—এ যদি না বলতাম তা হ'লে সমস্ত জিনিসটাই হয়তো পণ্ড হ'য়ে যেত।

একটা অনির্দিষ্ট দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন প্রকাশের মনটা অসুস্থ হ'য়ে রইল। কাজের তাড়ায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেও সেদিন একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। এসে শুনলে দুপুরবেলা থেকে সন্ধ্যার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রমথরও উদ্দেশ নেই। ব্যাপারটা বুঝে নিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হলো না, এবং

সন্ধ্যার সহিত সকালবেলাকার ব্যাপারটা যে প্রচ্ছন্ন বিদায়-অভিনয়, তাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলে। সবিতার মুখে শুনলে টেবিলের উপর একটা খামে মোড়া চিঠি চাপা আছে;—সম্ভবতঃ সন্ধ্যারই চিঠি। খুলে দেখলে তাই-ই। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত,—এই রকম।

শ্রীচরণকমলেষু,

মুখুয্যে মশায়, সকালবেলাকার কথাবার্তার পর আজই আপনার কাছে একেবারে দু-দুটো অপরাধ করলাম। সকালবেলা যখন ব'লেছিলাম সন্ধ্যা-বেলা আপনাকে আসল কথা বলব, তখন এই চিঠিটার কথা ভেবেই 'ইতি গজ'র মিথ্যা কথা বলেছিলাম। সেই প্রথম অপরাধ, আর এই না জানিয়ে প্রমথবাবুর আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়া দ্বিতীয়। আমি জানি আপনি আমার এ দুটো অপরাধই ক্ষমা করবেন।

কেন আপনার আশ্রয় ত্যাগ করলাম, তা আপনার মতো বুদ্ধিমান আর হৃদয়বান লোককে বেশি বুঝিয়ে বলতে হবে না। আত্মহত্যাও তো করতে পারতাম, তা না ক'রে আত্মার হত্যা করলাম। এ একটা দুর্ঘটনা, যা যে-কোনো মেয়েমানুষের জীবনে ঘটতে পারে। বাঙলা দেশের শত সহস্র দুর্ভাগিনী মেয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে গেলাম। আপনি আশীর্বাদ করুন এই পথের চরম দুর্গতি থেকে আমি যেন রক্ষা পাই।

আপনি আমার জীবনে যে কত বড় হ'য়ে রইলেন, তা বড় ক'রে বলতে গিয়ে ছোট ক'রতে চাইনে। আপনার কথা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আর মনে থাকবে আমিনার কথা, সে-ও আমার পূর্বজন্মে আপনার জন ছিল।

চললাম মুখুয্যে মশায়, অভাগিনী সন্ধ্যাকে ক্ষমা করবেন। সমস্ত মনটা একটা গভীর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ-ও আবার হয়! আমারই জীবনে এ ও আবার হলো! উৎকট বিস্ময়ের মধ্যে আর সব অনুভূতি ডুবে গেছে। রাগ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই! কিন্তু এ আপনাকে ব'লে গেলাম, মুখুয্যে মশায়, সত্যিই আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি, যাতে সমাজের কাছ থেকে আমার এত বড় দণ্ডটা পাওয়া উচিত হলো।

মনের অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল, সব কথা ভালো ক'রে গুছিয়ে লিখতে পারছিনে, তাই এইখানেই শেষ করলাম।

সবিদিদিকে বলবেন, আমার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন, আপনিও জানবেন। ইতি—

আপনার অভাগিনী ছোট বোন

সন্ধ্যা

চিঠি শেষ ক'রে প্রকাশ চক্ষু মার্জনা করলে, তারপর সন্ধ্যার মঙ্গলের জন্যে মনে মনে এমন আকুলভাবে প্রার্থনা করলে যেমন সচরাচর কেউ কারুর জন্যে করে না।

উনিশ

টাটানগর স্টেশনে পৌঁছে লেডিস্ ওয়েটিং-রুমের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রমথ বললে, "সন্ধ্যা, ভিতরে গিয়ে একটু বোসো, গাড়ি এলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব অখন। আমি কাছেই আছি, ভয় নেই।"

ওয়েটিং-রুমের ভিতর সন্ধ্যা প্রবেশ করলে প্রমথ বুকিং অফিসে উপস্থিত হ'য়ে দু'জন কুলিকে দিয়ে সগুক্রীত সুটকেস, দুটো স্বতন্ত্র হোল্ডলে বাঁধা বিছানা এবং অপরাপর খুচরা দু'-একটা জিনিস নিয়ে লেডিস ওয়েটিংরুমের সম্মুখে উপস্থিত হলো। প্রথমে সে মনে করেছিল, পথে কোনো বড় শহরে এক-আধ দিনের জন্য নেমে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি কিনে নেবে, কিন্তু সর্বদা-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির অভাবে পথেও অসুবিধা ভোগের সম্ভাবনা আছে, তা ছাড়া, যুবতী স্ত্রীলোক সহ নিতান্ত এক-বস্ত্রে রেল-ভ্রমণ সাধারণের চক্ষে একটু বিসদৃশ ঠেকতে পারে মনে ক'রে সে জামশেদপুর থেকেই কতক জিনিস-পত্র কিনে নিয়েছিল। তারপর স্টেশনে এসে টিকিট কিনে, বুকিং অফিসে জিনিসগুলো একজন পরিচিত কর্মচারীর জিম্মায় রেখে সে পরামর্শ অনুযায়ী যথাসময়ে সন্ধ্যাকে আনবার জন্য প্রকাশের গৃহের কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

গাড়ি এলে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল। সে কামরায় অপর কোনো যাত্রী ছিল না। সাধারণতঃ প্রমথ দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করে, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সন্ধ্যার মতো অমন একটি সুদুর্লভ মেয়ের আধিপত্য লাভ করার অপরিসীম আনন্দে মনটা এমনই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ছিল যে, রেল-ভ্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা এবং আরাম দিয়ে তাকে অভ্যর্থিত এবং সম্মানিত করবার জন্য সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছিল।

স্ত্রীলোক নিয়ে ঘটনা প্রমথর অভিজ্ঞতায় এ নূতন নয়,—নীতিবোধের শৈথিল্য এবং অর্থের প্রাচুর্য, এই দুই কারণের সংযুক্ত ক্রিয়ায় তার নারী-পরিশীলনের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য যথেষ্ট—কিন্তু তাই ব'লে আজকের এ ঘটনার তুলনায় সে সকলই তুচ্ছ, হেয়। এর অপরূপত্ব, এর আভিজাত্য, এরূপ যে, যে-অংশ এর মলিন সেখানেও একে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না,—প্রজ্বলিত কয়লার মতো তাও উত্তপ্ত দীপ্তিশীল।

কিন্তু সে জন্য প্রমথর মনে ক্ষোভ ছিল না। বরঞ্চ আজকের দিনের এই সম্পূর্ণ নূতন আস্বাদ নূতন উদ্দীপনার আনন্দে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সন্ধ্যার প্রতি কৃতজ্ঞতাই ক্ষরিত হচ্ছিল। যে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ লাভ ক'রে তার মনের একটা দিক নূতন চেতনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে, তার জন্য সে ঋণী একমাত্র সন্ধ্যার অসামান্যত্বের কাছে, তার রূপসম্ভারের অপরূপত্বের কাছে, তার অচপল মনের দুরভিগম্যতার কাছে। এই সকলেরই দ্বারা নিষিক্ত নূতন এক রসায়নের ক্রিয়ায় প্রমথর মনে সুচিরসুপ্ত নীতিবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে, তার ভদ্র মন সাড়া

দিয়েছে। মনে হলো, যে নিরুপায় বিহঙ্গ অবস্থা-বিপর্যয়ে আজ তার পিঞ্জরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অপরিহার্য। প্রমথর জীবনে এ এক নূতন অনুভূতি। সংসারপথযাত্রায় সন্ধ্যার একান্ত নিরুপায়তার কথা স্মরণ ক'রে তার চক্ষু সজল হ'য়ে এল।

গাড়ি তখন টাটানগর স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্‌ সিগ্‌নাল ছাড়িয়ে ছুটে চলেছিল, প্রমথ চেয়ে দেখলে সন্ধ্যা পিছন ফিরে বাহিরের চলমান দৃশ্যরাজির দিকে তাকিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে।

প্রমথ ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা একটু ফিরে ব'সে জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

"আমরা কোথায় চলেছি, তার তুমি নিশ্চয় কিছু জান না?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "না।"

"কোন দিকে চলেছি,—কলকাতার দিকে, না কলকাতার বিপরীত দিকে, তাও বোধ হয় বুঝতে পারছ না?"

সন্ধ্যা বললে, "কলকাতার বিপরীত দিকে।"

"এটা ঠিক বুঝেছ। চলেছি আমরা আপাততঃ বিলাসপুরে। বিলাসপুরের টিকেট কিনেছি। সেখানে কাল ভোর পাঁচটায় পৌঁছব, তারপর তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হয় সোজা লক্ষ্ণৌ যাব, নয় কয়েকদিনের জন্য কাশী বাস ক'রে তারপর লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ যেতে তোমার আপত্তি কিংবা অনিচ্ছা নেই তো সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"কাশী যেতে?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি যেখানেই আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি বিনা আপত্তিতে যাব।"

গভীর ব্যগ্র কণ্ঠে প্রমথ বললে, "শুধু বিনা আপত্তিতে গেলে চল্‌বে না তো সন্ধ্যা, বিনা অনিচ্ছায় যাওয়া চাই।"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর যখন হাত নেই তখন সে কথা না ভাবাই ভালো। ইচ্ছা না হওয়াও তো অসম্ভব নয়।"

প্রমথ বললে, "না, একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে বিষয়ে আমার এই মাত্র বলবার আছে যে, অনিচ্ছার সঙ্গে কোনো জায়গায় যেতেই তোমার বাধ্যতা নেই। আমরা বিলাসপুরের দিকে চলেছি, তাতে যদি তোমার অনিচ্ছা থাকে তো বলো পরের স্টেশনে নেমে প'ড়ে ফিরতি ট্রেণে যে দিকে তোমার ইচ্ছে সেই দিকেই ফিরে যাই। যদি তা-ই তোমার ইচ্ছা হয় তো বল, আবার না-হয় জামশেদপুরে প্রকাশ দাদার বাড়িতেই গিয়ে উঠি। যতদিন না তুমি আমাকে তোমার আত্মীয় ব'লে মনে করতে পারছ ততদিন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পা অগ্রসর হবার অধিকার আমার নেই।

সন্ধ্যা জানলার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। এ কথার উত্তরে কী যে সে বলবে তা কিছুই ভেবে পেলে না। তা ছাড়া, এই যে বিশেষ একটা মুহূর্তের উন্মাদনায় সহসা একজন অপরিচিত-প্রায় পুরুষের সঙ্গে প্রকাশের গৃহ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসা—এর অচিন্ত্যনীয়তায় তার মন এমন আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল যে, সব কথার ভালো-মন্দ বিচার ক'রে দেখবার শক্তি সে যেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না। সমাজের পরীক্ষাপাত্রে একে ঢেলে দেখলে এ সেই বহুনিন্দিত কুলত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু মহামানবতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে দেখলে সেই কূলের সীমান্ত-রেখা কোন অকূলে যে স'রে গিয়ে দাঁড়ায় তা চোখে দেখা যায় না; সেই দিগন্তাতীত পরিবেশের মধ্যে প্রমথ তার অনাত্মীয় নয়, প্রমথ তার আপন; তার দুঃখ বিপত্তির সমবেদনায় প্রমথর চিত্ত বিগলিত হয়েছে, প্রমথ তাকে হীনতার চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছে,—এ উদ্ধার করার মধ্যে জোর-জবরদস্তি ছিল না, সহৃদয়তার সহজ প্রেরণায় প্রমথ আশ্রয়দানের প্রস্তাব তুলেছিল, সন্ধ্যা স্বেচ্ছায় সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তবু থেকে থেকে প্রমথর প্রতি মন যেন তিক্ত হ'য়ে ওঠে;—মনে হয়, একদিন মহবুবও তার বীভৎস অত্যাচারের মধ্যে যা করতে পারেনি, আজ প্রমথ তার এই সদয় উপচিকীর্ষার দ্বারা তাই করলে,—তার ভবিষ্যতের যা-কিছু সত্তা, যা কিছু সম্ভাবনা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ধুয়ে মুছে দিলে। কিন্তু কী যে এই সত্তা, এই সম্ভাবনা, নিঃসত্ব নিষ্প্রাণ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তার কিছুই অনুমান করা যায় না, তবু মনে হয়—মহবুব ছিল ব্যাধি, কিন্তু প্রমথ মৃত্যু।

"সন্ধ্যা!"

প্রমথর আহ্বানে সন্ধ্যা তার চিন্তার তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হ'য়ে ভালো ক'রে ফিরে ব'সে বললে, "বলুন।"

প্রমথ বললে, "তোমাকে দেখে মনে হচ্চে, তুমি বেশ একটু চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছ—নিজের অবস্থায় ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারছ না। প্রথমটা এরকম অবস্থা হবারই কথা, এর জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিতে পারিনে। কিন্তু শুধু আমার মুখের কথা ছাড়া আর কোনও রকমে তুমি যদি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক চোখে দেখতে পেতে তা হ'লে বোধ হয় তোমার উদ্বেগের বিশেষ কারণ থাকত না। একটা কথা তুমি সব সময়ে মনে রেখো সন্ধ্যা, তুমি আমার আশ্রয়ে আছ, কিন্তু তাই ব'লে তুমি আমার আশ্রিতা নও। কেন নও, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করলে।

প্রমথ বলতে লাগল, "কেন নও তা বলছি, শোন। আজ সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল, তখন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা ছিল ব'লে আমি স্বীকার করিনে; টেনে-বুনে যেটুকু সম্পর্ক স্থির করা গেছল, তার

কোনো অর্থ, কোনো মূল্য নেই। সে কেবল ভদ্রতার পাতানো সম্পর্ক। কিন্তু তারপর আমি যখন তোমার কাছে উপস্থিত হ'য়ে আমার আশ্রয়ে তোমাকে গ্রহণ করবার অধিকার প্রার্থনা করলাম, তুমিও আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে এবং সেই মতো প্রকাশ দাদার বাড়ি পরিত্যাগ ক'রে আমাকে অনুসরণ করলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার পরমাত্মীয়তা স্থাপিত হলো। তোমাদের সমাজে চলিত কোনো আত্মীয়তার চেয়ে আমাদের এ আত্মীয়তা কম মূল্যবান বা কম পবিত্র ব'লে আমি মনে করিনে। তুমি এলে আমার জীবনে অতিথি হ'য়ে, তুমি হ'লে আমার চিরদিনের জীবনসঙ্গিনী।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল এবং তার আকৃতির মধ্যে একটা সুপরিস্ফুট উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা দিলে।

সন্ধ্যার মনের অবস্থা সঠিক উপলব্ধি ক'রে প্রমথ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "তুমি অকারণ লজ্জিত হয়ো না সন্ধ্যা। তোমাকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে আমি কোনো কাব্য-কথা বলিনি। ও জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে সয় না। যাতে তুমি আমার কাছে সহজ হ'তে পার, স্বচ্ছন্দ হ'তে পার, যাতে আমার সঙ্গে তোমার যথার্থ সম্পর্ক জানতে পেরে তোমার মনে কোনো রকম কুণ্ঠা না থাকে, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার মনের অকপট কথা তোমাকে জানিয়েছি। জীবনসঙ্গিনী কথা শুনে তুমি চমকে উঠো না; ও কথার কোনো কদর্থ আছে ব'লে আমার ধারণা নেই। তা ছাড়া, স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো স্ত্রীলোকের জীবনসঙ্গিনী হবার অধিকার নেই, এ কথাও আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি যদি আজীবন আমার সঙ্গে বাস কর, তা হ'লে তোমাকে জীবনসঙ্গিনী ছাড়া আর কী বোলবো বলো?"

শব্দের সহজ অর্থ অনুসরণ করলে, এ কথায় আপত্তি করা চলে না, কিন্তু তথাপি কথাটা কানে কটু হ'য়েই বাজে। কিন্তু উপায় কী! যে কথার সুলভ যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে পরাস্ত হ'তে হবে সে কথার অনতিবর্তনীয় গ্লানিকে পরিপাক ক'রে সন্ধ্যা আহত মনে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

প্রমথ বলতে লাগল, "আমার সম্বন্ধে তুমি কতদূর কী শুনেছ তা জানিনে, কিন্তু আজ থেকে যার সঙ্গে তোমার জীবন জড়িত হ'ল সে কী প্রকৃতির মানুষ তা জানবার আগ্রহ এবং প্রয়োজন তোমার হ'তে পারে। সাধু প্রকৃতির লোক ব'লে আমি এক মুহূর্তের জন্যে দাবী করিনে, তবে একেবারে প্রথম নম্বরের দুর্বৃত্ত বললেও আপত্তি করব। আমাকে চরিত্রবান বললে গালি দেওয়া হবে, চরিত্রহীনই আমি নিশ্চয়,—কিন্তু তাই ব'লে দুশ্চরিত্রও নই। চরিত্রহীন, অথচ দুশ্চরিত্র নই, এর কী অর্থ তা হয়তো তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না,—কিন্তু আমার চরিত্রের এই খবরটুকু জানা আছে ব'লেই বোধ হয় প্রকাশদাদাদের বাড়ির মতো আরও পাঁচ সাত বাড়িতে আমার অবাধ প্রবেশ আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, সাধু-পুরুষ না হ'লেও আমার মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমার উপকারে

লাগবে। ছলে বলে অথবা কৌশলে আমি যখন তোমাকে আয়ত্ত করিনি সন্ধ্যা, তখন তুমি আমার কাছে অনেকটা নিরাপদ, এ আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি।”

আশ্বাসের পাশে পাশে যেন আশঙ্কা ওৎ পেতে ব'সে আছে, নল-খাগড়া বেড়ার অপর দিকে যেন বাঘের খস্‌-খসানি—কখন যে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে আসে তার স্থিরতা নেই!

মনের এই অকারণ দুর্বলতায় সন্ধ্যার হাসিও পায়। কী-ই বা তার অবশিষ্ট আছে যার জন্যে এই উৎকণ্ঠা, এই ভয়। মান গেছে, ইজ্জৎ গেছে, সমাজ সংসার কুল গেছে। আছে তো শুধু অস্থি রক্ত মাংসের জড়বস্তু এই দেহটা। তবে তার জন্যে এত আশঙ্কা কিসের? দিলেই তো হয় তাকে যে কোনো মুহূর্তে শেষ ক'রে। দোর খুলে এই চলন্ত গাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেই তো অভীষ্ট সিদ্ধি!—তবে?

চক্রধরপুর থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল তখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে। স্তব্ধ ভাবে জানালার ধারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা তার আলোড়িত কেন্দ্রচ্যুত মনকে কেন্দ্রস্থ করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময়ে প্রমথ ডাক দিলে।

প্রমথ বললে, “সন্ধ্যা, ছোট সুটকেসটা আমার, আর বড়টা তোমার। উপস্থিত ব্যবহারের জন্যে কিছু-কিছু জিনিস-পত্র জামশেদপুর থেকেই কিনে নিয়েছি। তোমার সুটকেস থেকে কাপড়-চোপড় সাবান-টাবান বার ক'রে নিয়ে বাথ্‌রুমে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এস। এই নাও তোমার চাবি।” ব'লে উঠে গিয়ে সন্ধ্যার পাশে চাবিটা রেখে এল।

আরক্তমুখে ভগ্নকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, এখন থাক, পরে নোবো অখন।”

“আবার পরে কখন? সেই সকালে তো দুটি ভাত খেয়েছ, ক্ষিদে পায় নি?”

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, “না।”

“না?—মেয়েদের কখনোই ক্ষিদে পায় না। কিন্তু আমি তো একজন পুরুষ-মানুষ,—আমার ক্ষিদে পেতে তো বাধা নেই?”

প্রমথর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, “বেশ তো, আপনি খান।” তারপর দৈব কর্তৃক সহসাগঠিত তাদের এই বিচিত্র সংসারকে একেবারে অস্বীকার না করলে তার যা কর্তব্য তা স্মরণ ক'রে বললে, “ওই ঝোড়াটায় বোধহয় খাবার আছে,—বার ক'রে দোবো?”

“নিশ্চয়ই দেবে,—কিন্তু তার আগে বাথ্‌রুম থেকে হ'য়ে এসে। কাপড়-চোপড় না বদলে কি খাবারে হাত দিতে আছে?”

এ সকল কথার পর আর আপত্তি করা চলে না,—অগত্যা সন্ধ্যা সুটকেস খুলে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বার ক'রে নিলে। মূল্যবান সৌখীন দ্রব্যে সুটকেস ভরা।

বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা দেখলে ইত্যবসরে প্রমথ দুই দিকের দুইটি বেঞ্চে শয্যা রচনা ক'রে রেখেছে। অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, “আপনি কেন বিছানা পাতলেন?”

প্রমথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ; বললে, "আর এ সব ব্যাপারে আপত্তি করলে চলবে না, এখন আমার পরিচর্যা তুমি করবে, তোমার পরিচর্যা আমি করব। এখনি তোমাকে আমাদের দু'জনের খাবার প্রস্তুত করতে হবে। ঐ বোড়ায় ফল, মিষ্টি, রুটি, মাখন, প্লেট, ছুরি—সবই আছে। দু' প্লেট খাবার প্রস্তুত ক'রে রাখ। আমি বাথ্‌রুমে চললাম।"

খাবার প্রস্তুত করতে ব'সে সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু ভ'রে এল। কার সংসার কে করে! অদৃষ্টে এতও লেখা ছিল!

প্রমথ বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে এলে সন্ধ্যা তার সম্মুখে এক প্লেট খাবার রাখলে। প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "আছে।"

খাবারের পালা শেষ হ'লে অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা তার শয্যায় শুয়ে পড়ল।

প্রমথ বললে, "এরই মধ্যে শুলে সন্ধ্যা ? এখনো আটটা বাজে নি।"

সন্ধ্যা বললে, "মাথাটা একটু ধরেছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রমথ বললে, "তাই না কি ? তা হ'লে আর কথা নেই, শুয়ে পড়।"

প্রমথ বাতিগুলো সব নিভিয়ে দিলে। তারপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থেকে সে-ও শুয়ে পড়ল। অন্ধকার কক্ষের দুইটি বিভিন্ন চিন্তামথিত যাত্রী নিয়ে রেলগাড়ি সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে চলল।

গভীর রাত্রে বৃষ্টি এসে একটা কন্‌কনানির সৃষ্টি করলে। সন্ধ্যা বুঝতে পারলে প্রমথ সন্তর্পণে তার গায়ে একটা বস্ত্র ঢেকে দিচ্ছে। একটা অনির্ণেয় ঘৃণা এবং বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রী রী ক'রে উঠল।

কুড়ি

শেষ রাত্রির দিকে সহসা সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। তিমিরাবৃত জনহীন প্রান্তর ভেদ ক'রে গাড়ি হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে রেলপথের অতি নিকটবর্তী গাছ-পালার কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে শট্‌ শট্‌ ক'রে পেছিয়ে যাচ্ছে। আকাশে একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং সমস্ত আকাশ নিশ্চয়ই এখনও মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

ঘরের ভিতরকার আলো নেভানো,—ল্যাভেটরীর বাতি জ্বলছে, ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে তার নিষ্প্রভ রশ্মি এসে কক্ষটিকে নির্ভেদ্য অন্ধকারের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। সেই স্তিমিত আলোকে দেখা যাচ্ছে অপর বেঞ্চে প্রমথ শয়ন ক'রে আছে ; নিদ্রিত কি জাগ্রত তা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তার নিশ্চল নীরব দেহ দেখে অনুমান হয় নিদ্রিতই।

প্রমথর গাত্রবস্ত্র তখনও তার গাত্রে আচ্ছাদিত রয়েছে মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা

ক্ষিপ্রবেগে সেটাকে টেনে নিয়ে মাথার শিয়রে একটা কোণে গুঁজে রেখে দিলে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'লো কী হবে তুচ্ছ একটা গাত্রবস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ক'রে, দেহ যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করছে এবং পাকস্থলীতে যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত খাদ্য জীর্ণ হচ্ছে! প্রমথর গাত্রবস্ত্র তো সহজেই টেনে ফেলে দেওয়া যায়; কিন্তু এই যে প্রমথর প্রসাদ-সঞ্জাত পরিবেশ যার মধ্যে সে তারই অন্নে-বস্ত্রে জীবন যাপন করছে, তাকে তো সহসা টেনে ফেলে দেবার উপায় নেই! এ অবস্থাকে সে স্বয়ং স্বীকার ক'রে নিয়েছে, গৃহস্থ গৃহের শেষ সীমান্ত রেখা অতিক্রম ক'রে সে স্বেচ্ছায় এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানে তার প্রমথর সঙ্গে যোগ!

সন্ধ্যা অপাঙ্গে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। তার অস্পষ্ট দীর্ঘ-বিসারিত দেহ দেখে মনে হ'লো যেন কোনো দৈত্য কার্যসিদ্ধির পর অপহৃতা বন্দিনীকে পাশে শুইয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছে। নদ-নদী পার হ'য়ে মাঠ-ঘাট কানন-কান্তার পশ্চাতে ফেলে দ্রুতগামী রেলগাড়ি কোন্ সুদূরে কত দিনের জন্য তাকে রেখে আসতে ছুটে চলেছে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই! সহসা মনে পড়ল পঞ্চবটী-নিবাসিনী জানকীর কথা। তাঁকেও একদিন লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ ক'রে রথে নিয়ে এমনি ক'রে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র জানকীকে উদ্ধার ক'রেছিলেন। কিন্তু তাকে উদ্ধার কে করবে? উদ্ধার তো দূরের কথা তার রামচন্দ্র গ্রহণ করতেও জানেন না, বোঝেন শুধু বর্জন করার যুক্তি! তারই ফলে সে এখন আর কন্যা নয়, বধূ নয়, পুরস্ত্রী নয়,—সে এখন যূথভ্রষ্টা বিপথগামিনী—হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে কোন এক লঙ্কাপুরীর কক্ষে প্রমথর চিরজীবনের রক্ষিতা!

দুঃখে, নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে সন্ধ্যার সমস্ত দেহ বিমথিত ক'রে মর্মান্তিক বেদনা জাগ্রত হ'লো। শয্যার উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগল যতক্ষণ না নিদ্রা এসে তাকে পুনরায় অচেতন ক'রে দিলে।

প্রমথর যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশে প্রত্যূষের আলো দেখা দিয়েছে। সেই অনুগ্র স্নিগ্ধ আলোকে প্রথমেই চোখে পড়ল নিদ্রিতা সন্ধ্যার নিমীলিতনেত্র মুখ; ঘুমের ঘোরে কোনো-এক সময়ে সে প্রমথর দিকে পাশ ফিরে শয়ন ক'রেছে। নিদ্রাজড়িত চক্ষে সন্ধ্যার মুখের অনির্বচনীয় সুষমা নিরীক্ষণ ক'রে প্রমথর বিস্ময়ের সীমা রইল না।—আশ্চর্য! এত সুন্দরও স্ত্রীলোকের মুখ হয়! সন্ধ্যার ঈষৎ-হিল্লোলিত দেহখানি দেখে মনে হ'লো যেন একটি সদ্য-ছিন্ন পুষ্পবল্লরী শয্যার উপর প'ড়ে রয়েছে! শাড়ির কালো পাড় অতিক্রম ক'রে আগু-পিছু রক্ষিত উন্মুক্ত দু'খানি পা দেখে প্রমথ মনে মনে বললে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের পা'কে কেন যে পাদপদ্ম বলে আজ তা স্পষ্ট বোঝা গেল! নিজেকে অসীম ভাগ্যবান ব'লে মনে হলো। এই অপরূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার তার প্রতিক্ষণের অধিকারের

বস্তু হ'লো। এই রজনীগন্ধারূপিণী বালিকার সহিত সে একত্রে নিশা যাপন ক'রেছে! সুপ্রভাত!

পুলকিত চিত্তে প্রমথ উৎসাহভরে শয্যা ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর দক্ষিণে বামে ভালো-রকম দুটো আড়া-মোড়া ভেঙে জামার পকেট থেকে সিগার-কেস ও দেশলাই বার ক'রে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বেঞ্চের প্রান্তে যুৎ ক'রে পা মুড়ে বসল। তারপর সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিঃশব্দ মৃদু মৃদু টানে চুরুটটি উপভোগ করতে প্রবৃত্ত হ'লো। দেখতে দেখতে, এবং সম্ভবতঃ ভাবতে ভাবতে সহসা কোন্ এক মুহূর্তে প্রমথ ভিতরে ভিতরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল, টানার অভাবে মুখের চুরুট মুখের মধ্যেই নিভে গেল, মনে হ'লো চিত্তের একটা নবোন্মুক্ত পথ দিয়ে এমন একটা অনুভূতি প্রবেশ করছে যা ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভব করে নি। দুঃখে, করুণায়, সমবেদনায় চোখের পাতা ভিজে এল; মনে মনে সন্ধ্যার প্রতি যে ভাব ব্যক্ত করলে ভাষায় তা প্রকাশ করলে বলা যেতে পারত, ওরে আমার ঝড়-খাওয়া পাখী, এসেছ যখন আমার পিঞ্জরে, নির্ভয়ে অবস্থান কর। ভয় নেই, ভয় নেই!

নিভে যাওয়া চুরুটটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে; আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আপন মনে মৃদুস্বরে বললে, সত্যই সুপ্রভাত! তারপর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে সন্তর্পণে ল্যাভেটরীতে প্রবেশ করলে।

ল্যাভেটরী থেকে বেরিয়ে এসে প্রমথ দেখলে তখনো সন্ধ্যা নিদ্রা যাচ্ছে; নিকটে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ডাকলে, "উষা, উষা!"

কানে শব্দ যেতেই সন্ধ্যা চোখ মেলে দেখলে পূর্বেকার অন্ধকার কক্ষ কখন আলোকে ভ'রে গেছে; ধড়্‌মড়্ ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ মুখে স্খলিত কণ্ঠে বললে, "কিছু বলছেন?"

নিকটেই সুটকেস দুটো উপর-নিচে রাখা ছিল, তার উপর ব'সে প'ড়ে স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "বলছি, সন্ধ্যা নামের পরিবর্তে আজ তোমার নূতন নামকরণ করলাম—উষা।"

প্রমথর এই অদ্ভুত প্রস্তাবে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'য়ে বিমূঢ়ভাবে সন্ধ্যা প্রশ্ন করলে, "কেন?"

প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "তা হ'লেই বিপদে ফেললে দেখছি! কেন বলতে হ'লে হয়তো এমন কথাও বলতে হবে জীবনে যেমন কোনদিন বলিনি। সরস সৌখীন পোষাকী কথা আমি দু'-চক্ষে দেখতে পারি নে। ধর এমন কথাই যদি বলি যে, 'আজ উষাকালে তোমাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, আমার জীবনেও আজ এক নতুন উষার উদয় হ'লো, সুতরাং তুমি আমার পক্ষে সন্ধ্যা নও, উষা, তা হ'লে লজ্জায় আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। আসলে হয়তো কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়,—কিন্তু সব সত্যি কথাই কি মুখ দিয়ে বলা যায়? এই ধর, তোমার হয়তো উপস্থিত মনের অবস্থা এ-রকম যে, সুবিধে

পেলেই আমাকে গাড়ি থেকে নিচে ঠেলে ফেলে দিতে পার, কিন্তু তাই ব'লে তো আর সে কথা খুলে বলতে পারছ না।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা একবার তার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ নত করলে। আরক্ত মুখে অতি ক্ষীণ যে হাস্যটুকু স্ফুরিত হ'লো, তার যথার্থ অর্থ করা কঠিন।

প্রমথ হো হো ক'রে হেসে উঠল; বললে, "রাগ কোরো না, উদাহরণ দিয়েছি, 'হয়তো' বলেছি। 'হয়তো'র মধ্যে 'হয়তো না'-ও আছে; কাজেই না-ও ঠেলে ফেলে দিতে পার।"

এবার সন্ধ্যার মুখে যে হাসি দেখা দিলে তা তত দুর্বোধ্য নয়। তার মধ্যে কৌতুকের স্পষ্ট আভা লক্ষ্য ক'রে প্রমথ খুশি হ'লো; বললে, "ও সব বাজে কথা যাক, উষা নামে তোমার কোনো আপত্তি আছে কি-না বল?"

প্রথমটা সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর মৃদুস্বরে বললে, "কোনো সুনামই আর যার নেই, কোনো নামেই তার আপত্তি থাকতে পারে না। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, উষা ব'লেই আমাকে ডাকবেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল মুখে প্রমথ বললে, "সুনাম-দুর্নামের তর্ক অন্য কোনও সময়ে হবে, এখন তার সময় নেই। আপাততঃ তুমি যে আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করলে এর জন্যে ধন্যবাদ দিই। আজ হ'তে যতদিন তুমি আমার কাছে থাকবে ততদিন তুমি আমার উষা। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনও দিন যদি তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হবার কারণ ঘটে,—ধর, কোনও শুভদিনে যদি আবার তোমার শ্বশুর বাড়ি কিংবা বাপের বাড়ি ফিরে যাবার সৌভাগ্য হয়—তা হ'লে সেদিন থেকে আবার তুমি আমার সন্ধ্যা হবে। কেমন?—এ বেশ ভালো ব্যবস্থা নয়?"

সন্ধ্যা এ কথার কোনও উত্তর দিলে না—নতমুখে ব'সে রইল।

প্রমথ বললে, "বিলাসপুর পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। বাথরুম থেকে চট্ ক'রে হ'য়ে এস। গাড়িতে জল-টলের ব্যবস্থা তবু ভালো আছে, অধ্রুব বিলাসপুরের উপর নির্ভর ক'রে কাজ নেই।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে শয্যা উত্তোলন করতে উদ্যত হ'লো। প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "ও কাজটা আমার এলাকার ভেতরে। আমি বাঁধা-ছাঁদাগুলো সেরে রাখি, তুমি ততক্ষণে বাথরুম থেকে হ'য়ে এস। আমার বাথরুম যাওয়া হ'য়ে গেছে।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি না হয় আমার বিছানাটা তুলে দিয়েযাই।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বললে, "না, সে ভালো দেখাবে না, লোকে বলবে শুধু আপনারটাই বোঝে; তুলতে হ'লে দুটো বিছানাই তুলতে হয়। কিন্তু বিছানা হোল্ডলে পোরা তোমার কর্ম নয়, ও কাজে পৌরুষের দরকার।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে না হয় শুধু গুটিয়ে দিয়ে যাই ?"

মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "তাও না। অতিথি-সেবার আনন্দের পুরোপুরিটাই ভোগ করতে দাও। জান তো অতিথি পুরুষমানুষ হ'লে নারায়ণ, আর স্ত্রীলোক হ'লে লক্ষ্মী। সুতরাং আর তর্কাতর্কি না ক'রে লক্ষ্মীটির মতো ল্যাভেটরীতে ঢুকে পড়।"

এ কথার পর ল্যাভেটরীতে প্রবেশ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রইল না। বিলাসপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, প্রমথ একবার মনে করলে সেইখানেই কুলীদের দিয়ে বিছানা-পত্র বাঁধিয়ে নেবে, কিন্তু মনের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এত বেশি সঞ্চিত হয়েছিল যে তার তাড়নায় নিজেই উদ্যমের সহিত লেগে গেল; তা ছাড়া, সন্ধ্যার কাছে সদ্য-প্রকাশিত পৌরুষের গর্ব ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়েও বোধ হয় আগ্রহ কম ছিল না।

ল্যাভেটরী থেকে সন্ধ্যা নিষ্ক্রান্ত হ'লে প্রমথ বললে, "বিলাসপুর তো পৌঁছলাম উষা, এখন কোথাকার টিকিট করব বল,—কাশীর, না লক্ষ্ণৌর ?"

একটু ইতস্ততঃ ভাবে প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কাশীরই না হয় করুন।"

প্রফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "বেশ কথা, আমারও তাই ইচ্ছে। কাশী আমরা এর চেয়ে অনেক সোজা পথে যেতে পারতাম। ইচ্ছে ক'রেই এই ঘোরা পথে যাচ্ছি। কাল বেলা সাড়ে দশটার সময়ে আমরা কাশী পৌঁছব, তার আগে পথে পথে এ দু'রাত্রের ঘরকন্না বোধ হয় নিতান্ত মন্দ হবে না।"

প্রমথর গৃহে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা প্রথমে যে স্বজনহীন কারাগৃহের নির্মমতার মতো একটা রূঢ় আঘাত পাবে, এ কথা অনুমান ক'রেই প্রমথ এই দীর্ঘ বিসর্পী পথ অবলম্বন করেছিল। পাখীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করবার পূর্বে গাছের শাখায় বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যদি তদবসরে কতকটা পোষ মানিয়ে নিতে পারে।

বিলাসপুরে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। আকাশ মেঘহীন হ'য়ে গেছে, বায়ু সুশীতল, এবং রাত্রে বৃষ্টিপাতের ফলে বৃক্ষলতা তখনও আর্দ্র।

প্রমথ বললে, উষা, ওয়েটিং রুমে যাবে, না বাইরে বেঞ্চিতে বসবে ? টিকিট কিনে আর চা-পানের ব্যবস্থা ক'রে আমরা গাড়িতে গিয়ে বসব। গাড়ি প্ল্যাটফর্মের কাছেই লেগে আছে।"

বাহিরের স্নিগ্ধতা পরিত্যাগ ক'রে ওয়েটিং রুমের আবদ্ধতার ভিতরে যেতে সন্ধ্যার প্রবৃত্তি হ'লো না; বললে, "বাইরেই বসব।"

প্ল্যাট্‌ফর্মের অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে একটা বেঞ্চে সন্ধ্যাকে বসিয়ে এবং অদূরে কুলীর জিম্মায় জিনিস-পত্র রেখে প্রমথ বুকিং অফিসে উপস্থিত হ'য়ে টিকিট করলে, তারপর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে চা ও খাবার প্রস্তুত ক'রে কাটনিগামী গাড়ির প্রথম শ্রেণীতে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার নিকট ফিরে চলল। দূর থেকে দেখলে বেঞ্চে সন্ধ্যার বাম পাশে একজন প্রৌঢ়া মহিলা ব'সে আছেন, মনে

হ'লো তাঁর দক্ষিণ বাহু যেন সন্ধ্যার স্কন্ধদেশ বেষ্টন ক'রে আছে। নিকটে আসতেই মহিলাটি সন্ধ্যার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলেন এবং সন্ধ্যাও একটু স'রে সোজা হ'য়ে বসল।

সন্ধ্যার মুখ চোখে আরক্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হ'য়ে প্রমথ বললে, "কী ব্যাপার উষা ? কী হয়েছে ?"

উত্তর দিলেন মহিলাটি ; সহাস্যমুখে বললেন, "হয় নি বিশেষ কিছু। এইদিক দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম মেয়েটির চোখ দু'খানি জলে টলটল করছে—বোধ হয় বাপ মার জন্যে মন কেমন করছিল, কাছে এসে ব'সে একটু আদর করতেই সমস্ত জলটা ঝরঝর ক'রে ঝ'রে গেল।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

প্রমথও সহাস্যমুখে কপট বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললে, "সে কি উষা ? একেবারে কান্নাকাটি ?" তারপর মহিলাটিকে সম্বোধন ক'রে স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "আপনার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ।"

মহিলাটি স্মিত মুখে বললেন, "না, না, এর জন্যে ধন্যবাদ দেবার কী আছে। এঁর নাম বুঝি উষা ?"

প্রমথ বললে, "হ্যাঁ, উষা।"

সন্ধ্যার প্রতি সতৃপ্তনেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে মহিলাটি বললেন, "যেমন নাম মূর্তি-খানিও তেমনি।"তারপর সন্ধ্যার চিবুক স্পর্শ ক'রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "চললাম, উষা, সুখে থেকো।"

সন্ধ্যা যুক্ত করে নমস্কার করলে, চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার দীপ্তি।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আপনার স্ত্রীভাগ্য ভালো।"

ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে প্রমথ বললে, "কেন বলুন তো ?"

সহাস্য মুখে মহিলাটি বললেন, "কেন, তা যদি এখনো না বুঝেও থাকেন তো শীঘ্রই বুঝবেন। আমরা জিনিস দেখলে বুঝতে পারি। যত্নে রাখবেন।" তারপর একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "রায়পুর থেকে আমার আত্মীয় আসছেন। ডিসট্যাণ্ট সিগ্‌নাল ডাউন হয়েছে ; এখন তা হ'লে আসি।"

প্রমথ যুক্ত ক'রে নমস্কার করলে। প্রতিনমস্কার ক'রে মহিলাটি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "সময় পাওয়া গেল না উষা, নইলে স্ত্রীভাগ্য আমার কী রকম ভালো তা ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দিতে পারতাম। যে ফুল এ পর্যন্ত ফুটল না, আর সম্ভবতঃ কোনদিনই ফুটবে না, সে ফুলের সুগন্ধের উনি প্রশংসা ক'রে গেলেন। তবে তুমি যে ভালো, সে অনুমান ওঁর ভুল হয় নি ; সে বিষয়ে উনি পাকা জহুরীর পরিচয় দিয়েছেন। আচ্ছা চল, এবার আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।" ব'লে জিনিস-পত্র ও সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ প্ল্যাটফর্মের সন্নিকটে অবস্থিত কাটনি যাবার গাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করলে।

বিলাসপুর থেকে কাটনি পৌঁছতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, এবং সেখানে গাড়ি পরিবর্তন ক'রে পরদিন প্রত্যুষে পাঁচটার সময়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা এলাহাবাদে উপনীত হ'ল।

প্রমথ বললে, "উষা, কী করবে বল? কাশী গেলে সেখানে পৌঁছতে একটু বেলা হ'য়ে যাবে, এগারটা সাড়ে এগারটার কম হবে না। হয়তো তোমার কষ্ট হবে। এলাহাবাদে আজ থাকবে? সুবিধে আছে থাকবার।"

সন্ধ্যা বললে, "আমার কষ্ট হবে না। আপনার যদি কষ্ট হয় তা হ'লে না হয় থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমারও কষ্ট হবে না। কিন্তু তুমি যদি কাশী পৌঁছে প্রথমেই বিশ্বেশ্বর দর্শন কর, তা হ'লে তো আরও বেলা হ'য়ে যাবে। অতক্ষণ উপোস ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।"

সন্ধ্যা বললে, "না, তাতেও কষ্ট হ'বে না। আপনি কিন্তু চা-টা খেয়ে নিন।"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেচ? এক যাত্রায় পৃথক ফল কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না। তুমি উপবাসী থেকে বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে পুণ্য অর্জন করবে, আর আমি চা-পাউরুটি পেটে পুরে গিয়ে নন্দীভৃঙ্গীর লাঠির গুঁতো খাব—এ সহ্য করতে পারব না। অতএব আমারও অদৃষ্টে আজ পুণ্য অর্জন আছে।"

বেনারস ক্যান্টন্‌মেন্টে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন বেলা এগারটা উত্তীর্ণ হয়েছে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা গোধুলিয়ার একটা ত্রিতল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হ'লো। ঘন ঘন হর্ণের শব্দ শুনে একজন পশ্চিমা ভৃত্য বেরিয়ে এল, তারপর প্রমথকে দেখেই দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

মিনিট খানেক পরে একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে গাড়ির ভিতর প্রমথকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বললে, "ও মা, তুমি এসেছ! আর মুখপোড়া বিশুয়াটা গিয়ে বললে কি-না যে বলদেঘাটার জমিদার বাবু এসেছে।"

প্রমথ স্মিতমুখে বললে, "মুখপোড়া বিশুয়া তো তা হ'লে তোমাকে ভারি নিরাশ করেছে মাসি! এসে দেখলে কি-না বলদেঘাটার জমিদার বাবুর বদলে কলকাতার ফতো বাবু।"

মাসী বললে, "তোমার মতো ফতো বাবুর পকেটে অমন দশ-বারোটা বলদেঘাটার জমিদার বাবু পোরা থাকে। কিন্তু গাড়িতে ব'সে কেন?—এস, নেমে এস।"

প্রমথ পকেট থেকে দশখানা দশটাকার নোট বার ক'রে মাসীর হাতে দিয়ে বললে, "না মাসী, এবার আর এখানে থাকা চলবে না। তুমি এখনি একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি এক মাসের জন্যে ভাড়া ক'রে ফেল। আর একজন রাঁধুনী, একজন চাকর, একজন ঝি—আর মোটামুটি সংসারের যা-যা জিনিস-পত্রের দরকার, ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

বিস্মিত হ'য়ে মাসী বললে, "কিন্তু এ-সবের কী দরকার তা তো বুঝ্‌তে

পারছিনে। তেতলায় তোমার তিনখানা বড় বড় ঘর আছে, নিত্যি সকাল-সন্ধে ঝাঁট পড়ে, সারাদিন দোর-জানলা খোলা থাকে—পাঁচ বছর ধ'রে তুমি ভাড়া দিয়ে রেখেছ। তবে আবার একটা আলাদা বাড়ির কী দরকার ?"

প্রমথ বললে, "ও যেমন আছে থাক মাসী, এবার একটা আলাদা বাড়িই চাই।"

প্রমথর কথায় সন্ধ্যাকে একটু ভাল করে নিরীক্ষণ ক'রে মাসী সহসা বললে, "বুঝেচি এখন। বউমা? বিয়ে করেছ? তা খুবই সুখের কথা, কিন্তু আমি এবার ছাড়ছিনে বাছা, এক জোড়া গরদের শাড়ি, আর গলার জন্যে এক ছড়া পবিত্তির হার আমার চাই-ই। মাদুলীটা সর্বদা খুলে খুলে প'ড়ে যায়, একটা হার হ'লে সুবিধে হয়।"

প্রমথ বললে, আচ্ছা মাসী, সে সবের জন্যে চিন্তা নেই, সে যা হয় হবে অখন। উপস্থিত আমরা শঙ্কর পাণ্ডার বাড়ি চললাম, সেখানে গঙ্গা স্নান সেরে, বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে প্রসাদ পাব। তারপর সমস্ত দিনটা বজরায় কাটিয়ে সন্ধ্যার সময়ে তোমার কাছে আসব। জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে দাও।"

"স্নানের পর কাপড় চোপড় ?"

"সে একটা পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হয়েছে।"

নিকটেই বিশুয়া ছিল, জিনিস-পত্র নাবিয়ে নিলে।

প্রমথ বললে, "যেমন বললাম সব যেন ঠিক থাকে মাসী।"

মাসী হাসিমুখে বললে, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো—তোমার মানদা মাসীর হাতে আধখানা কাশী আছে।"

"আর কিছু টাকা দোবো ?"

মাসী বললে, "ওমা, সে কি কথা, লক্ষ্মীকে না বলতে আছে কি ? দেবে দাও।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে প্রমথ বললে, "আর যাই বল, মাসীকে নাস্তিক বলতে পারবে না।" তারপর আর পাঁচখানা নোট মানদা মাসীর হাতে দিয়ে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলে।

মাসী যে একজন 'কাশীবাসিনী মাসী' এর বেশি পরিচয় দেবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। প্রমথ তার একজন শাঁসাল যজমান। সৌখীন জীবন-যাপনের ব্যাপারে এই সব কাশীবাসিনী মাসীরা প্রমথর মতো ধনী যুবকদের অভিভাবিকা।

একুশ

সন্ধ্যা আসন্ন। মানদার গৃহ থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে প্রমথ সন্ধ্যার সহিত তার নব-নিযুক্ত গৃহে উপস্থিত হলো। গৃহটি ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। দ্বিতলে তিনটি শয়নকক্ষ এবং পূর্বদিকে একটি সুপ্রশস্ত বারান্দা। পাশে একদিকে কল-

পাইখানার ব্যবস্থা। বারান্দার এক প্রান্ত দিয়ে নীচু ধাপের সিঁড়ি, যা কাশীতে খুব সুলভ নয়, নিম্নে নেবে গিয়েছে।

মানদার কার্যতৎপরতার গুণে এই অল্প সময়ের মধ্যে ধোয়া মোছা, উপরের তিনটি ঘর ও বারান্দা চুণকাম করা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘরে ঘরে আসবাব-পত্র সাজানো, ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। তার নিজ গৃহে প্রমথর তিনটি ঘরে আসবাব-পত্র নিতান্ত অল্প ছিল না, তার অধিকাংশই আনিয়ে নিয়েছে। বাকী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কতক সে নিজের থেকে উপস্থিত দিয়েছে, এবং কতক প্রমথর অর্থে ক্রয় করেছে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে চতুর্দিকে শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতা দেখে প্রমথর মন প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় ব'সে বিশুয়া নব-নিযুক্তা পরিচারিকা কামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বিস্তারে মনোযোগী ছিল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে কামিনীকে বললে, "বাবু এসেছেন।"

কামিনী উঠানে নেমে প্রমথ ও সন্ধ্যাকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "মা, চায়ের জল চড়িয়ে দোব কি?"

যে ধারণার বশবর্তী হ'য়ে এই মাতৃ-সম্বোধন উদ্ভূত, তা স্মরণ ক'রে সন্ধ্যা প্রথমটা ক্ষণকাল লজ্জায় মূক হ'য়ে রইল, কিন্তু সমস্ত দিনের নানা প্রকার হাঙ্গামা এবং পরিশ্রমের পর গৃহে এসে দু-এক পেয়ালা চা, অন্ততঃ প্রমথর পক্ষে, এতই প্রয়োজনীয় বস্তু যে, সে-বিষয়ে কোনো প্রকার আদেশ না দিয়ে নিরুত্তর থাকার লজ্জাটাও কিছু কম নয় মনে ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "দাও।"

কামিনী বললে, "চায়ের সঙ্গে খাবারের কী ব্যবস্থা করব, মা?"

সন্ধ্যা চিন্তিত হলো। এ প্রশ্ন পূর্ব প্রশ্নের মতো সরল নয়, এবং দু'-একটি বাক্যের সাহায্যে উত্তর দিয়ে একে শেষ করা শক্ত। প্রমথ দয়াপরবশ হ'য়ে সন্ধ্যাকে তার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলে। কামিনীকে সম্বোধন ক'রে বললে, "মাসী কোথায়?—মানদা মাসী?"

"দোতলায় আছেন বাবা।"

"তা হ'লে কিছু ভাবতে হবে না, তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চল উষা, আমরা উপরে যাই।"

প্রমথ ও সন্ধ্যা দ্বিতলে উপনীত হ'লে মানদা দক্ষিণ প্রান্তের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উভয়কে দেখে সহাস্যমুখে বললে, "এলে? সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুব কষ্ট হয়েছে?"

প্রমথ বললে, "কষ্ট কি মাসী? খুব আনন্দেই কেটেছে।"

স্মিতমুখে মাসী বললে, "তোমার তো আনন্দে কাটবেই বাবা, অমন লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো বউ পাশে থাকলে কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় কি?"

প্রমথ বললে, "লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো কি মাসী? কাশীতে কি ওকথা বলতে আছে?"

বিস্মিত-স্মিত মুখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মানদা বললে ,"কেন ?—কী বলতে হয় ?"

"বলতে হয় অন্নপুণ্যোর মতো।"

মানদা বললে, "সে কথা সত্যি। পিছন দিকে একটা চাল-চিত্তির রেখে দিলে তাই ব'লেই মনে হয়। এ জিনিস তুমি কোথা থেকে খুঁজে বার করলে বাবা ?"

প্রমথ বললে, "সে কথা তোমাকে আর একদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলব মাসী, এখন তাড়াতাড়ি চা-টার একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

মানদা বললে, "কামিনীকে বলা আছে, তোমরা এলেই সে চায়ের জল চড়িয়ে দেবে। তোমরা এই তিনটে ঘর দেখতে দেখতেই সব এসে পড়বে অখন। ততক্ষণ এস, এই ঘরটা থেকেই আরম্ভ করি। এইটে তোমাদের শোবার ঘর।" ব'লে মানদা দক্ষিণ দিকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

প্রমথ মানদার পিছনে পিছনে প্রবেশ করলে, সন্ধ্যা কিন্তু বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

মানদা দেখতে পেয়ে দ্বারের কাছে এসে বললে, "একা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা ? ভেতরে এস। এ তো তোমার ঘর তোমার সংসার, নিজে দেখে শুনে নাও।".

অগত্যা সন্ধ্যা ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে।

ঘরটি প্রশস্ত, কিন্তু ঘরের মধ্যে মাত্র তিনটি আসবাব—একটি পালঙ্ক, ছোট একটি কাঠের আলনা এবং ঘরের এক কোণে একটি ড্রেসিং টেবল,—অর্থাৎ কেবলমাত্র নিশা-যাপনের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাই। সুবৃহৎ পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র শয্যা ; তদুপরি দুইটি মাথার এবং তিনটি পাশের বালিশ পাশাপাশি রাখা। শয্যা রচনা তখনও শেষ হয়নি, একজন পশ্চিমা ভৃত্য আস্তরণের বিলম্বিত অংশ গদীর তলায় মুড়ে দিচ্ছিল।

মানদা বললে, "এ-ই তোমাদের চাকর থাকবে। বিরিঞ্চি, আমার জানা লোক, বিশ্বেসী—তবে একটু বোকা।"

বিরিঞ্চি বাঙলা ভালো বলতে পারে না, কিন্তু বুঝতেপারে অনেকটা ; তাই এ দোষারোপ সে একেবারে অপ্রতিবাদে পরিপাক করলে না, জিহ্বা-তালুর সংযোগে একটা মতভেদসূচক শব্দ নির্গত ক'রে বললে, "নেই, নেই, মায়জী ! চালাক ভী আছে।"

মানদা হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল,—"চালাক্ ভী আছে, না তোর মাথা আছে ! পই পই ক'রে ব'লে দিলাম যে, নীল ফুলওয়ালা ওয়াড়ের বালিসটা ডানদিকে দিবি, আর লালফুলেরটা বাঁ দিকে ; তা না, ভেবে চিন্তে ঠিক উল্টোটি ক'রে রেখেছে ! একটু নড়েচি কি অমনি ভুল।"

ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ক্ষণকাল বালিস দুটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে

ক্ষিপ্রগতিতে বিরিঞ্চি পালঙ্কের পাদদেশে এসে দক্ষিণ ও বাম হস্ত সম্মুখে প্রসারিত ক'রে যা বললে তা শুনে মানদা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

বিরিঞ্চির কৈফিয়তের মর্ম কিছুমাত্র বুঝতে না পেরেও মানদার হাসির ভঙ্গী দেখে প্রমথ হেসে ফেলে বললে, কী বলে ও মাসী ?"

মানদা তেমনি হাসতে হাসতে বললে, "বলে, গাছতলায় দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে নীলফুলওয়ালা বালিস ডানদিকে পড়বে আর লাল-ফুলওয়ালা পড়বে বাঁ দিকে। ডান-বায়ের কি টনটনে জ্ঞান দেখ দেখি বাছা।"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগল ; বললে, "সে যাই বল মাসী, বিরিঞ্চি আজ তোমাকে হারিয়েছে।"

"হারিয়েছে ব'লে হারিয়েছে, বিষম হারিয়েছে।" ব'লে মানদা নিজে বালিস দুটো উল্টে দিয়ে বিরিঞ্চিকে বললে, "খুব হয়েছে। এখন যা, নিচে গিয়ে তুই আর কামিনী দু'জনে মিলে চা আর খাবার নিয়ে আয়—ঠাকুরের কাছে খাবার ঠিক করা আছে।"তারপর প্রমথকে সম্বোধন ক'রে বললে, এ খাটটা চিনতে পারছ তো বাবা ? এ তোমারই নিজের খাট, ও বাড়ি থেকে আনিয়েছি। খুব চওড়া, দু'জনের শুতে একটুও কষ্ট হবে না।"

একটু অপ্রসন্ন স্বরে প্রমথ বললে, "এ-সব হাঙ্গামা আজই করবার দরকার ছিল কি মাসী, পরে হ'লেই তো হোত।"

মানদা সবিস্ময়ে বললে, "শোন কথা। নিজের এমন পালং থাকতে ভুঁয়ে শুতে হবে না কি ? চাবি দিয়ে খাটখানা খুলে কুলীরা এখানে এনে খাটিয়ে দিয়েছে—হাঙ্গামা তো এই।" তারপর হঠাৎ বিরিঞ্চির কথা মনে প'ড়ে গিয়ে আবার হাসতে লাগল ; বললে, "বিরিঞ্চিটা আজ কিন্তু ভারি হাসিয়েছে। ডান-বাঁয়ের মর্ম খুব বুঝেছিল যা হোক।"

এ কথার উত্তরে কোনো কথা না ব'লে চকিতে একবার সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "চল মাসী; এবার ও ঘরটা দেখিগে।"

বিরিঞ্চিকে নিয়ে যখন হাস্যকৌতুকের একটা অভিনয় চলছিল তখন তারই মধ্যে এক সময়ে সন্ধ্যা নিঃশব্দে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একই পালঙ্কের উপর পাশাপাশি দুটো মাথার বালিস দেখে আতঙ্কে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। তবে আর বাকি কী রইল। মাকড়সা যখন এক পাকে জড়িয়েছে, তখন দেখতে দেখতে শত পাক সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে। আজ আর রেলগাড়ির কক্ষে রাত্রি যাপন নয়—আজ সে প্রমথর অচল অনড় গৃহ-কারাগারে বন্দিনী। আজ রাত্রে যথার্থ পদ-মর্যাদায় তার অভিষেক হ'য়ে যাবে! হায় ভগবান, কপালে এতও ছিল। নিজের অবনত অসহায় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে সন্ধ্যার দুই চক্ষু ফেটে অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

"ঊষা।"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে ফেলে সন্ধ্যা ফিরে চাইলে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমথ বললে, "এবার ও ঘরটা দেখিগে চল।" তারপর সন্ধ্যা নিকটে এলে তার কানের অতি নিকটে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "ও-সব দেখে ভয় পেয়ো না—নিশ্চিন্ত থাক।"

ঘরের ভিতর দিয়ে দিয়ে তিনটে ঘরেই যাওয়া যায়। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করতেই মানদা বললে, "এইটে তোমাদের বসবার ও কাজকর্ম করবার ঘর।"

কক্ষের মধ্যস্থলে একটা টেবিল, তার চার দিকে চারটে চেয়ার, ঘরের এক পাশে দুটো ইজিচেয়ার এইং অপর দিকে একটা প্রশস্ত সোফা।

তৃতীয় ঘরে সুটকেস, বাক্স ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রাদির জন্য দুটো কাঠের আলনা।

সব দেখে শুনে প্রসন্নমুখে প্রমথ বললে, "না মাসী, তোমার বাড়িটিও পছন্দ-সই—আর ব্যবস্থাপত্র যা করেছ তার মধ্যেও ত্রুটি ধরবার কিছু নেই।"

প্রমথর প্রশংসা শুনে মানদা আনন্দিত হলো; বললে, "পরিশ্রমের মর্যাদা তুমি বোঝো বাবা, তাই তোমার কাজে পরিশ্রম ক'রে সুখ আছে।" তারপর বারান্দার দিকে তাকিয়ে বললে, "ওই তোমাদের চা-টা বোধ হয় নিয়ে এল—কলের ঘরে গিয়ে চট্ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এস।" ব'লে মানদা চায়ের ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

চা পান শেষ হ'লে প্রমথ মানদাকে বললে, "মাসী, অনেক পরিশ্রম তুমি করেছ, এবার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

মানদা বললে, "মনে করছিলাম তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যাব।

প্রমথ মাথা নেড়ে বললে, "না, না, মাসী, তার এখনও অনেক দেরি আছে। আমার কথা শোনো, বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করো। কাল সকালে একবার না-হয় এসে বাকি যা করবার আছে শেষ ক'রে যেয়ো।"

মানদা প্রমথর ধাতও জানত, সুরও চিনত; বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, অনুরোধের আকারে হ'লেও বস্তুতঃ এ আদেশ; বললে, "ওমা, কাল সকালে আসব বই কি। কিন্তু বাবা, তোমার টাকার হিসেবটা?"

"করেছ?"

"এখনও যে সব জিনিষের দাম দেওয়া হয় নি, তাই করা হয়নি।"

প্রমথ বললে, "যদি বেশি খরচ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় তা হ'লে হিসেব ক'রে কাল বাকিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো—আর যদি তা না হয়, তা হ'লে কেন আর মিছে কষ্ট ক'রে হিসেব করতে যাবে?"

"আচ্ছা, সে যা হয় কাল হবে" ব'লে মানদা প্রস্থান করলে, কিন্তু সিঁড়ির কাছ থেকে পুনরায় ফিরে এসে প্রমথর কানে কানে মৃদুস্বরে একটা কথা বললে।

শুনে প্রমথ একটু উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠল, "এ তুমি কেন করেছ মাসী?—ও জিনিস কিনতে তো আমি তোমাকে বলি নি। ও তুমি এখনই এখান থেকে নিয়ে যাও।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মানদা বললে, "অনেক পরিশ্রম হয়েছে, হঠাৎ যদি দরকার হয়—"

"তখন তোমার কাছ থেকে চেয়ে পাঠাব।"

"তা হ'লে আমার কাছেই ও-টা রেখে দেবো?"

প্রমথ বললে, "তা রাখতে পার; আর যদি তার চেয়েও ভালো একটা কাজ করতে চাও তা হ'লে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রে বিশ্বনাথকে দান কোরো।"

কপালে যুক্ত কর স্পর্শ ক'রে মানদা মৃদুস্বরে বললে, "বিশ্বনাথ।" তারপর তৃতীয় কক্ষে গিয়ে গা-আলমারী খুলে একটা বোতল বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

নিকটেই কোনো গৃহে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। পাঠের মাঝে মাঝে যে গান হচ্ছিল তার অস্পষ্ট ধ্বনি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, গায়ক একজন উচ্চশ্রেণীর গুণী। মানদা প্রস্থান করলে সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে সন্ধ্যা উত্তর প্রান্তের কক্ষের জানালার ধারে উপস্থিত হলো। সেখান থেকে গান আরও একটু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

মিনিট দশেক পরে প্রমথ সেখানে এসে দাঁড়াল। তখন অন্য একটা গান আরম্ভ হয়েছে। প্রমথ বললে, "বেশ গাচ্ছে, না ঊষা?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "চমৎকার গাচ্ছে।"

প্রমথ বললে, "সবিতা-বউদিদির মুখে শুনেছি তুমিও চমৎকার গাও। কাল তোমার গান-বাজনার সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে দোব, তারপর তোমার গান শোনা যাবে। কিন্তু সমস্ত দিন ঘোরা-ফেরা ক'রে তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ ঊষা, তোমার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা-টা একটু এলিয়ে দাও, সেখান থেকেও গান শুনতে পাবে।"

পরিশ্রান্ত সে সত্যই হয়েছিল—শুধু দেহে নয়, মনেও। সমস্ত দিনটা নানাবিধ কার্যকলাপের মধ্যে প্রমথর একান্ত সান্নিধ্যে অতিবাহিত ক'রে একটা কোন নির্জন কক্ষের শয্যার উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য সমস্ত দেহটা অবসন্ন হ'য়ে এসেছিল। এরূপ অবস্থায় প্রমথর প্রস্তাব লোভনীয়—কিন্তু মানদার লালফুল নীলফুল বালিসের ব্যবস্থার কথা স্মরণ ক'রে মন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "কোন্ ঘরটা আমার?"

"কেন, মানদা মাসী প্রথম যে-ঘরটা দেখালে, সেইটে। দক্ষিণের ঘরটা।"

সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "সে ঘরে তো আপনার বিছানা হয়েচে—আপনি শোবেন;"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "তুমি শুধু বয়সেই ছেলে-মানুষ নও ঊষা, বুদ্ধিতেও তাই। স্বয়ং পুলিস-কমিশনার যখন তোমার সহায় তখন কনস্টেবলের কাজ দেখে ভয় পাও কেন? তা ছাড়া, মানদা মাসীর দোষ কোথায় বল? যে ভুল ধারণা ওঁর মনের মধ্যে রয়েছে তা'তে ও-ভাবে বিছানা

করা বিশেষ ভুল হয়েছিল কি? কিন্তু এখন দেখবে এস তো।" ব'লে প্রমথ দক্ষিণদিকের ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

প্রমথর পিছনে পিছনে এসে সন্ধ্যা দেখলে পালঙ্কের উপর শয্যায় শুধু সেই লালফুলযুক্ত মাথার বালিস এবং তিনটের পরিবর্তে দুটো পাশ-বালিস। সকৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে কে শোবে?"

"তুমি।"

"আর আপনি?"

"দেখবে এস।"

প্রমথর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা দেখলে সোফার উপর সেই নীলফুলের বালিস। সবিস্ময়ে বললে, "আপনি এই সোফায় শুয়ে রাত কাটাবেন?"

প্রমথ স্মিতমুখে বললে, "কাটাব।"

এক মুহূর্ত্ত নির্বাক থেকে সন্ধ্যা বললে, "না, তা কিছুতেই হবে না; আমি এঘরে শোব, আপনি ওঘরে খাটে শোবেন।"

প্রমথ তেমনি স্মিতমুখে বললে, "তুমি আমার মান্য অতিথি উষা। মনে মনে আশা রাখি, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে আতিথেয়তার একটা ভালো-রকম সার্টিফিকেট আদায় করব। তুমি কি তার হন্তারক হ'তে চাও? এ বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হ'তো তাহ'লে আমাকে এঘরে শুইয়ে তুমি ওঘরে শুতে পারতে? কখনই পারতে না। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদিক থেকে লাগাবার জন্যে দরজায় ছিট্‌কিনি কিংবা হুড়্‌কো নেই, কিন্তু ওঘর থেকে হুড়্‌কো লাগিয়ে দেওয়া যায়। আমার ঘরে হঠাৎ ভুল ক'রেও কেউ এসে পড়তে পারে না, মনের মধ্যে এ নিশ্চয়তা থাকা ভারি আরামের জিনিস—বিশেষতঃ তোমাদের—মেয়েদের পক্ষে। কাল তোমার সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে, আজ কিন্তু আর একটিও নয়। যাও, শুয়ে পড়। রাত্রে খাবার ত'য়ের হ'লে আমি তোমাকে ডাকব অখন।"

সন্ধ্যা একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে ধীরে ধীরে ওঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে। প্রমথ একটু অপেক্ষা ক'রে দেখলে হুড়্‌কো লাগাবার শব্দ হ'লো না,—দরজা একটু ঠেলে দেখলে নিকটেই সন্ধ্যা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, হুড়্‌কো লাগালে না?"

সন্ধ্যা বললে, "রাত্রে শোবার সময়ে লাগাব অখন।"

"তখন লাগিয়ো, এখনও লাগাও। ব'লে প্রমথ দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিলে।

ভিতরে খট্‌ ক'রে একটা শব্দ হ'লো। তখন পকেট থেকে সিগার-কেস্ বার ক'রে একটা সিগার ধরিয়ে প্রমথ সোফায় গিয়ে ব'সে নিঃশব্দে টান দিতে লাগল।

বাইশ

প্রত্যূষে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'লো তখনও রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। মুখ হাত পা ধুয়ে এসে একটা চুরুট ধরিয়ে সে সোফায় বসল। চেয়ে দেখে মনে হ'লো সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধই রয়েছে। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, প্রথম রাত্রিটা যে ভালোয় ভালোয় কেটে গেল, বাঁচা গেল।

নিজের মানসিক শক্তির দৃঢ়তার প্রতি আস্থার অভাব না থাকলেও এ কথাও তার অবিদিত ছিল না যে, সাধু-সঙ্কল্পের দণ্ডাঘাতে বিতাড়িত হ'য়ে বাসনা-কামনার যে হাঙ্গর-কুমীরগুলো চিত্তের সুগভীর প্রদেশে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করছিল তাদের শক্তিও কম প্রবল নয়, এবং সুযোগ লাভ করলে যে-কোনো মুহূর্তে তারা উপরে ভেসে উঠে অনর্থ ঘটাতে পারে। রাত্রির নির্জনতা তেমনিই একটা সুযোগ। সুতরাং প্রথম রাত্রির বিষয়ে তার মনের মধ্যে সামান্য একটু উৎকণ্ঠা ছিল। সেই আশঙ্কার লগ্ন নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হ'য়ে আত্মজয়ের প্রসন্নতায় মনে মনে সে নিজের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললে, "সাবাস্ প্রমথ!"

কিন্তু এই সাবাশি সে কেমন ক'রে কোন্ শক্তির বলে অর্জন করলে তা ভেবে তার মন বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে আচ্ছন্ন হ'য়ে এল। তার চিত্তের অবচেতন মহলে যে আভিজাত্য এবং সুনীতিবোধ সুষুপ্ত ছিল তা-ই সহসা জাগ্রত হ'য়ে উঠল,—না, অস্পর্শনীয় সন্ধ্যার অপরিমেয় চরিত্র-প্রভাব তার মনের সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিলে, তা সে কিছুতেই ভেবে পেলে না। মনে মনে বললে, দুর হোক্‌গে ছাই, যেমন ক'রেই হোক এ যা হয়েছে খুবই ভাল হয়েছে; পাপ তো অনেকই করা গেছে, কিন্তু তাই ব'লে রক্ষক হবার ছল ক'রে ভক্ষক হওয়া—এত বড় পাপ কিছুতেই করা হবে না। কিন্তু মাত্র বৎসর দেড়েক পূর্বে কাঞ্চনপুরের বিনোদিনীর সম্পর্কে আশ্রিতকে রক্ষা করবার এ নীতিজ্ঞান তার কোথায় ছিল আজ তা একেবারেই মনে পড়ল না। অথচ সেই বিনোদিনী এই কাশীতে তারই মাসহারায় জীবন যাপন করছে। মনে মনে মাথা নেড়ে বারংবার সে বলতে লাগল, ক্ষেপেছ? কখনই না, কিছুতেই না। রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক হওয়া, সে কিছুতেই হবে না। তার চেয়ে এবার একবার ভক্ষক হ'য়ে রক্ষক হওয়ার আস্বাদটা উপভোগ ক'রে দেখা যাক।

খুট্ ক'রে একটা শব্দ হ'লো। প্রমথ চেয়ে দেখলে পাশের ঘরের দরজা খুলে সন্ধ্যা পাল্লা দুটোয় ছিটকানি লাগাচ্ছে।

"এস উষা।"

সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে প্রবেশ করলে। একটা চেয়ার নির্দেশ ক'রে প্রমথ বললে, "বোসো।" সন্ধ্যা উপবেশন করলে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি তো?"

সন্ধ্যা বললে, "না।" তারপর প্রমথর মুখের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে বললে, "আপনার নিশ্চয়ই হয়েছিল ?"

"অনুমান করছ ? না, দোর খুলে ঘরে এসে দেখে গিয়েছিলে ?"

ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "না, অনুমানই করছি।"

প্রমথ বললে, "অনুমান ভুল হচ্ছে। আমার ঘুম এত ব্যাঘাতশূন্য হয়েছিল যে, মনে মনে যে সঙ্কল্প ক'রে রেখেছিলাম রাত্রে এক আধবার বারান্দায় বেরিয়ে তোমার ঘরের সামনে পাহারা দিয়ে আসব, তা একবারও পেরে উঠিনি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিয়েছ কি ?"

কী মনে ক'রে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বললে, "দিয়েছি।"

"দিয়েছ, ভালোই করেছ। কিন্তু তুমি তা হ'লে আধ মিনিট বোসো উষা, আমি চট্ ক'রে সেই ফাঁকে একটা কাজ সেরে নিই।" ব'লে তার মাথার বালিসটা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে সন্ধ্যার ও তার মাথার বালিশ-দুটো পাশাপাশি স্থাপন ক'রে পাশ-বালিশটা শয্যার এক পাশে ঠেলে দিলে। সমস্ত পালঙ্কটা যৌথ নিশা-যাপনের একটা কপট পরিচয় বক্ষে ধারণ ক'রে মলিন হ'য়ে উঠল।

প্রমথর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা দরজার নিকট এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রমথ তার দিকে ফিরতেই সে বললে, "এ কিন্তু আমার ভালো লাগে না, প্রমথ দাদা।"

"কী ভালো লাগে না ?"

"এই এ-রকম ছল চাতুরী।"

প্রমথ এক মুহূর্ত নীরব থেকে ঈষৎ গভীর স্বরে বললে, "কিন্তু এ তো একমাত্র তোমার জন্যেই করছি উষা। নইলে আমারই কি এই বিনা শাঁসের খোসা চিবুতে ভালো লাগে ? সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যদি একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে না পার, একটু মাত্র মোহও যদি মনের মধ্যে লেগে থাকে, তা হ'লে এ-রকম ছোট-বড় কপট আচরণের আশ্রয় নিতেই হবে। এই যে তুমি এখন থেকে আমাকে প্রমথদাদা ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলে, এও তো তাই-ই। নইলে আমি আর তোমার দাদা কোন হিসেবে বল ? তা ছাড়া, এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত কুফলই ফলবে। কাশীর তৃতীয়-ব্যক্তি-হীন বাড়িতে আমাকে দাদা ব'লে সম্বোধন করলে সকলেই মনে মনে তোমাকে যা ব'লে স্থির ক'রে নেবে আসলে তুমি তো সে ঘৃণিত বস্তু নও, তাই তার মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। চল, ওঘরে গিয়ে বসা যাক।"

সোফায় উপবেশন ক'রে একটা চুরুট ধরিয়ে প্রমথ বললে, "এ অবস্থায় একমাত্র যে পরিচয়ে তোমার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, লোকে সহজ ভাবে সেই পরিচয়টাই ধ'রে নিচ্ছে। বিলাসপুর স্টেশনের সেই স্ত্রীলোকটির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু অত-বড় ধূর্ত মেয়েমানুষ মানদা মাসীর কথা ভাবো; সে তোমাকে আমার স্ত্রী ব'লে মনে করলে; শঙ্কর পাণ্ডা তোমার মুখের মধ্যে কী

দেখতে পেলে জানিনে, কিন্তু জিজ্ঞাসা না ক'রেই একেবারে আমার গোত্র ধ'রে তোমার সঙ্কল্প করিয়ে দিলে। স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে তার কাছে যাওয়া এই আমার প্রথম নয়, কিন্তু এ রকম সে কোনো বারই তো করে নি। সকলেই তোমাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছে উষা, আমি কেমন ক'রে তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনি ? আমার না হ'লেও, তুমি একজনের বিবাহিত স্ত্রী তো নিশ্চয়ই— রক্ষিতা তুমি কারোই নও। কিন্তু এ তুমি নিশ্চয় জেনো, তুমি যদি আমাকে প্রমথদাদা ব'লে ডাকতে আরম্ভ কর তা হ'লে কেউ তোমাকে তা ছাড়া আর কিছু মনে করবে না। এখন যারা তোমাকে অন্তরে বাইরে শ্রদ্ধা করছে, সম্মান করছে, সেই দাস-দাসী রামুন-চাকর থেকে আরম্ভ ক'রে মানদা মাসী শঙ্কর পাণ্ডা পর্যন্ত সকলেই তখন মনে মনে তোমাকে করুণা করবে, হয়তো একটু ঘৃণাও করবে। তুমি আমার জীবনে মান্য অতিথি উষা, তোমার এ অকারণ অমর্যাদা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তা যদি পারতাম তাহ'লে কাল সমস্ত দিন নৌকোয় না কাটিয়ে তোমাকে নিয়ে সোজাসুজি মানদা মাসীর বাড়িতেই উঠতাম, এত হাঙ্গামার মধ্যে যেতাম না।"

প্রমথর কথার ভিতর কোন্ এক মুহূর্তে অতর্কিতে সন্ধ্যার চোখের কোণে অশ্রু সঞ্চিত হয়েছিল, হঠাৎ ঝরঝর্ ক'য়ে ঝরে পড়ল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চক্ষু মুছে দুঃখার্ত কণ্ঠে সে বললে, "সত্যি! কী বিব্রতই না আপনাকে ক'রেছি।"

সন্ধ্যার কথা শুনে এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে প্রমথ বললে, "না, এ সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি যা, তা যদি সহজে বিশ্বাসযোগ্য না হয় তাহ'লে সে কথা কাউকে বলতে নেই, মনে মনে রাখতে হয়—এ হচ্ছে শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন, উষা ? আমি তো তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে কোনো কথা বলিনি। তবে তোমার এ দুঃখ কিসের ?"

একটু ইতস্তত: ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "আপনার আশ্রয়ে আমার নিজের যথার্থ পরিচয়ে বাস করবার সুবিধে হ'লো না—এই আমার দুঃখ।"

ঈষৎ মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "বুঝেচি। আমার নিজের দিক থেকে তাতে বিশেষ কিছু আপত্তি নেই উষা, কারণ সমাজকে আমি বহুদিন থেকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আসছি, কিন্তু তোমার যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করা তোমার পক্ষে সুবিধের হবে কি-না সেইটেই হচ্ছে কথা। আমার মনে হয় এই কথাটা স্থির করবার জন্যে আগে একটা পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়া ভালো।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কী পরীক্ষা ?"

প্রমথ বললে, "মাথার বালিস নিয়ে উপস্থিত যখন কথাটা উঠেছে তখন সেইটে দিয়েই পরীক্ষা হোক। আমার মুখ ধোয়া-টোয়া হ'য়ে গেছে, মিনিট কুড়ি-পঁচিশ মর্ণিং-ওয়াক্ ক'রে আসি। তুমি ততক্ষণে মুখ-হাত-পা ধুয়ে চা খাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নাও, আর তার আগে আমাদের মাথার বালিস দুটো, প্রয়োজন বোধ করলে বিছানার অন্যান্য জিনিসও, এ দুটো ঘরের এমন যায়গায় এমন ভাবে রেখে দাও

যা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাত্রে তুমি আর আমি পৃথক ঘরে পৃথক শয্যায় শুয়েছিলাম, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। তারপর সুবিধা মতো একদিন মানদা মাসীর কাছে তোমার জীবন-বৃত্তান্ত খুলে বোলো। তা হ'লেই সমস্ত জিনিসটা একেবারে স্পষ্ট হ'য়ে যাবে। কেমন ?"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিছু বললে না।

পাশের ঘরে গিয়ে ছড়ি নিয়ে ফিরে এসে প্রমথ বললে, "উষা, তয়েরী থেকো, বেড়িয়ে এসে একসঙ্গে চা খাব।" ব'লে আর একটা চুরুট্ ধরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রমথ যখন ফিরে এল তখন সন্ধ্যা বাথ্‌রুমে। কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দেখলে শয্যার অবস্থা সে যেমন ক'রে রেখেছিল ঠিক তাই আছে, সন্ধ্যা স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মনে মনে একটু হাস্য ক'রে নিজের ঘরে এসে বসল। রাস্তা থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে এনেছিল তাতেই মনোনিবেশ করলে।

মিনিট পাঁচেক পরে বাথরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে প্রমথ ফিরে এসেছে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার চা আর খাবার আনতে বলব ?"

প্রমথ বললে, "বল। কিন্তু শুধু আমার নয়, তোমারও।"

"আচ্ছা।" ব'লে সন্ধ্যা বেরিয়ে গেল;

কিন্তু চায়ের জন্য সন্ধ্যার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করতে হলো না, শুনতে পাওয়া গেল নীচে মানদা বিষম তর্জন করছে, "আটটা বাজতে চলল, এখনো চা আর খাবার তৈরী হ'লো না। তবু না যদি কাল সমস্ত ব'লে ক'য়ে দেখিয়ে শুনিয়ে যেতুম! বিরিঞ্চি, শীগগির ওপরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে আয়!"

উপরে এসে সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ ক'রে মানদা চিৎকার করে উঠল—"দেখেচ! কাণ্ড দেখেচ! বাসি বিছানা তেমনি প'ড়ে আছে, এখন পর্যন্ত হাত পড়েনি! আর দুটো দিন দেখব, তারপর ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় ক'রে একেবারে নতুন সেট্ আনব। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!"

প্রমথর ঘরে মানদা প্রবেশ করতে প্রমথ বললে, "কী মাসী, সকাল বেলা এসে একেবারে রণ-মূর্তি ধরলে কেন ?"

মৃদু হেসে চাপা গলায় মানদা বললে, "রণমূর্তি কি সাধে ধরেচি, দু'-তিনদিন এমনি ক'রে তম্বি করলে সবগুলো সায়েস্তা হ'য়ে যাবে।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কোনো অসুবিধে হচ্ছেও না তো বউমা।"

"সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল ?"

"হয়েছিল।"

কামিনী চা আর খাবার নিয়ে আসছিল, দেখতে পেয়ে মানদা বললে, "চা দিয়েছে, যাও তোমরা খেতে যাও।"

চা খেতে খেতে প্রমথ বললে, "তোমার পরীক্ষার কী হ'লো উষা? পরীক্ষায় একেবারে হাজিরই হ'লে না? পরীক্ষাটা একটু গোলমেলে ঠেকল না-কী?"

এতগুলো প্রশ্নের কোনোটারই উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা এখানে কতদিন থাকব?"

"যতদিন তোমার ইচ্ছে।"

"কলকাতায় কবে যাব?"

"যেদিন তুমি বলবে।"

"লক্ষ্ণৌ যাবেন না?"

"বল তো যাই। সেখানে তো আমার নিজের বাড়িই রয়েছে। কিন্তু কাশী কি তোমার ভালো লাগছে না উষা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না, খারাপও লাগছে না।"

প্রমথ বললে, "তবে কাশীতেই দিন কতক থাকা যাক। থাকতে থাকতে দেখবে কাশী নিতান্ত মন্দ জায়গা নয়। কিন্তু তোমার মন সহজ ক'রে নাও উষা, নইলে কোনো জায়গাই ভালো লাগবে না। নিজের যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করতেই যদি তোমার ভালো লাগে তাহ'লে তাই না হয় আরম্ভ কর। আজ থেকে রাত্রে তোমার ঘরের মেজেয় কামিনী যাতে শোয় সে ব্যবস্থা ক'রে দোব। কেমন, তা হ'লেই হবে তো?"

সন্ধ্যা মুহূর্তের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "না, কামিনীর শোবার দরকার নেই, আমি একাই শোব।"

হর্ষোৎফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "এই তো বীরত্বব্যঞ্জক কথা! না হয় কিছুদিনের জন্যে আমাকে পাতানো স্বামীত্বে বরণ করই না উষা? বিপদে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়, তোমার তো এ বিপদের কথাই নেই। এমন তো কত মেয়ে দাদা, কাকা, মেসো, পিসে পাতাচ্ছে; তেমন প্রয়োজন হ'লে স্বামী পাতানোতেই বা দোষ কী? বিয়ের আগে তো খেলাঘরে কত মেয়ে সে সম্পর্কও পাতায়। তোমারও এ খেলাঘরই। তারপর সৌভাগ্যক্রমে যেদিন আসল স্বামী তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে সেদিন খেলাঘরের এ পাতানো স্বামীকে ফেলে গেলেই হবে।" ব'লে প্রমথ হো হো ক'রে হাসতে লাগল।

পাতানো স্বামীত্বের এই বিচিত্র তত্ত্ব শুনে সন্ধ্যার হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। মনে হ'লো এই যেন তার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস। প্রমথর ঘর তার খেলাঘর, এবং সেই খেলাঘরের ভিতরে প্রমথ তার পাতানো স্বামী,—এই নিয়েই বাকি জীবনটা মিথ্যার অভিনয় ক'রে কাটাতে হবে। তারপর একদিন সৌভাগ্যক্রমে আসল স্বামী এসে উপস্থিত হবেন?—হায় রে। সে সৌভাগ্য চাচ্ছেই বা কে,

আর পাচ্ছেই বা কে! একটা মর্মন্তুদ নৈরাশ্যে সন্ধ্যার হৃদয় উদাস হ'য়ে গেল। চোখের সম্মুখে শরৎ-প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক হ'য়ে গেল স্তিমিত।

"উষা।"

সন্ধ্যা তার চিন্তা-স্বপ্ন থেকে সহসা জাগ্রত হ'য়ে বললে, "আজ্ঞে?"

"অলস হ'য়ে বাড়ি ব'সে কী হবে?—একটু বেড়াতে যাবে?"

"কোথায়?"

"এমনি,—পায়ে পায়ে, পথে পথে।"

দুঃখ মনস্তাপের মধ্যে প্রস্তাবটা সন্ধ্যার নিতান্ত মন্দ লাগল না; বললে "চলুন।"

চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, উভয়ে উঠে পড়ল। তারপর বেশভূষা পরিবর্তিত ক'রে পথে বেরিয়ে প'ড়ে উভয়ে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করলে। যেতে যেতে প্রমথ বললে, "উষা' আমাদের জীবনটা একটা অভিনয়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "সত্যি।"

প্রমথ বললে, "আমার সঙ্গে তোমার যে জীবন তাও অভিনয়, আবার প্রিয়লালের সঙ্গে তোমার যে জীবন হবে, তাও হবে অভিনয়। শুধু আমার সঙ্গে হচ্ছে ট্র্যাজেডি, আর তার সঙ্গে হবে কমেডি। বল, ঠিক কি না?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না। নীরবে চলতে লাগল।

"উষা!"

"আজ্ঞে?"

"ব্যাপার কী বল দেখি? একবার মাত্র ডেকে, আর আমাকে প্রমথ দাদা ব'লে ডাকছ না। কামিনীকে ঘরে শোয়াতে রাজি হ'লে না। শেষ পর্যন্ত নকল সম্পর্ক পাতাবারই মতলব নাকি।

সন্ধ্যা তেমনি নীরবে চলতে লাগল। কোন কথা বললে না।

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "তোমার কোনো ভয় নেই উষা, যদিই সে সম্পর্ক পাতাও, তার কপট অভিনয় চলবে একমাত্র মানদা মাসীদের দলের সামনে; তোমার আমার মধ্যে চলবে বন্ধুর সহিত বন্ধুর অকপট অভিনয়। তোমার ভয় নেই।"

এ কথাতেও সন্ধ্যা কোনও কথা কইলে না, নতমুখে প্রমথর পাশে পাশে চলতে লাগল। আধ মাইলটাক পথ অতিক্রম করবার পর একটা বড় বাদ্যযন্ত্রের দোকানের সম্মুখে তারা উপনীত হলো।

প্রমথ বললে, "চল উষা, এই দোকান থেকে দু' একটা যন্ত্র কেনা যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "কেন, কী হবে?"

"অবশ্য, বাজানো হবে।"

"কে বাজাবে?"

"ধর, কখনও কখনও আমিও বাজাব।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাজাতে পারেন ?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "পারিনে, কিন্তু বাজাই।"

উত্তর শুনে সন্ধ্যার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হলো; বললে, "কিন্তু আমার জন্যে যদি হয়, তা হ'লে এ-সব কেনবার কোনও দরকার নেই। মিছে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবেন না।"

প্রমথ বললে, "মিছে কেন বলছ, উষা ? আর নষ্টই বা কেন বলছ ? আমার তো মনে হয় দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ ভুলে থাকবার পক্ষে সঙ্গীতের চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু নেই। তোমার নিঃসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন জীবনে সঙ্গীত একটা বড় রকমের অবলম্বন হবে। লক্ষ্মীটি এস।" ব'লে প্রমথ দোকানের দিকে অগ্রসর হলো। অগত্যা সন্ধ্যাকে অনুসরণ করতেই হলো।

বেছে বেছে প্রমথ একটা হারমোনিয়ম, একটা এস্রাজ, একটা সেতার এবং এক সেট্ বাঁয়া তবলা কিনলে। পরীক্ষা করবার সময় সন্ধ্যার হাতের দুই-একটা টান এবং দু'-চারটে ঝঙ্কার থেকেই প্রমথ তার নৈপুণ্যের পরিচয় পেলে। সকাল সন্ধ্যার সঙ্গীতমুখর গৃহের কথা মনে মনে কল্পনা ক'রে খুসিতে মন ভ'রে উঠল।

দাম হলো সবশুদ্ধ দু' শ' পঁচাশী টাকা। দোকানদারকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বেনারস ব্যাঙ্কের উপর চেক লিখে দিলে চলবে ?"

দোকানদার একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে একজন কর্মচারী ত্বরিত পদে কাছে এসে কানে কানে কী বলতেই দোকানদার প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে বললে, "চলবে।" তারপর ক্যাশমেমো সই ক'রে প্রমথর হাতে দিয়ে বললে, বছর খানেক আগে আমরা যে আপনার জন্যে সাড়ে তিন শ' টাকা দামের একটা বক্স হারমোনিয়ম ক'রে দিয়েছিলাম, সেটা কেমন বাজছে ?"

প্রমথ বললে, "তা তো ঠিক বলতে পারিনে, যাঁর কাছে আছে সেই বলতে পারে। সম্ভবতঃ ভালোই বাজছে। দেখুন, আমাকে আর একটা সেই রকম হারমোনিয়ম করিয়ে দিন। আমি স্বতন্ত্র একটা চেকে পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে যাচ্ছি।"

দোকানদার বললে, "আগাম কিছুই দিতে হবে না। আপনি শুধু আমাকে আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন। হারমোনিয়ম হ'লেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দোবো।"

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বললে, "এত দাম দিয়ে আবার একটা হারমোনিয়ম করতে দিলেন কেন ? ও অর্ডারটা ক্যান্সেল করিয়ে দিন।"

প্রমথ হাসিমুখে বললে, "কিন্তু ও হারমোনিয়মটাও যে তোমারই জন্যে করাচ্ছি এ মনে করছ কিসের জোরে, উষা ?"

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন, সুতরাং চুপ করতেই হলো।

অপরাহ্ণে অনেক সাধ্য সাধনা উপরোধ অনুরোধ ক'রে প্রমথ সন্ধ্যাকে এস্রাজ

বাজাতে রাজি করালে। সোফার উপর বসে সন্ধ্যা একটা ভীমপলশ্রীর আলাপ করছিল, আর প্রমথ তন্ময় হ'য়ে মুদিতনেত্রে ইজিচেয়ারে শুয়ে তাই শুনছিল, এমন সময়ে কামিনী এসে ডাকলে, "বাবা!"

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "কী ?"

"একজন লোক দুটো টেরাঙ্কো নিয়ে এসেছে, নাম বললে শোভরাজ।"

মুহূর্তের মধ্যে প্রমথর মুখের বিরক্তির ভাব অপসৃত হলো; বললে, "শোভরাজ ?" একটু চিন্তা ক'রে বললে, "এইখানেই নিয়ে এস। বিরিঞ্চিকে বল বাক্স দুটো এখানে তুলে আনবে।"

ভীমপলশ্রীর সুমধুর রেশ শূন্যপথে তখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, ছড়টা এস্‌রাজের গায়ে সংলগ্ন করতে করতে সন্ধ্যা বললে, "আমি তা হ'লে ও ঘরে গিয়ে বসি ?"

একটু অন্যমনস্কভাবে প্রমথ বললে, "তুমি ?—আচ্ছা, তাই না হয় একটু বোসো।"

ক্ষণকাল পরে শোভরাজ এসে তার ট্রাঙ্ক দুটি খুলে টেবিলের উপর কুড়ি পঁচিশ খানা জড়োয়া অলঙ্কার সাজিয়ে ফেললে। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্নার বিচিত্র প্রভায় টেবিলখানা অপরূপ রূপ ধারণ করলে।

বহুক্ষণ ধ'রে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা ক'রে প্রমথ তা থেকে পাঁচখানা অলঙ্কার নির্বাচিত ক'রে নিয়ে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হলো। বললে, "উষা, এগুলো তোমার জন্যে নিলাম।"

বিরক্তি-বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কেন নিলেন ? এর তো আমার কোনও দরকার নেই। এ আপনি ফিরিয়ে দিন।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা, ফিরিয়ে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা উষা, তুমি শুধু তোমার নিজের দরকারটাই দেখচ,—আমার দরকার দেখচ না।"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আপনার আবার কী দরকার ?"

প্রমথ বললে, "তোমাকে আমি আমার বাড়িতে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি তার উপযুক্ত সাজ-সজ্জা অলঙ্কার দেওয়ার আমার একটা দায়িত্ব আছে। তার জন্যে তোমার কাছে আমার কোনও জবাবদিহি হয়তো নেই, কিন্তু তুমি ছাড়া আর সকলেরই কাছে আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "এই শুধু আপনার দরকার ?"

প্রমথ বললে, "এ ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তো তা জেনে তোমার প্রয়োজন কী ? যা বললাম তাই কি যথেষ্ট নয় ?"

বিষণ্ন গভীরকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে ফিরিয়ে কাজ নেই, রাখুন।"

প্রমথ বললে, "আর একটা উৎপীড়ন তোমার ওপর করতে হবে, উষা।"

"কি বলুন।"

"নিত্য ব্যবহারের মতো তোমার জন্যে এক সেট সোনার গহনা শোভরাজকে অর্ডার দোবো বলেছি—তার মাপ দিতে হবে।"

"কী ক'রে দোবো বলুন।"

"শোভরাজের কাছে নানা ধাঁচের মাপ আছে, ও-ই মাপ নেবে।"

"তা হ'লে ওর কাছে যেতে হবে কি ?"

"গেলেই ভালো হয়।"

"চলুন, যাই।"

শোভরাজ সন্ধ্যার অলঙ্কারের মাপ নিলে, তারপর জড়োয়া গহনাগুলোর রসিদ নিয়ে মনোনয়নের জন্য সেগুলো রেখে চ'লে গেল।

প্রমথ বললে, "গহনাগুলো একবার পরে দেখবে না উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "বলেন তো পরি।"

সাগ্রহে প্রমথ বললে, "পর না একবার।"

"আচ্ছা আপনি বসুন। আমি প'রে আসছি।"

পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা হাতে পরলে চুনির চুড়ি আর হীরার ব্রেসলেট্, গলায় পরলে মুক্তার হার, কানে পরলে হীরার দুল, আঙুলে পরলে হীরার আংটি। কী মনে ভেবে আরসির সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াল; স্তব্ধ হ'য়ে দর্পণের মধ্যে নিজ মূর্তি দেখতে দেখতে গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তারপর বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল ভালো ক'রে মুছে প্রমথর সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল।

নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থেকে প্রমথ বললে, "উষা, গয়না নিয়ে তোমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে অপরাধ হয় তো কিছু করেছি, কিন্তু তা না করলে আরও কত বড় অপরাধ করতাম জান ? প্রতিমার অঙ্গে রঙ এলিয়ে তারপর সাজ না পরালে কারিগরের যে অপরাধ হয়, আমার সেই অপরাধ হ'তো। বিশ্বাস না হয়, একবার একটা আরসির সামনে গিয়ে দেখে এস।"

কোনও কথা না ব'লে সন্ধ্যা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

"রাগ করেছ, উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"অভিমান হয়েছে ?"

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, হয় নি।"

"তা যদি না হ'য়ে থাকে তা হ'লে তখনকার শেষ-না-করা ভীমপলশ্রীটা আবার আরম্ভ কর না উষা, অবিশ্যি তোমাদের মতে ভীমপলশ্রীর লগ্ন যদি এর মধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়ে না থাকে।" ব'লে প্রমথ এস্রাজটা সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিলে।

এস্রাজটা হাতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যা বললে, "গয়নাগুলো এখন খুলে রেখে দোবো ?"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বললে, "থাক্ না একটু, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। বিশেষ আপত্তি আছে কি ?"

"না, তা নেই।" ব'লে সন্ধ্যা এস্‌রাজ নিয়ে সোফার উপর উঠে বসল। তারপর ছড় দিয়ে তারের উপর একটা টান দিলে, নি সা গা মা পা—

এর পর দিন দুই-তিন ধ'রে অবিশ্রান্ত নানাবিধ দ্রব্যের আমদানিতে গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতে লাগল। লোহার আলমারি, কাঠের আলনা, ক্যাশ্‌ বক্স, গহনার বাক্স, তাঁতের শাড়ী, রেশমি শাড়ী, ব্লাউস্‌পীস্‌, সেলাই কল, গ্রামোফোন, প্রসাধন সামগ্রী,—জিনিস-পত্রের একটা যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ফিরে ফিরে দেখেও, কিন্তু কিছু বলে না।

এক সময়ে তাকে কাছে পেয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বিরক্ত হচ্ছ, উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "বিরক্ত কেন হব ?"

"এই সব জিনিস-পত্র আসছে ব'লে ? কই, আর কিছু প্রতিবাদ করছ না তো ?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর মৃদুস্বরে বললে, "আপনার বাড়ি আপনি জিনিস-পত্রে পূর্ণ করছেন, আমি তাতে প্রতিবাদ করব কেন ?"

গভীর স্বরে প্রমথ বললে, "সে কথা সত্যি, উষা। যদিও ও সমস্তই আমি তোমার জন্যে করছি, কিন্তু বস্তুতঃ এ-সব কিছুই তোমার নয়। কোনও দিন যদি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাইক বরকন্দাজ এসে হাজির হয়, সেদিন তখনি এ খেলাঘর ভেঙে দিয়ে এর সমস্ত জিনিসই পিছনে ফেলে চ'লে যাবে। যে ব্যক্তি এ খেলাঘর গড়বার জন্যে উন্মত্ত হয়েছিল, যাবার তাড়াতাড়িতে হয় তো তার দিকেও একবার ফিরে চাইবার কথা মনে পড়বে না।"

সন্ধ্যা নিমেষের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নতমুখে বললে, "আমাকে কি এমনই অকৃতজ্ঞ মনে করেন ?"

"অকৃতজ্ঞ কেন, উষা ? পাতানো সম্পর্ক তো বেশি দূর পর্যন্ত শেকড় ফেলতে পারে না—তাই টান দিলে সহজেই সমূলে উপ্‌ড়ে আসে। কিন্তু সে যাই হোক —সংসারে তো কোনও জিনিসই চিরদিন থাকে না, শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়ই। আমাদের এ খেলাঘর যতদিন না ভাঙচে ততদিন এর প্রতি একটু মন দাও না ?"

"কী করতে হবে বলুন ?"

প্রমথ হেসে ফেললে ; বললে, "বেশ। আমাকে যদি ব'লে দিতে হয়, তা হ'লে আমাকেই তো মন দিতে হবে। ক্যাশ্‌ বাক্সর টাকা-কড়ি থেকে এক পয়সাও এ পর্যন্ত খরচ করেছ কি ?"

সন্ধ্যার মুখে অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে ; বললে, "করিনি, কিন্তু আজ করব।"

"কোরো।"

প্রমথর মুখের দিকে একবার দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে সন্ধ্যা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "একটা কথা বলব ?"

"বল-না ?"

"এখান থেকে শুনে ঠিক তৃপ্তি হয় না, আজ সন্ধ্যাবেলা ভাগবত পাঠ শুনতে যাব ?"

প্রমথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "নিশ্চয় যাবে। এর জন্যে আবার অনুমতি চাচ্ছ কেন ? তুমি আমার বাড়িতে বন্দিনী, এ ধারণা তুমি মন থেকে মুছে ফেল, উষা। বন্দিনী তুমি নও, তুমি আমার বন্ধু, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা ছাড়া ভাগবত-পাঠ শুনতে যাওয়া তো পুণ্যের কাজ। নিশ্চয় যাবে।"

"আপনি সঙ্গে যাবেন তো ?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "ঐটি পারব না। প্রথমতঃ, ধর্মের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার হাঁফ ধরে ; দ্বিতীয়তঃ, চড়া গলায় কড়া কীর্তন আধঘণ্টার বেশি আমি শুনতে পারিনে, মাথা ধরে। এ তো খুব কাছেই, বলতে গেলে পাশের বাড়ি। তুমি কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। মেয়েদের বসবার জায়গায় বোসো, কোনও অসুবিধে হবে না।"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।" তারপর প্রমথর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাড়িতে থাকবেন ?"

"হ্যাঁ, বন্ধুহীন একা !"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এর জন্যে আপনার খাওয়া-দাওয়ার দেরি হয়ে যাবে না ?"

প্রমথ বললে, "কিচ্ছু দেরি হবে না, তুমি এলে দু'জনে এক সঙ্গে খাব। আর, 'দাওয়া' তো আলাদা আলাদা ঘরে, কিন্তু তার আগে একটা বেহাগের আলাপ শুনিয়ে দিতে হবে।"

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "দোবো।"

তেইশ

সন্ধ্যার পর কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা যখন ভাগবত-সভায় উপস্থিত হ'লো তখন সবেমাত্র পাঠ আরম্ভ হয়েছে। চক্‌মেলান প্রশস্ত গৃহাঙ্গন। দুই দিকের বারান্দায় স্ত্রীলোকদের বসবার জায়গা, এবং একদিকের বারান্দায় এবং প্রাঙ্গণে পুরুষদের। পুণ্যকথা-শ্রবণোৎকর্ণ নরনারীতে সমস্ত স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে জন্য সন্ধ্যার কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হ'লো না ; তার দেহের লাবণ্যে এবং বস্ত্রালঙ্কারের আভিজাত্যে আকৃষ্ট হ'য়ে পুরমহিলাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হ'য়ে এসে সযত্নে তাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সম্মুখ শ্রেণীতে স্থান ক'রে বসিয়ে দিলে।

ভগবত-পাঠকের নাম শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। কাব্যে এবং ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে অসামান্য অধিকার। তর্ক-

দর্শন-তীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট উপাধি আছে, কিন্তু নামের পশ্চাতে কখনও সেগুলি ব্যবহার করেন না, সবগুলিই উপাধিপত্রের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে—বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে উপাধিটি। কেহ সে বিষয়ে উল্লেখ করলে মৃদু হাস্য করেন, পীড়াপীড়ি করলে বলেন, গ্রহণ ক'রে যে অন্যায় করেছি ঘোষণা ক'রে তাকে বাড়াতে চাইনে।

পাঠকর্তার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর; সুগঠিত নাতিপুষ্ট উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ; চক্ষে প্রতিভার প্রদীপ্ত দীপ্তি; সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া নির্মলতা এবং অধ্যাত্ম বৈভবের সুস্পষ্ট সুষমা। রঘুনাথের কণ্ঠে পুষ্পপত্রখচিত মাল্য, ললাট ও বাহু চন্দনচর্চিত, পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের রেশমের ধুতি এবং উত্তরীয়। সম্মুখে তুলসীবৃক্ষ তলে শালগ্রাম শিলা। কাষ্ঠাসনে উপবেশন ক'রে সুস্পষ্ট সুমিষ্ট কণ্ঠে রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করছেন—প্রথমে মূল শ্লোক, তারপর অন্বয়, তারপর অনুবাদ, সর্বশেষে টীকা। সূর্য্যকিরণের প্রভাবে পদ্মকোরকের দলগুলি যেমন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হ'য়ে যায়, সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যার প্রভাবে ভাগবতের শ্লোকসমূহ তেমনি তাদের অর্থ এবং মর্মের কোষগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে—কোথাও বিন্দুমাত্র জটিলতার আবরণ থাকচে না। বিদ্বান মূর্খ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পুরুষ স্ত্রীলোক সকলের মনে এক পরিতৃপ্তি, এক আনন্দ।

ব্যাখ্যার স্থানে স্থানে রঘুনাথ গান গাচ্ছেন। কণ্ঠের ধ্বনি সুমিষ্ট সুগভীর—গমক, গিটকারী, মীড় মূর্চ্ছনায় সম্পন্ন; শুনলে সন্দেহ থাকে না যে একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী।

পাঠ শেষ হবার পর রাত্রি সাড়ে নটার সময়ে সন্ধ্যা গৃহে ফিরল; চক্ষে অশ্রুর আমেজ, বক্ষে উদ্বেল আবেগ। গৃহে উপনীত হ'য়ে দেখলে প্রমথ বেরিয়েছে, তখনও ফেরেনি। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার ছিল, তার মধ্যে দিলে অবশ দেহটাকে এলিয়ে। স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে দুই চক্ষু বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। কিছুক্ষণ সেইভাবেই কাটল, তারপর সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনতে পেয়ে চক্ষু মার্জিত ক'রে উঠে দাঁড়াল।

প্রমথ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে বললে, "কী উষা? এখানে এসে দাঁড়িয়ে যে?"

সন্ধ্যা বললে, "এমনি।"

"ভাগবত কেমন লাগল?"

"বেশ লাগল।"

"আর ক'দিন হবে?"

"আর চার দিন। আসছে বুধবারে পূর্ণিমার দিন উদ্‌যাপন।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "এ কদিন আমি যাব?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে তোমরা যতই লাফালাফি কর-না কেন, উষা, শেষ পর্যন্ত ও জিনিষ তোমাদের

খাতে সইবে না। তোমরা লতার জাত, পাদপকে আশ্রয় ক'রেই চিরকাল থাকবে। আমি তো বলেছি তোমাকে, এ বাড়িতে তুমি যখন বন্দিনী নও তখন এ রকম অনুমতি চাইবার কোনও প্রয়োজন নেই। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তা হ'লে নিশ্চয় যাবে।"

ইচ্ছে! পরদিন সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার কাটল ভাগবত পাঠের অধীর প্রতীক্ষায়! দিন যেন আর শেষ হ'তে চায় না, সন্ধ্যা যেন আর আসে না! শেষ পর্যন্ত যথা-কালের জন্য ধৈর্য কিছুতেই রাখা গেল না। কয়েকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করতে প্রমথ বাইরে গিয়েছিল, তার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা ভাগবত-সভায় উপস্থিত হ'লো। চতুর্দিকে চেয়ে দেখলে সে-ই প্রথম, বাইরের শ্রোতাদের মধ্যে আর কেউ তখনও উপস্থিত হয়নি। নিজের অধীরতার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে মনে মনে একটু লজ্জিত হ'লো খুসিও হলো এই মনে ক'রে যে, যে-বস্তু তাকে এমন ক'রে আকৃষ্ট করছে, চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে তার প্রতি তার শ্রদ্ধারও অন্ত নেই। মনে বাইরে এমন সামঞ্জস্যের তৃপ্তি বহুকাল সে উপভোগ করেনি। গত রাত্রে যে সভাগৃহে সে এই নূতন আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিল আজ তার জনহীন নির্বাক আবেষ্টনীও তাকে কম পরিতুষ্ট করলে না।

মহিলাদের বসবার সম্মুখ বারান্দায় প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থলে সন্ধ্যা স্থান অধিকার ক'রে বসল। পূর্বদিনের সেই স্ত্রীলোকটি দেখতে পেয়ে সন্ধ্যার পাশে এসে উপবেশন ক'রে সহাস্যমুখে বললে, "কাল আপনি এসেছিলেন খুব দেরী ক'রে, আজ এসেছেন সকলের আগে—আপনার যে খুব ভালো লেগেছে, তা বুঝতে পারছি!"

সলজ্জমুখে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। এত ভালো জিনিষ আমি এর আগে আর কখনও শুনিনি।"

স্ত্রীলোকটি বললে, "সে কথা এক হিসেবে সত্যি। এত বড় ভাগবত-পাঠক সারা বাংলা দেশে আর নেই বললে চলে। তার ওপর কী চমৎকার গান গাইতে পারেন দেখেছেন?"

সন্ধ্যা বললে, "ভারি চমৎকার! আমার মনে হয় এত বড় গাইয়েও আমাদের বাংলা দেশে খুব বেশি নেই। আচ্ছা, ইনি কোথায় থাকেন?"

স্ত্রীলোকটি বললে, "নবদ্বীপে।"

"নবদ্বীপে কী করেন?"

"নবদ্বীপে এঁর আশ্রম আছে—সেখানে ইনি শিষ্যদের পড়ান, নিজেও পড়েন, তাছাড়া দুঃখী দুর্ভাগাদের আশ্রয় দেন, সেবা করেন। শুনেছি বিয়ে করবার পীড়া-পীড়িতে বিরক্ত হ'য়ে বাইশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে বৈরাগী হন। সেই থেকে বরাবর নবদ্বীপে আছেন। এত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত আর সাধু বৈষ্ণব নবদ্বীপে ইনি ছাড়া আর খুব বেশি নেই।"

শেষের দিকের সব কথা সন্ধ্যা মন দিয়ে শুনল কি-না বলা যায় না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "নবদ্বীপে এঁর আশ্রমে মেয়েরা কেউ আছেন কি?—শিষ্যদের মধ্যে, কিংবা সেবকদের মধ্যে?"

স্ত্রীলোকটি বললে, "তা তো ঠিক বলতে পারিনে, তবে থাকাই সম্ভব। কারণ এত বড় চরিত্রবান সংযমী মহাপুরুষের কাছে মেয়েদের আশ্রয় তো পাকা।"

"ইনি এখানে কোথায় থাকেন?"

"এখানে? এই বাড়িতেই থাকেন। ঐ যে পূর্বদিকের বারান্দায় কোণের ঘর দেখচেন, ঐ ঘরে থাকেন। সব সুদ্ধু চারখানা ঘর ওঁর ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়েচে। কেন? ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান না কি?"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

এর পর কথোপকথন তেমন আর জমল না, সন্ধ্যা অবিরত অন্যমনস্ক হ'তে লাগল; ওদিকে মেয়েরাও একে একে আসতে আরম্ভ করেছিলেন; স্ত্রীলোকটি বললে, "চললুম ভাই, ওঁদের বসাইগে; আবার আসব অখন।"

এ কথারও একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সন্ধ্যার ভুল হ'য়ে গেল, চিন্তাচ্ছন্ন মনে স্তব্ধভাবে ব'সে রইল।

সেদিন পাঠ-শেষে একটা গভীর স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে সন্ধ্যা বাড়ি ফিরল। দীর্ঘ-কালব্যাপী পাঠের মধ্যে কোন্ সময়ে ঠিক কী ভাবে এ স্বপ্ন সে দেখেছিল তা মনে পড়ে না, কিন্তু সেই অস্পষ্ট অনির্ণেয় স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে মন উত্তরোত্তর চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর হ'য়ে উঠতে লাগল। আহার বিহার, কাজ কর্ম, কথাবার্তার মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও তার বিরাম নেই।

এমনি ভাবেই আরও দু'দিন কেটে গেল, অবশেষে এল বুধবার, ব্রত উদ্যাপনের দিন। দীর্ঘ তিন মাস পূর্বে এক পূর্ণিমা তিথিতে এই পাঠ আরম্ভ হয়েছিল, আজ পূর্ণিমায় তার পরিসমাপ্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে অংশটুকু বাকি ছিল তা বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সেটুকু শেষ ক'রে রঘুনাথ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার উদার আদর্শ-বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সংসারনিস্পৃহ কৈবল্যকামী আদর্শ বৈষ্ণবের বৈরাগ্যমধুর অথচ সেবানিরত জীবনযাপনের বিষয়ে সে কী বিচিত্র অভিভাষণ! পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো সে জীবনের অবস্থান আছে; কিন্তু আসক্তি নেই, ঔদাস্য আছে; কিন্তু আলস্য নেই, কর্ম আছে, কিন্তু লোভ নেই। যে ধর্মকে অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণব এই ভাবে দিনাতিপাত করেন, রঘুনাথ তাকে উপমিত করলেন মহাসিন্ধুর সহিত। মহাসিন্ধুর মতোই সে ধর্মের বিস্তৃতি, মহাসাগরেরই মতো গভীরতা; মহাসিন্ধুর গর্ভের মতোই সে ধর্মের গর্ভে মানুষের দুঃখ-দৈন্য পাপ-তাপ সমস্ত নিমজ্জিত হ'য়ে যায়, আর মহাসিন্ধুরই মতো উপরে প্রবাহিত হয় জ্ঞানসূর্যকিরণে আনন্দের সমীরণ! বৈষ্ণব-ধর্মের মতো মানুষের এত বড় আশ্রয় আর কিছু নেই। কোনও অবস্থাতেই বৈষ্ণব-ধর্ম মানুষকে অস্বীকার

করে না—তার পাপ পুণ্য, দুঃখ দৈন্য, ত্রুটি বিচ্যুতি সমস্তর সঙ্গেই সে তাকে স্বীকার করে। তাই সে ধর্ম মানুষকে শাস্তি দেয় না, শোধন করে; তিরস্কৃত করে না, পরিষ্কৃত করে; বর্জন করে না, আশ্রয় দেয়। দুঃখ গ্লানি নৈরাশ্যে যে জীবন নিষ্ফল হবার উপক্রম করেছে মানব কল্যাণের মহত্তর কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ক'রে তাকে সার্থক ক'রে তোলে। তাই এ ধর্ম জাতি-কুল-গোত্রনির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বের মানবসমাজের দিকে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে আহ্বান করছে; বলছে—এস এস; দুঃখী এস, সুখী এস, আর্ত এস, সমর্থ এস, পাপী এস, পুণ্যাত্মা এস; আমার আশ্রয়ে এসে সকল সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে লঘু হও, মুক্ত হও—পরমা শান্তি লাভ কর!

সভা শেষ হ'য়ে গেছে। রঘুনাথ তাঁর বিশ্রামকক্ষে গিয়ে শ্রান্তি অপনয়ন করছেন, শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করেছে, সন্ধ্যা কিন্তু তার স্থানে অনড় স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে। চক্ষে অশ্রু, বক্ষের মধ্যে দুরন্ত ঝটিকা।

কামিনী এসে ডাকলে, "মা।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে কামিনীর দিকে চেয়ে দেখে সন্ধ্যা বললে, "কী?"

"ভাগবত তো শেষ হ'য়ে গেছে, রাত হয়েছে বাড়ি চলুন।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "কামিনী, পাঠক-ঠাকুর এখন কোথায় আছেন জান?"

কামিনী বললে, "জানি বই কি মা। ঐ যে কোণের ঘরে ব'সে আছেন, পর্দার ফাঁক দিয়ে ঐ যে একটু-একটু দেখা যাচ্ছে।"

"ওঁর কাছে গিয়ে বলতে পার, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে চায়?"

কামিনী ঘাড় নেড়ে বললে, "তা পারি। আপনি দেখা করবেন না কি মা?"

"হ্যাঁ।"

কামিনী রঘুনাথের কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'লো।

কামিনীর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা রঘুনাথের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে বারান্দায় দেখতে পেয়ে বললে, "মা, ঠাকুরমশাই আপনাকে ডাকছেন।"

সন্ধ্যা ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখলে দর্শনপ্রার্থিনীর অপেক্ষায় রঘুনাথ সহাস্যমুখে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা চেয়ার নির্দেশ ক'রে তিনি বললেন, "বোসো মা, বোসো, ঐ চেয়ারটায় বোসো।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে অবনত হ'য়ে রঘুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করলে।

অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে রঘুনাথ বললেন, "এ ভালো নয় মা, তুমি আমার পায়ে হাত দিলে কেন?—সাধারণ নমস্কার করলেই তো চলত।" তারপর

পুনরায় পূর্বের সেই চেয়ারটা নির্দেশ ক'রে সন্ধ্যাকে উপবেশন করতে বললেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করলে সন্ধ্যা সঙ্কুচিত হ'য়ে চেয়ারে উপবেশন করল।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও, মা, তুমি আমার কাছে ?"

রঘুনাথের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে সন্ধ্যা বললে, "আশ্রয়।"

বিস্মিতকণ্ঠে রঘুনাথ বললেন, "আশ্রয় ? আশ্রয়ের দ্বারা তুমি কী বলতে চাও তা তো ঠিক বুঝতে পারছিনে মা ?"

"আপনি আমাকে আপনার নবদ্বীপের আশ্রমের একজন সেবিকা ক'রে নিন—একজন দাসী।"

"কিন্তু তুমি আমার আশ্রমের দাসী কেন হবে, তাতো আরও বুঝতে পারছিনে মা! তোমার আকৃতি বেশভূষা দেখে তোমাকে তো রাজরাণী ব'লে মনে হয়!"

সন্ধ্যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ; কম্পিত দুঃখার্ত কণ্ঠে সে বললে, "এ বেশভূষা আমার নয়, আমার কাছে এর কোনও মূল্য নেই,—এ সাজানো জিনিষ! আপান আমাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিন, আমি সত্যিই আশ্রয়হীন। আজ আপনার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার মতো হতভাগিনীর জীবনও একেবারে অসার্থক না হ'তে পারে, কিছু প্রয়োজন তারও থাকতে পারে। আপনি আমাকে আপনার আশ্রমের সেবিকা ক'রে নিন!"

সন্ধ্যার দুস্থ অবস্থা দেখে রঘুনাথের মুখেচক্ষে গভীর সহানুভূতির চিহ্ন ফুটে উঠল ; স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "তুমি বিচলিত হয়েছ, মা, একটু সংযত হ'য়ে নাও, তারপর তোমার সকল কথা শুনব। যে গৃহত্যাগী হ'য়ে সংসার ছেড়ে আসতে উদ্যত হয়েছে সংযম তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে আমার হরিদাসকে বারান্দায় বসিয়ে আসছি, যাতে হঠাৎ কেউ এসে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।" ব'লে রঘুনাথ কক্ষের বাইরে চ'লে গেলেন, তারপর মিনিট দুই তিন পরে ফিরে এসে বললেন, "আচ্ছা মা, এবার তুমি বেশ সংযত হ'য়ে তোমার আর যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।"

তখন সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তার দুঃখময় জীবনের ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লে গেল—তার প্রয়োজনীয় অংশ কিছুই বাদ দিলে না, অনাবশ্যক অংশও বিবৃত করলে না।

গভীর মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শুনে রঘুনাথ বললেন, "কিন্তু তুমি কী তোমার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার জন্যে আর চেষ্টা করতে চাও না ?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"বাপের বাড়িও যেতে চাও না ?"

"না।"

"যতদূর শুনলাম আর বুঝলাম, প্রমথবাবু তোমাকে একটা বিশেষ রকম অবাঞ্ছনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে তোমার উপকার করেছেন। তোমার প্রতি আচরণও তাঁর যৎপরোনাস্তি ভালো। তবে তুমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে আসতে চাচ্ছ কেন?

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সন্ধ্যা বললে, "প্রমথবাবু আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, আর আমার প্রতি তাঁর আচরণ খুব ভালো এ নিশ্চয়ই সত্যি—কিন্তু এই কপট জীবন ধারণ ক'রে আমি বেশি দিন বাঁচব না—এ আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে!"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রমথবাবু সম্মত হবেন তো মা?"

"নিশ্চয় হবেন। আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি কখনও বাধা দেবেন না, একথা বার বার বলেছেন।"

"কিন্তু তোমার এরূপ আচরণে তিনি দুঃখ পাবেন ব'লে মনে কর না কি?"

একটু চিন্তা ক'রে ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "তা হয়তো একটু পাবেন, কিন্তু উপায় কি?" তারপর সংশয়-ব্যাকুল স্বরে বললে, "এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তবে কি আমাকে আশ্রয় দিতে আপনি রাজি নন?"

সন্ধ্যার কথা শুনে রঘুনাথ মৃদু হাস্য ক'রে বললেন, "তুমি যে অতিশয় বুদ্ধিশালিনী মেয়ে তা আমি তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা করবার শক্তি থেকেই বুঝতে পেরেছি, তাই তোমাকে এত অল্প কথা জিজ্ঞাসা করলাম; অপর কেহ হ'লে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'তো।"

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে আমাকে গ্রহণ করলেন তো আপনি?"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললেন, "হ্যাঁ মা, তোমাকে আমি সাদরে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম। শাস্ত্র চর্চা তো নীরস বস্তু, সেবা-ব্রতের মধ্যে সরসতার অন্ত নেই। পূর্বজন্মে নিশ্চয় কোনও পুণ্য অর্জন করেছিলাম, আজ তাই আমার হাতের সেবা গ্রহণ করবার জন্যে বাসুদেব তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার সেবা ক'রে আমি ধন্য হব, মা।"

রঘুনাথের কথা শুনে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে এল; বললে, "ও কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না!"

রঘুনাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, "তুমি জানো না মা, তাই ভাবছ, এ আমার অত্যুক্তি কিংবা অন্যায় উক্তি। কিন্তু আর কিছুদিন পরে তুমিও বুঝবে যে সেবা করতে পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য বৈষ্ণবের কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু সে কথা যাক—আমি তো আজ রাত্রেই বারোটার গাড়িতে নবদ্বীপ যাচ্ছি—তুমি কবে, কী রকম করে যাবে?"

সন্ধ্যা বললে, "আমিও আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে যাব ?"

"হয়ে উঠবে ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে।"

রঘুনাথ বললেন, "তবে আর বিলম্ব কোরো না—প্রস্তুত হ'য়ে এস। জিনিস-পত্র কিছু এনো না, সংসার ত্যাগ ক'রে আসবার সময়ে একবস্ত্রে আসতে হয়। দেহে যা থাকবে তা অবশ্য আনতে পারো—কিন্তু বহন ক'রে কিছু এনোনা। তোমার নিত্যকার যা কিছু প্রয়োজনের বস্তু সবই আশ্রম থেকে পাবে—তবে সেখানে গিয়ে দেখবে সে প্রয়োজন অতি অল্প।"

ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রঘুনাথকে প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। তার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক'রে রঘুনাথ বললেন, "বাসুদেবের ইচ্ছায় আশ্রমে তোমার এই যোগদান তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে আর আশ্রমের পক্ষে শুভ হোক, কল্যাণপ্রদ হোক্।"

আর একবার ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রঘুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

চব্বিশ

সন্ধ্যা যখন গৃহে পৌঁছল তখন রাত্রি নয়টা। প্রমথ একটা বিদেশী উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ পাঠে ব্যাপৃত ছিল। স্থানটা খুবই চিত্তচমকপ্রদ, কিন্তু উদরের মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ এমন একটু বেড়ে উঠেছিল যে মনটা ঠিক তার মধ্যে বসছিল না, মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা শীঘ্র এলে মন্দ হয় না, আহারে বসা যায়। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে সন্ধ্যার আবির্ভাবে মনটা খুসি হ'য়ে উঠল ; বললে, "আজ একটু শীঘ্র ফিরেছ ঊষা, আজ শেষ হ'য়ে গেল বুঝি ?"

নিকটে এসে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ।"

"আর অন্য কোন বাড়িতে পাঠ হবে না ?"

"না।" একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার খাওয়া হয়েছে ?"

এ প্রশ্নে একটু বিস্মিত হ'য়ে প্রমথ বললে, "তা কী ক'রে হবে ? তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে কোনও দিন খেয়েচি কি ?"

"তা হ'লে আপনার খাবার দিতে বলি ?"

"আর তোমার ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি আজ একটু জল-টল খেয়ে নোবো —বেশি কিছু খাব না।"

উদ্বিগ্ন মুখে প্রমথ বললে, "কেন, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "না, শরীর ভালো আছে।"

"তবে ?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "আপনি খেয়ে নিন, তারপর সে কথা বলব।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু সে তো আমি পারব না, উষা, উদ্বেগ নিয়ে এক গ্রাসও আমার গলা দিয়ে নাববে না। কী কথা, তুমি এখনি বল।"

সন্ধ্যা এক মুহূর্ত নীরবে ব'সে রইল, তারপর প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে বললে, "আমি আপনার কাছ থেকে আজ মুক্তি ভিক্ষে চাচ্ছি।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথর মুখখানা একটু বিবর্ণ হ'য়ে গেল; বললে, "বাঁধন কোথায় যে মুক্তি! কিন্তু সে কথা যাক, আসলে কথাটা কা খুলে বল দেখি?— ভাগবত-সভায় কোনও আত্মীয়-স্বজনের দেখা পেয়েছ?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, তা পাই নি। ভাগবত-পাঠকের সঙ্গে আমি নবদ্বীপ যেতে চাই তাঁর আশ্রমের একজন সেবিকা হ'য়ে।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে প্রমথ বললে, "এই রকম একটা কথা কি তুমি মনে মনে ভাবতে আরম্ভ করেছ, না, তাঁর সঙ্গে ও কথাটা শেষ ক'রেও এসেছ?"

"তাঁর সঙ্গেও কথা কয়েছি।"

"তিনি রাজি আছেন?"

"আছেন।"

"এ সংকল্প কি তোমার একেবারে পাকা, উষা, না এখনও এ বিষয়ে বাদানুবাদের সময় আছে?"

দুঃখ-মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "দেখুন, আপনি আমার পরম উপকারী বন্ধু, আপনার কাছ থেকে আমি যে সদয় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, কিন্তু তবু আপনি আমাকে এ অনুমতি দিন। আমার মনে হয় আশ্রমের সেবাদাসী হ'য়ে আমার এই কদর্য জীবন সামান্য একটুও সার্থক হ'তে পারে।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আঙুল দিয়ে দুই চোখ টিপে ধ'রে নিঃশব্দে ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করলে, তারপর চোখ চেয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমার কাছ থেকে উপকার পেয়ে তুমি যে আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বিদায় নিচ্ছ, উষা, এজন্যে আমিও তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের মন আজকাল এমন শুকিয়ে শক্ত হ'য়ে গিয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা লাভ করাও একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে কথা যাক, আজ তোমার কাছ থেকে যে আঘাতটা পেলাম তা একদিন পেতে হবে ব'লে যদি জানা থাকত তা হ'লে কখনই আমি তোমাকে প্রকাশ দাদার বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আনতাম না। এত বড় নিঃস্বার্থ-পরার্থপর ব্যক্তি আমি নই যে, এতখানি মূল্য দিয়ে পরের উপকার করতে পারি।"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, জড় পদার্থের মতো নিঃশব্দ নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইল।

একটু পরে প্রমথ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলে, "তোমার বোধহয় মনে আছে,

উষা, একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি গন্ত-প্রকৃতির সোজাসুজি লোক, কাব্যগন্ধী কথা শুনতেও ভালোবাসিনে, বলতেও ভালোবাসিনে। কিন্তু মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন দুর্বলতার মুহূর্ত আসে যখন সে নিজেকে হারায়, নিজের প্রকৃতিকে হারায়। আজ মনে হচ্ছে আমারও সেই রকম একটা মুহূর্ত এসেছে। আমি হয়তো আজ তোমাকে কিছু কাব্য-কথা শোনাব, কিন্তু তার আগে ভূমিকার মতো একটা খুব ছোট গল্প শোনাই। একজন অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুর্বৃত্ত লোক ছিল, তার কাজ ছিল সারাদিন তীর ধনুক হাতে বনে বনে পাখী মেরে বেড়ান। প্রাণী হত্যা ক'রে ক'রে তার মন হ'য়ে গিয়েছিল পাথরের মতো কঠিন, তাই কোনও রকম দুষ্কর্ম ক'রে তার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হ'তো না। একদিন তীর ধনুক হাতে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে পায়ে ঠেকল একটা পাথরের নুড়ি; নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে বিরক্ত হ'য়ে সেটা তুলে ধরতেই তার আকৃতি গেল বদলে, চোখ হ'য়ে গেল বড় বড়, মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর আনন্দের দীপ্তি। কত সংখ্যাতীত নুড়ি সে তার জীবনে দেখেচে, কিন্তু এমনটি তো কোনও দিন দেখেনি; একেবারে সুডৌল স্বচ্ছ শ্বেতকান্তি স্ফটিক, কোথাও কোনওখানে তার একটুখানি মলিনতা নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটিকে দেখতে দেখতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল, বাঁ হাত থেকে তীর ধনুক মাটিতে গেল খ'সে; তারপর নদীর জলে নুড়িটিকে পরিষ্কার ক'রে নিতে গিয়ে নিজেও জলের মধ্যে নেবে পড়ল; অবগাহন স্নান ক'রে নুড়িটি নিয়ে সে বনের মধ্যে নিজের আস্তানায় উপস্থিত হ'লো; একটা প্রকাণ্ড বুনো গাছের তলা, কত পাখীর পালক প'ড়ে আছে চতুর্দিকে, এইখানে সে পাখী পুড়িয়ে পুড়িয়ে খায়; সেখানে অমন নির্মল জিনিস রাখতে প্রবৃত্তি হ'লো না, একটা বটগাছ খুঁজে নিয়ে তার তলা পরিষ্কার ক'রে সযত্নে সেখানে সেটিকে স্থাপন করলে; তার পর খেয়াল চাপল, বন থেকে খুঁজে নিয়ে এল ফুল, ফল, দূর্বা, বেলপাতা; তাই দিয়ে পূজো করে, ভোগ দেয়; ভুলে গেল নদীর ধারে ফেলে-আসা তীর ধনুকের কথা। এই রকম করতে করতে একদিন সে হ'য়ে গেল বাবাজী-মহারাজ আর তার নুড়ি হ'য়ে গেল শালগ্রাম শিলা। আমার জীবনেও একদিন ঠিক এমনি একটা ঘটনা ঘটল, উষা! ছিলাম মোদো-মাতাল দুশ্চরিত্র, মেয়েমানুষ শিকার ক'রে ক'রে গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে বেড়িয়ে বেড়াতাম; হঠাৎ হলো প্রকাশ দাদার বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা; নিয়ে এলাম সেখান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে কাশীতে; সব ভুলে গিয়ে তোমাকে নিয়ে মত্ত হলাম; বসন-ভূষণ সাজ-সজ্জা দিয়ে তোমাকে সাজাতে লাগলাম মনের মতন ক'রে; কোথায় অন্তর্হিত হলো এতদিনের অভ্যাসের মদ আর মেয়েমানুষ। আজ আমার শালগ্রাম শিলা হঠাৎ নোটিস দিচ্ছেন যে, তিনি এই অপবিত্র কাশী শহর পরিত্যাগ ক'রে পবিত্র নবদ্বীপধামে আশ্রমবাসিনী হ'তে চলেছেন। এখন ভাবছি কি জানো, উষা? ভাবচি, এই শালগ্রামহীন বাবাজী-মহারাজের কি দশা হবে, এখন কি ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবেন,

না তীরধনুক সংগ্রহ ক'রে আবার ছুটবেন পাখী শিকার করতে। যাক, সে কথা ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে, উপস্থিত তোমার কথা একটু ভাবা যাক। নবদ্বীপ যাওয়া তা হ'লে কবে?"

পাষাণের মতো অসাড় হ'য়ে সন্ধ্যা এতক্ষণ প্রমথর কথা শুনছিল, এক এক সময়ে তার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে সিক্ত চক্ষু-পল্লব অলক্ষিতে বস্ত্রাঞ্চলে মুছে নিয়ে বললে, "আজই।"

"আজই? ক'টার গাড়িতে।"

"রাত্রি বারোটার গাড়িতে।"

পুনরায় ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রমথ বললে, "তা হ'লে তোমার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নাও। সময় তো খুব বেশি নেই।"

একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "জিনিষ-পত্র নিতে পাঠক-ঠাকুর নিষেধ করেছেন।"

"নিষেধ করেছেন? ওঃ, খেয়াল হয়নি! অপবিত্র স্থানের জিনিষপত্রের ছুঁৎ দিয়ে আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করা হবে না! তা হ'লে কি একবস্ত্রেই যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই বলেছেন।"

"মাথার একটা বালিশ, কি গায়ের একটা কাপড়, তাও নেওয়া চলবে না?"

"না।"

"জয়! পাঠক-ঠাকুরজীকী জয়! এখন থেকেই কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হ'য়ে গেল! তা হ'লে আর দেরি না ক'রে একটু যা হয় খেয়ে নাও। না, সে বিষয়েও পাঠক-ঠাকুরজীর নিষেধ আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "আপনার খাবার তা হ'লে দিতে বলি?"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেচ? আমি শুধু শুধু তোমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি খেতে যাব কেন? পাঠক-ঠাকুরজীর জিম্মায় তোমাকে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেতে বসব।"

প্রমথর প্রতি একটা কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে, তারপর মিনিট দশ পনেরো পরে ফিরে এসে দাঁড়াল। মূল্যবান শাড়ী পরিত্যাগ ক'রে একটা মামুলী সুতীর বস্ত্র পরিধান করেছে, দেহে কিন্তু অলঙ্কারগুলো তখনও রয়েছে।

প্রমথ চেয়ে দেখে বললে, "কী প্রস্তুত না কি?"

সন্ধ্যা কোনও উত্তর দিলে না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"চল, তা হ'লে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

একটু ইতস্তত: ক'রে কুণ্ঠিতস্বরে সন্ধ্যা বললে, "গহনাগুলো তা হ'লে খুলে দিই ?"

উঠতে উঠতে প্রমথ ধপ ক'রে সোফার উপর পুনরায় ব'সে পড়ল, মুখে তার ফুটে উঠল একটা মর্মান্তিক বেদনার ছায়া ; বললে, "দোহাই, উষা, তোমার সমস্ত জিনিসই তো ফেলে যাচ্ছ, গা থেকে গহনা খুলে নেবার গ্লানি থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও ! যদি প্রয়োজন মনে কর, ও নিষ্ফল অপয়া জিনিসগুলো পুলের উপর থেকে কাশীর গঙ্গায় ফেলে দিয়ো, কিন্তু আমার হাতে খুলে দিও না !"

আঁচল থেকে চাবির রিং খুলে প্রমথর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "এটা আপনার পকেটে রাখুন।"

চাবির রিংটা হাতে নিয়ে প্রমথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "একটা কথা, উষা। যাবার আগে আমার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে যাও। মাসিক একহাজার টাকা আয়ের আমার কলকাতার একটা বাড়ি তোমার নামে লিখে দোবো বলেছিলাম, আমাকে সে প্রতিশ্রুতি পালন করবার অনুমতি দিয়ে যাও। তার আয় থেকে তুমি আশ্রমেরও তো অনেক প্রয়োজন মেটাতে পারবে, জনসেবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন কম নয়। কিছু আগে কৃতজ্ঞতার কথা তুলেছিলে, সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ যদি শোধ ক'রে যেতে চাও তা হ'লে আমার এই অনুরোধটা রাখো।"

প্রমথর মুখের উপর সজল চক্ষের করুণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।" তারপর অঞ্চল-বস্ত্র গলায় দিয়ে প্রমথকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

প্রমথ বললে, "আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, উষা, যত দুঃখ যত কষ্টই আমাকে তুমি দিয়ে যাও-না কেন, তুমি যেন এবার সুখী হয়ো।"

সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে প্রমথ যখন গৃহ থেকে বহির্গত হলো তখন রাত্রি দশটা।

পঁচিশ

রঘুনাথ আহারাদি শেষ ক'রে বারান্দায় ব'সে তিন চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। প্রমথর সহিত সন্ধ্যাকে দেখতে পে'য়ে লোকগুলি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বসল।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে উঠে সাদরে আহ্বান করলেন, "আসুন, আসুন।" প্রমথর প্রতি সহাস্যে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "প্রমথবাবু নিশ্চয়ই ?"

করজোড়ে নমস্কার ক'রে প্রমথ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই পাপিষ্ঠই বটে। আপনারা সাধু পুরুষ, আমাদের মুখ দেখলেই চিনে ফেলেন।"

রঘুনাথ বললেন, "প্রমথবাবু, শাস্ত্রের মতে নিন্দার ছলে আত্মস্তুতি, আর স্তুতির ছলে পরনিন্দা—উভয়ই নিষিদ্ধ। আপনি নিজেকে পাপিষ্ঠ আর আমাকে সাধু পুরুষ ব'লে উভয়তই শাস্ত্রবাক্যের অপলাপ করছেন।" ব'লে হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

প্রমথ পুনরায় হাত জোড় ক'রে বললে, আপনি বৈষ্ণব, আর আমি শাক্ত, আপনার সঙ্গে বিনয়ে পেরে উঠব কেন? আমার বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিনি, তবে এক হিসাবে আপনি আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতেই আছেন—শুধু আপনি ওপরে আর আমি নিচে।"

রঘুনাথ বললেন, "সে কথা শুনছি, তার আগে এই চেয়ারটায় আপনি বসুন, আর তুমি মা, এই চেয়ারটায় বোসো।" উভয়ে উপবেশন করলে বললেন, "এবার বলুন, কোন্ শ্রেণীতে আপনার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

প্রমথ বললে, "কথাটি শুনতে ভালো নয়, কিন্তু আসলে সত্যি। অভয় দেন তো বলি।"

রঘুনাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, "ভয় দেখালেও আপনি বলবেন, কারণ আমি বৈষ্ণব আর আপনি শাক্ত। তবুও অভয় দিচ্ছি, বলুন।"

প্রমথ বললে, "পথে আসতে আসতে এই মেয়েটির মুখে শুনলাম, ইনি এঁর দুঃখের কাহিনী মোটামুটি সবই আপনাকে জানিয়েছেন। তা হ'লে বুঝতেই পারছেন যে আমি চোর, কারণ প্রকাশবাবুর বাড়ি থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এত বড় বাটপাড় কাশীতে ভাগবত পাঠ করছেন জানলে কি আমি এক দণ্ডের জন্যে কাশীর মাটি মাড়াই মশায়? একেবারে সোজা লক্ষ্ণৌয়ে পাড়ি দিই। এখন বুঝতে পারছেন, কোথায় আমি আর আপনি এক শ্রেণীতে আছি, আর সেখানে কেন আপনি ওপরে আর আমি নিচে?"

প্রমথর কথা শুনে রঘুনাথ হাসতে লাগলেন, বললেন, "এমন সাধু-চোরের ওপর যে বাটপাড়ি করে সে কিন্তু অসাধু, তা সে যতই ভাগবত পড়ুক-না কেন। মা-লক্ষ্মীর নামটি কিন্তু এখনও আমার জানা হয়নি প্রমথবাবু।"

প্রমথ বললে, "এঁর দুটি নাম—উষা আর সন্ধ্যা।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ, যেখানে উনি উদয় হন সেখানে উনি উষা, আর যেখানে অস্ত যান সেখানে সন্ধ্যা।"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললেন, "তা হ'লে আমার আশ্রমে ইনি উষাই হবেন।"

প্রমথ বললে, "তা সত্যিই হবেন। আপনি দেখবেন এঁর প্রভায় আপনার আশ্রম আলোকিত হবে। এমন একটি মেয়ে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় গোঁসাইজী, একেবারে খাঁটি হীরে—কোথাও একটু দাগ-দোগ খুঁজে পাবেন না।"

রঘুনাথ বললেন, "তা বুঝতে পেরেছি। বাসুদেবের কৃপায় আর আপনার অনুগ্রহে এমন রত্ন লাভ করলাম।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বললে, "বাসুদেবের কৃপায় কি-না তা বলতে পারিনে, কারণ বৈকুণ্ঠের কোন খবরই আমি রাখিনে; কিন্তু আমার অনুগ্রহে যে নয় তা হলফ নিয়ে বলতে পারি। রাত হ'য়ে আসচে, আর দুটো কথা আপনার সঙ্গে ক'রে নিয়ে বিদায় হই।"

রঘুনাথ বললেন, "কি কথা বলুন।"

প্রমথ বললে, "আমি তো একটি পয়লা নম্বরের দুরাত্মা ব্যক্তি। আপনার আশ্রমের কোন উপকারেই লাগব না, কারণ সেখানে আমার প্রবেশ-নিষেধ,—কিন্তু উষার জন্যে অথবা আশ্রমের জন্যে যদি কখনো আপনাদের বিশেষ কিছু অর্থের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হয় তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে হুকুম-নামা পাঠাবেন, তামিল করব।"

রঘুনাথ সহাস্যমুখে বললেন, "দুরাত্মা আপনি কার পক্ষে তা জানিনে, কিন্তু আমাদের পক্ষে যে নিকট আত্মীয় হলেন তাতে সন্দেহ নেই। আশ্রমে কারোই প্রবেশ-নিষেধ নেই, আপনার তো নেই-ই। যখনই আপনার ইচ্ছে হবে আমাদের সম্মানার্হ অতিথি হ'য়ে সেখানে যাবেন।"

প্রমথ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি ভদ্রতা ক'রে যেতে বললেন ব'লেই যে আমি যাব ব'লে আপনাকে ভয় দেখাব, ততটা দুরাত্মা আমাকে মনে করবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা শুনুন। অপরাধ নেবেন না গোঁসাইজী, ষোল আনা প্রত্যয় আমার কোন জিনিসেরই উপরে নেই, এমন কি আপনার আশ্রমের উপরেও নয়। তাছাড়া, মানুষের জীবন তো অনিশ্চিতই, তা আমারই বলুন, আর আপনারই বলুন : সেই জন্যে আমি শীঘ্র কলকাতা গিয়ে আমার একটা বাড়ি উষার নামে লিখে দিয়ে দলিলপত্রখানা আপনার কাছে পাঠিয়ে দোবো। সেই দলিলপত্রে লিখিত শর্ত মতো উষা আর আপনি বিষয় এবং আয়ের বিলি ব্যবস্থা করবেন, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিন। উষা সমস্তই ছেড়ে এসেছে, শুধু আমার একান্ত পীড়াপীড়িতে এইটুকুতে রাজি হয়েছে—এজন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

রঘুনাথ বললেন, "আমার প্রতি ভারার্পণ ক'রে আপনি যে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করছেন সে জন্যে আমিও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের ভার থেকে মুক্ত হওয়াই উচিত প্রমথবাবু, ভার বাড়ানো উচিত নয়।"

প্রমথ বললে, "দলিলপত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, তাতে ভার থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাই থাকবে। আমারই কর্মচারী আদায়পত্র ক'রে মাসে মাসে আপনাকে টাকা পাঠাবে—এবং সে টাকার হিসাব-নিকাশ করবার কোন দায়িত্বই আপনার থাকবে না।"

প্রমথ আসন ত্যাগ ক'রে উঠে রঘুনাথকে নমস্কার ক'রে বললে, "চিঠিপত্র লেখালেখি আপনাদের বোধহয় সুবিধে হবে না, নিয়মও হয়তো নেই, দরকারও নেই ; কিন্তু ভগবান না করুন, উষার যদি কখনও তেমন বেশি অসুখ-বিসুখ করে সে কথা আমাকে অবিলম্বে জানাবেন।"

রঘুনাথ বললেন, "নিশ্চয় জানাব।"

সন্ধ্যা উঠে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রমথকে প্রণাম করলে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "বাড়ি গিয়েই খেতে বসবেন।"

পুনরায় রঘুনাথকে নমস্কার ক'রে প্রমথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে চ'লে গেল।

ছাব্বিশ

অবস্থা বিশেষে মানুষে যেমন হাসি দিয়ে কান্না ঢাকবার চেষ্টা করে, ঠিক সেই রকমেই রঘুনাথের কাছে প্রমথ তার দুঃসহ দুঃখটা কৌতুক দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল। পথে বেরিয়ে কিন্তু চিত্তের সেই কৃত্রিম ভাবটা অন্তর্হিত হ'তে এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'লো না। রিক্ততার একটা মর্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় টন্ টন্ করতে লাগল। সন্ধ্যাসহ;বিগত কয়েকদিনের জীবনযাপন মনে হ'তে লাগল যেন একটা নিঃসত্ত্ব সুখস্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে যার অবাস্তবতা সমস্ত মনকে মহাশূন্যতায় ভ'রে দিয়ে গেল। পলে পলে তিলে তিলে যে জিনিসকে সে বহু দুঃখে যত্নে আয়ত্ত ক'রে আনছিল, এক মুহূর্তে তাকে হারাতে হ'লো।

গৃহে ফিরে প্রমথ সোজা সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ড্রেসিং টেবল, সেই কাঠের আলনায় কয়েক খানা কোঁচানো শাড়ী ব্লাউস আর পেটিকোট, পালঙ্কের উপরে সেই শয্যা পাতা। সবই রয়েছে, নেই শুধু সে, যার অভাবে এ সমস্তই বৃথা হ'য়ে গেছে। পিঞ্জর আছে, পাখী নেই; বৃন্ত আছে, ফুল নেই।

শয্যার উপরে প্রমথ তার শিথিল অলস দেহটাকে বিস্তৃত ক'রে দিলে। খাবার দেবে কি-না জিজ্ঞাসা করতে এসে পাচক বিষম তাড়া খেয়ে পালাল, কামিনী আসছিল সন্ধ্যার বিষয়ে কী-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে, প্রভুর রুদ্রমূর্তি দেখে ঘরে ঢুকতে সাহস হলো না, নিঃশব্দে পাচককে অনুসরণ করলে।

শুয়ে শুয়ে প্রমথ কত কী মাথামুণ্ড ভাবতে আরম্ভ করলে, যার না ছিল আদি, না ছিল অন্ত! অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন চিন্তার জাল—কখনও অতীতের স্মৃতি, কখনও বর্তমানের দুঃখ, কখনও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় আর অবস্থিতি। ভাবতে ভাবতে নিজের কথা ভেবে একবার তার ভারি হাসি পেলে। মনে মনে নিজেকে সম্বোধন ক'রে বললে, ছি বাপু প্রমথনাথ, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালি করতে, বেশ ছিলে! হঠাৎ একটা খেয়ালের বশে ভদ্রলোক সেজে এ দুর্গতি কেন টেনে আনলে! ফেরো আবার আগেকার জীবনে, আনো ডাকিয়ে মানদা মাসীকে, কিনতে পাঠাও শোকদুঃখচিন্তা-বিনাশিনী সুধার ভাণ্ডার। তারপর আছে বিনোদিনী, আছে সরমা, আছে সুরমা, আছে রেবতী। কে সন্ধ্যা? কার সন্ধ্যা? কোথায় সন্ধ্যা? সন্ধ্যা রজনীর অন্ধকারে মিশে গেছে!

চিত্তের এক দিক কিন্তু মাথা নেড়ে বলে, না, না, তা হয় না। এতটা এগিয়ে এসে এখন আর পেছন ফেরা যায় না। স্রোতস্বতীর সাক্ষাৎ পেয়ে পঙ্কিল নালার মধ্যে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। তার চেয়ে এবার এক তৃতীয় পন্থা অবলম্বন কর। এবার হিমালয় থেকে কুমারিকা আর মণিপুর থেকে বেলুচিস্থান ঘুরে বেড়াও। এবার পরিব্রাজক শ্রীমৎ প্রমথনাথ স্বামী!

দ্বারের দিকে কিসের খুসখাস শব্দ হ'লো। অল্প একটু মাথা তুলে প্রমথ দেখলে সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। সহসা এক ঝাঁকা দিয়ে টপ ক'রে

শয্যার উপর উঠে ব'সে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "এ কি সন্ধ্যা! তুমি যে আবার এলে ?"

সন্ধ্যা বললে, "দশ দিনের জন্যে ফিরে এলাম।" মুখে তার রহস্য এবং কৌতুকের অনিবারণীয় আভা।

"দশ দিনের জন্যে ফিরে এলে ? জয় বিশ্বনাথ। কিন্তু দশ দিনের জন্যে কেন ? চিরদিনের জন্যে কেন নয় ?" শয্যার একেবারে এক প্রান্তে স'রে গিয়ে অপর প্রান্তে সন্ধ্যাকে বসতে ব'লে প্রমথ বললে, "বোসো বোসো, ভালো ক'রে সমস্ত কথা বল।"

শয্যায় উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমরা যখন গেলাম তখন যে লোকগুলি পাঠকজীর কাছে বসেছিলেন তাঁরা তাঁদের বাড়িতে দশ দিনের পাঠের ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। আপনি চ'লে আসার পরই তাঁদের সঙ্গে কথা পাকা হ'য়ে গেল। পাঠকজী অবশ্য একবার বলেছিলেন যে, আমার থাকবার জন্যে একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিন্তু আমি যখন এই দশ দিন এ বাড়িতে কাটাবার কথা বললাম, তখন তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ভাবলাম, কাশীতেই যখন থাকতে হ'লো তখন পরের বাড়ি থাকি কেন ?"

প্রমথর মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল ; বললে, "বেশ কথা বলেছ। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। সত্যিই তো তোমার নিজের বাড়ি থাকতে পরের বাড়ি থাকতে যাবে কেন ?"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। প্রমথ যে তার কথাটা নিয়ে এমন একটা মোচড় দেবে তা সে আগে বুঝতে পারেনি।

"উষা ?"

"আজ্ঞে ?"

"দশ দিন পরে নবদ্বীপ যাওয়া কি একেবারেই ঠিক ?"

একটু চুপ ক'রে থেকে নতনেত্রে সন্ধ্যা বললে, "উপস্থিত তো ঠিক।"

"তা হোক। আমি মুহূর্তের উপাসক উষা ; মুহূর্তের সুখ মুহূর্তের আনন্দকে আমি উপেক্ষা করিনে। কালকের দুশ্চিন্তায় আজকের দিনকে নষ্ট করা আমি বোকামি মনে করি। এই ধর, কথার কথা বলছি, দশ দিন পরে তুমি যখন চ'লে যাবে তখন তো ঠিক আজকের মতোই দুঃখ পাব ? কিন্তু এমনও তো ঘটা আশ্চর্য নয় যে সে দুঃখ না পেতে পারি। জীবন তো আমাদের অনিশ্চিত উষা ; ধর, দশ দিনের মধ্যে কোনো দিনও আমার যদি মৃত্যু হয়, কথার কথা বলছি, তা হ'লে তো আর আমাকে তোমার চ'লে যাওয়ার দুঃখ ভোগ করতে হবে না। তবেই বুঝে দেখ, দশ দিন পরে যে দুঃখ ঘটবে তার জন্যে আজ হা-হুতোস্মি করার মধ্যে কোনও বুদ্ধির পরিচয় নেই।"

স্তব্ধ হ'য়ে সন্ধ্যা প্রমথর এই গভীর বেদনাত্মক কথা শুনছিল, চোখের কোণ

তার ভিজে এসেছিল। আদ্র নেত্রের চকিত-বিমর্ষ দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য প্রমথর মুখে স্থাপিত ক'রে সে বললে, "জীবনের উপমা দিয়ে কোনও কথাই এ রকম ক'রে বলতে নেই।"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "ক্ষণে-অক্ষণের কথা হঠাৎ লেগে যেতে পারে এই ভয় করছ তো? নিশ্চিন্ত থেকো, অত সুখে-সুখে মরব না—তোমার হাতে অনেক দুঃখ পেতে এখনও বাকি আছে। কিন্তু এ সব কথা পরে হবে, উপস্থিত কাশীর রাবড়ি, চমচম—এই সব ভালো ভালো জিনিস আনাও, ভালো ক'রে খেতে হবে।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা চমকিত হ'য়ে বললে, "আপনি এখনও খাননি নাকি?"

হাসিমুখে প্রমথ বললে, "নিশ্চয় খাইনি, কিন্তু নিশ্চয় খাব! তুমিও খাবে।"

খাবারের ব্যবস্থা করবার জন্য সন্ধ্যা দ্রুতপদে অগ্রসর হলো। প্রমথ ডাক দিয়ে বললে, "উষা, একটা কথা শুনে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আজ আমার যেমন দুঃখের দিন, তেমনি সুখের দিন। আজ আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ করবে?"

কুণ্ঠিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কী বলুন?"

"খাওয়া-দাওয়ার পরে এস্রাজের গোটা দুই আলাপ, আর তোমার গলার গোটা দুই গান শোনাবে? তুমি তো বলেছিলে উষা, ভাগবত শেষ হ'য়ে গেলে শোনাবে—আর আজ না শুনিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছিলে। শোনাবে?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "শোনাব," তারপর দ্রুতপদে নিচে নেমে গিয়ে পাচককে বললে, "ঠাকুর, শীঘ্র বাবুর খাবার উপরে নিয়ে এস।"

পাচক বললে, "মা, একটু আগে বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম, বাবু আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে আজ খাবেন না।"

ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "না খাবেন—নিয়ে এসো।"

"আপনারও তো নিয়ে যাব, মা?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আন।"

সাতাশ

সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত ভাবে ঘটনার সমাবেশ হয় যে, মনে হয় এ যেন আপন খেয়ালে ঘটেনি, কোনো অদৃশ্য নিয়ন্তার ইচ্ছার বশে ঘটেছে। দু'দিন পরে অপরাহ্নের দিকে অতিশয় কম্প দিয়ে প্রমথর যখন জ্বর এল তখন অন্ততঃ সন্ধ্যার মনে হলো, হয়তো এমনি একটা ঘটনাই ঘটবার উপক্রম করছে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, মনে হলো কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে!

একটা মোটা র‍্যাগে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে বালিসে ভর দিয়ে প্রমথ সোফার উপর শুয়ে ছিল ; চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। সন্ধ্যা এসে বললে, "চলুন, ওঘরে বিছানায় শোবেন চলুন।"

রক্তবর্ণ চক্ষু সন্ধ্যার মুখে স্থাপিত ক'রে প্রমথ বললে, "কার বিছানায় ? তোমার ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় শোবে ?"

সন্ধ্যা বললে, "সে রাত্রের কথা রাত্রে হবে, এখন তো আপনি চলুন।"

সমস্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে ভালো ক'রে শয়ন করবার জন্য ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল. উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথ বললে, "চল।"

প্রমথ শয্যায় শয়ন করলে সন্ধ্যা ভালো ক'রে দু'খানা র‍্যাগ তার গায়ে দিয়ে দিলে, তারপর অডিকলোনের জল ক'রে কপালে জলপটি দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে মাথার শিয়রে বসল।

"উষা।"

"আজ্ঞে ?"

"কোনও দিন বোধহয় ভুলে বড় রকমের একটা পুণ্যের কাজ করেছিলাম—তাই এ অসুখটা আজ হলো।"

সন্ধ্যা কোনও কথা কইলে না, চুপ ক'রে রইল।

"কেন বুঝতে পেরেছ ?"

সন্ধ্যা বললে, "পেরেছি, আপনি চুপ ক'রে থাকুন, কথা কইবেন না।"

প্রমথ কিন্তু কথাটা শেষ না ক'রে ছাড়লে না ; বললে, "তাই তোমার হাতের এত মিষ্টি সেবা পেলাম।" তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু তাই ব'লে মনে কোরো না, সে পুণ্যটা এত বেশি যে, সেদিনকার সে কথাটাও ফ'লে যাবে। দেখো, শেষ পর্যন্ত সেরেই উঠব।"

সন্ধ্যার মুখে গভীর বেদনার রেখা ফুটে উঠল। আর্ত কণ্ঠে সে বললে, "আপনি চুপ করবেন কিনা বলুন।"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, চুপ করলাম। চুপ করতেই তো চাই, কিন্তু জ্বরের ধমকে কথাগুলো কেমন আপনি যেন বেরিয়ে আসে।"

সন্ধ্যা মনে মনে সকাতরে তার অন্তরের ঐকান্তিক প্রার্থনা জ্ঞাপন ক'রে বললে, 'হে বাবা বিশ্বনাথ। দয়া করো ঠাকুর! নইলে এ মুখ দেখাবার আর কোনও উপায়ই থাকবে না।'

"মা।"

সন্ধ্যা তাকিয়ে দেখলে, দ্বারের কাছে কামিনী দাঁড়িয়ে। উঠে গিয়ে বললে, "এনেছ ?"

হ্যাঁ,, মা, এনেছি," বলে কামিনী একটা থার্মোমিটার সন্ধ্যার হাতে দিলে।

প্রমথ তাকিয়ে দেখে বললে, "ওটা কী উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "থার্মোমিটার।"

"আনালে ?"

"হ্যাঁ।"

থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পরীক্ষা ক'রে সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে গেল। জ্বর প্রায় ১০৫ ডিগ্রি।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "কত দেখলে ? খুব বেশি, না ?"

সন্ধ্যা বললে, "না, এমন-কিছু বেশি নয়।" কিন্তু সন্ধ্যা যে সত্য কথা অনেকখানিই গোপন করলে তার মুখ দেখে প্রমথর বুঝতে বাকি রইল না।

থার্মোমিটার তুলে রেখে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে নিচে গিয়ে কামিনীকে বললে, "কামিনী, বাবুর বড় বেশি অসুখ। তুমি মানদা মাসীর কাছে গিয়ে বল যে, তিনি যেন শীঘ্র একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে এখানে আসেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই মানদা একজন বিচক্ষণ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো। ডাক্তার ভালো ক'রে রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে গোটা দুই প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিলেন।

সন্ধ্যা এসে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন দেখলেন ?"

ডাক্তার বললেন, "উপস্থিত ভয়ের কোন কারণ নেই, কিন্তু আপনার স্বামীর হার্ট তেমন সবল নয়। একেবারে ওঠা-বসা করতে দেবেন না, তা ছাড়া অবিরত মাথায় বরফ দিতে হবে, অডিকলোনে চলবে না। জ্বর একশ দুয়ের নিচে নামলে বরফ বন্ধ করবেন। মনে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। কাল রক্ত পরীক্ষা করাব।"

পথ্যাদির ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার চ'লে গেলে সন্ধ্যা ঔষধ-পত্রের একটা ফর্দ ক'রে মানদার হাতে দিলে। একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে, "শীঘ্র এগুলো আনিয়ে দিন।"

ঔষধাদি এলে একটা ছোট টেবিলের উপর সন্ধ্যা সেগুলো সাজিয়ে ফেললে।

সমস্ত রাত ঔষধ পথ্য আর বরফ চলল। রাত দুটোর সময় প্রমথ তাকিয়ে দেখলে তার মাথায় বরফের টুপি ধ'রে সন্ধ্যা ব'সে রয়েছে। ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "এখনও ব'সে আছ, উষা ? বিরিঞ্চিকে কি ঠাকুরকে ধরতে দাও না একটু।"

সন্ধ্যা বললে, "ওরা এসব পারবে কেন ? আপনি ঘুমোন, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

মেঝেয় বিছানা পেতে মানদা ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে প্রমথ বললে, "মানদামাসীকে একটু দাও না।"

সন্ধ্যা বললে, "একটা লোক ঘুমোচ্ছে, অনর্থক তার ঘুম ভাঙিয়ে কী লাভ হবে ?"

প্রমথ একটু হাসলে ; বললে, "কিন্তু সমস্ত রাত জেগে ব'সে থেকে তোমারই বা কী লাভ হবে বল ?"

সন্ধ্যা কোন উত্তর দিলে না—বরফ বদলে আনবার জন্যে টুপিটা নিয়ে উঠে গেল।

প্রত্যূষ পাঁচটার সময় সন্ধ্যা থার্মোমিটার নিয়ে দেখলে জর একশ এক-এর কাছে নেবে গেছে। টুপি থেকে বরফ ফেলে দিয়ে টুপিটা রেখে ফিরে এসে দেখলে প্রমথ তারই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছিল, একটা র‍্যাগ আস্তে আস্তে গা থেকে তুলে দিলে। তারপর মানদার পাশে একটা মাদুর পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

দু'দিন অসুখটা খুব বেশি চলল। তারপর ক্রমশঃ ক'মে ক'মে ছ'দিনের দিন জর ছেড়ে গেল। বেলা দশটার সময় সন্ধ্যা প্রমথকে হরলিক্‌স্ ক'রে খাওয়াবার উপক্রম করছে, এমন সময় একটা পিতলের পরাতে নৈবেদ্য নিয়ে কামিনী প্রবেশ ক'রে বললে, "মা, পূজো দিয়ে এলুম।"

সন্ধ্যা উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে কামিনীর হাত থেকে পরাতটা নিয়ে ঘরের এককোণে রাখলে। তারপর তা থেকে একটি ফুল আর বিল্বপত্র তুলে নিয়ে প্রমথর মাথায় ছুঁইয়ে দিলে। একটুখানি চিনি নিয়ে প্রমথকে বললে, "হাঁ করুন।" প্রমথ হাঁ করলে তার মুখে চিনিটুকু ফেলে দিয়ে হাতটা নিজের মাথায় বুলিয়ে নিলে। তারপর ফীডিং কাপে হরলিক্‌স্ ঢেলে প্রমথকে খাওয়াতে উদ্যত হলো।

হরলিক্‌স্ খাওয়া শেষ হ'লে প্রমথ সন্ধ্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "অনাহারে অনিদ্রায় নিজের শরীরপাত ক'রে, দেবতার পায়ে মাথামুড় খুঁড়ে আমাকে তো বাঁচিয়ে তুললে উষা, কিন্তু এ অসার অপদার্থ বস্তু তোমার কোন্ কাজে লাগবে তা তো ভেবে পাচ্ছিনে একটুও।"

সন্ধ্যা বললে, "শরীর আপনার অতিশয় দুর্বল, এ সব কথা এখন ভাববেন না।"

প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "ভাবব না সে কথা কেমন ক'রে বলি, তবে বলব না না-হয়। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ উষা, শরীর আমার অতিশয় দুর্বল হয়েছে। মাত্র দিন ছয়েকের জর, শরীরটা কিন্তু একেবারে গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে। তুমি না থাকলে এবার লম্বা পাড়ি দিতে হতো। ভাগ্যিস দিন কতকের জন্য ফিরে এসেছিলে—তাই।"

কথাটা যে একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, এ বিশ্বাস সন্ধ্যারও ছিল। নিরবসর সতর্ক সেবার মধ্যে সামান্য অবহেলা হ'লেও সে কঠিন রোগ বোধহয় একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যেতে পারত। শুশ্রূষার অকুণ্ঠিত প্রশংসা করবার সময় ডাক্তারও সেই মর্মে ব'লে গিয়েছিলেন। তাই প্রমথর কৃশ দেহ এবং পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে আসত। মনে হতো, আহা! বাপ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই, কেউ নেই—ভাগ্যে আমি ছিলাম! এই চিন্তা হ'তে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হতো একটা সূক্ষ্ম মমতার বোধ— কঠিন রোগ হ'তে

আরোগ্য লাভের পর সন্তানের প্রতি জননীর যেমন নূতন ক'রে একটা মায়া পড়ে কতকটা সেই প্রকার।

দিন দুই পরে প্রমথর শয্যাপার্শ্বে ব'সে সন্ধ্যা বেদানা ছাড়াচ্ছিল, এমন সময়ে কামিনী এসে বললে, "মা, সেই পাঠক-ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

কামিনীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল; বললে, কী দরকার?"

"তা' ত' বলতে পারিনে মা, আপনাকে খবর দিতে বললেন।"

প্রমথ বললে, "কী দরকার বুঝতে পারছ না, উষা? আজ বোধ হয় দশদিন পুরল—তাই তোমাকে খবর দিতে এসেছেন।"

এ কথা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সে আপন মনে মৃদুস্বরে গুঁইগাঁই করতে লাগল—আমি কিন্তু আজ কী ক'রে যাই—আজ আমার যাওয়া কেমন ক'রে হয়?—

প্রমথ বললে, "আমি তো এখন ভাল হয়েছি, উষা। এখন আর তোমার যেতে আপত্তি কী?"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন যোগযুক্তি-বর্জিত যে কয়টি কথা বললে তার ভাষাগত অর্থ নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু ভাবগত অর্থ যে নবদ্বীপ যাবার একান্ত অনিচ্ছা, তা বুঝতে প্রমথর কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। উদগ্র আনন্দ এবং কৌতুক কষ্টে রোধ ক'রে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কিন্তু সেটা ভালো দেখায় না, উষা। কথা দিয়ে এখন যদি বলো—"

প্রমথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু কথা আমি যখন দিয়েছিলাম তখন তো আপনার অসুখ হয় নি। এখনও আপনি ভাত খাননি, এ অবস্থায় ফেলে কেমন ক'রে চ'লে যাই? তা ছাড়া—"

এবার প্রমথ সন্ধ্যাকে তার অসমাপ্ত কথার মধ্যে নিবারিত করলে; বললে, "তা ছাড়া যা বলবার তা পাঠক-ঠাকুরকে আমিই বলব, তোমার আর কিছু বলবার দরকার নেই।" কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, "তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

রঘুনাথ ঘরে প্রবেশ করতেই প্রমথ হাত জোড় ক'রে বললে, "ক্ষমা করবেন, মশায়। রোগে পড়া ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় অপরাধ নেই, আপনার শিষ্যা কিন্তু বিগড়েছেন।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললেন, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন যে, উপস্থিত যে সেবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছেন তা অসমাপ্ত রেখে নবদ্বীপ গেলে আশ্রম-ধর্মের ব্যতিক্রম হবে।"

রঘুনাথ বললেন, "তা সত্যিই হবে। বিশেষতঃ তাঁর সেবা অসমাপ্ত রেখে, যাঁর কাছে মা-লক্ষ্মী এতখানি উপকৃত।"

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "উপকার-প্রত্যুপকারের হিসেব করতে যাবেন না, গোঁসাইজী। ও ব্যাপার অতিশয় জটিল, কারণ ওঁর কাছেও আমি কম উপকৃত নই। সেই উপকারের কথা স্মরণ ক'রে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সমর্থ হওয়া মাত্র আমি ওঁকে আপনার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

রঘুনাথ বললেন, "সেই কথাই ভালো। এখন মা-লক্ষ্মী আপনার কাছেই থাকুন। তাঁর জন্যে আমার আশ্রমের দ্বার সব সময়েই খোলা রইল।"

প্রমথ ও সন্ধ্যার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে রঘুনাথ বিদায় গ্রহণ করলেন।

দিন দশেক পরের কথা। নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ দ্বিপ্রহরের গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে সে বললে, "ঊষা, এখন তো আমি বল পেয়েছি, এবার চল একদিন তোমাকে নবদ্বীপ রেখে আসি।"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল।

"কী বলো?"

সন্ধ্যা বললে, আপনি বলছেন বল পেয়েছেন, কিন্তু আপনাকে দেখে তো একটুও মনে হয় না। আমার মনে হয় একটা কোনও ভালো জায়গায় আপনার চেঞ্জে যাওয়া উচিত।"

"কোথায় যাবে বলো?"

একটু ভেবে সন্ধ্যা বললে, "লক্ষ্ণৌয়ে তো আপনার নিজের বাড়ি আছে। সেখানে গেলে হয়।"

প্রমথ বললে, "সে মন্দ কথা নয়। তা হ'লে কবে যাবে বলো?"

সন্ধ্যা বললে, "দেরি ক'রে আর লাভ কী? দু' তিন দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। এখন তো আপনি কতকটা বল পেয়েছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না; বললে, "কিছু মনে কোরো না, ঊষা, যে অত্যাশ্চর্য বল আমাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যেতে পারে অথচ নবদ্বীপে নিয়ে যেতে পারে না, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু একটা কথাব উত্তর দেবে কি?"

আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কী?

সন্ধ্যার দিকে একটু মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে প্রমথ বললে, "পাখী কী অবশেষে পোষ মানল? আমার সংসারেই কি তোমার আশ্রম পাতলে, ঊষা?"

সন্ধ্যা কোনও কথা বললে না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বললে, "পাত-না, ভাই! নাও-না আমাকে রিক্ত ক'রে আমার সমস্ত সম্পদ! নিরন্নের আহার যোগাও, দরিদ্রের সেবাশ্রম কর—যে ভাবে তোমার ইচ্ছে হয়, যা করতে তোমার ভালো লাগে। পরের আশ্রমে গিয়ে কাজ কী ঊষা?"

এবার সন্ধ্যা তার মুখ আরও খানিকটা ফিরিয়ে নিলে রামনগরের তীরের

দিকে, তখন তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝ'রে পড়ছে—বোধহয় অনেক দুঃখে অনেক সুখে।

এর দিন তিনেক পরে কামিনী প্রভৃতিকে নিয়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা লক্ষ্ণৌ রওনা হলো।

আটাশ

কালের চাকায় সময়ের কাঁটা মাস ছয়েক এগিয়ে গেছে। চৈত্র মাসের শেষ ভাগ। জহরলাল চৌধুরী তাঁর কলিকাতার বাড়ির বৈঠকখানায় ব'সে সদ্য-লব্ধ সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে নত হ'য়ে যুক্তকরে জহরলালকে অভিবাদন করলে।

চশমার রীমের উপর দিয়ে আগন্তুকের প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে জহরলাল বললেন, "কী কেশব, খবর কী? কখন এলে?"

বিনীতকণ্ঠে কেশব বললে, "আজ্ঞে মহারাজ, আজ এসেই বাসায় জিনিসপত্র ফেলে হুজুরে হাজির হয়েছি।"

"আচ্ছা, বোসো, সব শুনছি।" ব'লে জহরলাল আলবোলার নল মুখে দিয়ে অসমাপ্ত সংবাদটুকু শেষ করতে উদ্যত হ'লেন।

ফরাসের নিকটে কাঠের পালিশ করা একটা বেঞ্চ ছিল। কেশব সন্ত্রস্তভাবে তার এক প্রান্তে উপবেশন করল। কেশব, অর্থাৎ কেশবচন্দ্র হালদার, জহরলালের বিশ্বস্ত নায়েব। জমিদারী পরিচালনার জন্য যে বুদ্ধির অথবা কূট বুদ্ধির প্রয়োজন, কেশবের তা যথেষ্ট ছিল। শুধু তাই নয়, সুনীতি এবং বিবেক নিন্দিত যে-কোনো দুঃসাধ্য কর্ম সাধনের জন্য বিচক্ষণতার সহিত যে দুঃসাহসের প্রয়োজন তা'ও তার অল্প ছিল না। সেজন্য, দুরূহ অথবা গোপনীয় বিশেষ কোনো কার্যসাধনের প্রয়োজন হ'লে জহরলাল কেশবের সহায়তা গ্রহণ করতেন।

সংবাদের অপঠিত অংশটুকু সমাপ্ত ক'রে জহরলাল চক্ষু হ'তে চশমা খুলে রেখে কেশবের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "কী খবর বল, কেশব। আপাততঃ কোথা থেকে আসছ?"

"আজ্ঞে মহারাজ, কাশী থেকে।"

"সেখানে সন্ধান কিছু পেলে?"

"বিশেষ কিছু পাই নি, কিন্তু প্রমথ যে বউ-রাণীমাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিল এ বিষয়ে আমার খুব বেশি সন্দেহ নেই।"

কেশবের কথা শুনে জহরলালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হলো; ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "মুখে বলেছি, চিঠিতে লিখেছি, বউ-রাণীমা বোলোনা তাকে, এ পরিবারের সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক নেই, তবু বারংবার ঐ কথাটা ব্যবহার করবে!"

অপ্রতিভ ভাবে কেশব বললে, "মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় হুজুর, এখনও অসম্মানের কথা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে।"

জহরলাল বললেন, "তার তো কুলত্যাগ ক'রে প্রকাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধল না, তোমারই বা বাধে কেন ? কাশীতে কি সন্ধান পেলে বল, শুনি।"

কেশব বললে, "কাশীতে পাণ্ডাদের মধ্যে সন্ধান করতে করতে শঙ্কর পাণ্ডা নামে একজন পাণ্ডার কাছে টের পেলাম যে প্রমথ নামে এক ব্যক্তি মাস পাঁচ ছয় আগে সস্ত্রীক কাশীতে এসেছিল ; কিন্তু দু'-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতেই, কী তার মনে হ'ল, হয়তো আমাকে গোয়েন্দা ব'লেই সন্দেহ করলে, আর কোনও কথা ভাঙলে না। শুধু সে-ই নয়, তারপর যাকেই প্রমথর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি সে-ই মাথা নাড়ে আর বলে কিছু জানে না। খুব সম্ভবতঃ শঙ্কর পাণ্ডার পরামর্শে। শঙ্কর পাণ্ডা যে দোকান থেকে ফুল বিল্বপত্র নেয়, যে দোকান থেকে ফলমূল কেনে, যে দোকানের মিষ্টান্ন ব্যবহার করে—সব জায়গায় চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও সন্ধান পাইনি।"

জহরলাল বললেন, "আর কোনও সন্ধানে দরকারও নেই, যতটুকু পেয়েছ, তাই যথেষ্ট। প্রকাশের বাড়ি থেকে সে কাউকে না জানিয়ে প্রকাশের বিনা অনুমতিক্রমে প্রমথ নামে একজন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, আর বাপের বাড়ি কিংবা অন্য কোনও আত্মীয়ের বাড়ি নেই—এ কথায় তো তোমার কোনও সন্দেহ নেই ?"

কেশব মাথা নেড়ে বললে, "না মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

জহরলাল বললেন, "এ-ই যথেষ্ট। আর কিছু দরকার নেই।" তারপর কেশবের সহিত অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

প্রমথর সহিত সন্ধ্যার প্রস্থানের পর নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রকাশ অবিলম্বে সে কথা সন্ধ্যার পিতাকে পত্র লিখে জানায়, এবং জহরলালকে সে কথা জানানো-না-জানানোর কর্তব্য নিরূপণের ভার তাঁরই বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যার পিতা বেণীমাধব কিন্তু সহসা একথা জহরলালকে জানানো সমীচীন মনে করেননি, কারণ তা হ'লে সন্ধ্যার শ্বশুরালয়ে প্রবেশের যৎসামান্য আশাটুকুও যে চিরদিনের মতো নির্বাপিত হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে কথাটা অন্যদিক থেকে একটু গোলমেলে ভাবে জহরলালের কানে এসে পৌছায়। পীরনগরেরর পাঁচ-আনা তরফের ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুধারাণীর স্বামী, জামসেদপুরে চাকরী করে। ইন্দ্রনাথের নিকট হ'তে জহরলাল একখানা চিঠি পান, তার প্রধান বক্তব্য এইরূপ।—'কাকাবাবু, আমার এখানকার একটি বন্ধুর মুখে আজ কথায় কথায় শুনলাম যে, মাস তিন চার পূর্বে প্রকাশভায়ার গৃহে সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে সহসা একদিন আবির্ভূত হয় এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান ক'রে সকলের অগোচরে প্রমথ

নামে একটি যুবকের সহিত একদিন অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। এ-সন্ধ্যা আমাদের অপহৃতা বধূমাতা সন্ধ্যা কি না জানবার জন্য আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য হয়েছে। কিন্তু আমার সহিত প্রকাশভায়ার অকারণ বিরোধ এবং অসরস আচরণের কথা আপনি তো সমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং বুঝতেই পারছেন তাঁর নিকট গিয়ে একথা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, এ কথাও মনে হচ্ছে যে, জামসেদপুরে প্রকাশভায়ার অপেক্ষা আমি আপনার অনেক নিকটতর আত্মীয়, সুতরাং বধূমাতা হ'লে তিনি খুব সম্ভবতঃ আমার গৃহেই আসতেন। এ যদি আর কোনও সন্ধ্যা হয় তা হ'লে প্রকাশের কাছে এ কথা তুলে তার অধিকতর বিরাগ-ভাজন হব। সে কারণ কথাটা অবিলম্বে আপনাকে জানালাম। আপনি প্রকাশকে পত্র লিখে অনুসন্ধান করবেন এবং যথাকালে অনুসন্ধানের ফল অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জানাবেন।' এই চিঠি পাওয়ার পর জহরলাল কেশবকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

দ্বিপ্রহরে জহরলাল পত্নী মমতাময়ীর নিকট কথাটা উত্থাপিত করলেন। বললেন, "কেশব আজ ফিরে এসেছে মমো।"

মমতাময়ী বুঝলেন যে সংবাদ যদি জহরলালের মতের অনুকূল না হতো তা হ'লে এত শীঘ্র এবং এত উৎসাহ সহকারে তিনি কখনই তা বলতে উদ্যত হতেন না। তথাপি নিজের অন্তরের অবুঝ ঔৎসুক্যকে অপ্রকাশ রেখে বললেন, "কী খবর আনলে?"

জহরলাল মুখ গম্ভীর ক'রে বললেন, "খবর আর নতুন কা আনবে, আমি যা মনে মনে জানতাম তাই। প্রকাশের বাড়ি থেকে একটা বকাটে ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে কাশীতে দু'জনে বাস করছে।"

বস্তুতঃ কথাটা সত্য হ'তে বিশেষ দূরবর্তী মিথ্যা না হ'লেও জহরলাল প্রকৃত কথার মধ্যে এমন একটু অসত্য মিশিয়ে দিলেন যার দ্বারা সমস্ত জিনিসের আকৃতিটা অনেকখানিই কদর্য হ'য়ে উঠল। কথাটা কিন্তু মমতাময়ীর নিকট সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হ'লো না; বললেন, "এ কথা তুমি সত্যি ব'লে মনে করছ?"

জহরলাল বললেন, "কথাটা এমন কী অপরাধ করলে যে, মিথ্যা ব'লে মনে করতে হবে? তুমি জানোনা, মমো, ও-সব মেয়ের এই রকম পরিণতিই হ'য়ে থাকে।"

জহরলালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, "দেখ, এত বড় অধর্মের কথা মুখে এনো না! হিন্দু সমাজের জাঁতি-কলে তাকে ফেলেছ, যত ইচ্ছে পীড়ন করো; কিন্তু নিজেদের সাফাই গাইবার জন্যে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না। তুমি তার কী জানো যে, ওকথা বলছ? আমি জানি সে মেয়ে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ।"

মমতাময়ীর তীব্র প্রতিবাদে জহরলাল ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন;

বললেন, "তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝচ মেো। আমার বলবার উদ্দেশ্য, এ রকম ঘটনার পর ও-সব মেয়ের আর দ্বিতীয় কোনও উপায় থাকে না ব'লে প্রকৃতিও সেইভাবে বদলে যায়। একটা কথা আছে, বিষাক্ত সাপের মুখ থেকে যে ব্যাঙ্‌ কোনও রকমে রক্ষা পেয়ে পালায়, সে-ও বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে। এও তেমনি আর কি।"

মমতাময়ী বললেন, "সে যাই হোক, এ কথা তুমি প্রিয়কে জানিয়ো না। তুমি যে মনে করেছ, এ কথার জোরে বউমার উপর থেকে প্রিয়র মন তুলে নিয়ে তুমি তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করবে, তা কিছুতেই হবে না।"

"কেন ?"

"কেন ? তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে জিজ্ঞেস করছ, 'কেন ?' এ কথা শুনে হয় সে কাশী গিয়ে একটা খুনোখুনি ব্যাপার করবে ; নয় চিরদিনের জন্যে এমন অশ্রদ্ধা হ'য়ে যাবে যে, জীবনে কখনও মেয়েমানুষের মুখ দেখবে না। কত ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের স্বামী সন্ন্যেসী হ'য়ে গেছে তা তুমি ভুলে যাচ্ছ ? বিপিন বৈরিগীর কথা মনে নেই তোমার ? পরাণ হালদারের কথা ভুলে যাচ্ছ ? তা ছাড়া, এমন কথা যদি মনে হয় যে, আমাদের জবরদস্তির জন্যেই এ কাণ্ডটা ঘটল, তা হ'লে আমাদের উপর হয় তো এমন অভিমান হবে যা জীবনে কোন দিন যাবে না। স্ত্রী ভ্রষ্টা, এ কথা কি সহজে কোনও পুরুষমানুষকে বলতে আছে ? অনর্থ ঘটে যাবে যে ?"

মমতাময়ীর ভয়-প্রদর্শনে জহরলাল চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। এ অভিসন্ধি তাঁর মনে মনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই যে, সন্ধ্যার প্রতি প্রিয়লালের মনে একটা ঘৃণা উৎপাদন করতে পারলে কতকটা সহজে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহে স্বীকৃত করতে পারা যাবে। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে ব্যাধির উপশম না হ'য়ে বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা আছে কি-না সে কথা ভেবে দেখবার অবসর হয়নি।

স্বামীকে নির্বাক এবং চিন্তিত দেখে মমতাময়ী বললেন, "অত কী ভাবচো ?"

জহরলাল বললেন, "ভাবচি, প্রিয়র মনের অবস্থা যদি কোনও রকমে না বদলায় তা হ'লে ও যে কখনও আবার বিয়ে করতে রাজি হবে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। দেখলে তো রামলাল চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে কী কাণ্ডটা করলে।"

মমতাময়ী বললেন, "তা কী করবে ? সকলেরই কি অদৃষ্টে সব সুখ থাকে। স্ত্রী-ভাগ্য ওর যদি ভালোই হবে তা হ'লে অমন বউই বা হারাবে কেন। রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা। মনে মনে কত সাধ করেছিলাম যে এই কলকাতার বাড়ি সে আলো ক'রে থাকবে। কত দুঃখ কষ্ট পেয়ে এ বাড়িতে এসে দাসী হ'য়ে থাকতে চেয়েছিল! দিলাম তাকে দূর দূর ক'রে শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে! একদিক দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে।—ছেলেটাই না হয় সন্ন্যেসী হ'য়ে থাকবে, অদৃষ্ট যখন তার এতই মন্দ।" ব'লে মমতাময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছলেন।

জহরলাল বললেন, "অদৃষ্ট শুধু প্রিয়র মন্দ নয়, মমো, আমাদেরও মন্দ—নইলে এ দুঃখ কে-ই বা চেয়েছিল, বলো। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলছ কেন? পাপ কোথায় যে তার প্রায়শ্চিত্ত?"

"পাপ যদি না থাকবে—তা হ'লে দিবারাত্র মনের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জলছে কেন?"

"সেইটেই তো অদৃষ্ট।"

"তাই যদি হয় তা হ'লে ছেলেরও অদৃষ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যেয়োনা; ও যেমন দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে তেমনি করুক।" ব'লে মমতাময়ী কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন।

কথাটা সেদিনের মতো সেইখানেই শেষ হ'য়ে রইল।

স্বামীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পেরে মমতাময়ী সেই দিনই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জামসেদপুরে গোপনে সবিতাকে চিঠি লিখলেন। দিন দুই পরে কিন্তু সবিতার নিকট থেকে উত্তর পেয়ে পড়তে পড়তে তাঁর মুখ অনেকখানি ম্লান হ'য়ে গেল। সবিতার পত্রের মর্ম জহরলালের কাহিনীর পরিপন্থী নয়, বরং তার প্রথমাংশের পরিপোষক। সবিতা লিখেছে—মামীমা, এ কথা সত্য, সন্ধ্যা আমাদের না জানিয়ে প্রমথবাবুর সঙ্গে কোথায় চ'লে গিয়েছে; কিন্তু সে কোথায় গিয়েছে, অথবা কাশী গিয়েছে কি-না, তা আমরা জানিনে। কাশী যাওয়া অবশ্য কিছুই আশ্চর্য নয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যে প্রমথবাবুর সঙ্গে অসঙ্গত জীবন যাপন করছে, এ আমার সহজে বিশ্বাস হয় না। তার অদৃষ্ট মন্দ, কিন্তু প্রকৃতি মন্দ নয়।

একটা কোনও কাহিনীর পারম্পর্যের মধ্যে কতকটা অংশ সত্য ব'লে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হওয়ার পর বাকি অংশকে মিথ্যা ব'লে সন্দেহ করবার প্রবলতা অনেকখানি ক'মে যায়। মমতাময়ীরও তাই হলো; সবিতার নিকট হ'তে এ চিঠি পাওয়ার পর জহরলালের কথার কোনও অংশকেই আর অসত্য ব'লে অগ্রাহ্য করবার সাহস রইল না। অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে সকলের অগোচরে আত্মীয়ের গৃহত্যাগ করার পর কাশী গিয়ে অসঙ্গত জীবনযাপন করার মধ্যে এমন একটা সহজ সম্ভাবনীয়তা আছে যা প্রতিকূল প্রমাণের অভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। যে ব্যক্তি উগ্র বিষ সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল ব'লে জানি, সে একদিন বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে শুনলে কথাটা সম্ভব ব'লেই মনের মধ্যে স্থান লাভ করে।

প্রিয়লালের মানসিক দুরবস্থার জন্য জহরলালের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সমাজের অনুশাসন প্রতিপালন করতে গিয়ে যে অনিবার্য আঘাত দিতে হয়েচে তার জন্য তিনি দায়ী নন—এই যুক্তি সন্ধ্যার পক্ষে জহরলাল যেমন অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করতেন, প্রিয়লালের পক্ষে তেমন পারতেন না। দৈবের অনিবার্যতা প্রিয়লালের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সান্ত্বনা ছিল না, তাই তার জন্য জহরলালের চিন্তারও অবধি ছিল না। অবশেষে একটা উপায় মাথার মধ্যে দেখা দিলে।

চতুর্দিক থেকে বিচার বিবেচনা ক'রে উপায়টিকে পাকা ব'লেই মনে হলো—

সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—সেই শ্রেণীর একটা নিখুঁৎ কৌশল। এবার কিন্তু জহরলাল মমতাময়ীর সহিত পরামর্শ করলেন না, 'মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ' চাণক্য নীতি পালন করলেন। তলব পড়ল গুপ্তমন্ত্রী কেশব হালদারের। সমস্ত সবিস্তারে শুনে কেশব কৌশলটি অনুমোদিত করলে।

জহরলাল বললেন, "দেখো, চিঠি যেন খবরদার নিজের হাতে লিখো না—তোমার লেখা অনেকেই এখানে চেনে।"

জহরলালের কথা শুনে কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বললে, "মহারাজ, এতদিন ধ'রে নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রে, আজ এই উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করছেন ?"

এই অনধিকার স্তুতির চাটুবাণীতে প্রসন্ন হ'য়ে জহরলাল বললেন, "তা বটে, কিন্তু চিঠি একটা লিখবে, না তুটো লিখবে, কেশব ?"

"আমি বলি মহারাজ, তিনটে,—একটা হুজুরকে, একটা বেণীবাবুকে, একটা প্রকাশবাবুকে। কাজ করতে গেলে সাহস ক'রে সব দিক মেরে না করলে কাঁচা কাজ হয়। এক সঙ্গে সকলকে চিঠি দিয়ে অবস্থা এমন করুন যাতে মোকাবিলা হ'লে সব জায়গায় একই কথা শোনা যায়। প্রমথর দেখা এখন কেই বা পাচ্ছে আর কেই বা চাচ্ছে যে, আসল কথার মোকাবিলা হবে।"

মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে জহরলাল বললেন, "মন্দ নয়, তাই তবে কর। কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে কাশীতে যাকে পাঠাবে সে বিশ্বাসী লোক তো ?"

"হুজুর যেমন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তেমনি তাকে করি।"

"কবে পাঠাবে তাকে ?"

"আজ্ঞে, আজ রাত্রেই!"

মনে মনে হিসাব ক'রে জহরলাল বললেন, "তা 'হলে বুধবারের ডাকে এখানে আমরা চিঠি পাব। এ সময়টা তোমার এখানে উপস্থিত থাকাই ভালো, নইলে লোকের মনে কোনও রকম সন্দেহ হ'তেও পারে।" এ 'লোক' অর্থে প্রধানতঃ যে মমতাময়ী, সে কথা অবশ্য জহরলাল প্রকাশ ক'রে বললেন না।

তৃতীয় দিন বেলা দশটার সময় ডাক এল। জহরলাল ইচ্ছা ক'রেই দমদমার বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত হ'য়ে চিঠিখানা মমতাময়ী বা প্রিয়লালের হাতে পড়ে এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। পিয়ন যখন এল তখন প্রিয়লাল বার-মহলে তার পড়বার ঘরে ব'সে এম্-এ ক্লাসের একটা পাঠ্য পুস্তকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। পিয়ন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেলতে উদ্যত হ'য়েছে দেখতে পেয়ে সে পিয়নকে ডেকে তার হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে নিলে। পাঁচ ছ'খানা চিঠি; ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা পোস্টকার্ডের ভিতরে গোটা তুই তিন কথা চোখে পড়তেই মাথাটা গেল ঘুরে। কোনও প্রকারে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে চিঠিখানা প'ড়ে শেষ করলে। চিঠিটা এই—

"কাশীধাম"

সবিনয় নিবেদন,

গতকল্য রাত্রি দেড়টার সময়ে অভাগিনী সন্ধ্যা চিরদিনের মতো আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। তিন দিনের কলেরা রোগে তার মৃত্যু ঘটল। এক সময়ে সে আপনার পুত্রবধূ ছিল, এখনও সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নি ভেবে যদি অশৌচাদি পালন করেন সেই জন্য এ পত্র দিলাম। ইতি—

বিনীত

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘরের দরজা জানালাগুলো রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এসে টেবিলে মুখ গুঁজে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করলে, তারপর বস্ত্রে চক্ষু মার্জিত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বসল। দুঃখ ও অনুশোচনার একটা মর্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত মন, এমন কি অন্তরিন্দ্রিয় পর্যন্ত, অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল। মনে মনে বললে, অপরাধ করেছিলাম, কিন্তু তাই ব'লে এমন শাস্তি দিলে যে, জীবনে কোনও দিন যে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নোবো তার পথ রাখলে না। অভিমান কি এমনি ক'রেই করতে হয়? জানকীও বোধ করি হতভাগ্য রামচন্দ্রের উপর এমন দুর্জয় অভিমান ক'রে পাতাল প্রবেশ করেননি, তুমি যেমন আমার উপর ক'রে প্রাণত্যাগ করলে। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র যে পাপ ক'রেছিলেন, পিতৃ-মনোরঞ্জনের জন্য আমি তার চেয়ে গুরুতর পাপ ক'রেছিলাম! প্রকাশদাদার বাড়িতে তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েও তোমার মনে সান্ত্বনার একটু ক্ষীণ আলো জ্বেলে রাখিনি।—প্রিয়লালের চক্ষু হ'তে পুনরায় টপ্ টপ্ ক'রে বড় বড় অশ্রুবিন্দু টেবিলের উপর ঝ'রে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কাশীর চিঠিখানা ছাড়া বাকি চিঠিগুলা চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে প্রিয়লাল মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'লো। প্রিয়লালের আকৃতি দেখে মমতাময়ী আতঙ্কে শিউরে উঠলেন; ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "কী হয়েছে, প্রিয়?"

প্রিয়লাল বললে, "আপদ একেবারে চুকেচে মা, আমাদের কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অধীরভাবে মমতাময়ী বললেন, "কী হয়েছে খুলে বল না!"

প্রিয়লালের মুখমণ্ডল একটা বিচিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল—ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মহানগরীর ভগ্নস্তূপের উপর প্রভাত-সূর্যের কিরণ পড়লে যেমন দেখায়, দেখালো ঠিক তেমনি। পোষ্টকার্ডখানা মমতাময়ীর দিকে আগিয়ে ধ'রে বললে, "প'ড়ে দেখ।

চিঠিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই মমতাময়ী চীৎকার ক'রে উঠলেন, "এ কী সর্বনাশের কথা নিয়ে এলি, প্রিয়।" তারপর ভূমিতলে ব'সে প'ড়ে চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রিয়লাল বললে, "বুকের মধ্যে ভারি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, মা!—আমি আমার

ঘরে কিছুক্ষণের জন্য শুতে চললাম।" ব'লে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে ফিরে এসে বললে, "তুমি আমার সব দুঃখ-কষ্ট বোঝো ব'লেই তোমাকে বলছি, মা, আমাকে যেন তোমরা সান্ত্বনা দিতে যেয়ো না। কিছুতে ও কাজ কোরো না। আমার এ দুঃখ আপনিই শেষ হ'তে দিয়ো।"

এ যে জহরলালের প্রতি প্রিয়লালের অব্যক্ত মর্মান্তিক অভিমান তা বুঝতে মমতাময়ীর বিলম্ব হ'লো না। প্রিয়লালের প্রতি কাতর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললেন, "ওরে প্রিয়, একবার আমার কাছে এসে বোস, বাবা!"

প্রিয়লাল নিকটে উপবেশন করলে তার মাথাটা নিয়ে মমতাময়ী ক্ষণকাল নিজের বক্ষের মধ্যে চেপে ধ'রে রইলেন, তারপর দু-চারবার সযত্নে তার উপর হাত বুলিয়ে বললেন, "যাও বাবা, শুয়ে থাক গে; কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।"

কিছুক্ষণ পরে জহরলাল ফিরে এলেন। রোদনবিক্লিন্না পত্নীর আকৃতি দেখে আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, "কী হয়েছে, মমো?"

মমতাময়ী বললেন, "বউমা নেই! সব শেষ হ'য়ে গেছে!"

"তার মানে?"

"কলেরা হ'য়ে মারা গেছেন।"

জহরলাল চমকে উঠলেন। কপট অভিনয়ের চমকটা বোধহয় একটুখানি মাত্রা অতিক্রম ক'রেই গেল; বললেন, "বউমা বাপের বাড়ি এসেছিলেন নাকি?"

মমতাময়ী মাথা নেড়ে বললেন, "না গো, কাশীতেই এই ব্যাপার ঘটেছে।" তারপর টেবিলের উপর থেকে পোস্টকার্ডখানা নিয়ে জহরলালের হাতে দিলেন।

চিঠি প'ড়ে জহরলালের মুখের মধ্যে নিবিড় বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু তারই অন্তর্গত একটা দুর্নিবার আনন্দের দীপ্তি সেই ছায়াকে একটু ফিকে ক'রেও রইল। অন্যদিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে জহরলাল বললেন, "বেয়াই বাড়িতে চিঠি লিখে খবরটা একটু ভালো ক'রে জানলে হয় না?"

"আবার কী ভালো ক'রে জানবে?"

একটু ইতস্ততঃ সহকারে জহরলাল বললেন, "খবরটা ঠিক পাকা কি-না?"

আর্তকণ্ঠে মমতাময়ী বললেন, "দুঃসংবাদ কখনও মিথ্যে হয় না।"

"সে কথা ঠিক।" ব'লে জহরলাল একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লেন।

মমতাময়ীর অবস্থা দেখে এবং প্রিয়লালের কথা শুনে জহরলাল বুঝলেন ঔষধ ক্রিয়াশীল হয়েচে। নিজের শুভবুদ্ধির প্রমাণে মনের মধ্যে একটা বিশেষ রকম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। ভাবলেন, যে দুষ্ট গ্রহ পুত্রকে এতদিন সংসারবিমুখ ক'রে রেখেছিল মৃত্যুর দ্বারা তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ায় এবার পুত্রকে সংসারী করা সহজ হবে।

কিন্তু দিন তিনেক পরে মমতাময়ীর নিকট হ'তে পুত্রের মানসিক অবস্থার ও সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়ে আশঙ্কা হলো ঔষধ বুঝি সক্রিয় হ'য়ে বিপরীত ফলই

কলায়। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে প্রিয়লাল সুদূর পশ্চিম দেশে যাত্রা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছে।

মমতাময়ী বললেন, "আমি অনেক বুঝিয়ে দেখেছি, তাকে আটকানো যাবে না। কিছুদিন ঘুরে এলে হয় তো তাকে সুস্থ মনেই ফিরে পাবে। আমি মা, আমি যখন বলছি তখন তুমি অমত করো না।"

জহরলাল কিন্তু শুধু মমতাময়ীর কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকলেন না, নিজেও অনেক চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হলো।

মাস দুয়েক পরে পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে পি অ্যাণ্ড ও-র সুবৃহৎ স্টিমারে প্রিয়লাল অধীর উদভ্রান্ত হৃদয় নিয়ে সুদূরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে।

উনত্রিশ

মেয়ারসাই বন্দরে জাহাজ পরিত্যাগ ক'রে রেলযোগে প্রিয়লাল প্যারিসে উপনীত হলো। জাহাজে একজন ভাটিয়া যুবকের সহিত তার আলাপ হয়েছিল। বছর পাঁচেক সে প্যারিসে আছে, মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে আসবার প্রয়োজন হয়। মাস তিনেক পূর্বে তেমনি প্রয়োজনে ভারতবর্ষে এসেছিল, এখন ফিরে চ'লেছে। প্রথমে প্রিয়লাল স্থির ক'রেছিল যে প্যারিসে উপস্থিত হ'য়ে টমাস কুক এণ্ড সন্সের অফিসের সাহায্যে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নেবে; কিন্তু ভাটিয়া যুবকটির নিকট প্যারিসের প্লাস-ভো-লাপেরা অঞ্চলের একটি বিখ্যাত হোটেলের সন্ধান লাভ ক'রে সে সেখানেই গিয়ে উঠল।

হোটেলটি অনেক দিক থেকে ভালো লাগায় প্রিয়লাল স্থির করলে কিছু কাল সেইখানেই বাস করবে। প্রথমে দিনকতক সে হোটেল পরিত্যাগ ক'রে সহজে কোথাও বহির্গত হতো না। নিজের নির্জন নির্বান্ধব কক্ষে আবদ্ধ হ'য়ে দুরদৃষ্টের চিন্তায় এবং পুস্তকপাঠে দিনের পর দিন অতিবাহিত করত। হঠাৎ একদিন মনে পড়ল লুভর্ মিউজিয়মের কথা। চিরকাল চিত্রের প্রতি তার অনন্যসাধারণ অনুরাগ। মনে পড়বা মাত্র একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তখনি তথায় উপস্থিত হলো। এতদিন পর্যন্ত একান্ত শ্রদ্ধা এবং কৌতূহলের সহিত যে-সকল বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের কথা শুনে এসেছে, সেই র‍্যাফায়েল, দাভিঞ্চি, মুরিলো, ভ্যান ডাইক, রেমব্রাঁ, মিলে প্রভৃতির অঙ্কিত মূল চিত্রাবলীর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রিয়লাল একেবারে আত্মহারা হলো। যে দুরপনেয় বেদনা অহরহ অনুক্ষণ তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখত, তার চাপ যেন অনেকটা লঘু হ'য়ে গেল। নিঃস্বাদ নিস্পন্দ জীবনের মধ্যে একটা অনুভূতির সাড়া দেখা দিলে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সমস্ত দ্বিপ্রহরটা প্রিয়লাল লুভর্ মিউজিয়মে অতিবাহন করতে লাগল। 'মোনা লিসা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, 'ক্লাইট্ অফ্ লট্' দেখে দেখে দেখবার আগ্রহ কিছুতেই পরিতৃপ্তি মানে না।

কিন্তু মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন তার মনের মধ্যে এমন একটা কি পরিবর্তন এল যে, এ আকর্ষণ আর তাকে প্যারিসে আটকে রাখতে পারলে না। হোটেলের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে রেলস্টেশনে এসে টিকিট কিনে গাড়িতে চ'ড়ে বসল। তারপর মাস চারেক ধ'রে কন্টিনেন্টের নানাস্থান পরিভ্রমণ ক'রে অবশেষে একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হ'য়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলো।

লণ্ডনে তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অভাব না থাকলেও সে তাদের অগোচরে একটা হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে সহসা ইংলণ্ড আগমনের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে উৎপীড়িত হবার আশঙ্কায় প্যারিসেরই মতো কতকটা অজ্ঞাত-বাস অবলম্বন ক'রে রইল।

লণ্ডনে আগমনের মাসখানেক পরে একদিন ভারতবর্ষের ডাকে সে তার শ্বশুর বেণীমাধবের একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে যেমন বিস্মিত হলো, তেম্‌নি হলো বিরক্ত। বেণীমাধব লিখেছেন যে, ইম্পিরিয়াল সারভিসের একটি পাত্রের সহিত তাঁর কন্যা সাধনার যে বিবাহ-প্রস্তাব প্রায় স্থির হ'য়ে এসেছিল শুধু তা-ই ভেঙে যায়নি, তারপর তিনি অপরাপর বহু স্থলে যত চেষ্টা করেছেন সমস্তই বিফল হয়েছে—তাঁর কন্যা সাধনা পরমা সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সর্বগুণসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং এরূপ দুর্ভেদ্য সঙ্কটে একমাত্র প্রিয়লালের বিবেচনা এবং সহৃদয়তার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই ব'লে তিনি তার সঙ্গে সাধনার বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ প্রস্তাব যে অসমীচীন নয় তা প্রমাণ করবার জন্য বেণীমাধব দ্বিবিধ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রথমতঃ, মৃত্যুর দ্বারা সন্ধ্যা যখন ইহলোকের এবং ইহকালের পক্ষে একেবারে গত হয়েছে তখন সে ঘটনা যত শোচনীয়ই হোক-না কেন, তার অনুশোচনা পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ বিবেচনার প্রত্যাদেশ হচ্ছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এবং দ্বিতীয়তঃ, সন্ধ্যাকে গৃহে স্থান না দেওয়ার জন্য তার জীবনের যে মর্মন্তুদ পরিণাম ঘটল তজ্জনিত প্রত্যবায়ের যদি কোনও অংশ প্রিয়লালের থাকে তা হ'লে সাধনাকে বিবাহ করলে তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, কারণ তার অতি-বিপন্ন শ্বশুর যে দুশ্ছেদ্য সমস্যা নিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন তা কখনই উপস্থিত হতো না যদি তাঁর অভাগিনী কন্যা স্বামীগৃহে স্থান লাভ করতে সমর্থ হতো। বেণীমাধবের চিঠিখানা অনুনয় এবং অনুযোগের দ্বিবিধ সুরে রচিত—অনুযোগের সুর অত্যন্ত ক্ষীণ, অনুনয়ের সুর যৎপরোনাস্তি প্রবল।

প্রিয়লাল সেইদিনই বেণীমাধবের পত্রের উত্তরে লিখলে, "যার হাতে আপনার একটি মেয়ে অমন নির্দয়ভাবে নিগৃহীত হয়েছে তার হাতে আপনার আর একটি মেয়েকে সমর্পণ করবার দুঃসাহস দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। বাংলা দেশের মেয়ে কি বাপ-মার পক্ষে এত বড়ই পাপ যে, তার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য

একজন নামজাদা দুর্বৃত্তের হস্তে তাকে সমর্পণ করবার প্রস্তাব অনায়াসেই চলে? সন্ধ্যাকে নিগৃহীত করার জন্য যে প্রত্যবায় হয়েছে ব'লে আপনি লিখেছেন, আমি নিজেকে তার অংশভাগী ব'লে মনে করিনে, সে প্রত্যবায়ের ষোল আনাই আমার ব'লে আমি জানি। এবং সমস্ত জীবনব্যাপী দুঃখ এবং অনুশোচনার দ্বারা তার দণ্ড ভোগ করতে চাই। সাধনাকে বিবাহ করলে সে প্রত্যবায়ের ক্ষয় হবে না, বৃদ্ধিই হবে। সন্ধ্যার প্রতি আমার আচরণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিপদগ্রস্ত করেছি ব'লে যদি মনে করেন তা হ'লে অর্থের দ্বারা যদি সম্ভবপর হয় আমি আপনার সে ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত আছি; অর্থলোভে বশীভূত ক'রে আপনি সাধনার জন্য মনোমত পাত্র সংগ্রহ করুন, সে অর্থের ভার রইল আমার উপর। আপনি জানেন উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের নিকট হ'তে আমি কম অর্থ পাইনি, সুতরাং আমার সে অর্থের জন্য বাবার নিকট আবেদন করবার প্রয়োজন হবে না।"

বেণীমাধবের পত্রের সঙ্গে এক ডাকেই জহরলালেরও চিঠি এসেছিল। সে চিঠির মর্ম—দীর্ঘকাল গত হলো প্রিয়লাল গৃহ ছাড়া হ'য়ে আছে, সেজন্য তার পিতা-মাতার দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, সুতরাং আর বিলম্ব না ক'রে অচিরে যেন সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

যোগ-সাজসের মৈত্রীর দ্বারা এই দুটি চিঠি যে পরস্পর-আবদ্ধ, এমন একটা সন্দেহ প্রিয়লালের মনে সহজেই দেখা দিলে। উত্তরে সে জহরলালকে লিখলে, ইংলণ্ডে যখন এসেই পড়েছে তখন বৎসর দুই এখানে যাপন ক'রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডির ডিগ্রীটার জন্য চেষ্টা করা তার একান্ত ইচ্ছা, সুতরাং এখন গৃহে প্রত্যাগমন করা উচিত হবে না।

কিছুকাল ধ'রে জহরলাল এবং প্রিয়লালের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক পত্রব্যবহার চলল, কিন্তু অবশেষে জহরলালকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'লো—পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য প্রিয়লালের ইংলণ্ডে অবস্থান করাই স্থির হ'লো।

অতঃপর প্রিয়লালের ডক্টরেট্ লাভ করা পর্যন্ত বৎসর দুয়েকের কথা এ আখ্যায়িকার পক্ষে প্রয়োজনীয়ও নয়, কৌতূকাবহও নয়।

পুত্র পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অধিকার করেছে অবগত হওয়ার পর জহরলাল এবং মমতাময়ী তাকে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখলেন। জহরলাল লিখলেন, শরীর আমার অতিশয় অসুস্থ, তুমি যদি এখনও আসতে বিলম্ব কর তা হ'লে হয়তো আর দেখা হবে না। মমতাময়ী লিখলেন, কিছুকাল হ'তে রক্তচাপ রোগে ওঁর শরীরের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়; এখনও যদি তুমি অবিলম্বে এসে উপস্থিত হও তা হ'লে হয়তো সামলে উঠতে পারেন।

এ সংবাদ পাওয়ার পর মাসখানেকের মধ্যে প্রিয়লাল প্রবাসের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষের জন্য রওয়ানা হলো। কিন্তু তিন বৎসর পরে গৃহে উপনীত হ'য়ে দেখলে মাত্র পাঁচ দিনের জন্য বিলম্ব ক'রে এসেছে। পাঁচ দিন পূর্বে মৃত্যু

এসে জহরলালকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। জননীর বিধবা-বেশ দেখে প্রিয়লাল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগল।

শ্রাদ্ধ-শান্তির মাস দুই পরে প্রিয়লাল একদিন মমতাময়ীকে বললে, "মা, দিন কতক একটু ঘুরে আসি।"

বিস্মিত হ'য়ে মমতাময়ী বললেন, "এরই মধ্যে আবার ?"

প্রিয়লাল বললে, "এবার বেশি দিনের জন্যে নয়, মা, মাস চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

"কোথায় যাবি ?"

"প্রথমে দিন পাঁচ-সাতের জন্যে ফয়জাবাদে আমার একটি বন্ধুর কাছে, তারপর লাহোরে পান্টু মামার কাছে। সেখান থেকে পান্টু মামাকে নিয়ে রাউলপিণ্ডি হ'য়ে কাশ্মীর, তারপর কাশ্মীর থেকে তোমার কাছে।"

বিষণ্ণ গম্ভীরমুখে মমতাময়ী বললেন, "এটা কি এখন না করলেই নয়, প্রিয় ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে মমতাময়ীর প্রতি মুখ তুলে প্রিয়লাল বললে, "কিছু ভালো লাগছে না, মা।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমারই কি ভালো লাগছে বাবা ?"

অপ্রতিভ আর্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "তোমার কী করে ভালো লাগবে মা! তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না। বেশ তো তুমিও আমার সঙ্গে চল-না। তুমি যদি যাও, তাহলে আমি ফয়জাবাদ লাহোর কাশ্মীর ছেড়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থে তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। যাবে আমার সঙ্গে ?"

প্রিয়লালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'লো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নামল অশ্রুর প্রবল বর্ষণ। অঞ্চলে চোখ মুছে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "এই সংসারের যে খোঁটায় তিনি আমাকে বেঁধে দিয়ে গেছেন তা থেকে আমার সহজে মুক্তি নেই, প্রিয়। যে কাজের ভার আমাকে দিয়ে গেছেন তা শেষ ক'রে তবে তীর্থই বল আর যাই বল—তার আগে চৌধুরী বংশের এই বাড়িই আমার কাশী বৃন্দাবন হ'য়ে রইল।"

কথাটা সেদিন আর বেশি দূর অগ্রসর না হ'য়ে এইখানেই শেষ হ'লো। কিন্তু দিন পাঁচ সাতের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল যে, জহরলালের মৃত্যুর জন্য আইন আদালত সংক্রান্ত যে সামান্য বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে তা সম্পন্ন ক'রেই প্রিয়লাল পুনরায় দেশ ভ্রমণে নির্গত হবে।

ত্রিশ

শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। অপরাহ্নের দিকে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু পূর্বদেকে পুনরায় মেঘের উপর মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে অবিলম্বে প্রবলভাবে বর্ষণ আরম্ভ হবে। কলিকাতা বালীগঞ্জের

একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত অঞ্চলে বিস্তৃত কম্পাউণ্ড সংযুক্ত একটা দ্বিতল গৃহের দোতলার বারান্দায় ব'সে সন্ধ্যা বই পড়ছিল। এমন সময়ে ভৃত্য সাধুচরণ এসে ডাকলে, "মা!"

বই হ'তে মুখ তুলে সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কী সাধুচরণ?"

বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সাধুচরণ বললে, "মেঘ করেছে ব'লে কি বেলা হয়নি, মা? বেলা যে গড়িয়ে শেষ পোহোরে পৌছল!"

"ক'টা বাজল?"

অধিকতর মুখ-বিকৃতির সহিত সাধুচরণ বললে, "সে তোমাদের বিশ পঁচিশটা ঘড়ি আছে, দেখে নাও কটা বাজল, কিন্তু এমন ক'রে পিত্তি পড়িয়ে অত্যাচার করলে শরীর আর কতদিন টেঁকবে, বল দেখি? সেই জষ্টি মাসের মতো আবার যদি অসুখে পড় তাহ'লে আর উঠতে পারবে কি?"

বারান্দার পিছন দিকে একটা ক্লক্ টাঙানো ছিল, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "ওমা তাই তো, সাড়ে তিনটে বাজে যে। কিন্তু তিনি না খেয়ে বাইরে রয়েছেন, আমি কী ক'রে খাই, সাধু?"

সাধুচরণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তেনার কথা ছাড় দাও। ছেলেবেলা থেকে তেনাকে নিয়ে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হ'য়ে আছে; তেনার এ সব অত্যাচার বরদাস্তও হয়। কিন্তু তোমার?"

"আমারও তো তাহ'লে বরদাস্ত হওয়া উচিত, সাধু। কিন্তু সে কথা যাক, তোমরা সকলে খেয়ে নিয়েছ তো?"

"তোমার আলি-হুকুম জারি আছে, তারা ছেড়েছে কি-না। সব খেয়ে দেয়ে এতক্ষণ এক ঘুম সেরে নিলে।"

"আর তুমি? তুমি খেয়েছ?"

সাধুচরণ মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আরে, আমার কথা ছাড় দাও। আমি তোমার আর-সব চাকর-বাকরদের সঙ্গে এক গোত্তোর না কি?"

সন্ধ্যা বললে, "না, তা নও, কিন্তু তুমি বুড়োমানুষ, এই বেলা পর্যন্ত না খেয়ে রয়েছ, সাধু?"

সাধুচরণ তেমনি মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "বুড়োমানুষের অত ক্ষিদে ভেষ্টা লাগে না, মা। তুমি সোমোখো মেয়ে, তুমি ক্ষিধের লেগে ছটফট্ করছ—আর আমি খাব?"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি ছট্‌ফট্ করছি তুমি কা ক'রে জানলে, সাধু? কই আমি তো একটুও ছট্‌ফট্ করছি নে?"

সাধুচরণ বললে, "আরে, তুমি না কর, তোমার আত্মি তো করছে।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "ওমা সে আবার কী? আত্মি কাকে বলে?"

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হলো না, গেটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায়

সাধুচরণের মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে সে বললে, "অই নাও। ছাতা মাথায় দিয়ে আবার একটা সাধু আসছে। আজকের মতো তোমাদের খাওয়া দাওয়া সিকেয় তুলে রাখ।"

সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে গৈরিক বসন পরিহিত একজন সন্ন্যাসী বৃষ্টির তাড়না থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছাতা দিয়ে দেহের উর্ধ্বাংশের প্রায় সবটা প্রচ্ছন্ন ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে অনুমানে বুঝলে ভারতী আশ্রমের স্বামী অচলানন্দ।

সাধুচরণ বললে, "মা, বল তো বাবা বাড়ি নেই ব'লে সাধু মহারাজকে বিদেয় ক'রে আসি।"

সন্ধ্যা বললে, "তাতে সুবিধে হবে না সাধু, উনি হয়তো আমার সঙ্গেও দেখা করতে চাইবেন। তার চাইতে আমি গিয়ে ওঁর কাজ সেরে দিয়ে আসি।" তারপর স্মিতমুখে বললে, "কিন্তু সাধু, তুমি নিজে সাধুচরণ হ'য়ে সাধুদের ওপর এত চটা কেন বল দেখি?"

সাধুচরণ চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বললে, "এদের তুমি সাধু বল, মা? তুমি জান না, এরা এক-একটি লবাব। চেহারা দেখে বুঝতে পার না যে, দস্তুরমতো দুধ-ঘী-খেকো শরীর? আর ঐ যে গেরুয়া রঙের খদ্দর দেখ, ওর একটি তোমার তিনখানা ধুতিকে হার মানাতে পারে। বড় মানুষের দোরে এসে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যায় আর এই সব লবাবী ক'রে।"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না সাধু, তুমি জান না, এরা সত্যি-সত্যিই সাধু। এঁরা যে টাকা নিয়ে যান তাতে অনেক সৎকার্য করেন। গরীব দুঃখী রোগীর সেবা, দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো—এইরকম অনেক ভালো কাজ এদের দ্বারা হয়।"

তা হয়তো হয়। কিন্তু তথাপি সাধুচরণ সন্ন্যাসীদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। অপ্রসন্ন মুখে বললে, "তা হ'লে বসাব না কি?"

"হ্যাঁ বসাওগে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

বিড়বিড় ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে কী বলতে বলতে সাধুচরণ প্রস্থান করলে। সেটা যে সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে অভিলষণীয় মন্তব্য নয় তা সহজেই বোঝা গেল।

সাধুচরণ প্রমথর পিতার আমলের ভৃত্য। প্রমথর যখন চোদ্দ বৎসর বয়স তখন তার বিধবা মাতা মৃত্যু-শয্যায় অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তির অভাবে বিশ্বস্ত ভৃত্য সাধুচরণের উপর একমাত্র পুত্রের ভার সমর্পণ করেন। সে আজ পনের ষোল বৎসরের কথা হবে। সাধুচরণ যথাশক্তি সব বিষয়েই প্রমথকে শাসন ক'রে আসছিল, কিন্তু জ্ঞাতি-গৃহে বিবাহ উপলক্ষে দেশের বাটীতে কিছুদিন একাকী অবস্থান কালে প্রতিবেশিনী বিধবা কন্যা বনমালতীর হাতে ঘটনাচক্রে প্রথম তালিম নিয়ে প্রমথ যে কর্দমাক্ত পথের পথিক হলো সে পথের গতি কিছুতেই সে রোধ করতে সমর্থ হ'লো না। বিপদ দেখে সাধুচরণ প্রমথর বিবাহ দেওয়ার

জন্ত উঠে পড়ে লাগল। প্রমথর অর্থের প্রভাবে সুন্দরী পাত্রীকে সম্মুখে ফেলে প্রমথকে লুব্ধ করবার ব্যবস্থা কঠিন হ'লো না। কিন্তু কোন মতেই তাকে বশীভূত করা গেল না—প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলে, 'কিছুতেই না সাধু, কিছুতেই না; পায়ে শেকল লাগিয়ে তুই যে আমাকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলতে চাস, তা কিছুতেই হবে না। তা ছাড়া, যে লোক চিংড়ি মাছ খেতে অভ্যস্ত হয়েছে তাকে মালপোয়া খাওয়ালেই সে যে চিংড়ি মাছ খাওয়া ত্যাগ করবে তার কোনও মানে নেই।'

ক্রমশঃ সাধুচরণেরও মনে সংশয় উপস্থিত হ'লো যে, হয়তো সত্যিই তার কোনও মানে নেই। তখন অগত্যা হতাশ হ'য়ে সে হাল ছেড়ে দিলে।

তারপর আট দশ বৎসর কেটে গেছে, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বিচিত্র কীর্তিকলাপের দ্বারা প্রমথ তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ দিয়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বৎসর তিনেক দেশে না এসে প্রবাসে অজ্ঞাতবাস ক'রে যেমন দিয়েছে তার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। তাই গত বৎসর বৈশাখের প্রারম্ভে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ যখন তার দীর্ঘ প্রবাসবাসের পর কলিকাতার বাটীতে এসে উপস্থিত হ'লো, তখন প্রথম তিন চার দিন সাধুচরণ ঘৃণায় বিদ্বেষে, কথা কওয়া তো দূরের কথা, সন্ধ্যার মুখের প্রতি ভালো ক'রে দৃষ্টিপাতও করেনি। তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সম্বোধনে বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা করার পর বিতৃষ্ণার মূলে প্রবল একটা আঘাত পড়ল—সন্ধ্যা হয়তো বা ঠিক চিংড়িমাছ শ্রেণীর জীব নয়, মনের মধ্যে এ সংশয়ও সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলে। ক্রমশঃ দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে বিতৃষ্ণা রূপান্তরিত হ'লো সুগভীর আসক্তিতে—এমন কি পর্যায়ের ক্রমে প্রমথও একদিন সন্ধ্যার কাছে পিছিয়ে পড়ল। এখন সময়ে-সময়ে সাধুচরণের মনে হয়, সন্ধ্যা হয়তো বা প্রমথর বিবাহিত স্ত্রীই। অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে এ ধারণা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয় সেই ভয়ে অনুসন্ধান করে না—মনে মনে ভাবে, যে-চাকে এত মধু সে চাক মৌমাছিরই হবে—বোলতার সম্ভবতঃ নয়।

নিচে এসে অফিস ঘরে প্রবেশ ক'রে স্বামী অচলানন্দকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা বললে, "এই বৃষ্টি-বাদলায় কষ্ট ক'রে কেন এলেন, ভারি কষ্ট হয়েছে আপনার।"

প্রতিনমস্কার ক'রে অচলানন্দ বললেন, "না, একটুও কষ্ট হয়নি, ভারি আনন্দে এসেছি। আমাদের আশ্রমে আপনার আশাতীত অর্থসাহায্যের জন্যে অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজ সকালে আপনাকে একখানা চিঠি লিখলাম। তারপর ভাবলাম চিঠিখানা বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে আপনার হাতে দেওয়ার আনন্দ থেকেই বা বঞ্চিত হই কেন।" ব'লে খামে-মোড়া একখানা চিঠি সন্ধ্যার হাতে দিয়ে হাসতে লাগলেন।

চিঠিখানা খুলে প'ড়তে প'ড়তে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; চিঠি শেষ

ক'রে অচলানন্দর প্রতি অপ্রতিভ মুখ উত্তোলিত ক'রে বললে, "সামান্য সাহায্য, তার জন্যে এত বেশি ক'রে ব'লে লজ্জিত করেছেন—"

মাথা নেড়ে অচলানন্দ বললেন, "সামান্য নিশ্চয়ই নয়, মিসেস মুখার্জি। দশ বৎসরের জন্যে মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা, এ সত্যিই সামান্য নয়। এর জন্যে আমাদের আশ্রম চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে! কিন্তু আপনাদের লক্ষ্ণৌ যাওয়া কবে স্থির হ'লো? আমরা মনে করছিলাম শীঘ্রই একদিন আপনাদের দু'জনকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সামান্য একটু অভিনন্দনের উৎসব করব।"

অচলানন্দর কথা শুনে সন্ধ্যা চকিত হ'য়ে উঠল; বললে, "না, না, কখনও তা করবেন না অচলানন্দজী। আমি তা হ'লে ভারি লজ্জিত হব।"

অচলানন্দ স্মিতমুখে বললেন, "বাইরের কোনও লোককেই তো বলবো না। শুধু আশ্রমবাসীদের মধ্যে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে একটু আনন্দ।" করজোড়ে বললেন, "অনুমতি দিন।"

ব্যস্ত হ'য়ে আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "এ কী করছেন আপনি! আচ্ছা, তা না-হয় হবে। কিন্তু আমরা যে পরশু চ'লে যাচ্ছি।"

"বেশ তো কাল সন্ধ্যা ৬টার সময়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে?"

একটু চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা। কিন্তু উনি তো এখনও এলেন না, ওঁকে তো বলা হ'ল না।"

অচলানন্দ স্মিতমুখে বললেন, "সে জন্যে কিছু আটকাবে না। আপনাকে বলা হ'লেই তাঁকেও বলা হ'ল।" আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমরা নিজেদের সন্ন্যাসীমানুষ ব'লে গর্ব করি, লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের ভালো দেখায় না। কিন্তু তবু একটা কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছিনে।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বললে, "কি কথা বলুন-না?"

"আমাদের ইচ্ছে, নারী-কল্যাণ মন্দিরের চাঁদার খাতাটা আপনাকে দিয়ে আরম্ভ করি।"

অচলানন্দের কথা শুনে যৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "ছি ছি, দেখুন, আমি একেবারে ভুলে গেছি! আপনি একটু বসুন, আমি এখনই এনে দিচ্ছি।" ব'লে সে ত্বরিতপদে উপরে গেল, তারপর একটা হাজার টাকার চেক লিখে এনে অচলানন্দর হাতে দিয়ে বললে, "এইটে প্রথম কিস্তি।"

চেকে টাকার পরিমাণ দেখে অচলানন্দর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন; "ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ মিসেস মুখার্জি। আর আপনার ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্যে এখনও যে খানিকটা খোলা রইল, তার জন্যে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু লক্ষ্ণৌ থেকে আপনারা ফিরচেন কবে?"

মাস দুই পরে—সম্ভবতঃ পূজোর আগেই।"

মনে মনে একটু কী চিন্তা ক'রে অচলানন্দ কতকটা স্বগতই বললেন, "আচ্ছা, তা হ'লেও হবে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কী হবে, মহারাজ ?"

"সে কথা এখন আপনাকে বললে আপনি ভারি আপত্তি করতে থাকবেন।" ব'লে সহাস্যমুখে অচলানন্দ প্রস্থান করলেন।

বৈকালের দিকে আবার সজোরে বৃষ্টি নেমেছিল। দক্ষিণদিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শয়ন ক'রে প্রমথ বৃষ্টি এবং বাতাসের মাতামাতি উপভোগ করছিল। কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা প্রস্ফুটিত কদম গাছে গোটা দশ বার বাদুড় ঝুলছিল আর দুলছিল। কয়েক বৎসর আগে কোনও অজ্ঞাত কারণে তাদের পূর্বের বাসা পরিত্যাগ ক'রে এক বাদুড়-দম্পতি এই গাছে এসে আশ্রয় বাঁধে, তারপর ক্রমশঃ তাদের সন্তান-সন্ততির জন্মের ফলে দল পুষ্ট হয়েছে।

সন্ধ্যা এসে প্রমথর নিকট আর একটা ইজিচেয়ারে উপবেশন করলে, তারপর হাত বাড়িয়ে অচলানন্দর চিঠিখানা প্রমথর হাতে দিলে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "এ, কী উষা ?"

স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "আমার কাঁধে চাপানো তোমার যশের বোঝা।" কাশী হ'তে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পর একত্র জীবন যাপনের জন্য ক্রমশঃ আত্মীয় ঘনীভূত হওয়ার ফলে সন্ধ্যা প্রমথকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছিল।

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "আমার যশের বোঝা ? দেখি, কী এমন সৎকার্য করলাম যে আমার যশের বোঝা তোমার কাঁধে চাপল !"

নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সঙ্গে চিঠিখানা শেষ ক'রে প্রসন্নমুখে প্রমথ বললে, "চমৎকার লিখেছেন !—আর, সমস্তই ঠিক লিখেছেন। লিখবেনই বা না কেন ? যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনি উদার অন্তঃকরণ ! একথা তুমি নিশ্চয় জেনো উষা, অচলানন্দ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এম-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন এইটেই তাঁর পাণ্ডিত্যের সব চেয়ে বড় কথা নয়। তাঁর মতো অত বড় বৈদান্তিক বাঙলা দেশে আর কেউ আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সে কথা যাক, তুমি এ চিঠিখানাকে আমার যশের বোঝা বলছিলে কেন ?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "টাকা যখন তোমার, যশ তখন তোমার নয় তো কার ?"

কপট ক্রোধভরে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রমথ বললে, "মন্ত্র-পড়া বউ নও ব'লে ভারি তোমার দম্ভ হয়েছে দেখছি ! চুল-চেরা ভাগ ক'রে অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়েছি তবু টাকা আমার ? রোসো, জব্দ করছি ! একদিন একজন পুরুত ডাকিয়ে কয়েকটা অনুস্বর বিসর্গের মন্ত্র পড়িয়ে নিচ্ছি, তারপর কার টাকা তুমি বল, দেখা যাবে ! নিতান্ত আমাকে ভালোমানুষ পেয়েছ, তাই !"

"তাই কি ?"

"তাই এ-সব কথা বলতে সাহস পাও !"

সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর গভীর হ'য়ে এল ; বললে, "তাই শুধু এ সব কথা বলতেই সাহস পাইনে, আরও অনেক কিছুতেই সাহস পাই।"

সন্ধ্যার পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে প্রমথ বললে, "যথা ?"

পশ্চিম আকাশে মেঘের একটা ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "একটা কথা শুনেছ ?"

এটা প্রসঙ্গান্তরের ভূমিকা, সুতরাং এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ বুঝতে পেরে প্রমথ বললে, "যদি এ পর্যন্ত না ব'লে থাক তা হ'লে শুনিনি।"

"কাল সন্ধ্যেবেলা আমার অভিনন্দন।"

"আনন্দের কথা। কিন্তু কোথায় ?"

"অচলানন্দজীর আশ্রমে।"

"টাকা যখন আমার, তখন তোমার অভিনন্দন কী রকম ?"

"সে কৈফিয়ৎ তাদের কাছে নিয়ো। শুধু আমার নয়, তোমারও।"

সোচ্ছ্বাসে প্রমথ বললে, "যুগলে ?—কিন্তু পরশু সকালে লক্ষ্ণৌ যাওয়া, কাল সন্ধ্যায় অতখানি সময় দিলে অসুবিধে হবে না তো ?"

"কী করব বল ? হাত জোড় করলেন, অস্বীকার করতে পারলাম না।"

"তা ভালোই করেছ—কিছু অসুবিধে হবে না। এখন চল, মিস্ চ্যাটার্জির সঙ্গে সেই কথাটা শেষ ক'রে আসা যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "চল।"

একত্রিশ

পরদিন সকালে চা পানান্তে প্রমথ বললে, "উষা, চল, ঝাঁ ক'রে কতকগুলো দরকারি জিনিস কিনে নিয়ে আসি।"

দুই হাত যুক্ত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "রক্ষে কর, আর দরকারি জিনিস কিনে কাজ নেই! লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে যে সব জিনিসপত্র সত্যিই দরকারি, তা তিন দিন হ'ল কেনা হ'য়ে গেছে। তারপর যে রাশখানেক জিনিস কিনেছ সবই অদরকারি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "একটিও না। 'বিনা প্রয়োজনে কেনো যাহাকে, প্রয়োজন কালে কাছে সে থাকে'—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পদে ভরা এই সারগর্ভ উপদেশটি সর্বদা মনে রেখো। তুমি ছেলেমানুষ—দশ বছরের প'ড়ে-থাকা অদরকারি জিনিস হঠাৎ একদিন কী ভীষণ দরকারি হ'য়ে ওঠে—সে রহস্য কিছুমাত্র জান না।',

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হাসতে লাগল; বললে, "তাই ব'লে বেলা চারটে পর্যন্ত না খেয়ে শরীর নষ্ট ক'রে রাজ্যের অদরকারি জিনিস কিনতে হবে ?"

এ কথায় প্রমথর মনোযোগ হঠাৎ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হলো; বললে, "কিন্তু আমি তো চুনীলাল মোতিলালের দোকান থেকে তোমাকে খেয়ে নেবার জন্যে একটার সময়ে ফোন ক'রেছিলাম, উষা। তুমি খেলে না কেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি একটার সময়ে খেলে তোমার চারটে পর্যন্ত না খেয়ে থাকার অত্যাচার কাটে কী রকম ক'রে সে কথাটা বল ?"

প্রমথ হাসতে হাসতে বললে, "না, কোনও রকমেই কাটে না। যুক্তি অকাট্য—হার স্বীকার করছি !"

এমন সময়ে দেখা গেল অদূরে ধীর পদক্ষেপে সাধুচরণ অগ্রসর হচ্ছে। মনের মধ্যে যে একটা-কিছু বিশেষ মতলব প্রবল হয়েছে, তা তার গতিভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। প্রমথ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আন্দাজ করতে পারছ কিছু, ঊষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "কতকটা পারছি বই কি।"

"কী ?"

"এসে তো পড়েছে। ওর মুখেই শোন-না।"

সাধুচরণ নিকটে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর একটু ইতস্তত: সহকারে বললে, "কিছু নিবেদন আছে, বাবা।"

সাধুচরণের দিকে মুখ তুলে প্রমথ বললে, "কী নিবেদন সাধু ?"

নিঃশব্দ হাস্যে সাধুচরণের মুখমণ্ডল ভ'রে গেল ; বললে, "এবার আমি মা'র সঙ্গে লখ্‌নো যাব।"

"কেন ? কী দরকার ?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাধুচরণ বললে, "মাকে একটু দেখাশোনা দরকার। মা'র শরীরে একটুও যত্ন নেই।"

প্রমথ বললে, "সে তো ভালো কথা ; কিন্তু আমার শরীরে এমন কী যত্ন দেখেছিলি, সাধু, যাতে এতদিনের মধ্যে একবারও আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবার যাবার কথা মনে হয়নি ?"

প্রমথর কথায় সাধুচরণ অপ্রতিভ হ'লো ; একটু ইতস্তত: ক'রে বললে, "আজ্ঞে, তুমি হ'লে বেটাছেলে—"

সাধুচরণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রমথ বললে, "আর মা হলেন মেয়েমানুষ। এই তো ? এ কথা আমার কতকটা জানা আছে সাধু। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুই লক্ষ্ণৌ গেলে এখানকার বাড়ির হেপাজতে থাকবে কে ?"

প্রমথর মন্তব্যে সাধুচরণের মনে ক্রোধ সঞ্চারিত হ'লো ; ঈষৎ উষ্মার সহিত বললে, "শোন কথা। সারাটা জীবন আমি তোমার বাড়ির হেপাজতে থাকব নাকি ? এখন থেকে আমি মা'র সাথে সাথে থাকব।"

কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বললে, "কেন ? এখন থেকে তুমি মা'র খাস চাকর হ'লে নাকি ?"

ঊর্ধ্বে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ঔদাস্যের সুরে সাধুচরণ বললে, "তা তুমি যাই বল, বাবা।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "তুমি কী বল, ঊষা? সাধু আমাদের সঙ্গে যাবে না কি?"

সন্ধ্যা বললে, "ইচ্ছে যখন হয়েছে, চলুক। রামভজন সিংকে বাড়ির চার্জে থাকবার জন্যে ও রাজি করিয়েছে। এখন না গিয়ে সে পুজোর পর বাড়ি যাবে।"

সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রমথ বললে, "গয়লা হ'লে কী হয়, পেটে পেটে কম বুদ্ধি নয় তো! সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তারপরে আমার কাছে এসেছ অনুমতি নেবার জন্যে?"

সাধুচরণের মুখমণ্ডলে পুনরায় নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "তা বাবা, তুমি হ'লে মনিব, তোমাকে একবার না বলা ভালো দেখায় কি?"

কষ্টে হাস্য রোধ ক'রে কপট বিদ্রূপের স্বরে প্রমথ বললে, "উঃ! কর্তব্যজ্ঞান একেবারে টনটন্ করছে! আমি হলাম মনিব, আর মা তোমার মনিব নয়?—তিনি তোমার গুরুঠাকরুণ—না?"

প্রমথর কথা শুনে সাধুচরণ হেসে ফেললে। বললে, "এক হিসেবে মিথ্যে বলনি বাবা! এই বয়সে ঐটুকু মেয়ের কাছে কম শিক্ষে হ'লো না!" ব'লে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলে।

প্রমথ বললে, "আশ্চর্য! অথচ এই লোকটি প্রথম কয়েক দিন ঘৃণায় বিদ্বেষে তোমার মুখদর্শন পর্যন্ত করেনি। মানুষ বশীকরণের এমন অদ্ভুত যন্ত্র বিধাতাপুরুষ তোমার দেহের কোন জায়গায় বসিয়েছেন বলতে পার, ঊষা, যাতে ক'রে কোন লোকই তোমার কাছে রক্ষে পায় না?"

সন্ধ্যা বললে, "কোথায় বসিয়েছেন তা বলতে পারিনে, কিন্তু বসিয়ে যদি থাকেন তো একেবারে অকেজো যন্ত্র বসিয়েছেন, তা বলতে পারি।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "অকেজো কেন?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "যন্ত্রটি আমার শ্বশুরবাড়িতে কী চমৎকার পরিচয় দিয়েছিল সে কথা তো শুনেছ। যার কাছে যাই, সেই দূর-দূর করে।"

প্রমথ বললে, "তার দ্বারা যন্ত্রটি এই প্রমাণ করেছিল যে, তারা মানুষ নয়, অমানুষ। আমি মানুষ-বশীকরণের যন্ত্রের কথাই বলছিলাম, ঊষা, অমানুষ-বশীকরণের কথা বলিনি। তারপর কিছুদিন পরে একজন সত্যিকার মানুষ যখন সেই যন্ত্রটির সম্মুখে প'ড়ে গেল তার কী অবস্থা হ'লো, ভেবে দেখ। দেখতে দেখতে তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্তটা বেমালুম হজম হ'য়ে গেল, কিছুই বাকি রইল না। সাধে কি তোমাকে মাঝে মাঝে রাক্ষুসী ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হয়?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "ইচ্ছে যদি হয় তো ডাক-না কেন?"

প্রমথ বললে, "কেন ডাকিনে, জানো? অমন আদরের ডাকটি হঠাৎ খরচ

ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করে না। ডাকতে গিয়ে ভাবি আজ থাক আর একদিন ডাকব।"

শুনে সন্ধ্যার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল ; মনে মনে বললে, "ভারি তো বাকি রইল ডাকতে!"

"উষা ?"

"কী বল ?"

"একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না কর।"

"কি কথা ?"

"ডক্টরেট লাভ ক'রে প্রিয়লাল দেশে ফিরে এসেছে, আর তোমার শ্বশুর জহরলাল চৌধুরী মারা গেছেন, এ সংবাদ তোমার জানা আছে ?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, তুমি তো খবরের কাগজে এ দুটো খবরই আমাকে দেখিয়েছিলে।"

একটু ইতস্তত: ক'রে প্রমথ বললে, "যদি অনুমতি দাও তো লক্ষ্ণৌ যাওয়া উপস্থিত বন্ধ রেখে দু-চার দিন একটু দৌত্য করি।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বললে, "দৌত্য ? কার কাছে দৌত্য ?"

"প্রিয়লালের কাছে।"

"কেন ? কিসের জন্যে ?"

প্রমথ বললে, "অবশ্যই তোমাদের দু'জনের পুনর্মিলনের জন্যে।"

সন্ধ্যা বললে, "ও!" তারপর একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "এ কথা কি তুমি আমার মন পরীক্ষা করবার জন্যে বলছ ?"

প্রমথ বললে, "না, তা কেন ?"

"তবে কি তোমার দায়িত্ব কাটাবার জন্যে বলছ ?"

"না, তাই বা কেন ভাবছ ?"

"তবে পরিহাস করছ ?"

প্রমথ মাথা নেড়ে বললে, "না, না, পরিহাসও করছিনে।"

"পরিহাসও নয় ?—তবে আজই আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখন তো আমাকে খুব বড়লোক ক'রে দিয়েছ, এখন বোধহয় সেখানে স্থান পাওয়া খুব কঠিন হবে না।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "হঠাৎ বাপের বাড়ি যাওয়ার কী দরকার পড়ল ?"

সন্ধ্যা বললে, "একজন অনাত্মীয় পুরুষের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা ক'রে কোনও ফল আছে কি ? এখান থেকে তারা আমাকে তাদের ঘরে নিতে চাইবে কেন ?"

একমুহূর্ত সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বললে, "তুমি আমার উপর রাগ করছ, উষা!"

সন্ধ্যা বললে, "রাগ আমি করছিনে, কারণ আমি জানি যে-কথা তুমি বলছ

তোমার নিজের কাছেও সে কথার কোনও মানে নেই। কিন্তু রাগ আমি করলে এমন-কিছু অন্যায় করা হতো কি ?"

ঈষৎ ব্যথিতস্বরে প্রমথ বললে, "তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি, উষা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেললে। বললে, "ক্ষমা তা হ'লেই করব বাজে কথায় যদি আর সময় নষ্ট না ক'রে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেবার বিষয়ে মন দাও। আজ ও-বেলা আশ্রম থেকে ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে, কাল সকালে খাওয়া-দাওয়া বাঁধা-ছাঁদা করতেই সময় পাওয়া যাবে না, আজ এখন সমস্ত একেবারে ঠিক ক'রে গুছিয়ে না ফেললে অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু গোছাবার এমনই বা কী আছে, উষা ? জিনিস-পত্রগুলো তাড়াতাড়ি প্যাক্ ক'রে নিলেই তো হলো।"

সন্ধ্যা বললে, "সেইখানেই তো গোল। প্রত্যেকটি জিনিস বিবেচনা ক'রে তবে প্যাক্ করতে হবে। লক্ষ্ণৌ আর কলকাতা দুই সংসারের জিনিস-পত্র আমি এমন স্বতন্ত্র ক'রে ফেলতে চাই যে ভবিষ্যতে যাতায়াতের সময় অতি অল্প জিনিস সঙ্গে নিলেই চলবে।"

প্রমথ বললে, "সেই ভাবে গুছিয়ে নেবার জন্যে এবারকার কেনা সমস্ত জিনিস লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া দরকার।"

সন্ধ্যা বললে, "মোটেই নয়। লক্ষ্ণৌ-এ বোধ হয় থান পনের ষোল তোয়ালে আছে, তারপর পছন্দ হলো ব'লে পরশু একেবারে দু' ডজন তোয়ালে কিনে ফেললে। আচ্ছা, দু'জন লোকের অতগুলো তোয়ালে কী হবে বল দেখি ?"

"সময়ে কাজে লাগবে।"

"সে কাজে কলকাতায় লাগবে। ওর আমি একটিও লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাব না।"

"আচ্ছা, সে তুমি যেমন ভালো বোঝ, কোরো—কিন্তু বাজারে একবার কখন বেরুচ্ছ ?"

"লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে তারপর।"

"তার আগে আর নয় ?"

হেসে ফেলে সন্ধ্যা বললে, "না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ক্ষুণ্নমনে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তথাস্তু।"

বত্রিশ

কলিকাতা হ'তে মাইল আষ্টেক দূরে সুদূরগামী কোনও রাজপথের উপরে ভারতী আশ্রমের আলয়। দুই শতাধিক বিঘা পরিচ্ছন্ন সমতল ভূমির উপর আশ্রম অবস্থিত। চতুর্দিক সুদৃঢ় তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ প্রধান সৌধ এবং সুরকি-ঢালা পথের পাশে-পাশে দূরে-দূরে কাঁচা পাকা ছোট বড় কয়েকটি

গৃহ। তোরণ অতিক্রম ক'রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই দক্ষিণে বামে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী, একটিতে শ্বেত এবং অপরটিতে রক্তপদ্মের লতা। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি—আশ্রমের প্রবেশপথ হ'তে তার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

একজন আশ্রম-সদস্যের সমভিব্যাহারে প্রমথ ও সন্ধ্যা যখন তোরণ-সম্মুখে উপনীত হলো তখন ছয়টা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। বরণ্যে অতিথি-যুগলের সাদর অভ্যর্থনার জন্য স্বামী অচলানন্দ এগিয়ে এসে তোরণ-পথে অপেক্ষা করছিলেন। তোরণের শীর্ষদেশে পুষ্পস্তবকে রচিত "স্বাগত"; তোরণের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ এবং কদলী বৃক্ষের পাশে নারিকেল ফল সমন্বিত পূর্ণকলস।

অচলানন্দকে দেখতে পেয়ে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। অচলানন্দ সহাস্যমুখে সন্ধ্যা এবং প্রমথকে যুক্তকরে নমস্কার ক'রে স্নিগ্ধগভীর কণ্ঠে ক্ষুদ্র একটি অভ্যর্থনা শ্লোক পাঠ করলেন, তারপর মোটরে আরোহণ ক'রে ধীরে ধীরে প্রধান সৌধের অলিন্দ প্রান্তে এসে উপনীত হলেন।

সেখানে আশ্রম বালিকারা প্রস্তুত হ'য়ে ছিল। মোটর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতেই শঙ্খধ্বনি হলো, সন্ধ্যা এবং প্রমথ গাড়ি থেকে অবতরণ করবামাত্র কয়েকটি বালিকা তাদের মাথার উপর পুষ্প-বর্ষণ করলে, তারপর জলপূর্ণ ঝারি হস্তে দুটি বালিকা জল ফেলতে ফেলতে পুষ্পবিকীর্ণ পথে অভ্যাগতদ্বয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে, অলিন্দ অতিক্রম ক'রে, হল্-ঘরের মধ্যস্থল দিয়ে সভাবেদী পর্যন্ত লাল শালু-ঢাকা পথ। পত্রে পুষ্পে মাল্যে স্তবকে সাজানো হল্-ঘরের শেষ প্রান্তে সভাবেদী, তদুপরি একটি সুদৃশ্য আস্তরণ-আচ্ছাদিত টেবিল—টেবিলের উপরে দুটি মূল্যবান পিতলের ফুলদানীতে পদ্মগুচ্ছ। টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি রাখা দুটি কারুকার্য-খচিত চেয়ার। তার আশে-পাশে কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার।

প্রমথ ও সন্ধ্যা হল্-ঘরে প্রবেশ করতেই সমাগত ব্যক্তিগণ উঠে দাঁড়াল এবং চতুর্দিকে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন উত্থিত হলো। প্রমথ সহাস্যমুখে যুক্ত করে সকলকে অভিবাদন করলে, তারপর সন্ধ্যাসহ বেদীর উপর উপস্থিত হলো।

প্রমথ ও সন্ধ্যা দুটি সাধারণ চেয়ার অধিকার করতে উদ্যত হ'লে অচলানন্দ বাধা দিয়ে বললেন, "এ আমাদের সাধারণ সভা নয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে সভার সাধারণ নিয়ম মেনে চলবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে একেবারে আপনাদের নিজ নিজ আসনে উপবেশন করুন। তার জন্যে প্রস্তাব এবং সমর্থন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে প্রস্তাব কয়েকদিন থেকেই আমাদের সকলের মনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রয়েছে।"

প্রমথ এবং সন্ধ্যা আসন গ্রহণ করার পর সভাগৃহে একটা আনন্দধ্বনি উদ্বেল হয়ে উঠল। তারপর দুটি বালিকা এল বরণের বিবিধ উপচার নিয়ে। ধান্য দূর্বা

পুষ্প চন্দন গন্ধদ্রব্য দিয়ে ঘন ঘন শঙ্খ-ধ্বনির মধ্যে তারা তাদের মান্য অতিথিদ্বয়কে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বরণ করলে, তারপর একটি পাত্র থেকে দুটি মালা তুলে উভয়ের কণ্ঠে বিলম্বিত ক'রে দিলে; বাজারে-কেনা তারের কঠিন মালা নয়, সুদৃঢ় রেশমী সুতায় সযত্নে আশ্রমে গাঁথা কমনীয় মালা।

দেখা গেল ইত্যবসরে কখন অলক্ষিতে সভাবেদীর এক দিকে একটি ক্যামেরা উদ্যত হয়েছে। ফটো গ্রহণের সুবিধার জন্য টেবিল চেয়ারগুলিকে ঈষৎ সরিয়ে ফিরিয়ে নিতে হলো। প্রমথ ও সন্ধ্যা পুনরায় আসন গ্রহণ করলে অচলানন্দ নিকটে এসে স্মিতমুখে যুক্তকরে বললেন, "একটু ভুল হয়েছে। অনুগ্রহ ক'রে পাল্টে বসুন।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"স্বামীকে নিজের দক্ষিণ দিকে পাবার স্ত্রীর অধিকার অলঙ্ঘনীয়—ফটোগ্রাফে তো কথাই নেই।"

এ কথাটা সন্ধ্যার পূর্বে খেয়াল হয়নি! মৃদুস্বরে বললে "ও।" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে প্রমথর আসবার জন্য স্থান ক'রে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়াল।

উভয়ে আসন পারবর্তিত ক'রে বসলে পর-পর দুটি ফটো তোলা হলো—প্রথমটি শুধু প্রমথ এবং সন্ধ্যার, দ্বিতীয়টি আশ্রমের আচার্যগণের সহিত একত্রে।

এর পর সভার কার্যাবলী আরম্ভ হলো। পরদিন সকালের গাড়িতে প্রমথ এবং সন্ধ্যার লক্ষ্ণৌ যাত্রার কথা, সুতরাং তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র মুক্তি দিতে হবে, এ কথা স্মরণ রেখে সভার কার্যসূচী সংক্ষিপ্তই করা হয়েছিল। দু'-চারটি গান, দু'-তিনটি কবিতা-আবৃত্তি, অচলানন্দর অভিভাষণ, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে অভিনন্দন-লিপি প্রদান, প্রমথর প্রতিভাষণ, অচলানন্দর ধন্যবাদ জ্ঞাপন—এই কার্যসূচী। কিন্তু নির্বিকল্প ঐকান্তিকতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত কার্যসূচী দেখতে দেখতে অভিব্যক্তির এমন একটা স্তরে উপনীত হলো যে, সমস্ত সভা একটা সুসম্বদ্ধ সঙ্গীত-যন্ত্রের মতো সুরের ঐক্যে অনুরণিত হ'তে লাগল।

কবিতায় কবিতায়, গানে গানে, অভিনন্দন-লিপিতে সন্ধ্যা এবং প্রমথর প্রতি একই উচ্ছ্বাস, একই নিবেদন। অচলানন্দ তাঁর অভিভাষণে বললেন, "যে মিলনের ভিত্তিতে রুচি এবং সহৃদয়তার ঐক্য বর্তমান সেই মিলনই যথার্থ মিলন। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অভিন্ন বন্ধনে যে স্বামী-স্ত্রী আবদ্ধ সেই স্বামী-স্ত্রীই যথার্থ দম্পতি। সেই হিসাবে আমাদের আজ সন্ধ্যার এই বরেণ্য অতিথিদ্বয়কে আমি আদর্শ দম্পতি বলতে পারি। এঁদের রুচি এক, প্রবৃত্তি এক, মত এবং পথ এক, সুতরাং ধর্মও এক। সেই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শাস্ত্রের অনুশাসন—সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ—এত সহজে এবং সুন্দর ভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে উজ্জ্বল করেছেন এবং এদের সংযুক্ত জীবন উভয়ের দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে। এই সম্পর্কে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের একটি পদ আমার মনে পড়ল, যেটি এদের বিষয়ে সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে

পদটি এই—শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী, শশিনা নিশয়া বিভাতি নভঃ; অর্থাৎ শশীর দ্বারা নিশা শোভা পাচ্ছে, এবং নিশার দ্বারা শশী শোভা পাচ্ছে, এবং শশী এবং নিশা উভয়ের দ্বারা নভ শোভা পাচ্ছে। বর্তমান ক্ষেত্রে শশী এবং নিশা কারা এবং নভ কী, আশা করি সে কথা প্রকাশ ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।"

অভিভাষণের শেষ ভাগে প্রমথ এবং সন্ধ্যার সমুদার দানশীলতার পুনরুল্লেখ ক'রে অচলানন্দ বললেন, "এঁরা দু'জনে চিরদিনের জন্য আমাদের এই আশ্রমের পরমাত্মীয় হ'য়ে রইলেন। এঁদের দু'জনের দানশীলতা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করেছে। যে বিপুল অর্থ এঁরা আশ্রমকে দান করেছেন শুধু তার পরিমাণ মনে ক'রেই এ কথা বলছি নে, এঁদের দু'জনের মনে দান করবার প্রবৃত্তির যে বিস্ময়জনক অবলীলা আছে প্রধানতঃ সেই কথা মনে ক'রেই বলছি। এঁদের কাছে চাওয়া এবং পাওয়া এমন অভেদ্যভাবে এক যে, আমাদের পক্ষে পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই ক্রমশঃ অনেক বেশি কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। যে গাছকে নাড়া দিলেই ফল পাওয়া যায় সে গাছকে যখন-তখন নাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না এমন নির্লজ্জ লোভী মন খুব বেশি নেই।"

অচলানন্দের অভিভাষণ শেষ হ'লে উত্তরে প্রমথ বললে, "আপনারা আমাদের দু'জনকে দানশীল ব'লে প্রশংসা করেছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধ'রে নেওয়াই যায় যে, আমরা নিজেদের দানশীল ব'লে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, তা হ'লে আপনারাই আমাদের নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ, কারণ আপনারা আমাদের সে খ্যাতি অর্জন করবার সুযোগ দিয়েছেন। দানের উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন দাতার চেয়ে গ্রহীতার আসন কম উচ্চে নয়। সঞ্চয়ের সার্থকতা সদ্ব্যয়ে। সুখে-দুঃখে ধর্মেকর্মে যিনি আমার অংশভাগিনী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে আমার ব্যয় ছিল না সে কথা বলিনে, কিন্তু সে ব্যয় ছিল অপব্যয়। ইনি এর অনতিবর্তনীয় প্রভাবের দ্বারা সে ব্যয়ের গতি পরিবর্তিত করেছেন সদ্ব্যয়ে, সুতরাং এই প্রসঙ্গে ইনিও আমার ধন্যবাদার্হ।"

সন্ধ্যার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "এঁর মুখের পরিবর্তিত আকৃতি দেখে আমি বুঝতে পারছি যে এঁর সম্পর্কে এই সকল কথা আমি বলতে উদ্যত হয়েছি ব'লে ইনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথা বলবার লোভ সংবরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই, সুতরাং এঁর বিষয়ে আর একটি মাত্র কথা ব'লে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। দুর্ভাগা, বিপন্না, সমাজ কর্তৃক উৎপীড়িতা নারীদের কল্যাণসাধনের জন্যে এঁর মনের তীব্র আগ্রহ দেখে আমি এঁকে একটি নারীকল্যাণ মন্দির স্থাপন করবার পরামর্শ দিই। ইনি কিন্তু, পাছে যথোপযুক্ত শক্তি এবং সামর্থ্যের অভাবে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয় সেই আশঙ্কায়, নিজে ভার গ্রহণ না ক'রে কোনও চলতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্প করেন। তারপর কী প্রকারে আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এবং নারীকল্যাণ মন্দিরের পরিকল্পনা গ'ড়ে

ওঠে সে সকল কথা আপনাদের সম্পূর্ণ জানা আছে। আপনাদের পরিকল্পিত নারীকল্যাণ মন্দিরের সাহায্যে গতকল্য ইনি কিছু টাকা দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় কিস্তি স্বরূপ আজও একটি চেক্ এনেছেন। আপনাদের নারীকল্যাণ মন্দিরের কার্যের অগ্রগতি দেখে ইনি যদি উৎসাহিত হন তা হ'লে এঁর সাহায্যের সমষ্টি কালে লক্ষ টাকা অতিক্রম করতে পারে, এঁর মনের এই সিদ্ধান্তটুকু আমি আপনাদের কাছে আজ প্রকাশ করলাম।"

সভাস্থলে আনন্দসূচক ঘন ঘন করতালি এবং 'সাধু সাধু' রব উত্থিত হলো। প্রমথ বললে, "আপনারা আজকে আমাদের দু'জনকে এমন সুস্পষ্ট আন্তরিকতা এবং অনুরাগের সঙ্গে অভিনন্দিত ক'রে আমাদের মনে যে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছেন তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষার আমার অভাব। যে বস্তু অনির্বচনীয় তাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করবার চেষ্টাকে আমি অপরাধ ব'লে মনে করি। সুতরাং আমি সে চেষ্টায় বিরত থেকে শুধু আমাদের দু'জনের চিত্তের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম। যে গভীর অনুভূতি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নোব, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা আমার চিত্তের অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইল। আপনারা সাধু, সজ্জন, মানবসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য সংসারত্যাগী—আপনাদের শুভ প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা ক'রে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।"

একটু নত হ'য়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছ থেকে চেকটা চেয়ে নিলে, তারপর সেটা অচলানন্দর হাতে দিয়ে আসন গ্রহণ করলে।

অচলানন্দ দণ্ডায়মান হ'য়ে বললেন, "যে মহীয়সী নারী আজ আমাদের আশ্রমে পদার্পণ করে আমাদের ধন্য করেছেন, তিনি কাল আমাদের নারীকল্যাণ মন্দিরের সাহায্যকল্পে এক হাজার টাকা দান করেছেন তা আপনারা জানেন, আজ তিনি চার হাজার টাকা দিলেন। তা ছাড়া যে বিপুল অর্থ দান করবার তাঁর অভিপ্রায় আছে, তার কথাও আপনারা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের মুখে শুনেছেন। এই মহীয়সী নারী এবং তাঁর মহাপ্রাণ স্বামীকে আমি কী ব'লে অভিনন্দিত করব তা ভেবে পাচ্ছিনে। প্রমথনাথেরই ভাষা ব্যবহার ক'রে আমি বলি অনির্বচনীয়কে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে কাজ নেই, যা অনুভূতির বস্তু তা আমাদের অনুভবের মধ্যেই বর্তমান থাকুক। প্রচলিত প্রথায় এঁদের ধন্যবাদ দিতে আমার মন পরিতৃপ্তি মানবে ব'লে মনে হচ্ছে না। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ এই শুভক্ষণে এ-দুটি তরুণ-তরুণীকে আশীর্বাদ করবার জন্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে! আমার বলতে ইচ্ছে করছে—তোমরা বেঁচে থাক, তোমরা সুখী হও! তোমাদের মিলন দৃঢ়তর মধুরতর হোক! আর-কোনও অধিকার আমার না থাকলেও আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সেই অধিকারে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের দ্বারা এই পুণ্যচরিত্র দম্পতিকে আশীর্বাদ ক'রে বলি,

সমানি ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

তোমাদের ইচ্ছা একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় একরূপ হোক, তোমরা যাতে পরস্পর সুন্দরভাবে একত্র থাকতে পার তজ্জন্য তোমাদের মন একরূপ হোক।"

অচলানন্দ আসন গ্রহণ করলে প্রমথ সন্ধ্যার কানে কানে কী বলতে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল, তারপর উভয়ে অচলানন্দর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে যুক্ত করে প্রণাম করলে।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে অচলানন্দ বললেন, "দীর্ঘায়ুরস্তু!"

সভা শেষ হলো।

প্রমথ বললে, "মহারাজ, এবার আমাদের বিদায় দিন।"

অচলানন্দ বললেন, "কিন্তু একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে তো ছাড়তে পারিনে।"

"একান্তই যদি না ছাড়েন তো যত শীঘ্র এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে হয়, অনুগ্রহ ক'রে তার ব্যবস্থা করুন।"

অচলানন্দ বললেন, "ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য—আর তা প্রস্তুতই আছে। আসুন আমার সঙ্গে।" ব'লে অগ্রসর হলেন।

বিদায়কালে প্রমথ ও সন্ধ্যা মোটরে ওঠার পর অচলানন্দ বললেন, "ফিরে যাবার সময়ে মালা খুলে যাওয়া যদিও সাধারণ আচরণ, কিন্তু এ আমার ঠিক ভালো লাগছে না। আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাবার সময়ে আমাদের আদরের চিহ্ন দুটি আপনাদের গলায় ঝুললে আমরা ভারি খুশি হব। আসুন, পরিয়ে দিই।" ব'লে অচলানন্দ সম্মুখের সীট্ থেকে মালা দুটি তুলে নিয়ে তার মধ্যে একটি প্রমথর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

প্রমথ নিজের গলার মালা এবং অচলানন্দর হাতের মালা বার দুই তাড়াতাড়ি লক্ষ্য ক'রে বললে, "মহারাজ, আপনার হাতের ও মালাটাই কিন্তু আমার।"

অচলানন্দ সহাস্যমুখে বললেন, "তাই না-কি? কেমন ক'রে বুঝলেন।"

"ওঁর মালার মধ্যিখানের ফুল লাল গোলাপ, আর আমার হলদে।"

"এতটা লক্ষ্য ক'রে রেখেছেন?—তা হোক,—স্বামী-স্ত্রীর মালা যত বদল হয় ততই মঙ্গল।" ব'লে অচলানন্দ হাসতে হাসতে হাতের মালাখানা সন্ধ্যার গলায় পরিয়ে দিলেন।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি এবং জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমথ ও সন্ধ্যার মোটর চলতে আরম্ভ করলে এবং দেখতে দেখতে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে রাজপথে এসে পড়ল।

যদিও শ্রাবণ মাস, আকাশে তেমন মেঘ ছিল না। কৃষ্ণ পক্ষের তিথির অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দুই পাশের অস্পষ্ট দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে মোটর দ্রুতবেগে কলিকাতার অভিমুখে ছুটে চলেছে। প্রমথ ও সন্ধ্যা তাদের হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতির নির্মম আলস্যে নির্বাক হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে। মুখে কথা নেই, কিন্তু

তাই ব'লে মনের মধ্যে এমন-কিছু চিন্তার তরঙ্গ যে আলোড়িত হচ্ছিল, তাও নয়। হিম-শীতল সমুদ্রতটে বিস্তৃত বালুকারাশিকে আচ্ছন্ন ক'রে স্তিমিত জ্যোৎস্না যেমন প'ড়ে থাকে তেমনি একটা অলস মন্থর চিন্তা তাদের মনকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল। অভিনন্দন-উৎসবের আকারে যে ব্যাপারটা আজ সহসা ঘ'টে গেল তা যেন তাদের পক্ষে একটা পুরোদস্তুর বিবাহ অনুষ্ঠানই। শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবর্ষণ, বরণ, মাল্য-বদল, এমন কি বিবাহ পদ্ধতির অন্তর্গত আশীর্বাদের শ্লোক পর্যন্ত! কা-ই যে নয়!

কলিকাতার এলাকায় প্রবেশ করবার কিছু পরে প্রমথদের মোটরের পাশ দিয়ে বর এবং বরযাত্রীদের একটা শোভাযাত্রা চ'লে গেল।

সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রমথ বললে, "উষা, আজ দেখছি বিয়ের লগ্নও আছে।"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর মুখের উপর চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে—কোনও কথা বললে না।

গৃহে যখন তারা পৌঁছল তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ছাদে গিয়ে পাশাপাশি রাখা দুটো ইজিচেয়ারের উপর দু'জনে আশ্রয় গ্রহণ করলে। এখনও কোনও কথাবার্তা হলো না, উভয়ে নিঃশব্দে পাশাপাশি ব'সে রইল।

ক্ষণকাল পরে প্রমথ বললে, "উষা, আজ এখন তোমার কোনও কাজ সারবার বাকি থাকে তো চল।"

সন্ধ্যা বললে, "যা বাকি আছে কাল সকালে সেরে নোবো। আজ থাক।"

আর কোনও কথা হলো না। তারপরও বহুক্ষণ তারা স্তব্ধ হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে রইল।

তেত্রিশ

পরদিন সকালে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হলো তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। ঘণ্টাখানেক হলো সূর্যোদয় হয়েছে, বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে লক্ষ্ণৌ যেতে হবে, এত দেরি পর্যন্ত নিদ্রিত থাকার জন্য লজ্জিত হ'য়ে সে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হলো। সন্ধ্যা তখন পথে ব্যবহারের উপযোগী বিছানা-পত্র একটা হোল্ড-অলে বাঁধিয়ে নিচ্ছে।

প্রমথ বললে, "আশা করি আমার অভাবে কোনও অসুবিধে হয়নি, উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "নিজেকে হঠাৎ এত খাটো ক'রে মনে করছ কেন যে, তোমার অভাবে কোনো অসুবিধে হবে না?"

একটা নিবিড় গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে প্রমথ বললে, "বিশেষ একটা সাধু উদ্দেশ্যে।"

হাস্যাবরুদ্ধ মুখে সন্ধ্যা বললে, "সাধু উদ্দেশ্যটা কী শুনতে পাইনে?"

"বিনয় প্রকাশ।"

শুনে সন্ধ্যা হাসতে লাগল ; বললে, "বুঝতে পারিনি ? কিন্তু আপাতত বিনয় প্রকাশ বন্ধ রেখে একটু কাজের লোক হও দেখি।"

উচ্ছ্বাসের সহিত প্রথম বললে, "অতি অবশ্য ! কী করতে হবে বল ?"

"মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নাও।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ ক্ষণকাল তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল ; তারপর কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে বললে, "বিদ্রূপ ! আচ্ছা, এ অপমানের প্রতিশোধ নোব রেল-গাড়িতে উঠে—তখন করব একেবারে পুরোপুরি ননকো-অপারেশন। দেখি তুমি কেমন ক'রে লক্ষ্ণৌ পৌঁছও !"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তা কোরো—শুধু খাওয়ার সময় খেয়ো, আর—" কথা শেষ্ না ক'রে সে হাসতে লাগল।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আর কী ?"

"তুমিই বল না, কী।"

"ঘুমোবার সময়ে ঘুমিয়ো ?"

সন্ধ্যা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল ; বললে, "ঠিক তাই। কী ক'রে বুঝলে ?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "তা বলব না। আমার যদি আরব দেশের একটা বেগবান শাদা ঘোড়া থাকত তা হ'লে এ অপমানের প্রতিকারে কী করতাম, জানো ?"

স-পুলকে সন্ধ্যা বললে, "কী করতে ?"

"তাইতে সওয়ার হ'য়ে বায়ুবেগে বালীগঞ্জের মাঠ পেরিয়ে গড়ের মাঠ ছাড়িয়ে ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া ব্রিজ পার হ'য়ে দেশান্তরে চ'লে যেতাম ! তা যখন নেই, তখন কী করব জান ?"

"কী করবে ?"

"কক্ষান্তরে গিয়ে চা-পান করব।"

সন্ধ্যা বললে, "সেই কথাই ভালো। আমি ততক্ষণে গাড়ির খাবারগুলো কতদূর এগোলো দেখে আসি।"

সন্ধ্যার তাগাদার দাপটে বেলা নয়টার মধ্যে সকল ব্যবস্থা ঠিক হ'য়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সকলে হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা হলো। সঙ্গে চলল সাধুচরণ, পাচক মাধব এবং পরিচারিকা সারদা।

যে-সকল দাস-দাসী-দারোয়ান-মালী কলিকাতার বাড়িতে রইল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে প্রণাম করবার জন্য তারা বিদায়কালে গাড়ির কাছে এসে একত্র হলো। আসন্ন বিচ্ছেদের করুণতায় রামভজন সিং-এর চক্ষু সজল হ'য়ে এল—বললে, "মা-জীর অভাবে সমস্ত বাড়ি 'শূন্' হ'য়ে যাবে, মন লাগবে 'উদাস',—সুতরাং মা-জী যেন অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করেন।"

অর্থে এবং মিষ্টবাক্যে সন্ধ্যা সকলকে পুরস্কৃত করার পর মোটর রওনা হলো।

স্টেশনে যখন তারা পৌঁছল তখন গাড়ি ছাড়তে মিনিট কুড়িক বিলম্ব আছে। ইতিপূর্বে বাড়ির পুরাতন সরকার যোগীন দত্ত জিনিস-পত্র ও বামুন-চাকরদের নিয়ে এসে হাজির ছিল।

একটি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের তলার দুটো বার্থ প্রমথ এবং সন্ধ্যার জন্য রিজার্ভ করা ছিল, এবং উপরের দুটো বার্থের মধ্যে একটা রিজার্ভ করা ছিল কোনো ইংরাজ ভদ্রলোকের নামে। রিজার্ভ কার্ডে নাম প'ড়ে সন্ধ্যা বললে, "ই. এ. বেণ্টলী।"

প্রমথ বললে, "তা হ'লে ভালোই হয়েছে। আপাতত আমরা দু'জনে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকের বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বসি, আর দিনের বেলা বসবার জন্যে বেণ্টলীকে ও-দিকের বেঞ্চটা ছেড়ে দেওয়া যাক।"

প্রমথর কথার ধরণে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "বেণ্টলীকে তুমি চেন না-কি?"

মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "এ পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে কী জান?—উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। মনে মনে একটা কুটুম্বিতে পাতিয়ে নিলেই হলো।"

সন্ধ্যা হাসতে লাগল; বললে, "তাই বল! আমি ভাবলাম, তোমার কাজ-কারবারের চেনাশোনা কোন সাহেব হয়তো, সারাপথ ভজোর-ভজোর ক'রে গল্প করতে করতে যাবে।"

প্রমথ হেসে উঠে বললে, "ও! সেই সিমলা যাবার সময়কার কথা মনে পড়ল বুঝি? না, এবার আর ভজোর-ভজোরের কোনো ভয় নেই। সারাপথ গুঞ্জন করতে করতেই যাওয়া যাবে।"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হাস্য করলে।

মাধব তৎপর লোক। প্রমথর সঙ্গে সে কয়েকবার রেলপথে যাতায়াত করেছে। গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি হোলড্-অল খুলে বেঞ্চের উপর বিছানা পেতে দিলে। অপর বেঞ্চে সন্ধ্যার শয্যা পাততে যাচ্ছিল, প্রমথ মানা করলে, "এখন ওটা থাক, রাত্রে পেতো।"

কামরার সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফর্মে সরকার যোগীন দত্ত অপেক্ষা করছিল, তাকে সম্বোধন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "সরকার মশায়, মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র দিয়ে খবরা-খবর জানাবেন।"

"জানাব, মা।"

"আর দেখুন, একটু কাছে আসুন তো।"

নিকটে এগিয়ে এসে যোগীন দত্ত বললে, "মা?"

একখানা দশ টাকার নোট যোগীন দত্তর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "জোড়া দুই শাড়ি সাতুকে কিনে দিবেন।" সাতু যোগীন দত্তর কনিষ্ঠা কন্যা, সম্প্রতি পিত্রালয়ে এসেছে

উৎফুল্ল মুখে যোগীন দত্ত বললে, "এই সেদিন তো তাকে অমন একটা ভালো শাড়ি দিলেন, আবার শাড়ি কেন, মা ?"

সন্ধ্যা বললে, "তা হোক, জোড়া দুই সাধারণ শাড়ি তাকে কিনে দেবেন ."

"কিন্তু তা'তে এত পয়সা লাগবে না তো, মা।"

"যদি কিছু বাঁচে, সাতুর ছেলেকে খেলনা কিনে দেবেন ."

নত হ'য়ে যুক্তকরে প্রণাম ক'রে যোগীন দত্ত বললে, "যে আজ্ঞে, মা।"

গাড়ি ছাড়তে মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি এমন সময়ে বেণ্টলী এসে উপস্থিত হ'লো। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথার আধখানা জুড়ে টাক। বয়স বৎসর পঞ্চাশের কাছাকাছি। আরদালীর পালিশ করা তকমা থেকে বোঝা গেল তার প্রভু সারভেয়ার জেনারেল অফ্ ইণ্ডিয়া অফিসের কোনো বড় কর্মচারী।

কামরায় প্রবেশ করবার পূর্বে বেণ্টলী গাড়ির হাতলে লটকানো রিজার্ভ কার্ড থেকে তার সীটের সংস্থান বুঝে নিলে, তারপর ভিতরে প্রবেশ ক'রে একটা বেঞ্চ একেবারে খালি রয়েছে দেখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমি যদি উপস্থিত এ বেঞ্চে একটা সীট্ অধিকার করি তা হ'লে বোধকরি আপনাদের তেমন অসুবিধা হবে না।"

প্রমথ বললে, "রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে পড়ুন।"

ধন্যবাদ জানিয়ে বেণ্টলী অপর বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বসল।

একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে এবং দেখতে দেখতে হাওড়া-বর্ধমান কর্ডে এসে পড়ল।

গাড়ি হু-হু ডানকুনির বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করছিল। প্রমথ বললে, "ঐ যে দেখছ, উষা, একটা পথ সোজা ওদিকে চ'লে গেছে, ওটা দিয়ে গেলে কৃষ্ণপুর নামে একটি গ্রামে যাওয়া যায়। সেখানে একবার জষ্টি মাসে আমার এক বন্ধুর বাড়ি এমন আলো চিঁড়ে আর আমের ফলার করা গিয়েছিল যে কোথায় লাগে তার কাছে তোমার চপ্ কাট্‌লেট্।"

কৌতূহলী হ'য়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কোন ষ্টেশনে নেমে কৃষ্ণপুর যেতে হয় ?"

প্রমথ বললে, "ডানকুনি। এই যে এখনই ডানকুনি পাস্ ক'রে এলাম। ডানকুনি নামের একটা বেশ গল্প আছে, সে একসময়ে তোমাকে বলব অখন। কিন্তু এ রকম ক'রে সুবিধে হবে না, এস দস্তুরমতো বাঙলা ভাবে পা তুলে তৃতীয় ব্যাক্তর দিকে পিছন ফিরে ব'সে দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে যাওয়া যাক।"

প্রস্তাবটা সন্ধ্যার কাছে এত উৎকৃষ্ট বোধ হলো যে কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে অবিলম্বে সে পা তুলে পিছনে ফিরে বসল। প্রমথও তার পাশে সেইভাবে উপবেশন করল।

প্রমথ বললে, "এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা কথার বিচার করা যাক উষা।"

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা বললে, "কী কথা ?"

প্রমথ বললে, "এই তো আমি কতবার কত জায়গায় যাতায়াত করেছি, কিন্তু কৈ কখনও তো আজকের মতো এমন ক'রে চাকর-বামুন-দারওয়ানরা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে নি। কখনও তো দারোয়ান আমাকে বলেনি যে বাবু, আপনার অভাবে বাড়ি 'শূন্' আর মন 'উদাস' হ'য়ে যাবে। অথচ তুমি আসবার আগে আমি তো এ বাড়ির একাধিপতি অধীশ্বর ছিলাম। তোমার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে ওদের ব্যবহারের এতটা ভেদ কিসের জন্যে হয় তার একটা বিচার হওয়া উচিত, উষা!"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা সহাস্যমুখে বললে, "এখনও সে কথা তোমার মনে আছে না-কি ?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "থাকবে না ? যে কথা মনের মধ্যে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল সে কথা এরই মধ্যে ভুলে যাব ?

হাসিমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিসের রেখাপাত ? ঈর্ষার ?"

প্রমথ বললে, "ঈর্ষার নয়তো আবার কিসের ? দিব্যি ছিলাম, কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কোথা থেকে তুমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে এমন করলে যে, মহলের সর্বত্র—অন্দর, বার—বেদখল হ'য়ে গেলাম!"

সন্ধ্যা বললে, "নিজে ডেকে এনে এখন আমার দোষ দিলে কী হবে, বল।'

প্রমথ বললে, "না, তা কিছুই হবে না ; কিন্তু সদা-সর্বদা মনে মনে কী ভাবি, জানো উষা ?"

"কী ভাবো ?"

"ভাবি, ভাগ্যিস ডেকে এনেছিলাম! নইলে তো ভূতপূর্ব প্রমথনাথ, অর্থাৎ প্রমথনাথ ভূতই, থেকে যেতাম। তুমি এসে অজানা শক্তির এমন চাপ দিলে যে দেখতে দেখতে বহুকালের কয়লা হীরে হ'য়ে গেল। যে তোমাকে মলিন করতে পারত, তাকে তুমি দিলে চকচকিয়ে। তোমার এ ঋণ কি শোধ করতে পারা যায়, উষা! আমার সম্পত্তি তোমার সঙ্গে আধা-আধি ভাগ ক'রে নিয়েছি ব'লে তুমি কত সময়ে কত কথা বল, কিন্তু সে ঋণ তো ইচ্ছে করলে ফেলে দেওয়া যায়, ফিরিয়ে দেওয়া যায় ; কিন্তু এ তা যায় না—এর শেষ নেই, শোধ নেই।"

বেগমপুরের মাঠ বিদীর্ণ ক'রে ট্রেণ বায়ুবেগে এগিয়ে চলছিল। প্রমথর রসগভীর কথার উত্তরে কোনও কথা না ব'লে সন্ধ্যা সুদূর দিকচক্রবালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইল। মনে মনে বললে, তুমি শুধু তোমার টাকাটাই দেখ, কিন্তু টাকা ছাড়া আর আর যে জিনিসে আমার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়ে দিয়েছ তার কাছে টাকাটা যে কিছুই নয়, সে কথা তো বোঝ না!

"উষা!"

সন্ধ্যা ফিরে চেয়ে মৃদুস্বরে বললে, "কী ?"

"তুমি অদৃষ্ট মানো ?"

"মানি।"

"আমি সেই অদৃষ্টে তোমাকে পেয়েছি। আশ্চর্য দেখ, কোথাকার ধন কোথায় এসে আটকালো! কাদের গৃহলক্ষ্মী হবার কথা তোমার, হ'লে আমার গৃহলক্ষ্মী! কার হৃদয় আলোকিত করবার কথা, করলে আমার হৃদয় আলোকিত! তাদেরও পক্ষে এ সেই অদৃষ্টের কথা! যে জিনিসের অংশ মাত্র পেয়ে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়েছে, তার সবটা পেয়েও তারা তা হারালে। এর চেয়ে দুরদৃষ্ট আর কী হ'তে পারে তা জানিনে!"

এবারও সন্ধ্যা কোনও কথা কইলে না, বাহিরের দ্রুত অপসৃয়মাণ দৃশ্যাবলীর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। প্রমথ ক্ষণকাল নীরবে ব'সে থেকে পুনরায় কথা আরম্ভ করলে।

"একদিক থেকে দেখলে আমারও কম দুরদৃষ্টের কথা নয়! আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ। আজকের দুর্বলতা আমার ক্ষমা কোরো ঊষা, কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রেই বলি। তুমি এলে আমার গৃহের মধ্যে, আমার প্রাণের মধ্যে—কিন্তু তবু তোমার অনেকখানিই রইল সমাজের অনড় খোঁটায় বাঁধা! সমাজের সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রে দু'জনে বাসা বাঁধলাম সমাজের এলাকার বাইরে, তবু সমাজের অনুশাসন ষোল আনা কাটাতে পারলাম না! আমি জানি, আমার এই অন্তরের মধ্যে তোমার প্রতি যে ভালোবাসা বাস করে, তা এত বৃহৎ এত বিরাট যে, কোনও প্রিয়লাল তার কাছে সামান্য একটা বিন্দুর মতোও বড় নয়। কিন্তু তবু তুমি প্রিয়লালেরই স্ত্রী, আমার স্ত্রী নও; যদিও সমস্ত বিশ্বসংসার জানে, তুমি আমার স্ত্রী। এ কি কম দুঃখের, কম দুরদৃষ্টের কথা!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ঈশ্বর বিশ্বাস করো, ঊষা!" পরজন্ম মানো ?"

সন্ধ্যা কোনও কথা বললে না, শুধু প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টি পরিবেদনায় বিহ্বল; সহানুভূতিতে আর্দ্র।

"ঈশ্বর যদি থাকেন আর পরজন্ম যদি সত্যি হয়, তা হ'লে কোনও রকমে কোনও দিন যদি ঈশ্বর ব'লে কাউকে খুঁজে পাই তা'হলে বলি, এ জন্মে যত মিথ্যা অভিনয় করালে পরজন্মে সমস্ত সত্যি কোরো, মায় কাল রাত্রের ভারতী আশ্রমের ঘটনা পর্যন্ত! কাঙালকে শুধু লুব্ধ ক'রেই রেখো না, তৃপ্ত কোরো তাকে।"

প্রমথর অন্তরের এই আকুল কামনার অভিব্যক্তি শুনে দুঃখে, বেদনায়, আনন্দে সন্ধ্যার চোখ থেকে অশ্রু ঝ'রে পড়ল। বহুকাল প্রমথর সহিত তার এরূপে প্রণয়-সমুদ্বেল কথোপকথন হয়নি। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে দীর্ঘকাল একত্র যাপনের ফলে এ কথা অনেক সময়েই তারা ভুলে থাকত যে তাদের মিলনের মধ্যে কোনও ব্যত্যয় অথবা অপূর্ণতা আছে; সুতরাং অধিকাংশ সময়েই তারা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মতো নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় দিনাতিপাত করত। কিন্তু

গত রাত্রের ভারতী আশ্রমের ঘটনার অচিন্তিত আঘাত তাদের দুঃখ-গ্লানির ক্ষতস্থানকে পুনরুন্মোচিত ক'রে তাদের যেন প্রথম মিলনের তরুণতায় টেনে নিয়ে গেছে। তাই আবার নূতন ক'রে তাদের হৃদয়ে-দুঃখ-সুখের বান ডেকেছিল, যার অধীরোন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস কথোপকথনের মধ্যেও উদ্বেল হ'য়ে উঠছিল।

নিবাত বর্ষাদিনের আর্দ্র উত্তাপের পরিশ্রান্তিতে বেণ্টলীর নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল, দ্রুত-চালিত ইলেকট্রিক পাখার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন অতিক্রম ক'রে মাঝে মাঝে তার নাসিকা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ট্রেন চলেছিল বনজঙ্গল-পথ-প্রান্তর ভেদ ক'রে উন্মত্ত বেগে বর্ধমানের অভিমুখে, যেখানে না পৌঁছতে পারলে তার এই একটানা অবিশ্রান্ত গতির বিরাম নেই। বাহিরে নিসর্গ তার গাছপালা, নদীনালা বন-বাদাড় নিয়ে দিকচক্রবালের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষিপ্ত বেগে আলোড়িত হচ্ছিল। প্রমথ ও সন্ধ্যা বহুক্ষণ ধ'রে তাদের চিন্তা-বিলাসে মগ্ন হ'য়ে পাশাপাশি নিঃশব্দে ব'সে রইল। বাক্য যেখানে নীরবতার নিকট পরাস্ত হয় সেই অবস্থায় তারা উপনীত হয়েছিল।

হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা-বিমুক্ত হ'য়ে ব্যস্তভাবে হাতের রিস্টওয়াচ দেখে সন্ধ্যা বললে, "যাঃ। তোমার খাওয়ার দেরি হ'য়ে গেল। সাড়ে এগারোটা বাজে।"

প্রমথ নিজের ঘড়ি দেখে বললে, "এমন কিছু দেরি হয়নি, এখন সওয়া এগারোটা, তোমার ঘড়ি কিছু ফাস্ট আছে। বর্ধমান পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি।"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি একটা বড় প্লেটে নানাবিধ আহার্য সাজিয়ে ফেললে, তারপর বাথরুম থেকে প্রমথ হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলে সেই প্লেট ও কাঁচের গ্লাসে ক'রে এক গ্লাস জল তার সম্মুখে স্থাপিত ক'রে বললে, "খাও, পরে আরও দোবো।"

"কিন্তু তোমার ?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "প্লেটের অভাব। বড় টিফিন-বাক্সটা মাধব ভুল ক'রে নিজের কাছে রেখেছে।"

প্রমথ বললে, "তা হ'লে পরে কোন প্লেটে খাবে ?"

"কেন, তোমাব প্লেটে।"

"এঁটো পাতে ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "দোষ কী তাতে ? জাত যাবে না-কি ?"

প্রমথ বললে, "জাতের চেয়েও যে তোমাদের এমন একটা জিনিস আছে যা কথায়-বার্তায় নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যায়।"

একটু ইতস্তত ক'রে, প্রমথর মুখের উপর একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তোমার কাছে তো সে জিনিস যাবার নয়।"

"নয় ?" প্রমথর মুখ উল্লাসে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এমন ক'রে প্রশ্রয় দিয়ো না, ঊষা ! খাবার-দাবার সব মাথায় উঠবে।"

আর একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তবে এসব কথা এখন থাক—তুমি খাও।"

প্রমথ বললে, "তুমিও এস না ঊষা, দু'জনে এক প্লেটেই খাওয়া যাক। টিফিন-কেরিয়ারটা কাছে রাখো, তুলে তুলে নিলেই হবে।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, তুমিই খাও, আমি পরে খাব অখন।"

প্রমথ বললে, "কেন এক সঙ্গে খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে ? তুমি পরে খেলে আমাকে তাড়াতাড়ি ক'রে খাওয়া সারতে হয়, কারণ বর্ধমান পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। এস, লক্ষ্মীটি !"

সন্ধ্যা একবার বেণ্টলীর দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে, তারপর মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, আসছি।" ব'লে টিফিন-কেরিয়ারটা নিকটে এনে রাখলে। বেণ্টলী তখন পাশ ফিরে নিদ্রা দিচ্ছিল।

চৌত্রিশ

বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে গাড়ি কার্মাটারে পৌছল। এ স্টেশনে গাড়ি অতি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে। গার্ড হুইসল দিয়েছে, এমন সময়ে বিলাতী স্যুটপরা একজন বাঙ্গালী যুবক ব্যস্ত হ'য়ে জিনিস-পত্র নিয়ে প্রমথদের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'লো। কামরার ভিতর স্ত্রীলোক দেখে একটু কুণ্ঠার সহিত প্রমথকে উদ্দেশ ক'রে বললে, "উঠতে পারি ? কোনও অসুবিধা হবে না তো ?"

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে দিয়ে প্রমথ বললে—"কিচ্ছু না। আসুন, আসুন !"

যুবকটি ক্ষিপ্রগতিতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলে, তারপর জিনিস-পত্র তুলতে তুলতেই গাড়ি দিলে ছেড়ে। কুলীরা পয়সার জন্য চলন্ত গাড়ির সঙ্গে দৌড়চ্ছিল, যুবকটি তাড়াতাড়ি একটা টাকা বার ক'রে তাদের মধ্যে একজনের হাতে গুঁজে দিলে। তারপর কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে গাড়ির ভিতর চেয়ে দেখতেই চোখাচোখি হ'য়ে গেল সন্ধ্যার সঙ্গে। আরক্ত মুখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রমথরা যে বেঞ্চে বসেছিল তার প্রান্তদেশে একটা গদী-মোড়া চেয়ার ছিল, চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে যুবকটি ধীরে ধীরে তার উপর ব'সে পড়ল। কে এ সুন্দরী রমণী যাকে দেখে মনে হ'লো সে যেন কত দিনকার পরিচিত জন, যেন কোনও-এক সময়ে তার সহিত যথেষ্ট জানা-শোনা ছিল ! কে এ হ'তে পারে ! তার কোনও বহুদূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া নয় তো যার সহিত দীর্ঘকাল দেখা শুনা নেই। কিংবা কোনও বন্ধু-বান্ধবের আত্মীয়া, যার সহিত কোনও কালে অল্পদিনের জন্য আলাপ-পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। মুখখানা আর একবার ভালো ক'রে দেখবার জন্য যুবকটি সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিন্তু সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ

ফিরিয়ে ছিল ব'লে দেখা গেল না। যথাসম্ভব মুখখানা মানসচক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত ক'রে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল বছর চারেক আগেকার দেখা একখানা বিস্মৃতপ্রায় মুখ। কিন্তু ইহলোকের সহিত সকলপ্রকার দেনা-পাওনা মিটিয়ে যে চিরদিনের জন্য মহাকালের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে, তার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত ক'রে কোনও লাভ নেই। কত লোকের সহিত কত লোকের আকৃতির সাদৃশ্য থাকে—এও নিশ্চয় তাই-ই।

কিন্তু কী অদ্ভুত সুন্দর এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মুখ! আয়তগভীর দুটি স্নিগ্ধ চক্ষের কী অতলস্পর্শী দৃষ্টি! সমস্ত মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ক'রে কী অপার্থিব সুষমা! মুহূর্তের জন্য মুখখানি দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু এখনও যেন সুস্পষ্ট রেখায় জ্বলজ্বল্ করছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকত তা হ'লে হয়তো এই রকমই দেখতে হ'ত। একটি তপ্ত শ্বাস যুবকটির অন্তর ভেদ ক'রে বাহিরের বায়ুমণ্ডলে মুক্তিলাভ করলে।

আগন্তুকের জিনিসপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গাড়ির মেঝের উপর প'ড়ে ছিল। প্রমথ বললে, "এর পরের স্টেশন মধুপুর। সেখানে সময় পাবেন। একটা কুলি ডেকে জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে নেবেন।"

আগন্তুক প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।"

"কত দূর যাবেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আপাতত ফয়জাবাদ। পরে লাহোর হ'য়ে কাশ্মীর পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে আছে।"

প্রমথ বললে, "ফয়জাবাদ যখন যাবেন তখন সমস্ত রাত তো গাড়িতে কাটাতে হবে। উপরের একটা বার্থ খালি আছে। কিছু কিছু জিনিসপত্র রেখে আগে থাকতেই অধিকার ক'রে রাখলে ভালো হয়।"

"ধন্যবাদ। তাই রাখব।"

আগন্তুকের বড় স্যুট্-কেসটার উপর লিখিত নামের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রমথ চমকে উঠল—ডক্টার পি, এল, চৌধুরী! স্যুট্‌কেসের ধারের দিকে পি, এ্যাণ্ড ও স্টীমার কোম্পানীর সবুজ আর বাদামি রঙের লেবেল আঁটা। মনে মনে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি ডক্টার পি, এল, চৌধুরী?"

স্যুট্‌কেসের উপর নামের পরিচয় পেয়ে প্রমথ যে এ কথা বলছে তা বুঝতে পেরে আগন্তুক বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।"

এ ডক্টর পি, এল, চৌধুরী যে প্রিয়লাল চৌধুরী, সে বিষয়ে প্রমথর মনে বিশেষ কিছু সন্দেহ না থাকলেও যেটুকু ছিল তা সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই মুহূর্তের মধ্যে অপসৃত হলো। সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মতো আরক্ত এবং চক্ষের মধ্যে সুতীব্র দৃষ্টির দ্বারা নিষেধের শাসন—খবরদার কোনও রকম চপলতা কোরো না।

এ নিষেধের খুব যে বেশি-কিছু প্রয়োজন ছিল তা নয়, কারণ প্রমথ সহসা

কখনই আত্মপরিচয় প্রদান করত না, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে নিষেধ না ক'রেও সন্ধ্যার নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় ছিল না।

ঘটনার অপরূপত্বে এবং আকস্মিকত্বে প্রমথ ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হ'য়ে গেল। যে ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার হ'তে বিচিত্র ঘটনাবলীর দ্বারা বিচ্যুত ক'রে নিয়ে নিয়তি সন্ধ্যাকে তার জীবনের পরম বস্তু ক'রে দিয়েছে এবং যে অদেখা অজানা ব্যক্তি এ পর্যন্ত তার পক্ষে পরম কৌতূহলের এবং অবচেতন মনের মধ্যে কতকটা উৎকণ্ঠার, বস্তু হ'য়ে বিরাজ করছে, সেই প্রিয়লালের সহসা বিনা নোটিশে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে প্রবেশ এবং দীর্ঘ পথ একত্রে যাত্রার বিজ্ঞপ্তি প্রমথর মতো শক্ত লোককেও প্রথমটা বিহ্বল ক'রে দিলে! কিন্তু সে নিতান্তই অল্পক্ষণের জন্য, অবিলম্বে তার প্রকৃতির সহজ অবিচলতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা ফিরে এল।

প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "দেখুন ডক্টর চৌধুরী, আপনি যাবেন ফয়জাবাদে, আমরা যাচ্ছি লক্ষ্ণৌ, দীর্ঘ পথ একত্র যেতে হবে। সুতরাং আপনার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জন্যে আমার মধ্যে যদি কৌতূহলের পরিচয় পান তা হ'লে সেটা আমার ভারতবর্ষীয় মনের দুর্বলতা মনে ক'রে ক্ষমা করবেন।"

প্রিয়লাল হাসিমুখে বললে, "সেই ভারতবর্ষীয় মন আমারও তো আছে। সুতরাং আমার দিক থেকেও যদি সে রকম দুর্বলতার পরিচয় পান তাহ'লে আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন।"

প্রমথ বললে, "শুধু ক্ষমা করব না, সুখী হব। আমাদের বিষয়ে আপনার কোনোরকম কৌতূহল হ'লে তা নিবৃত্ত করতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। ডক্টর চৌধুরী, আমি সংক্ষেপের পক্ষপাতী নই, বিস্তারের পক্ষপাতী। সুতরাং, ধরুন যদি জানতে পারি যে আপনার নামের পি, এল ইংরাজি অক্ষর দুটি আদতে বাঙলা প্রদ্যুম্নলাল নামের সংক্ষিপ্তসার তাহ'লে নিশ্চয়ই দুঃখিত হব না, যদিও প্রদ্যুম্নলাল নামটি ব্যবহার বাঙলা দেশের চেয়ে বাঙলা দেশের বাইরে, মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ও নামের সঙ্গে মাছ-ভাতের চেয়ে ডাল-রুটির যোগটাই বেশি।"

প্রমথর কৌতুকরসাত্মক কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "কিন্তু আমার নাম প্রদ্যুম্নলাল নয়, আমার নাম প্রিয়লাল।"

প্রমথ বললে, "প্রিয়লাল? তাই পি, এল। এখন বুঝলাম।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "আপনি তো কিছু কিছু পরিচয় আমার পেলেন, এবার নিজের দিন। প্রথমে আপনার নামটি জানতে পারলে সুখী হব।"

প্রমথ বললে, "আমার নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অর্থাৎ পি-এন্। আপনি পি-এল আর আমি পি-এন্।"

যে ব্যক্তি পোস্টকার্ডে সন্ধ্যার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল তারও নাম যে প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সে কথা প্রিয়লালের আদৌ মনে পড়ল না। যে ভীষণ দুঃসংবাদ সে,

পোস্টকার্ড বহন ক'রে এনেছিল তার কাছে লেখকের নাম তুচ্ছ বস্তু; হয়তো ভালো ক'রে প্রিয়লাল সে নাম লক্ষ্যই করেনি, করলেও হয়তো দু'দিনেই ভুলে গিয়েছিল। আজ তো সে প্রায় চার বৎসরের কথা হ'লো। মৃদু হেসে সে বললে, "মন্দ হয়নি তো! আমি পি-এল্ আর আপনি পি-এন্। মধ্যে একজন পি-এম-এর অভাব। মধুপুরে পেয়ারীমোহন ব'লে কোন লোক যদি আমাদের কামরায় এসে ওঠে তা হ'লে আপনার আর আমার মধ্যে যোগটা সম্পূর্ণ হ'তে পারে।"

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "আপনার আর আমার মধ্যে যে যোগ নিয়তি ঘটিয়ে দিয়েছে তাই যথেষ্ট। আর পেয়ারীমোহনকে কামনা ক'রে অকারণ ভিড় বাড়াবেন না।"

প্রমথর এ কথার মধ্যে যে কোনও প্রকার দ্ব্যর্থ থাকতে পারে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না ক'রে প্রিয়লাল বললে, "ঠিক বলেছেন, স্থানাভাব। আর যোগ বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই।"

প্রমথ বললে, "লাভ নেই শুধু নয়, ক্ষতি আছে। তাতে কেবল গোলযোগই বাড়বে।"

বাক্যের সহজ অর্থের বাইরে না গিয়ে প্রিয়লাল হাসতে হাসতে বললে, "তা সত্যি।"

ট্রেন মধুপুরের নিকটবর্তী হ'য়ে এসেছিল; সহরের উপকণ্ঠের দুই একটা বাড়ি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যা জানলার ভিতর দিয়ে বাহিরের দৃশ্যাবলীর উপর তার অন্যমনস্ক মনের অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। প্রমথ এবং প্রিয়লালের কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ তার কানে আসছিল, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। মনের মধ্যে তার এই দুশ্চিন্তা তীব্রভাবে দংশন করছিল যে, মর্মান্তিক হীনতা এবং গ্লানির মধ্য দিয়ে যে-ব্যক্তির সহিত চিরদিনের মতো সকল সম্পর্ক সকল বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে গেছে তার এই অনীপ্সিত এবং অপরিজ্ঞাত পুনঃপ্রবেশ ভবিতব্যের বিধান না হয়, এবং নূতন ক'রে নিকৃষ্টতর দুঃখ গ্লানি এবং সমস্যার সৃষ্টি না করে! মনে মনে সন্ধ্যা একান্তভাবে প্রার্থনা করছিল যে, প্রিয়লালকে নিয়ে তার এই তৃতীয় বারের কাহিনী যেন ফয়জাবাদেই নিরুপদ্রবে শেষ হয়।

দেখতে দেখতে ট্রেন মধুপুরের স্টেশনে এসে স্তব্ধ হ'ল। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে প্রিয়লাল একজন কুলি ডাকবার জন্য উদ্যত হ'তে প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "আর কুলির দরকার নেই। মাধব এসে পড়েছে, ও-ই সব ক'রে দিচ্ছে।" তখন মাধব বড় টিফিন-বাস্কেটটা নিয়ে দ্বার ঠেলে কামরায় প্রবেশ করছে।

প্রিয়লাল বললে, "মাধব তো আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে।"

প্রমথ বললে, "খাবারের ব্যবস্থাও করবে, জিনিসের ব্যবস্থাও করবে। সর্ব্ব-কার্য্যেষু মাধবঃ!" তারপর মাধবের দিকে চেয়ে বললে, "মাধব, টিফিন-বাস্কেটটা

মা'র জিম্মা ক'রে দিয়ে তুমি সায়েবের জিনিস-পত্রগুলো ঠিক ক'রে গুছিয়ে রেখে দাও।"

টিফিন-বাস্কেটটা সন্ধ্যার কাছে রেখে মাধব এগিয়ে আসতেই প্রিয়লাল উঠে দাঁড়িয়ে মাধবকে সাহায্য করতে উদ্যত হলো।

প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না ডক্টর চৌধুরী, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে ব'সে দেখুন আমি মাধবকে দিয়ে আপনার সমস্ত জিনিস-পত্র গুছিয়ে দেওয়াচ্ছি। যদি পছন্দ না হয় পাল্টে নেবেন।"

প্রিয়লাল কুণ্ঠিত স্বরে বললে, "না না, পছন্দ হবে না কেন। কিন্তু আপনি কেন অনর্থক—"

প্রমথ বললে, "অনর্থক কিছু-ই নয় ডক্টর চৌধুরী, সব জিনিসেরই অর্থ আছে—ব্যক্ত কিংবা গূঢ়—আমরা সব সময়ে ধরতে পারিনে।"

প্রিয়লাল বললে, "এখানে কিন্তু কিছু কিছু ধরতে পারা যাচ্ছে।"

প্রমথর দৃষ্টি ছিল মাধবের প্রতি এবং কান ছিল প্রিয়লালের প্রতি; বললে, "না, না, ও হলো না মাধব, হোল্ড-অল থেকে বিছানা বার ক'রে একেবারে পেতে দাও। অধিকার বিস্তার ক'রে রাখা ভালো।" তারপর প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কী ধরতে পারা যাচ্ছে ডক্টর চৌধুরী ?"

প্রিয়লাল বললে, "ধরতে পারা যাচ্ছে যে, আপনি যে রকম ক'রেই হোক বুঝেছেন যে, আমি একটি মহা অপটু লোক, আর তা-ই বুঝে আপনার করুণার উদ্রেক হয়েছে।"

প্রমথ একটু হেসে বললে, "ঠিক তা নয়, ডক্টর চৌধুরী। আপনি হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক সৌভাগ্য যাদের ব্যবস্থা আগে থাকতে ক'রে রাখে। এমন তো কত লোক নিয়ত ট্রেন ফেল করছে, কিন্তু প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকদের জন্যে প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা হাজির থাকে এবং ট্রেন ছাড়বার হুইস্‌ল্ দিলে প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকেরা প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে যখন অবান্তর কথা তোলে তখন প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাদের পথ ক'রে দেয়।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল, বললে, "এ কথা কিন্তু ঠিক বলেছেন।"

ট্রেন ছাড়বার সময় হ'য়ে এসেছিল। মাধব বললে, "মা খাবার তো দেওয়া হলো না।"

সন্ধ্যা বললে "আমি দোবো অখন, তুমি যাও।"

গার্ডের হুইস্‌ল্ শুনে মাধব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলে।

প্রিয়লাল বললে, "দেখুন মিস্টার মুখার্জি, মাধবকে দিয়ে আমার জিনিসপত্র গোছানোতে আপনাদের অসুবিধেয় পড়তে হ'লো।"

প্রমথ বললে, "কিছু অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। যিনি ভার নিলেন, দেখবেন, তিনি সুচারুরূপে কার্য সমাধা করবেন।"

"মিস্টার মুখার্জি ?"

"আজ্ঞে ?"

ঈষৎ নিম্নস্বরে প্রিয়লাল বললে, "উনি নিশ্চয়ই মিসেস মুখার্জি,—অর্থাৎ আপনার স্ত্রী ?

একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে একটু চিন্তা ক'রে মৃদু হেসে প্রমথ বললে "কেন ? আপনার কি অন্য রকম মনে করবার কোনও কারণ ঘটেছে ?"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বললে, "না না ! নিশ্চয় নয় ! আমিও তাই অনুমান করেছিলাম !" প্রমথর উক্তি যে 'ইতি গজ' জাতীয়, সে কথা মনে করবার কোনও কারণই তার ছিল না।

প্রমথ বললে, "আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ঊষা, আপাতত আমাদের ক্ষণিকের অতিথি—ডক্টর প্রিয়লাল চৌধুরী।"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্ত কর উত্তোলন ক'রে বললে, "নমস্কার।"

সাগ্রহে প্রিয়লাল বললে, "নমস্কার মিসেস মুখার্জী, নমস্কার।"

কিন্তু দ্বিতীয়বার পরিপূর্ণ ভাবে সন্ধ্যার মুখ নিরীক্ষণ ক'রে প্রিয়লাল পুনরায় গভীরভাবে চমকিত হ'লো। দুশ্ছেদ্য যবনিকার অন্তরাল ভেদ ক'রে মনে পড়ল পরলোকবাসিনী অভাগিনী সন্ধ্যার মুখ !

তারপর বারংবার মিসেস্ মুখার্জির মুখ দেখতে দেখতে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'য়ে আসতে লাগল সন্ধ্যার মুখের স্তিমিত স্মৃতি। অবশেষে এমন হ'লো যে, মনে মনে সন্ধ্যার মুখ মনে করতে গেলে তৎস্থলে ভেসে ওঠে মিসেস মুখার্জির মুখ ! প্রদীপ্ত সূর্যকরে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল দুর্বল দীপশিখা।

পঁয়ত্রিশ

প্রমথ এবং প্রিয়লালের মধ্যে কথোপকথন জ'মে উঠেছিল। সন্ধ্যা প্রমথর দিকে মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন খাবার দোব ?"

সন্ধ্যার দিকে ফিরে চেয়ে প্রমথ তেমনি মৃদুস্বরে বললে, "দাও।" তারপর প্রিয়লালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "ডক্টর চৌধুরী, সামান্য একটু খাবার দিলে, আশা করি আপত্তি করবেন না।"

প্রমথর প্রস্তাব শুনে প্রিয়লাল ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল, বললে, "না, না, মিস্টার মুখার্জি, অনেক উপদ্রব আপনাদের ওপর করেছি—তার ওপর খাবারেও ভাগ বসাতে চাইনে।"

মাথা নেড়ে সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "ভুল, ডক্টর চৌধুরী, আপনার ভুল।

এত সহজে কেউ কারো জিনিসে ভাগ বসাতে পারে না যতক্ষণ না ভাগ্য নিজে তার ব্যবস্থা করে।"

প্রিয়লাল বললে, "ভাগ্য এতটা করতে পারে ব'লে আপনি মনে করেন মিষ্টার মুখার্জি ?"

প্রমথ বললে, "নিশ্চয় মনে করি। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন আর সীমা-পরিসীমা থাকে না, একেবারে অখিল ভ'রে দিয়ে যায়—তখন ফকিরকে বানিয়ে দেয় আমীর।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লালের মুখমণ্ডলে দুঃখের একটা ক্ষীণ ছায়াপাত হ'লো ; বিষণ্নমুখে সে বললে, "ভাগ্যকেও সব সময়ে খুব নিরাপদ বন্ধু ব'লে মনে করবেন না মিস্টার মুখার্জি। সে যখন বিরূপ হয় তখন সর্বস্ব অপহরণ ক'রে আমীরকে ফকির বানিয়েও ছাড়ে।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু সে ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।"

প্রিয়লাল বললে, "দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যেরই বৈমাত্র ভাই। ওরা দু'জনে পাশাপাশি বাস করে, আর কে যে কখন আমাদের কাঁধে চড়াও হয় তা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, এখনও আমার খাবার সময় হয়নি, অনেক বেলায় আজ খেয়েছি।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "তাহ'লে খাবার সর্বোৎকৃষ্ট সময় কখন, সে বিষয়ে জগতের একজন অতি বিচক্ষণ লোকের উপদেশ কী তা আপনি নিশ্চয় জানেন না।"

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "না, তেমন তো কিছু জানি ব'লে মনে পড়ছে না।"

প্রমথ বললে, "তাঁর উপদেশ, খাবারটা যদি নিজের পয়সায় হয় তা হ'লে যখন ক্ষিদে পাবে তখন, আর যদি পরের পয়সায় হয় তা হ'লে যখনই হাতে পাওয়া যাবে তখন।"

আহারের সর্বোৎকৃষ্ট সময়ের সূত্র শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; বললে, "তা হ'লে আপনার বিচক্ষণ লোকের উপদেশই পালন করব। অসময়ে না খেয়ে প্রমাণ করব যে, আপনারা আমার পর নন, আপনার।"

এই অসংশয়িত পরিহাস-বাণীর মধ্যে দৈবক্রমে যে মর্মন্তুদ সত্য প্রচ্ছন্ন ছিল তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থেকে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; কিন্তু কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সন্ধ্যার চক্ষু সজল হ'য়ে এল, এবং কৌতুক-বাক্যের সফেন জলরাশির মধ্যে সহসা নির্মম সত্যের কঠিন পাথর দেখতে পেয়ে প্রমথ নির্বাক হ'য়ে গেল। ট্রেন তখন রোহিণীর লেভ্‌ল্ ক্রসিং-এর উপর দিয়ে শড়াক্ শড়াক্ শব্দে দ্রুতবেগে অদূরবর্তী জশিডি স্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে।

প্রমথকে নিরুত্তর থাকতে দেখে প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, কী মিস্টার মুখার্জি, নিজের জালে নিজেই ধরা পড়লেন না কি ? মুখে কথা নেই যে।"

শুনে প্রমথ নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে হাসতে লাগল; বললে, "ধরা প'ড়ে যদি এই প্রমাণ ক'রে থাকি যে আপনি আমাদের পর নন, আপনার —তা হ'লে ধরা পড়ার জন্যে একটুও দুঃখিত নই। কিন্তু আপনি যে আমাদের আপনার, তার এই সামান্য প্রমাণ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকব না, ডক্টর চৌধুরী এর খুব জোরালো রকমের প্রমাণ ভবিষ্যতে আপনাকে দিতে হবে।"

"কিন্তু প্রমাণের দায়িত্ব আপনারা তো আমার উপর দিচ্ছেন না, প্রমাণ তো আপনাদেরই দিক থেকে আসছে।" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

প্রিয়লালের পিছন দিকে ইঙ্গিত ক'রে প্রমথ বললে, "ফিরে দেখুন, পিছন দিক থেকেও আসছে।"

পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল দেখলে দুই হাতে দুটি খাবারের প্লেট নিয়ে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছে। একটিতে ফল এবং মিষ্টি—অপরটিতে কচুরি, চপ, কাটলেট প্রভৃতি নোন্‌তা খাবার। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার হাত থেকে প্লেট দুটি নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "এ দুটি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর জন্যে মিসেস মুখার্জি?"

নিমেষের জন্য দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হ'লো কিন্তু পর মুহূর্তেই দৃষ্টি অবনত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, এ আপনার জন্যে।"

"আমার জন্যে? কিন্তু আমি তো—" সন্ধ্যার বিরুদ্ধে ঠিক কী প্রতিবাদ করবে ভেবে না পেয়ে প্রিয়লাল তার কথার মধ্যে অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় থেমে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের আরও দু'খানা প্লেট নিয়ে প্রমথ বললে, "উচ্চ আদালতে আপনার মামলা টিঁকল না ডক্টর চৌধুরী, অতএব খাবারের সদ্ব্যবহার করুন।"

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বললে, টিঁক্‌ল না তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু—"

কিন্তু কী?"

প্রমথর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আপনার খাবার তো দেখচি নে মিসেস মুখার্জি। নিজের খাবারটাই বুঝি আমাকে দিলেন?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "না, খাবার যথেষ্ট আছে।"

"তবে এখন আপনি নিলেন না কেন?"

"পরে নোবো অখন।"

"কিন্তু সে রকম ইচ্ছে তো আমারও ছিল মিসেস্ মুখার্জি, তবে আমাকেই বা এখন কেন দিলেন?"

এ কথার উত্তর প্রমথ দিলে; বললে, "হয়তো ওঁদের মেয়েলী শাস্ত্রের নিগূঢ় কোনও কারণে—হয়তো অতিথি সৎকারের নিয়মে অতিথিকে খাওয়ানো শেষ হওয়া পর্যন্ত অভুক্ত থাকলে পুণ্যের অঙ্কটা একটু বেশি ফুলে ওঠে।"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্য যদি অতিথিকে আনন্দ দান করাই হয়, তা হ'লে আমার মনে হয় অভুক্ত না থাকলেই বেশি ফোলে।"

প্রমথ বললে, "অন্ততঃ আমাদের পুরুষদের শাস্ত্র মতে তো সেই কারণেই ফোলা উচিত।"

সমস্যার সমাধান হ'ল জশিডি স্টেশনে। গাড়ি থামতেই মাধব ছুটে এল, তারপর গাড়ির ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রেই বললে, "মা, প্লেট তো কম পড়েচে, আর দু'খানা প্লেট এনে দিই?"

সন্ধ্যা বললে, "দু'খানার দরকার নেই, একখানা নিয়ে এস, তাহ'লেই হবে।"

প্রমথ বললে, "ব্যাপারটা তা হ'লে এতক্ষণে বোঝা গেল ডক্টর চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বললে, কিন্তু এ কথা একটুও বোঝা গেল না যে, ওঁর যখন একখানা প্লেটেই চলে, তখন চারখানা প্লেটের মধ্যে তিনখানাতে আমাদের তিন জনের কেন চলত না।"

প্রমথ বললে, "ওঁদের বোধহয় এই রকম কিছু ধারণা আছে যে, নিজেদের একখানা ক'রে প্লেট নিতে হ'লে আমাদের দু'খানা ক'রে না দিলে সৌজন্যের ত্রুটি হয়। ওঁদের সঙ্গে আমাদের রেশিয়োটা অন্ততঃ ওয়ান্ টু টু হওয়া উচিত ব'লে ওঁরা বোধহয় মনে করেন।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "সত্যিই তাই।" তারপর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিনয়ে বললে, "আমার অনধিকার-চর্চা ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জি, কিন্তু এর জন্যে প্রধানতঃ আপনারাই দায়ী। পুরুষদের সুবিধের জন্যে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে ক'রে আপনারা আমাদের এত demoralised ক'রে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় আপনারা যা আমাদের দান করেছেন তা আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ব'লে মনে করি। আপনাদের আত্মসংকোচকে আমরা আপনাদের অধিকার করবার শক্তির খর্বতা ব'লে ধ'রে নিই।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু স্থল-বিশেষে ওঁদের আবার এমন আত্মস্ফীতি আছে যে, তার মধ্যে গোটা দশ বারো আত্মসংকোচ ডুব মারতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, ওঁর কানের অলঙ্কারের একখানার দামে আমার ঘড়ি চেন আঙটি বোতাম অন্ততঃ দশ সেট কেনা যেতে পারে। অপরাপর অলঙ্কারের কথা না হয় বাদই দিলাম।

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু বাঙালী মেয়ের গহনা তো অধিকাংশ স্থলেই Reserved fund, যা সংসারের সংকটের সময়ে কাজে লাগে।"

প্রমথ বললে, "সে হয়তো কখনও কোনওদিন লাগতে পারে, কিন্তু সেই Reserved fundকে পুষ্ট করতে করতে নিত্যকার Current account এত বিশীর্ণ হ'য়ে ওঠে যে সংসারের খরচ চালানোই দুষ্কর হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে উপস্থিত আমরা আহারে মন দিতে পারি, কারণ মাধব দু'খানা প্লেটই দিয়ে গেছে, সুতরাং প্লেট-সংকোচের কোনও অভিযোগ এখন আর নেই।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "মাধবকে ধন্যবাদ!"

শিমুলতলা থেকে গাড়ি হুড়্ হুড়্ ক'রে ঝাঝার দিকে নেমে চলেছিল। উভয়

পার্শ্বে তরুগুল্মমণ্ডিত ঘননিবদ্ধ পর্বতশ্রেণী, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ রেলপথ অতিকায় সরীসৃপের মতো এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে। কিছু পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় সমস্ত গাছপালা একটা আর্দ্র স্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করেছে। প্রিয়লাল, প্রমথ এবং সন্ধ্যা প্রকৃতির এই অপূর্ব স্তিমিত সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে ঝাঝা স্টেশনে দাঁড়াল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সের একজন আরোহী যুবক কুলির মাথায় সুটকেস্ এবং বেডিং চাপিয়ে ঈষৎ বিবর্ণমুখে ইণ্টার ক্লাসের দিকে চলেছিল, হঠাৎ প্রমথর উপর দৃষ্টি পড়ায় থমকে দাঁড়াল, তারপর নিকটবর্তী ইণ্টারক্লাস কামরায় তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্র রেখে কুলির পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল প্রমথর গাড়ির সম্মুখে। ভাল ক'রে প্রমথকে নিরীক্ষণ ক'রে গাড়ির কাছে এসে বললে, "প্রমথ না ?"

যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখে ঔৎসুক্যভরে প্রমথ বললে, "প্রমথই। কিন্তু আমি তো ঠিক—" তারপর সহসা উল্লসিত হ'য়ে জানলা দিয়ে যুবকের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আরো, আরে সুরেশ যে! কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা রে সুরেশ!"

সুরেশ প্রমথর হাত নিজ হাতের মধ্যে ধারণ ক'রে স্মিতমুখে বললে, "তা হ'লে চিনতে পেরেছিস ? আমি ভেবেছিলাম হয়তো চিনতেই পারবিনে।"

প্রমথ বললে, "এমন কিছু অন্যায় ভাবিসনি। সেই তো বি, এ পরীক্ষার পর ছাড়াছাড়ি, তারপর এই বার তের বছর আর দেখা নেই। কোথায় যাচ্ছিস ?"

"মুঙ্গের।"

"মুঙ্গের ? তবে তো এ গাড়িতে মোটে কিউল পর্যন্ত। উঠে আয়-না, গল্প করতে করতে যাই।"

মৃদু হেসে সুরেশ বললে, "আমি লাল টিকিটের যাত্রী, আমাকে এ গাড়িতে উঠতে দেবে কেন ? তার চেয়ে তুই আয়-না আমার গাড়িতে।" তারপর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "মেয়েরা আছেন, অসুবিধে হবে হয়তো, থাক না-হয়।" ট্রেনের পিছন দিকে দেখে প্রমথর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে, চললাম, প্রমথ।"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রমথ বললে, "দাঁড়া সুরেশ, আমিও যাচ্ছি।" তারপর সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, "সুরেশের সঙ্গে একটু গল্প করতে চললাম, উষা।" প্রিয়লালকে বললে, "আপনারা গল্প-টল্প করুন ডক্টর চৌধুরী, কিউলে ফিরে এসে ভালো ক'রে গল্প জমানো যাবে।" তারপর গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটে গিয়ে যখন সুরেশের পিছনে পিছনে ইণ্টার ক্লাসে উঠে পড়ল তখন ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে।

উদ্বিগ্নচিত্তে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্ধ্যা দেখছিল প্রমথ নির্বিঘ্নে গাড়িতে উঠতে পারে কি না, প্রমথ গাড়িতে প্রবেশ করলে সে মুখ ভিতরে ক'রে নিয়ে সোজা হ'য়ে বসল।

প্রিয়লাল বললে, "কী চমৎকার মানুষ আপনার স্বামী মিসেস্ মুখার্জি! এই অল্পক্ষণের মধ্যে আমাকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আপনারা আমার একটুও পর নন, পরম আত্মীয়। এমন সহৃদয় মিশুক লোক জীবনে আমি আর একটি দেখিনি। আমার লাহোর যাওয়ার পথে এইবারই আমাকে লক্ষ্ণৌয়ে আপনাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবার জন্যে এর মধ্যে তিনবার অনুরোধ করেছেন। আপনি তার কিছু শুনতে পেয়েছিলেন?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, কিছু-কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম।"

প্রিয়লাল বললে, "এবার হবে না, তাড়াতাড়ি আছে; কিন্তু কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে একদিনের জন্যে আপনাদের দর্শন ক'রে যাব।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, শুধু ক্ষণিকের জন্য একবার প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে চুপ ক'রে রইল। তার পক্ষ হ'তে যথোচিত আগ্রহ এবং সহযোগিতার অভাবে কথোপকথন ভালো ক'রে অগ্রসর হ'তে পারছিল না; অগত্যা প্রিয়লালকেও চুপ করতে হলো। সন্ধ্যার স্তব্ধ মূর্তি এবং স্বল্পভাষিতা লক্ষ্য ক'রে তাকে স্বভাবতঃ লাজুক এবং গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ব'লেই প্রিয়লালের মনে হয়েছিল; তা ছাড়া, এ কথাও সে মনে মনে বিচার ক'রে দেখলে যে, তার সহিত সন্ধ্যার পরিচয়ই বা কতটুকু এবং সে পরিচয়ের ভিত্তিই বা কী এমন, যাতে ক'রে তার সহিত নিরবচ্ছিন্ন কথোপকথন চালানো সন্ধ্যার পক্ষে অসুবিধাজনক মনে না হ'তে পারে। নিজের দিক থেকেও সে ভেবে দেখলে যে, আত্মীয়তার অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োগ শুধু অনাবশ্যকই নয়, সুরুচি-বিগর্হিতও।

গাড়ি তখন গিধৌড় স্টেশন ছেড়ে জামুইয়ের দিকে ছুটে চলেছিল, প্রিয়লাল তার এটাশি কেস্ থেকে একখানা ইংরাজি ম্যাগাজিন বার ক'রে একটা অর্ধসমাপ্ত প্রবন্ধে মনোনিবেশ করলে।

কিন্তু মৌনের এরূপ পাকাপাকি অবস্থাও সন্ধ্যার নিকট বেশ স্বাভাবিক অথবা শোভন মনে হলো না;—বিশেষতঃ সে যখন বুঝলে যে, এ মৌনের জন্য একমাত্র তার নিস্পৃহতার আচরণই দায়ী। প্রিয়লাল, প্রিয়লাল না হ'য়ে অপর কোনও ব্যক্তি হ'লে এ অবস্থায় যে একটা সহজ সাধারণ কথাবার্তার ধারা চলত, সে কথা মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা নিজেই কথা আরম্ভ করলে; বললে, "মিস্টার চৌধুরী, কতদিন আপনি কাশ্মীরে থাকবেন?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল বইখানা মুড়ে বেঞ্চের উপর রাখলে, তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে ব'সে বললে, "ইচ্ছে আছে মাস দুই থাকব। ফিরতে কিন্তু মাস তিনেকের কম হবে না।" তারপর সহসা আগ্রহের সহিত বললে, "মিসেস্ মুখার্জি, চলুন না আপনারা দু'জনে আমার সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে। অনুগ্রহ ক'রে যদি যান তা হ'লে কাশ্মীর ভ্রমণটা কী যে আনন্দের হয় তা রেল-পথের এইটুকু অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছি। যাবেন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "সম্ভব হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

"কেন ? সম্ভব হবে না কেন ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মাথা নেড়ে তেমনি মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, বোধহয় হবে না।"

আর অনুরোধ ক'রে বিশেষ কোন ফল নেই বুঝতে পেরে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "হ'লে কিন্তু ভারী খুশি হ'তাম।" তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বললে, "মিসেস্ মুখার্জি, সময়ে সময়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আকৃতির অদ্ভুত মিল থাকে, এ আপনি জানেন ?"

প্রিয়লালের এ প্রশ্নের গতি কোন দিকে অগ্রসর হবে তা বুঝতে পেরে সন্ধ্যা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল ; বললে, "শুনেছি, থাকে।"

প্রিয়লাল বললে, "সত্যিই থাকে। আমার একটি আত্মীয়ার সঙ্গে আপনার আকৃতির এমন অদ্ভুত মিল আছে যে, মৃত্যু যদি মনে করবার পক্ষে বাধা না হ'তো তা হ'লে মনে করতাম আপনিই তিনি।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "মৃত্যু বাধা কেন ?"

প্রিয়লাল বললে, "মৃত্যু বাধা এই জন্যে যে, আমি যাঁর কথা মনে করছি বছর চারেক হ'লো তাঁর ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার বিস্ময়ে অবধি রইল না। দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "মারা গেছেন তিনি ? কী হয়েছিল তাঁর ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "কাশীতে তাঁর একজন আত্মীয়ের কাছে ছিলেন, সেইখানে কলেরা হ'য়ে মারা যান।"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে বিশেষ কোনও অভীষ্ট সাধনের জন্য কেউ প্রিয়লালকে তার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল, এবং এখনও প্রিয়লাল জানে যে, সন্ধ্যা জীবিত নেই। একথা জানতে পেরে সে মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লো।

"মিস্টার চৌধুরী ?"

"আজ্ঞে ?"

"আপনাকে এখন চা দোবো কি ? ফ্লাস্কে গরম চা আছে।"

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "এখন থাক, কিউলে মিস্টার মুখার্জী এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে অখন।"

কিন্তু আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি যখন কিউল স্টেশনে পৌঁছল তখন সহসা এমন একটা গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হ'লো যার জন্য চা খাওয়ার কথা কারও মুহূর্তের জন্য মনেও পড়ল না, আসন্ন বিপদের ঘন ছায়াপাতে সকলের মন তমসাবৃত হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যাদের গাড়ির সামনে উপস্থিত হ'য়ে বিশুষ্ক মুখে প্রমথ বললে, "সর্বনাশ হয়েচে, ঊষা।"

সন্ত্রস্ত হ'য়ে উদ্বিগ্নমুখে সন্ধ্যা বললে, কী হয়েচে ?"

"সুরেশের কলেরা হয়েচে।"

"ওমা, সে কি কথা!"

"ঝাঝাতেই রোগের সূত্রপাত হয়। ওদের পাড়ায় কলেরা হচ্ছিল, দু'বার দাস্ত হ'তেই ও ভয় পেয়ে মুঙ্গেরের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রোগ এত বেড়ে গেছে যে সুরেশ বাঁচবে ব'লে আমার ভরসা হয় না। এরই মধ্যে নাড়ী ছিঁড়ে এসেছে, গলা ভেঙে গেছে। কুলির জিম্মায় প্লাটফর্মের একটা লুকোনো জায়গায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি; রেলের লোক জানতে পারলে আর গাড়িতে উঠতে দেবে না। কোন রকমে এখন মুঙ্গেরে ওকে পৌছে দিতে পারলে বুঝি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে নাকি ?

"তা না গেলে আর কে যাবে বলো ? আর কি কেউ আছে ?"

'না, তা কিছুতে হবে না, তুমি যেতে পাবে না। অন্য কোনও ব্যবস্থা কর।"

ভৎসনার স্বরে প্রমথ বললে, "ছিঃ ঊষা! এ কি কথা বলছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু তাই ব'লে এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব।"

মুঙ্গেরের গাড়িতে তুলে দিলে উনি যেতে পারবেন না ?"

"ওর অবস্থা দেখলে এ কথা আর জিজ্ঞাসা করতে না। ও কি পুরোপুরি বেঁচে আছে, এখন সে আধ-মরা মানুষ। হয়তো মুঙ্গের পর্যন্ত পৌছতেও পারবে না। হাত জোড় ক'রে আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে যখন বললে, "ভাই প্রমথ, মুঙ্গেরে গিয়ে অন্ততঃ যাতে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সামনে মরতে পারি দয়া ক'রে এইটুকু ক'রে দাও, তখন বুকখানা যেন ফেটে গেল।" প্রমথর চক্ষু সজল হ'য়ে এলো।

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্তর নামাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমথ বললে, "কী বল, ঊষা ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? তাতে সুবিধে তো কিছুই হবে না, অত্যন্ত অসুবিধেই হবে। ছেলেমানুষি কোরো না, তা কিছুতে হ'তে পারে না।" তারপর প্রিয়লালের দিকে তাকিয়ে বললে, "মিস্টার চৌধুরী, এ বিপদে আপনার কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া দরকার, আশা করি তা পাব। ঊষার সঙ্গে আপনি লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যাবেন এবং আমি না ফেরা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বললে, "এ আমি নিশ্চয়ই করব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমার জন্যে ভেবো না, ঊষা, আমি সাবধানে থাকব। পরশু কোন সময় আমি লক্ষ্ণৌ পৌছব। আমার না যাওয়া পর্যন্ত মিস্টার চৌধুরীকে কিছুতেই ছেড়ো না।"

গাড়ির সামনে এসে মাধব দাঁড়িয়ে ছিল, সন্ধ্যা বললে, "মাধব, ভেতরে এসো।" মাধব ভিতরে এলে তাড়াতাড়ি একটা স্যুটকেসে কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস ভ'রে দিয়ে মাধবকে বললে, "মাধব, তুমি বাবুর সঙ্গে বরাবর থাকবে।"

প্রমথ বললে ; "আঃ, মাধব আবার কেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "না, নিশ্চয়ই মাধব তোমার সঙ্গে যাবে। মাধবের মতো একজন লোক তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার সুবিধেই হ'বে, অসুবিধে হবে না।"

প্রমথ আর কোন আপত্তি করলে না। গাড়ির ঘণ্টা পড়েছিল, মাধব তাড়াতাড়ি নেবে গেল। সন্ধ্যার টিকিটটা প্রিয়লালের হাতে দিয়ে প্রমথ বললে, "যা বললাম, মনে রেখো প্রিয়লাল। আমি না যাওয়া পর্যন্ত চলে যেয়ো না, ভাই।"

বিপদের চরম মুহূর্তে এই আকস্মিক আত্মীয়তার সম্বোধনে হর্ষান্বিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে প্রমথর হাত ধ'রে প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

গাড়ি ছেড়ে দিলে। যতক্ষণ প্রমথকে দেখা গেল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। অদৃশ্য হ'লে মুখ ভিতরে ক'রে নিয়ে তারা সোজা হ'য়ে বসল।

প্রিয়লাল বললে, "মিসেস্ মুখার্জি, আপনার স্বামী একজন উদার ব্যক্তি তা পূর্বেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এত মহৎ তা জানতাম না।"

সন্ধ্যা একটু পিছন ফিরে বসেছিল, কোন উত্তর দিলে না। প্রমথর জন্য মনটা উদ্বেল হওয়ায় সে কথা কইতে পারছে না বুঝতে পেরে প্রিয়লালও আর কিছু বললে না।

গাড়ি তখন লক্ষ্মীসরাইয়ের পুলের উপর দিয়ে মহা কলরব করতে করতে চলেছিল।

ছত্রিশ

রাত্রি গভীর। বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ স্টেশন ছাড়িয়ে এসে ট্রেন তখন শিউপুরের প্রান্তর ভেদ ক'রে হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথম দু-চার সেকেণ্ড নিদ্রা ও স্বপ্নের প্রভাব কাটিয়ে নিজের যথার্থ অবস্থা এবং অবস্থান নির্ণয় করতে কাটল, তারপর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখলে, বাঙ্কের উপর বেণ্টলী নেই, অগোচরে কখন কোনও স্টেশনে জিনিসপত্র নিয়ে নেবে গেছে। অপর দিকের বেঞ্চে প্রিয়লাল শুয়ে আছে—সম্ভবতঃ নিদ্রিতই। তারা দু'জন ব্যতীত সে কামরায় তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় কিছুক্ষণ সন্ধ্যা স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। ভাবতে ভাবতে এক

সময়ে সত্যিই তার মনে মনে হাসি পেলে। আশ্চর্য! এ-ও হয়? সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে যখন খেয়ালে পেয়ে বসে তখন বোধহয় এই রকমই হয়। Truth is stranger than fiction ব'লে ইংরেজিতে একটা যে কথা আছে তা হ'লে সব সময়ে তা মিথ্যে নয়! সাধারণ পরিবারের একজন সাধারণ মেয়ে সে; সাধারণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করবে মনে মনে এই কথাই জানত; বিয়ে হলো এক আশাতীত ধনীর গৃহে; তারপর জীবন যে প্রবাহে বেয়ে চলল তাকে অসাধারণ বললেও খাটো ক'রেই বলা হয়। চূড়ান্ত হলো তার আজকে। যে স্বামীর আশ্রয় পাবার জন্যে একদিন সমস্ত দেহ-মন পণ ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, আজ সেই ব্যক্তির সঙ্গে রেলগাড়ির একই কক্ষে একাকী আবদ্ধ হ'য়ে ছুটে চলেছে! আইনের চক্ষে এখনও হয়তো সে তার স্বামীই, অথচ···।

সহসা সন্ধ্যা সে-দিককার মনের কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে প'ড়ে গেল প্রমথর কথা। কী অদ্ভুত মানুষই না তিনি! নীচু হ'য়েই সর্বদা আছেন, অথচ ধরতে গেলে নাগাল পাওয়া যায় না, এতই উঁচু! মারাত্মক সংক্রামক রোগে পীড়িত বন্ধুর সেবার জন্যে অনেকেই হয়তো ছুটে যায়, কিন্তু এমন অবলীলার সঙ্গে কেউ যায় না। সন্ধ্যার নিষেধে প্রমথর ভর্ৎসনার কথা মনে প'ড়ে গেল, 'ছিঃ উষা! এ কি কথা বলছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু তা ব'লে এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব!' এ-ই হলো প্রমথর মনের সহজ সরল পরিচয়। এর মধ্যে পর-হিতৈষণার কৃত্রিম আস্ফালন নেই, বাহাদুরী নেই। স্বার্থপরতার সংকীর্ণতায় সে প্রমথর কত পিছনে প'ড়ে আছে, অথচ কথায় কথায় প্রমথ বলে, সন্ধ্যার সংস্পর্শে এসে সে মানুষ হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য মানুষ যা হোক!···প্রমথর চিন্তায় সন্ধ্যার মন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। জানলার দিকে মুখ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে বিশ্বনাথকে স্মরণ ক'রে বললে, ঠাকুর, ভালোয় ভালোয় নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে এনো!

ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে নিদ্রা ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে দেখলে দপ দপ ক'রে আলো জ্বলছে, আর সম্মুখেই প্রিয়লাল দাঁড়িয়ে; জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি আমাকে ডাকছিলেন?"

প্রিয়লাল বললে, "হ্যাঁ, বোধহয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলেন।"

লজ্জিত-স্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কেন, চেঁচাচ্ছিলাম বুঝি?"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "হ্যাঁ, কাছাকাছি দু'বার।" তারপর নিজের শয্যায় ফিরে গিয়ে ব'সে বললে, "প্রথমবার অল্পক্ষণ, আপনিই ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়-বার বেশ খানিকক্ষণ, কাজেই না ডেকে থাকতে পারলাম না।"

অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "ছি ছি, দেখুন দেখি, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।"

ব্যস্ত ভাবে প্রিয়লাল বললে' "না, না, একটুও নয়। ঘুমিয়ে থাকলে আমি আপনার শব্দ কখনই শুনতে পেতাম না। আমি তখন জেগে ছিলাম। কিন্তু মিসেস্ মুখার্জি, হয় অল্পক্ষণের জন্ম জেগে ব'সে থাকুন, নয় অন্যদিকে মাথা রেখে পাশ ফিরে ভালো ক'রে শোন। সময়ে সময়ে এক-একটা স্বপ্ন, বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন, এমন পেছনে লেগে থাকে যে, ঘুমিয়েছেন কি অমনই আবার তার হাতে পড়েছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "একটু জেগেই ব'সে থাকি, আপনি শুয়ে পড়ুন।" হাতের রিস্টওয়াচ দেখে বললে, "প্রায় চারটে বাজে। কতদূর এলাম জানেন কি?"

প্রিয়লাল বললে, "কতদূর এলাম তা ঠিক বলতে পারিনে, তবে জৌনপুর ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ।" মাথার শিয়র থেকে টাইম টেবল নিয়ে দেখে বললে, "এবার শাগঞ্জ আসছে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবটি কখন নেবে গেল, জানেন?"

প্রিয়লাল বললে, "জানি। রাত তখন দেড়টা হবে, মোগলসরাইয়ে নেবে গেল। কিন্তু আপনি শুয়ে পড়ুন মিসেস্ মুখার্জি, স্বপ্নে-স্বপ্নে আপনার ঘুম ভালো ক'রে হ'তে পারেনি, অথচ রাতও আর বেশি নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "আপনিও তো সমস্ত রাতই জেগে আছেন, আপনিও শুয়ে পড়ুন।"

প্রিয়লাল বললে, "সমস্ত রাত জেগে আছি তা ঠিক নয়, তবে ঘুম ভালো হয়নি। ট্রেনে আমার ভালো ঘুম হয় না। তা ছাড়া—" কথা শেষ না ক'রে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

ঔৎসুক্যভরে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কী?"

"একটু পাহারা দিয়েছি আপনাকে।" ব'লে প্রিয়লাল ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল।

সন্ধ্যা বললে, 'তা হ'লে এবার আপনি ঘুমোন, আমি জেগে থাকি। আমি যথেষ্ট ঘুমিয়েছি, আর ঘুমোবার দরকার নেই, রাতও শেষ হ'য়ে এসেছে।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "না মিসেস্ মুখার্জি, অনুগ্রহ ক'রে আপনি আর আমার ও অপবাদের কারণ হবেন না। একেই তো আপনার স্বামী আমাকে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ফেলেছেন যাদের হাঙ্গামা অপরে সহ্য করে, তার ওপর যদি শোনেন যে খানিকটা পথ আপনি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছেন, তাহ'লে আর কোনদিনই তাঁর সেই শ্রেণী থেকে মুক্তি পাবার আশা থাকবে না! তার চেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন, আমিও একটু গড়াবার চেষ্টা দেখি, যদিও এ আমি নিশ্চয় জানি যে ঘুম হবে না।"

অগত্যা সন্ধ্যা জানলার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, এবং রাত্রি শেষের সুশীতল স্নিগ্ধতার প্রভাবে নিদ্রাগত হ'তে বিলম্ব হলো না। ঘুম যখন ভাঙল তখন ট্রেন একটা ষ্টেশনে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল সূর্যকিরণে প্লাবিত। শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বললে, "ঈস্, এত বেলা হ'য়ে গেছে তবু ঘুম ভাঙেনি!"

প্রিয়লাল তার বেঞ্চে ব'সে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল; বললে, "ঘুম ভেঙেছে তো মিসেস্ মুখার্জী, আপনি তো নিজেই উঠেছেন।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কোন স্টেশন ডক্টর চৌধুরী ?"

প্রিয়লাল বললে, "অযোধ্যা। অভাগিনী সীতার শ্বশুরবাড়ি ?

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে মনে মনে কী চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "অভাগিনী বলছেন কেন সীতাকে ?"

প্রিয়লাল বললে, "কেন বলব না মিসেস মুখার্জী ? দুর্বলচিত্ত স্বামীর হাতে প'ড়ে কি অবিচারটাই না বারংবার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। অবশেষে এই অযোধ্যা নগরীতে বসুন্ধরার গর্ভে প্রবেশ ক'রে তিনি নিদারুণ অপমান আর মনস্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তাই ব'লে রামচন্দ্রকে দুর্বলচিত্ত বলছেন কেন ? আমার তো মনে হয় তিনি দুর্বলচিত্ত ছিলেন না ব'লেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ জেনেও প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যে সীতার সঙ্গে ও-রকম আচরণ করতে পেরেছিলেন। প্রজারঞ্জক রাজা ব'লে পৃথিবীজোড়া খ্যাতিও তো তাঁর আছে।"

সন্ধ্যার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে "এ আপনি মুখে বলছেন বটে, কিন্তু এ আপনার মনের কথা নয় মিসেস্ মুখার্জি—এ আপনি শ্লেষ ক'রে বলছেন। আমি জানি, আমাদের বাঙলা দেশের প্রত্যেক আত্মসম্মানে সচেতন মেয়ের মনে রামচন্দ্রের প্রতি গভীর অভিমান আছে। রামায়ণের কবি শুধু একজন রামচন্দ্র আর একজন সীতার কাহিনী লিখেই খালাস, কিন্তু সেই রামায়ণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত কত রামচন্দ্র আর কত সীতা যে এল গেল, তার খবর কেউ রাখে কি ?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সহসা আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "মিছিমিছি এ আক্ষেপ কেন করছেন, ডক্টর চৌধুরী ? এই অদৃষ্টবাদের দেশে সে খবর রেখে কোনও লাভ আছে কি ? যত অবিচারই রামচন্দ্র করুন না কেন, সীতার অদৃষ্ট দিয়ে তার সমস্তটার কাটান হ'য়ে যাবে। সীতা দুঃখ পেলে তাতে রামচন্দ্রের অপরাধ কোথায় ?—তিনি তো শুধু নিমিত্তের ভাগী। শুধু কি তাই ? পত্নীপীড়ন করার মহত্ত্বে তিনি সকলের কাছে বাহাদুরিই পাবেন—কেউ বলবে এমন প্রজারঞ্জক রাজা আর হয় না, কেউ বা বলবে আর কিছু।"

সন্ধ্যার এই সুতীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার আঘাতে প্রিয়লালের মুখ কালো হ'য়ে উঠল। এ তিরস্কার তার প্রতি কতখানি প্রযোজ্য তা উপলব্ধি ক'রে, সন্ধ্যা সাধারণভাবে তার মন্তব্য প্রকাশ করছে, এই ভ্রান্ত ধারণাও তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলে না। ক্ষণকাল নির্বাক থেকে দুঃখার্ত কণ্ঠে সে বললে, "আপনার অনুযোগের একটি কথারও আমি প্রতিবাদ করিনে মিসেস্ মুখার্জি, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনার তিরস্কারের সবটা মাথায় পেতে নিতে বাধ্য।

কথাটা সবিস্তারে বলবার প্রয়োজনও নেই, বললে হয়তো অশোভনও হবে, তবে এটুকু আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে, আমার কাহিনী শুনলে আপনি বুঝতে পারতেন, আমি নিজেও আপনাদের এই বাঙলা দেশের একজন অত্যাচারী রামচন্দ্র।”

সহসা প্রিয়লালের এই নির্মুক্ত আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মপ্রকাশে সন্ধ্যা বিমূঢ় হ'য়ে গেল। প্রিয়লালের কাহিনী যে তারই হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লেখা কাহিনী তা তো প্রিয়লাল জানে না, সুতরাং তার বিবৃতি কোন পথে কী ভাবে অগ্রসর হ'য়ে তাকে বিপন্ন করবে সেই দুশ্চিন্তায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে সে বললে, “থাক, ডক্টর চৌধুরী, এ-সব কথার আলোচনায় কোনও ফল নেই—এ শুধু আপনাকে অকারণ কষ্ট দেবে।”

বিষণ্ণমুখে প্রিয়লাল বললে, “সত্যিই কোনও ফল নেই, কারণ আমার সীতাও নিজেকে এমনভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে, কোনওদিন দেখা হ'য়ে যে মার্জনা ভিক্ষা করবার সৌভাগ্য পাব সে পথ আর নেই।” তারপর সন্ধ্যা হয়তো এ-সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পছন্দ করছে না আশঙ্কা ক'রে অপ্রতিভ মুখে বললে, “আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জি, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে এমন ক'রে ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা টেনে আনা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। সময়ে সময়ে মানুষের এমন দুর্বলতার মুহূর্ত আসে যখন সে কোনও মতেই নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারে না। আমারও বোধহয় ঠিক সেইরকম একটা মুহূর্ত এসেছিল—নইলে পূর্বে তো আর কখনও কারুর কাছে এ-সব কথা বলবার প্রবৃত্তি হয়নি।”

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, “আপনার কথা শুনে দুঃখিত হ'লাম ডক্টর চৌধুরী, কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গে আর কাজ নেই। আপনি স্থির হোন।”

ট্রেন তখন অযোধ্যার ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছিল। ক্ষণকাল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল উভয়ে নিজ-নিজ চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে নীরবে ব'সে রইল। অবশেষে মৌনভঙ্গ ক'রে সন্ধ্যা ডাকলে, “ডক্টর চৌধুরী!”

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, “আজ্ঞে?”

“ফয়জাবাদ আর ক'টা স্টেশন পরে?”

“এর পরে ফয়জাবাদ সিটি, তারপরে ফয়জাবাদ জংশন।”

“আমি বলি ডক্টর চৌধুরী, ফয়জাবাদে না নাবলে আপনার যদি কাজের ক্ষতি হয় অথবা অন্য কোনও অসুবিধা হয়, তা হ'লে আমার সঙ্গে আপনার লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত গিয়ে কাজ নেই। একটুকু পথ দিনে-দিনে অনায়াসে একা যেতে পারব। চিঠি গেছে, কাল হাওড়া স্টেশন থেকে তার করা হয়েছে, স্টেশনে গাড়ি নিয়ে লোকজন আসবে, কোনও অসুবিধে হবে না।”

প্রিয়লাল বললে, “একটি বন্ধুর জন্যে আমার ফয়জাবাদে নাবা। সে যদি এর

মধ্যে লাহোর চ'লে গিয়ে থাকে তাহ'লে ফয়জাবাদে নাবার কোন প্রয়োজনই থাকবে না।"

"তিনি ফয়জাবাদে আছেন কি চ'লে গেছেন সে খবর আপনি স্টেশনে পাবেন?"

"নিশ্চয়ই পাব। থাকলে সে আমাকে নাবিয়ে নিতে স্টেশনে আসবে।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে অবশ্য কোনও অসুবিধে নেই, ফয়জাবাদ স্টেশনেই কথাটা বোঝা যাবে।"

কিন্তু ফয়জাবাদ স্টেশনে যখন গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল।তখন কথাটা খুব সহজে বোঝা গেল না, একটু জটিল হ'য়েই দেখা দিলে। প্রিয়লালের বন্ধু গোপিকারমণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উন্নয়নে ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িগুলো লক্ষ্য করছিল; প্রিয়লালকে জানলার ধারে দেখতে পে'য়ে হাসিমুখে তাড়াতাড়ি প্রিয়লালের কামরার পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়লাল বললে, "কী গোপি, খবর সব ভালো তো?"

গোপিকারমণ বললে, "ভালো। কিন্তু নেবে পড়, প্রিয়।"

প্রিয়লাল আদৌ সে-বিষয়ে কোনও লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে বললে, "রোসো, একটু ভেবে দেখি।"

বিস্মিতকণ্ঠে গোপিকারমণ বললে, "ভেবে দেখবে আবার কী হে?"

কণ্ঠস্বর একটু নিচু ক'রে প্রিয়লাল বললে, "সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি আমার বন্ধু-পত্নী, তাঁকে লক্ষ্ণৌ পৌছে দেবার জন্যে আমি প্রতিশ্রুত।"

মৃদুস্বরে বললেও কথাটা সন্ধ্যা স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল; প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "সমস্ত রাত তো আপনি হেপাজৎ ক'রে নিয়ে এলেন, এখন এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারব। আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে যেতে পারেন, ডক্টর চৌধুরী।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে গোপিকারমণ বললে, "ঐ তো উনি অনুমতি দিচ্ছেন, তবে আর কা চল।"

প্রিয়লাল বললে' "উনি ভদ্রতা ক'রে দিচ্ছেন ব'লেই আমি অভদ্রতা ক'রে আমার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে পারি কি-না তাই ভাবচি। উনি এ কথা অনেক আগে থেকেই বলছেন, কিন্তু লক্ষ্ণৌ এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ। এত আগে ওঁকে একা ছেড়ে দিলে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন হবে না কি?"

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গোপিকারমণ বললে, "সে কথা তুমি ভেবে দেখ। কিন্তু কাশ্মীর আমার যাওয়া হ'লো না এ কথাও তোমাকে ব'লে দিলাম।"

"কেন?"

"কেন? একা আমি তৎপর হ'য়ে ফয়জাবাদ থেকে লাহোর গিয়ে তোমাদের সঙ্গে একত্র হব, এই পরিচয় তুমি আমার জানো?"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "আচ্ছা, তার

ব্যবস্থা আমি করব। লক্ষ্ণৌ থেকে ফয়জাবাদ এসে তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাব।"

গোপিকারমণ বললে, "একমাত্র সেই রকম বন্দী অবস্থাতেই যদি হয়—স্বেচ্ছায় স্বচেষ্টায় যে হবে না তা নিশ্চয়। কিন্তু এ রকম ভবঘুরে হ'য়ে আর কতদিন কাটাবে, প্রিয় ?"

স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "যতদিন না ভবলীলা সাঙ্গ হয় ততদিন।"

"বাজে কথা রাখো—কথার উত্তর দাও।"

প্রিয়লাল বললে, "তা তুমি কী করতে বল ? বাড়িতে ব'সে বন্দী হ'য়ে কাটাতে বল না কি ?"

গোপিকারমণ বললে, "নিশ্চয় বলি।—ভালো রকম একটি খোঁটা গেড়ে।"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল ; তারপর মৃদুস্বরে বললে, "খোঁটা তো উপড়ে গেছে, গোপি। জীবনে দু'বার খোঁটা গাড়া যায় না কি ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোপিকারমণ বললে, "দু'বার ? তুমি যদি ফয়জাবাদে নাবতে তা হ'লে এমন একজন লোক দেখাতে পারতাম যার উপস্থিত পাঁচ নম্বরের খোঁটা চলছে।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; বললে, "পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য না থাকলে অতটা সৌভাগ্য হয় না, ভাই ! আমরা পাপিষ্ঠ পামর মানুষ, আমাদের এক নম্বর খোঁটার বেশি ওঠবার সাধ্য নেই।"

প্রিয়লালের কথা শুনে গোপিকারমণও হাসতে লাগল।

ট্রেন ছেড়ে দিলে ট্রেনের সঙ্গে চলতে চলতে গোপিকারমণ বললে, "তা হ'লে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরছ তো ?"

প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয় ফিরছি।"

ট্রেনটা একটু এগিয়ে গেলে সন্ধ্যা বললে, "অনর্থক এ কষ্টটা না ক'রে এখানেই নাবতে পারতেন, ডক্টর চৌধুরী।"

সন্ধ্যার এই পৌনঃপুনিক নির্বন্ধে মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বললে, "জীবনে এমন অনেক-কিছু করতে পারতাম মিসেস মুখার্জি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারিনি। বুঝতেই পারছেন, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি।" তারপর সন্ধ্যাকে কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে বললে, "এক কাজ করলে হয়—লক্ষ্ণৌয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে স্টেশন থেকেই ফয়জাবাদ ফিরলে হয়। রসুন, টাইম-টেবিলটা দেখি।" টাইমটেবল দেখে বললে, "চমৎকার ট্রেন আছে। লক্ষ্ণৌয়ে আমরা পৌঁছচ্ছি নটার সময়, আর একটার কাছাকাছি লক্ষ্ণৌ থেকে একটা ট্রেন ছেড়ে ফয়জাবাদ পৌঁছবে বেলা চারটের একটু পরে।"

সন্ধ্যা বললে, "লক্ষ্ণৌয়ে যখন অতক্ষণ সময় পাচ্ছেন তখন স্টেশন থেকেই ফেরবার দরকার কী ডক্টর চৌধুরী—বাড়ি গিয়ে অনায়াসে স্নানাহার ক'রে তো আসতে পারেন।"

প্রিয়লাল কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হলো না; বললে, স্টেশনে যখন রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে তখন স্নানাহারের কোনও অসুবিধাই হবে না, বাড়ি গেলেই বরং সদ্যোপনীতা সন্ধ্যাকে নূতন অতিথির সেবাসংকারের দ্বারা অসুবিধায় ফেলা হবে।

লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছে দেখা গেল মে.টর এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে গৃহরক্ষক বসন্ত চৌবে স্টেশনে এসেছে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কী চৌবেজী, সব ভালো তো?"

চৌবে আনত হ'য়ে সন্ধ্যাকে নমস্কার ক'রে বললে, "আপ্‌কা দোয়াসে সব কুশল মা-জী!" তারপর প্রমথকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হ'য়ে বললে, "বাবু-সাহেব কাঁহা মা-জী?"

সন্ধ্যা বললে, "তিনি পথে নেবেছেন, কাল পৌঁছবেন।"

প্ল্যাটফর্মে অবতরণ ক'রে সন্ধ্যা প্রিয়লালকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে কা স্থির করছেন ডক্টর চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বললে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জি, এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই সুবিধের হচ্ছে—কোনও অসুবিধে হবে না।"

যুক্তকরে সন্ধ্যা বললে, "আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলেন ডক্টর চৌধুরী। যদি কিছু ত্রুটি অপরাধ হ'য়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "আপনি যে অপরাধ করেছেন তা আমার চিরকাল মনে থাকবে মিসেস্ মুখার্জি, কিন্তু আমার কথায়-বার্তায় যদি কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ পে'য়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে তা ভুলে যাবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার!"

জিনিস-পত্র নিয়ে সন্ধ্যা প্ল্যাট্‌ফর্মের বাইরে চ'লে গেলে প্রিয়লাল ওয়েটিংরুমে উপস্থিত হলো। মনটার একটা দিক বিষণ্ণতার মেঘে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। কারণ কিন্তু তার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যথাকালে স্নানাহার সমাপন ক'রে একটা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে প্রিয়লাল প্ল্যাট্‌ফর্মে একটা ইজিচেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করলে। পড়তে পড়তে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল, তারপর কী ভেবে একটা কুলিকে ডেকে বললে, "সমান উঠাও।" প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাটলারগঞ্জ মুখার্জি সাহেবকা কোঠি মালুম হ্যায়?"

ড্রাইভার সাগ্রহে বললে, "মালুম হ্যায় সাহেব!"

জিনিস-পত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিয়লাল বললে, "চলো।"

অর্ধপথ এসে কিন্তু সহসা মনটা একটা অপরিমেয় বিরক্তিতে তিক্ত হ'য়ে উঠল। ছি, ছি, এ তো ঠিক প্রতিশ্রুতি পালনের পালনের সংকল্প নয়! এ কিসের আকর্ষণ! কিসের মোহ! অন্যায়, ভারি অন্যায়! পাঞ্জাবী ড্রাইভারের দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রিয়লাল বললে, "রোকো।"

পথপার্শ্বে গিয়ে গাড়ি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল।

"স্টেশন ওয়াপস্ চলো।"

সবিস্ময়ে ড্রাইভার প্রিয়লালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

আরও একটু দৃঢ়স্বরে প্রিয়লাল তার পূর্বাদেশের পুনরুক্তি করলে। তখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার স্টেশনের অভিমুখে ছুটে চলল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'য়েই কিন্তু পুনরায় মন গেল বদলে। স্টেশনে উপনীত হ'য়ে ড্রাইভারের হাতে একটা টাকা দিয়ে বললে, "একঠো বড়া টাইমটেবল্ খরিদ করতে লাও।"

অনাবশ্যক দ্বিতীয় টাইমটেবল্ খরিদ হ'য়ে এলে প্রিয়লাল বললে, "চলো, বাটলারগঞ্জ।"

প্রিয়লালের ভ্রান্তিশীল খেয়ালী মনকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ড্রাইভার বাটলার-গঞ্জের দিকে ধাবিত হলো।

সাঁইত্রিশ

বাট্লারগঞ্জের একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে প্রমথর গৃহ। বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ডের মধ্যস্থলে সদ্য-সংস্কৃত সুবৃহৎ বাংলো-ছাঁদের বাড়িটি ঝক্ঝক্ করছে। রাজপথ থেকে বাংলোর সম্মুখ দিকের বারান্দা পর্যন্ত ঘুটিং-ঢালা পথ, তার দুই পার্শ্বে মূলবান অ্যারকেরিয়ার বীথি, বাংলোর সম্মুখে পথ শেষ হয়েছে একটি প্রশস্ত চক্রাবর্তে, সেই আবর্তের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত ম্যাগনোলিয়া বৃক্ষ; পথের দুই দিকে এবং কম্পাউণ্ডের স্থানে স্থানে যত্নবিন্যস্ত বিচিত্র আকারের পুষ্পোদ্যান, তাতে ক্যামেলিয়া, ম্যাগ্নোলিয়া, গন্ধরাজ, কাঁটালী চাঁপা, গোলন চাঁপা, যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, জবা প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ; কম্পাউণ্ডের চতুঃসীমায় মেহগনি এবং ইউক্যালিপটস্ তরুশ্রেণী, এবং তার কাছে কাছে বহুপ্রকারের মূল্যবান এবং দুর্লভ ফলের গাছ; পশ্চিম দিকের কোণে গ্রীণ হাউস, তাতে ফার্ণ, অর্কিড এবং বহুবিচিত্র লতাগুল্ম; কম্পাউণ্ডের একদিকে সহস্রাধিক টবে টিকিট-মারা বিবিধ প্রকারের চন্দ্রমল্লিকার চারা সযত্নে বর্ধিত হচ্ছে, শীতকালে যখন প্রস্ফুটিত হবে বাগানের সেই দিকটা আলোকিত ক'রে রাখবে। সন্ধ্যা চন্দ্রমল্লিকা ভালোবাসে তাই প্রমথ এবার চন্দ্রমল্লিকার এই বিপুল আয়োজন করিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকার মরশুমটা সন্ধ্যাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে বাস করবে এই তার মনের বাসনা।

বাংলোটি একতলা, কিন্তু বৃহদায়তন—তা ছাড়া, আধুনিক জীবন যাপনের যত কিছু সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা সকলই তার মধ্যে সুলভ।

বেলা তখন দেড়টা। সন্ধ্যা তার বসবার ঘরে টেবিল চেয়ারে ব'সে প্রমথকে চিঠি লিখছিল। গৃহে পৌঁছবার ঘণ্টাখোনেকের মধ্যে সে মুঙ্গের থেকে প্রমথর

টেলিগ্রাম পেয়েছে। টেলিগ্রামের মর্ম—সুরেশের অবস্থা সংকটাপন্ন, সুতরাং লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে প্রমথর তিন চার দিন বিলম্ব হবে, সন্ধ্যা যেন প্রত্যহ চিঠি এবং টেলিগ্রামে তাদের সংবাদ পাঠায় এবং প্রমথ লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার পূর্বে কিছুতেই প্রিয়লালকে না ছাড়ে।

এরূপভাবে প্রমথ মুঙ্গেরে আটকে পড়ায় সন্ধ্যা অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে তাকে চিঠি লিখছিল। চিঠি প্রায় শেষ হ'য়ে 'এসেছে, এমন সময়ে সাধুচরণ এসে বললে, "মা, সেই ডাক্তার সাহেব এসেছে।"

চিঠি লেখবার তন্ময়তার মধ্যে একবার যেন একটা মোটর আসার শব্দ কানে পৌঁছেছিল,. কিন্তু তখন কৌতূহল সে তন্ময়তাকে পরাস্ত করতে পারে নি। সাধুচরণের কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "এরই মধ্যে ডাক্তার সাহেব আবার কে এল, সাধু ?"

সাধুচরণ বললে, "ঐ যে গো, ইজের পরা সাহেবের মতো চেহারা ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে জিনিস-পত্তোর নিয়ে চ'লে গেল। এখন এসে বলতেছে, তোমাদের মাঠাকরুণকে বল কি-যেন-ভাল ডাক্তার এসেছে।"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে প্রিয়লাল এসেছে এবং সাধুচরণের কাছে ডক্টর চৌধুরী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছে। তার পরিধানের 'ইজের' এবং নামের 'ডক্টর'—এই দুইকে সংযুক্ত ক'রে সাধুচরণ তাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত করেছে। জিজ্ঞাসা করলে, "জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছেন ?"

সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম ক'রে বন্ধুবান্ধবহীন অবাঙালীর দেশে এসে সাধুচরণের মেজাজটা খুব মসৃণ ছিল না, রুক্ষস্বরে বললে, "শোনো কথা! নিয়ে আসবে না তো কী ফেলে আসবে ? নিয়ে এসেছে।"

মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল। গোলযোগটা কিছুতেই তা হ'লে সহজে মিটকে না না কি। প্রমথ আসবার আগেই এ অপ্রীতিকর অভিনয়ের যবনিকা পাত হ'লে ভালো ছিল, কারণ রহস্যপ্রিয় প্রমথ কী করতে কী ক'রে ফেলে তার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা স্থির করলে সে যাই হোক-না কেন, নিজগৃহে নিষ্ঠার সহিতই আতিথ্যধর্ম পালন করবার চেষ্টা করবে—আচরণের মধ্যে এমন-কিছুই করবে না যা অতিথিকে ক্ষুব্ধ করতে পারে।

চিঠি লেখা আপাততঃ স্থগিত রেখে বাইরে এসে প্রিয়লালকে দেখে সন্ধ্যা বললে, "আসুন ডক্টর চৌধুরী, আসুন।"

দুই হাত যুক্ত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "কোন রকম কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা না ক'রে অকপটে স্বীকার করছি আমি একজন অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি।"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "সে তবু ভালো। সময়ে সময়ে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের কম হাঙ্গামা পোহাতে হয় না।"

প্রিয়লাল বললে. "কিন্তু আপাতত যে আমি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিই। স্টেশন থেকে

দৃঢ়পণ ক'রে এসেছি, প্রমথর সঙ্গে কিছুতেই চুক্তি ভঙ্গ করব না, সে ফেরা পর্যন্ত আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করবই।"

সন্ধ্যা বললে, "বেশ তো, তাই করুন। বাড়ি পৌঁছে ওঁর একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি, তাতেও উনি লিখেছেন যে উনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার আগে আপনাকে যেন ছাড়া না হয়।"

শুনে প্রিয়লালের মনের কুণ্ঠা অনেকখানি কেটে গেল; প্রফুল্লমুখে বললে, "আত্মসমর্পণ করলাম, ছাড়বেন না। উপস্থিত তা হ'লে যেখানে হোক একটা আস্তানা বেঁধে দিন।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে লজ্জিত হ'য়ে বললে, "কী রকম স্বার্থপর লোক দেখুন, নিজের কথাটুকু নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি, অথচ প্রথমেই যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এ পর্যন্ত তা করিনি! প্রমথ কেমন আছে, কবে আসছে? তার বন্ধু কেমন আছেন?"

সংক্ষেপে প্রিয়লালের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "আসুন, আপনার থাকবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

বাংলোর পূর্বপ্রান্তে প্রমথ ও সন্ধ্যার ঘর। ঠিক তার বিপরীত পশ্চিম প্রান্তের ঘরে সন্ধ্যা প্রিয়লালের শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। কক্ষসংলগ্ন ড্রেসিং রুম, তার পরেই বাথরুম। শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরটা স্থির করলে প্রিয়লালের বসবার, লেখাপড়ার জন্য। অবসর কালে বারান্দায় বসবার জন্য একটা প্রশস্ত ইজিচেয়ার রাখালে, তার পাশে গোটা তিন চার আর্মলেস্ চেয়ার আর একটা ছোট চারকোণা টেবিল—বই খবরের কাগজ অ্যাসট্রে ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিস রাখবার জন্য।

হরিয়া নামে একজন চতুর ভৃত্যকে ডেকে প্রিয়লালের ঘর ঝেড়ে মুছে পালঙ্কে শয্যা রচনা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে দেবার আদেশ দিলে। সংসারের আর-সব কাজ থেকে তাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে নিরন্তর প্রিয়লালের পরিচর্যায় মোতায়েন করলে।

দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কাল রাত্রে গাড়িতে আপনার ঘুম হয়নি, এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমিও ওঁর চিঠিটা শেষ ক'রে ডাকে পাঠিয়ে দিই। আবার একটু পরে দেখা হবে অখন।"

হৃষ্টমুখে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা।"

"কষ্ট হবে। কোন রকমে এরই মধ্যে কাজ চালিবে নেবেন।"

প্রিয়লাল সজোরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, মিসেস্ মুখার্জি, এখন যখন আপনার আশ্রয়ে এসে আপনার অতিথি হ'লাম, তখন ভদ্রতার এ-রকম সাজানো কথা বললে চলবে না, একেবারে খাঁটি আন্তরিকতার সোজা কথা বলতে হবে। আমি সত্যিই এমন অপদার্থ লোক নই যে, এমন সুব্যবস্থায় আমার কষ্ট হবে।"

মৃদুহাস্যের সহিত সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে যখন যা দরকার হবে অসংকোচে চেয়ে নেবেন।"

"নিশ্চয় নোব।"

"আপনার খাওয়া হয়েছে তো ডক্টর চৌধুরী ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; বললে, অনেকক্ষণ। অর্ধজীর্ণ হ'য়ে এল।"

"এখন সামান্য কিছু খাবেন ?"

"কিছু না।"

"একটু সরবৎ আর ফল ?"

"তাও না।"

"চা খাবেন কখন ?"

"পাঁচটার সময়ে।"

"আচ্ছা, এখন তা হ'লে একটু বিশ্রাম করুন, আমিও চিঠিখানা শেষ করি গিয়ে।"

চিঠিতে সন্ধ্যা প্রিয়লালের বিষয়ে এইটুকু যোগ করলে—তোমার আসা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করবেন এই স্থির ক'রে ডক্টর চৌধুরী কিছুক্ষণ হলো স্টেশন থেকে এসেছেন। সুতরাং তুমি অনর্থক যে গোলযোগের সৃষ্টি করেছ আমার দ্বারা তার শেষ হ'লো না, তুমি অবিলম্বে এসে এ থেকে আমাকে মুক্তি না দিলে আমার প্রতি সত্যই অন্যায় ব্যবহার করা হবে। আশা করি, এর চেয়ে বেশি-কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

আটত্রিশ

বৈকালে চা পানের পর সন্ধ্যা প্রিয়লালকে মোটর ক'রে বেড়াতে পাঠিয়েছিল। গোমতীর তীরে খানিকটা সময় অতিবাহিত ক'রে এবং দু-চার জন পরিচিত ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিয়ে প্রিয়লাল যখন বাড়ি ফিরে এল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ড্রইং রুমে আলো জ্বলছিল। কথোপকথনের শব্দে সন্ধ্যা ব্যতীত অপর ব্যক্তির উপস্থিতি বুঝতে পেরে প্রিয়লাল সেখানে প্রবেশ না ক'রে বারান্দায় একটু দূরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

মোটরের হর্ণের শব্দ সন্ধ্যার কানে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে হরিয়া এসে বললে, "মা, সাহেব এসেছেন।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কী করছেন ? মুখ-হাত ধুয়েছেন ? কাপড় বদলেছেন ?"

"হ্যাঁ। বারান্দায় ব'সে আছেন।"

"আমাকে ডাকছেন ?"

"না, আমি নিজেই আপনাকে খবর দিতে এলাম।"

আগন্তুকের নিকট অল্পক্ষণের জন্য অবকাশ গ্রহণ ক'রে প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, এরই মধ্যে ফিরলেন, ডক্টর চৌধুরী ? বন্ধুবান্ধবদের দেখা পেলেন না বুঝি ?"

প্রিয়লাল বললে, "সে কথা আর বলবেন না! দু'জন গেছেন দেশান্তরে, আর একজন গৃহান্তরে। বিরক্ত হ'য়ে ফিরে এলাম।"

"গোমতীর ধারে যাননি ?"

"গেছলাম, তাও একা-একা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না।"

সন্ধ্যা বললে, "চলুন, ঘরে চলুন, চৌবেজীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। মথুরানাথ চৌবে, লক্ষ্ণৌর একজন বিখ্যাত গাইয়ে। চমৎকার লোক।"

প্রিয়লাল বললে, "আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তো হবে বাক্য-ছন্দের আলাপ, চৌবেজীর পক্ষ থেকেই আসল আলাপটা হওয়া উচিত।"

প্রিয়লালের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে সন্ধ্যা স্মিতমুখে বললে, "বেশ তো, সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু হিন্দী ওস্তাদি গান আপনার ভাল লাগবে তো ?"

প্রিয়লাল বললে, "লাগবে, যদি-না সেই উপলক্ষে রাগ-রাগিণীর নাম-গোত্র সম্বন্ধে বিদ্যের পরিচয় দিতে হয়। সে যা একবার জব্দ হয়েছিলাম, তাই থেকে শিক্ষা হ'য়ে গেছে।"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "কী হয়েছিল ?"

প্রিয়লাল বললে, "একটা গানের বড় আসরে দুর্বুদ্ধিক্রমে গাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ একসময়ে আমাকে সমঝদার বিবেচনা ক'রে গাইয়ে ব'লে বসল, 'এবার কোন্ রাগিণী গাইব ফরমাস করুন।' কতকগুলো রাগ-রাগিণীর নাম জানা ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা জমকালো নাম মনে পড়ল; বললাম, 'একটা সুরফাঁকতাল গান।' শুনে গাইয়ে তো অবাক! মুখে বিহ্বলতার ছায়া। চেয়ে দেখি অনেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছে। গৃহস্বামী, আমার বন্ধু, জোড় হাত ক'রে বললেন, 'ওস্তাদজী, মাফ করবেন, সুরফাঁকতাল শব্দের দ্বারা আমার বন্ধু এই কথাই বলতে চাচ্ছেন যে সুর আর তাল দিয়ে এমন একটা জমাটি গান করুন যার মধ্যে একটুও ফাঁক অর্থাৎ ফাঁকি না থাকে।' একটা প্রচণ্ড হাসিতে আসরটা গর্জন ক'রে উঠল। তবলার আসরে সুরফাঁকতাল গাইতে ব'লে কী বিপর্যয়ের অবতারণা করেছিলাম তা অবশ্য আমার বন্ধুরই কাছ থেকে পরে বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু যে-কথার শুরু হলো 'সুর' দিয়ে সে কথা যে সুরের নাম নয় তালের নাম, এ কী ক'রে জানব, বলুন।"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বললে, "কিন্তু শেষ হয়েছে তো 'তা 'তাল' দিয়ে।"

প্রিয়লাল বললে, "মাতাল পাতাল নৈনিতাল—এমন অনেক কথা তো শেষ হয়েছে 'তাল' দিয়ে, কিন্তু তাই ব'লে তো আর ওগুলো তালের নাম নয়।"

প্রিয়লালের যুক্তিতে পরাজিত হ'য়ে সন্ধ্যা হাসতে হাসতে বললে, "তা বটে।"

ড্রয়িং রুমে যেতে যেতে প্রিয়লাল বললে, "মিসেস্ মুখার্জি, ঝাঁপতালটা কিন্তু একটা তাল। কী বলুন?"

প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলুন, চৌবেজীর কাছে আপনার এ-সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না।"

মথুরানাথ চৌবের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে দু-চার বৎসর হবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, মাথার চুলে খামখেয়ালীভাবে স্থানে স্থানে পাক ধরেছে, মুখে প্রসন্ন হাসি—দেখে মনে হয় তার উৎপত্তিস্থল মনের আকাশও নির্মল।

মথুরা চৌবের নিকট সন্ধ্যা প্রিয়লালের পরিচয় দিলে। বললে, 'ইনি কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ বড়লোক, মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি, সম্প্রতি বিলাত থেকে খুব সম্মানজনক উপাধি নিয়ে এসেছেন।' মথুরা চৌবের কথা বললে, 'ইনি লক্ষ্ণৌর একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে ইনি এখানকার সকল ওস্তাদকে পরাজিত করেছেন। ধার্মিক, সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমি এঁকে আমার অতি নিকট আত্মীয় ব'লে মনে করি।'

বহু বাঙালী মেয়েদের গান শেখাবার সুযোগে মথুরা চৌবে বাঙলা ভাষাটা এমন আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে যে বুঝতে প্রায় কিছুই আটকায় না, কাজ চলা গোছ বলতেও কতকটা পারে। সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বাবুসাহেব তোমার কে আছে উষামায়ী?"

সহসা এই প্রশ্নে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। কীভাবে উত্তর দেবে ভেবে সে কতকটা বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে, এমন সময়ে প্রিয়লাল তাকে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে; বললে, "আমি ওঁর স্বামীর বন্ধু হই।"

প্রসন্নতাব্যঞ্জক শিরশ্চালনা ক'রে মথুরা চৌবে বললে, "ঠিক আছে!"

আলাপ-পরিচয়ের পর প্রিয়লালকে গান শোনাবার জন্য সন্ধ্যা মথুরানাথকে অনুরোধ করলে। এ অনুরোধে মথুরানাথ আনন্দিতই হোল কারণ প্রথমত, এই তার জীবিকা অর্জনের কাজ; দ্বিতীয়ত, গানের একটা তানও মেরে যেতে পারলে সন্ধ্যার কাছে যে মোটা মাসহারার ব্যবস্থা আছে আজ থেকেই তার গোড়াপত্তন হয়। পূর্বদিকের একটা ঘরে গানবাজনার যন্ত্রাদির ব্যবস্থা ছিল, মথুরা চৌবের তবলা-বাদকও সেই ঘরে অপেক্ষা করছিল। ফরাস এবং সোফা-চেয়ার উভয় প্রকারের ব্যবস্থাই তথায় বর্তমান। সন্ধ্যা, প্রিয়লাল এবং মথুরা চৌবে সেই ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

তবলা এবং তানপুরা বাঁধা হ'লে মথুরানাথ গান আরম্ভ করলে, 'এরি অব গুঁথ লায়োরি মালনিয়াঁ'—সুলতান সালেমের একটি বিখ্যাত খেয়াল। দেখতে দেখতে কামোদের গভীর-করুণ ধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা ভ'রে উঠল—এমন অপূর্ব একটা সঙ্গীত-পরিবেশ স্থাপিত হলো, মনে হলো যার মধ্যে যন্ত্র, কণ্ঠ এবং শ্রোতাদের মন এক বেদনার আনন্দে মিলিত হ'য়ে স্পন্দিত হচ্ছে। দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ কর্তব-কৌশলের মধ্য দিয়ে গান শেষ হলো।

প্রিয়লাল মুগ্ধ হ'য়ে মথুরানাথের সুরমাধুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছিল ; গান শেষ হ'লে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে আরও দুই-একটি গান গাইবার জন্য তাকে অনুরোধ করলে।

আর দু'খানা গান গেয়ে মথুরানাথ বললে, "বাবুজী, হামার তিনখানা গান শুনলেন, এবার হামার সাকরিদ উষামায়ীর একখানা গান শুনুন। এ হামি জোরসে বলতে পারি বাবুজী, সারা লক্ষ্ণৌ শহরে উষামায়ীর মাফিক সুরেলা কণ্ঠ দুসরা না আছে। গুমটি দরিয়াতে যত জল আছে, মায়ীর কণ্ঠে তত সুর আছে। মায়ী তো রেওয়াজ করে না, শুধু হামার গান শোনে। রেওয়াজ করলে মায়ী সারা হিন্দুস্থানকে পরাস্ত্ করতে পারে।"

প্রিয়লাল বললে "মনে মনে তা হ'লে ঠিকই ভাবছিলাম যে, যে-বাড়িতে গান-বাজনার এত ব্যবস্থা সেখানে তার একটা গুরুতর কারণ না থেকে যায় না।" তারপর অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সন্ধ্যাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলে।

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "না, না, আমি গাইব না। ওস্তাদজী আমাকে ভালোবাসেন তাই ও-সব কথা বললেন। ও-সব কথা ঠিক নয়।"

সন্ধ্যার কথা শুনে মথুরানাথ হাসতে লাগল ; বললে, "হামি তোমাকে ভালোবাসি মায়ী, সে বাৎ ঠিক আছে। লেকিন তোমার বারে যো-সব বাত বলেছি সে-ভি ঠিক আছে!"

প্রিয়লাল বললে, "আপনি যে, গান গাইতে পারেন, আর ভালো গাইতে পারেন, চৌবেজীর কথা থেকে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। এর পর আপনি যদি না গান তা হ'লে এই বুঝব যে, যে-আনন্দ আপনি আপনার অতিথিকে অনায়াসে দিতে পারতেন তা ইচ্ছে ক'রেই দিলেন না—সুতরাং আপনার আতিথ্যধর্মে দোষ পড়ল।" মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, কী বলুন চৌবেজী, ঠিক কি-না?"

মথুরানাথ হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "বহুৎ ঠিক আছে!"

অনেক ওজর-আপত্তির পর সন্ধ্যা যখন দেখলে যে একটা গান না গাইলে প্রিয়লাল সত্যিই ক্ষুণ্ণ হবে তখন অগত্যা সে গাইবার জন্য প্রস্তুত হলো।

প্রায় চার বৎসর সন্ধ্যা মথুরানাথের নিকট গান শিখছে। কাশীতেই প্রমথ সন্ধ্যার গান গাইবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। প্রমথ নিজেও সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী এবং একজন শিক্ষিত গায়ক। লক্ষ্ণৌয়ে এসেই সে তথাকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মথুরানাথকে নিযুক্ত করে। চার বৎসর মথুরানাথের নিকট সন্ধ্যা গান শিক্ষা করছে বটে, কিন্তু এই চার বৎসরের মধ্যে যতক্ষণ সময় সে মথুরানাথের মুখে গান শুনেছে তার এক চতুর্থ অংশও নিজে গানের চর্চা করেনি। গানের ঘরে তার জন্য একটি অর্ধ-হেলা আরাম কেদারা ছিল, তাইতে উপবেশন ক'রে মুদিত নেত্রে নিমজ্জিত মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মথুরানাথের গান শ্রবণ করত। সে সময়ে তার মনে হতো সুরের সচল স্রোতে অবগাহন করতে করতে তার পরিক্লিষ্ট

আত্মা নির্মল হ'য়ে উঠছে, নিরাময় হ'য়ে আসছে। সঙ্গীতকে সে বিলাস-বস্তুর মতো গ্রহণ করেনি, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। তাই একমাত্র প্রমথ ভিন্ন অপর কারও অনুরোধে সহজে সে গান গাইত না।

সন্ধ্যা চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে ফরাসের উপর উঠে বসল। তারপর দু-চার মোচড়ে তার ছোট তানপুরাটা ঠিক ক'রে নিয়ে মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কী গাইব আদেশ করুন, ওস্তাদজী।"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে মথুরানাথ বললে, "সেই ভূপালীটা গাও, মায়ী, সে গানটা খুব সুন্দর আছে—'মেরে ঘর বাজে'।"

সে গানের অর্থ, বিশেষতঃ অন্তরা-অংশের অর্থ, স্মরণ ক'রে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। এ পর্যন্ত যা কোনও দিন করেনি তাই করলে—প্রতিবাদ ক'রে বললে, "ও গানটা ভালো হবে না। অন্য কোনও গান বলুন, ওস্তাদজী।"

সন্ধ্যার আপত্তির প্রকৃত কারণের কাছ দিয়েও না গিযে মথুরানাথ সবেগে বললে, "না, না, খুব ভালো হবে, তুমি গাও। এখন ভূপালীর লগন আছে, ও গান খুব জমবে।"

আর আপত্তি করলে আপত্তির নিগূঢ় কারণটিকেই হয়তো প্রকট ক'রে তোলা হবে আশঙ্কা ক'রে সন্ধ্যা তানপুরাটা তুলে নিয়ে তার উপর মাথার বাম দিকটা স্থাপন ক'রে একাগ্র মনে সুর ছাড়তে লাগল; তারপর মাত্র দু-চার মিনিট ভূপালীর স্বরগ্রামটা একটু ভেঁজে নিয়ে হঠাৎ এক মুহূর্তে গাইতে আরম্ভ করলে—

মেরে ঘর বাজে
সরল সুন্দর বীণা মৃদঙ্গ।
বহুত দিনন পর পিয়া ঘর আয়ে
সব মিলি গায়ে রসকি তান॥

অর্থাৎ,

আমার গৃহে সরস সুন্দর
বীণা মৃদঙ্গ বাজে।
বহুদিন পরে প্রিয়তম ঘরে এসেছেন,
সকলে মিলে গাও সরস তানে॥

গান তো এইটুকু, এই তো এক ফোঁটা তার অর্থ, কিন্তু তান বাঁট সার্গম বিস্তার দিয়ে এই গান সন্ধ্যা আধঘণ্টা ধ'রে গায়। আজ কিন্তু সে তেমন কিছুই করলে না। দু-চারটে ছোট ছোট তান দিয়ে বার তিনেক গানটা গেয়ে অল্পক্ষণেই শেষ করলে। কিন্তু কোথা থেকে তার মধ্যে এল এমন-একটা প্রাণস্পর্শী দরদ যে, গান যখন থামল তখন শুধু সন্ধ্যারই নয়, দেখা গেল প্রিয়লালেরও চোখ সজল হ'য়ে এসেছে।

এই বাঁট-বিস্তারহীন গান ওস্তাদ মথুরানাথকেও এত মুগ্ধ করলে যে, সে তার

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে বললে, "ধন্য বেটি, ধন্য! আশ্চর্য! এ গান তুমি এত ভালো কোনও দিন গাওনি।"

প্রিয়লাল বললে, "মিসেস্ মুখার্জি, চৌবেজী বলছেন আপনি ধন্য, কিন্তু আমি বলছি, আমিই ধন্য! কী অদ্ভুত গান আপনি গাইলেন। অদ্ভুত ছাড়া একে আমি আর কিছুই বলব না।"

প্রিয়লালের কথা শুনে মথুরানাথ হাসতে লাগল; বললে, "আর গান শুনবেন, বাবুজী?"

প্রিয়লাল বললে, আজ আর না চৌবেজী, আজ মন ভ'রে গেছে, অন্য দিন আবার হবে।"

"ঠিক বাৎ।" ব'লে মথুরানাথ তানপুরার খোলটা টেনে নিয়ে তানপুরায় পরাতে সুরু করলে।

মথুরানাথ এবং তার তবলচী প্রস্থান করলে প্রিয়লাল বারান্দায় গিয়ে ইজি-চেয়ারে বসল। সন্ধ্যা গেল প্রিয়লালের আহারের তত্ত্বাবধানে। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ডক্টর চৌধুরী, আপনার খাবার এখন দেবে?"

"এখনই না দিলে এমন কোনও অসুবিধে হবে কি?"

সন্ধ্যা বললে, "কিচ্ছু না, যখন আপনার ইচ্ছে হবে তখনই দেবে।"

"তা হ'লে আধঘণ্টাটাক পরে দিলেই হবে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিসেস্ মুখার্জি, বসুন।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যা বসল। তারপর ক্রমশঃ নানা বিষয়ে কথা উঠল—সন্ধ্যার গানের কথা; লক্ষ্ণৌর স্বাস্থ্যের কথা; সেখানকার বাঙালী সমাজের কথা; অবশেষে প্রমথর কথা।

প্রিয়লাল বললে, "প্রমথর উদার অন্তঃকরণের যতটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাকে ভালোবাসি কেন জানেন মিসেস মুখার্জি?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "না, তা জানিনে।"

"সে আপনার স্বামী ব'লে। মহাভাগ্যবান পুরুষ সে। আমি তার সৌভাগ্যের পরিমাণ আমার দুর্ভাগ্য দিয়ে চমৎকার মাপতে পারি। যে সম্পদ লাভ করেছে ব'লে আমি তাকে ভাগ্যবান বলছি, আমি ঠিক সেই জিনিস হারিয়েছি মিসেস মুখার্জি!"

"মিসেস্ মুখার্জী?"

একমুহূর্ত বিলম্ব ক'রে মৃদু-কম্পিতকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে?"

"আমি হয়তো আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, হয়তো আপনাকে 'অফেন্স্' দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা যদি অনুগ্রহ ক'রে স্মরণ রাখেন, তা'হলে বোধ হয় আপনার মনে আমার প্রতি একটু সহানুভূতিও জাগতে পারে। সে কথাটা একবার গাড়িতে কতকটা আপনাকে বলেছিলাম,

আর একবার ভালো ক'রে বলবার আগে একটা গল্প বলি, তাহ'লে বোধ হয় আমার মনের অবস্থা অনেকটা বুঝতে পারবেন। আমাদের পাড়াতে মানিকের মা নামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ছিল, তার একমাত্র সন্তান ছিল মানিক। সেই সতের আঠার বৎসরের ছেলে মানিক, বিধবার নয়নের মণি, হঠাৎ একদিন তিন দিনের জ্বরে মা'র কোলে মাথা রেখে মারা গেল। দুঃখে শোকে মানিকের মা তো একেবারে পাগল হ'য়ে গেল। কিন্তু সে সত্য-সত্যই পাগল হলো মাস ছয়েক পরে একদিন, যেদিন তাদের পাশের বাড়িতে একটি সতের আঠার বৎসরের আত্মীয়ের ছেলে এসে উপস্থিত হ'লো। মানিকের সঙ্গে সে ছেলেটির আশ্চর্য রকমের মিল—বয়সের মিল, আকৃতির মিল, এমন কি কণ্ঠস্বরেরও মিল। একদিন হঠাৎ সে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে মানিকের মা পাগলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরলে, তারপর 'ওরে আমার মানিক রে!' ব'লে সে কী কান্না! ছেলেটি তো অবাক! তারপর তাকে কী আদর যত্ন, কী খাওয়ানো-দাওয়ানো, কী জিনিষ-পত্র উপহার দেওয়া! তারপর মাসখানেক পরে যেদিন মানিকের মা'র কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটি নিজের বাড়ি চ'লে গেল সে-দিন মানিকের মা'র কী নিদারুণ কান্না! সেদিন যেন আবার নতুন ক'রে মানিকের মৃত্যু হ'লো, এমনি ব্যাপার। বুদ্ধি দিয়ে মানিকের মা বেশ জানে যে, ও ছেলেটি মানিক নয়, মানিক ছমাস হলো তারই কোলে মাথা রেখে মারা গেছে—তবু মনের দিক দিয়ে তার ওপর মানিকেরই মতো প্রবল আকর্ষণ। আপনাকে নিয়ে আমারও হয়েছে মানিকের মা'র অবস্থা। বুদ্ধি দিয়ে বেশ জানি যে আপনি সে নন, অপর লোক, কিন্তু কর্মাটারে গাড়িতে উঠে আপনাকে হঠাৎ দেখে যে চমকানটা চমকে উঠেছিলাম তার বেগ তো এখনও থামল না। সেই বেগ থেকে অহেতুক হ'লেও আপনার ওপর এমন একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মেছে যার জন্যে সত্যি বিব্রত হ'য়ে আছি। সেই আকর্ষণের উপদ্রবে যদি মাঝে মাঝে আমার কথায় বা ব্যবহারে একটু অসংযম দেখতে পান তাহ'লে মানিকের মা'র গল্প মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জী! বাস্তবিক আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আশ্চর্যরকম মিল! শুধু বয়সে আর আকৃতিতেই নয়, নামেও। আপনার নাম উষা, আর আমার স্ত্রীর নাম ছিল সন্ধ্যা; বেশি তফাৎ নয়, মাত্র ঘণ্টা বারোর তফাৎ!" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

"মা!"

চমকিত হ'য়ে সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে পিছনে সাধুচরণ দাঁড়িয়ে।

"কী সাধু"

"ডাক্তার সাহেবের খেতে যদি দেরি থাকে তো তুমি খেয়ে নাও না। তোমার আবার পিত্তি পড়লে মাথা ধ'রে।"

সাধুচরণের কথা শুনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার ও-সব কথা ভাবতে হবে না।"

প্রিয়লাল বললে, "তা বেশ তো এবার আমারও খাবার দিক, রাতও হয়েছে অনেক।"

দুর্বোধ্যভাবে ভন্ ভন্ ক'রে কা বকতে বকতে সাধুচরণ প্রস্থান করলে। স্পষ্ট বোঝা গেল তার সদুদ্দেশ্যের প্রতি অবিচারের জন্যে সে প্রসন্ন হয় নি।

প্রিয়লাল সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সাধুচরণ আমাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত কেন করলে বলতে পারেন মিসেস্ মুখার্জি ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "আপনি সাহেবের পোষাক প'রে এসে তার কাছে ডাক্তার চৌধুরী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন, বোধহয় সেই জন্যে।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

খাবার টেবিলে একজনের খাবার দেখে প্রিয়লাল বললে, "শুধু আমার কেন! আপনার ?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন মিসেস মুখার্জী ?—বিলম্ব ক'রে লাভ কী? আপনারও দিতে বলুন-না।"

সন্ধ্যা কিন্তু স্বীকৃত হ'লো না, যত্নপূর্বক প্রিয়লালকে খাইয়ে তাকে বাথরুমের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দ্রুতপদে প্রিয়লালের শয়ন-কক্ষের দিকে প্রস্থান করলে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে প্রিয়লাল দেখলে হরিয়া নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, আর সন্ধ্যা তার বিছানায় মশারি গুঁজে দিচ্ছে। ব্যগ্রস্বরে বললে, "আপনি কেন নিজে করছেন মিসেস্ মুখার্জী! হরিয়া তো রয়েছে।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হোক, ওরা হয়তো কোনও দিকে ফাঁক রেখে দেবে, মশা ঢুকবে।"

"মশা আছে নাকি ?"

"যথেষ্ট।"

"কিন্তু মশারি তো আমার ছিল না ?"

"এটা এখানকার মশারি। বিছানার সঙ্গে কিন্তু সর্বদা দুটো ক'রে মশারি রাখবেন।"

মশারি গোঁজা হ'য়ে গেলে সন্ধ্যা বললে, "কুঁজোয় জল আছে, আর টেবিলের উপর গেলাস রইল। রাত হয়েছে, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। কোনও দরকার হ'লে হরিয়াকে বলবেন, বারান্দায় সে শুয়ে থাকবে।"

প্রিয়লাল বললে, "আপনার অনেক কষ্ট হলো এবার গিয়ে খেতে বসুন। আচ্ছা, নমস্কার!"

"নমস্কার!"—বারান্দার আলোছায়ার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

উনচল্লিশ

বেলা আটটা বাজে। চা পানের পর বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে প্রিয়লাল সেদিনকার সংবাদপত্র পাঠ করছিল। হঠাৎ এক সময়ে উপলব্ধি করলে, যে বিষয়টা তখন পড়ছিল তার আট-দশ ছত্র পড়া হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু কী যে প'ড়েছে তার বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। মন যতক্ষণ বিনা নোটিসে বিষয়ান্তরে ডুব মেরেছিল, চক্ষু ততক্ষণ শ্রেণী-বদ্ধ অক্ষরগুলোর উপর নিরর্থক বিচরণ ক'রে বেড়িয়েছে, সামান্য মাত্রও তার মর্মগ্রহণ করতে পারেনি। বিরক্ত হ'য়ে প্রিয়লাল কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পাশের টেবিলে রেখে দিলে। মনটা হ'য়ে উঠল উৎকণ্ঠিত, অপ্রসন্ন।

আজ আট দিন হলো সে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেচে, কিন্তু আট দিন পূর্বে লক্ষ্ণৌ স্টেশন থেকে মনের যে চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিল তা উপশমিত হওয়া তো দূরের কথা, উত্তরোত্তর প্রবলতরই হয়েছে। এই চঞ্চলতা যে শুধু চিত্তের গোপন মহলেই নিবদ্ধ নয়, বাহিরেও তার কিছু প্রকাশ আছে, তা সে বুঝতে পারে, কিন্তু তাকে রোধ করতে পারে না। বাহিরে তার যতটুকু প্রকাশ, তার আকৃতি এবং পরিমাণ হয় তো এমন যা অপর পক্ষের মনে বিরক্তি এবং বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যা নিয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা চলে না। হয়ত আতিথ্যধর্ম পালনের অনুরোধে সহৃদয়া মিসেস্ মুখার্জি সেটুকু তিতিক্ষার সহিত পরিপাক করেন, কিন্তু মনে মনে তাকে কামিনী-পরায়ণ বিশ্বাসহন্তা ব্যক্তির শ্রেণীতে স্থান দেন। অথচ, বস্তুতঃ সে যে একেবারেই তা নয়, এ সে কেমন ক'রে বোঝাবে! কেমন ক'রে বোঝাবে যে, মিসেস্ মুখার্জির প্রতি তার আকর্ষণ কামজ নয়, সে আকর্ষণের সহিত মিসেস্ মুখার্জির দেহের কোনও সম্পর্ক নেই, একমাত্র যে বস্তুর সহিত আছে তা তার পরলোকগতা স্ত্রীর আকৃতির সহিত মিসেস্ মুখার্জির আকৃতির বিস্ময়জনক সাদৃশ্য।

প্রিয়লাল স্থির করলে, যে প্রকারে হোক সেইদিনই প্রকৃত কথাটা সন্ধ্যার নিকট স্পষ্টতর করবে, নচেৎ তার পক্ষ থেকে আতিথ্যধর্ম হয়তো পদে পদে ক্ষুণ্ণ হতেই থাকবে।

"হরিয়া!"

হরিয়া প্রিয়লালের ধৌত বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, নিকটে এসে বললে, "হুজুর?"

"তোমার মা কোথায় আছেন?"

অনুসন্ধান ক'রে এসে হরিয়া জানালে, সন্ধ্যা কম্পাউণ্ডে চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলি পর্যবেক্ষণ করছে। ঘরে গিয়ে সুটকেস থেকে একটা কী বার ক'রে পকেটে পুরে প্রিয়লাল সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হলো। সন্ধ্যা তখন ভূমিতলে হাঁটু গেড়ে ব'সে ছোট একটা কাঁচি দিয়ে সযত্নে একটি চন্দ্রমল্লিকার চারার পাতা ছাঁটছিল, প্রিয়লালকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বললে, "আসুন!"

প্রিয়লাল বললে, "স্বহস্তে পরিচর্যা করছেন মিসেস্ মুখার্জি ?"

সন্ধ্যা বললে, "এতগুলি গাছের মধ্যে দশ রকমের দশটি গাছ আমার নিজের পরিচর্যায় আছে, বাকি মালীর পরিচর্যায়। কার গাছের ফুল বড় হয়, তা নিয়ে মনে মনে মালীর সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা নেই তা বলতে পারিনে ; যদিও এ কথাও মনে মনে বেশ জানি যে, মালীর কাছে আমার হার সুনিশ্চিত।" ব'লে হাসতে লাগল।

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "আমি যদি আপনার দশটি গাছের মধ্যে একটি গাছ হ'তাম মিসেস্ মুখার্জি, তা হ'লে আপনার কাঁচির আঘাত খেয়ে এমন একটি অদ্ভুত ফুল আপনাকে উপহার দিতাম যাতে শুধু আপনার নিজের মালীই নয়, সারা লক্ষ্ণৌ শহরের মালী আপনার কাছে হার মানত।"

সন্ধ্যা এ কথার কোনও উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল।

"মিসেস্ মুখার্জি !"

নিঃশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আমি বুঝতে পারছি মিসেস্ মুখার্জি, মানিকের মা'র গল্পটা আজকাল আপনার একটু বেশি-বেশি মনে করবার দরকার হচ্ছে ; কিন্তু আমার মনের প্রকৃত অবস্থাটা একবার যদি আপনি একটু ভালো ক'রে বুঝে নেন, তা হ'লে আর আপনার মনে কোনোরকম সংকোচ আসে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। অনুগ্রহ ক'রে এখন যদি আপনি মিনিট দশ পনেরো সময় আমাকে দিতে পারেন তা হ'লে আমরা ওই বাদামগাছ তলায় বেঞ্চিতে গিয়ে একটু বসি।"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি তো আপনার মনের কথা জানি ডক্টর চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বললে, "জানেন। কিন্তু আজ আপনার কাছে আমি তার একটা প্রমাণ দিতে চাই—একটা tangible প্রমাণ।"

"প্রমাণের কোনও দরকার আছে কি ?"

"একটু আছে। শুধু মুখের কথা, আর প্রমাণাশ্রিত কথা—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছেই। প্রমাণটা পেলে আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।"

নিশ্চিন্ত হওয়া তো দূরের কথা, প্রিয়লালের কথায় আপাততঃ সন্ধ্যা উদ্বিগ্নই হ'য়ে উঠল ; কটিদেশে নিবদ্ধ চামড়ার ব্যাগে কাঁচিটা রেখে মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, চলুন।"

উভয়ে বেঞ্চে গিয়ে উপবেশন করলে প্রিয়লাল বললে, "এ কথা বললে কোনও দিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় তাহ'লে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জি, কিন্তু এ কথা প্রথমেই বলা দরকার যে, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি বন্ধুর একান্ত সঙ্গত যেটুকু আকর্ষণ থাকতে পারে, আপনার প্রতি আমার তার বেশি এক বিন্দু আকর্ষণ নেই। মাঝে মাঝে যদি কিছু অতিরিক্ত আকর্ষণের

পরিচয় পেয়ে থাকেন, নিশ্চয় জানবেন যে আকর্ষণের লক্ষ্য আপনি নন, আপনি তার উপলক্ষ্য ; তার একমাত্র লক্ষ্য আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী সন্ধ্যা। এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন তো মিসেস্ মুখার্জি ?"

ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "করি।"

"করেন জানি, কিন্তু যে প্রমাণটা এখনই আপনাকে আমি দিচ্ছি, সেটা পেলে আপনার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।" ব'লে পকেট থেকে সেই কাগজটা বার ক'রে সন্ধ্যার অনুৎসুক হাতে দিয়ে বললে, "এটা আমার স্ত্রী সন্ধ্যার ফটোগ্রাফ। আচ্ছা, একটা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার আকৃতির সঙ্গে এই ফটোগ্রাফটা মিলিয়ে দেখে সত্যি ক'রে বলুন দেখি, কার্মাটারে গাড়িতে আপনাকে দেখে যে চমকে উঠেছিলাম সেটা বিশেষ অন্যায় হয়েছিল কি-না।" ব'লে প্রিয়লাল নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অখণ্ডনীয়তার প্রত্যয়ে হাসতে লাগল।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা ক্ষণকাল ফটোটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইল। এ সেই ফটো, যা তার বিবাহের প্রস্তাবকালে প্রিয়লালদের গৃহে প্রেরিত হয়েছিল। প্রিয়লাল ফটোটা হস্তগত করেছিল এবং বিবাহের তিন চার দিন পরে সন্ধ্যাকে দিয়ে ফটোর তলায় নাম লিখিয়ে নিয়েছিল। সন্ধ্যা শুধু দুটি কথা লিখে দিয়েছিল, "তোমার সন্ধ্যা।" এতদিন পরেও লেখাটা সদ্য টাটকা লেখার মতো জলজল করছে! কম্পিত হস্তে সন্ধ্যা ফটোখানা প্রিয়লালকে ফিরিয়ে দিলে।

"মিলিয়ে দেখলেন না, মিসেস মুখার্জি ?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "মেলাবার দরকার নেই, বুঝতে পেরেছি।"

প্রসন্নমুখে প্রিয়লাল বললে, "তাহ'লে এ কথাও বুঝতে পারছেন যে, আপনি আমার পক্ষে এমন অদ্ভুত একটি মিডিয়ম যার মধ্য দিয়ে আমি অনায়াসে সন্ধ্যার, অন্ততঃ সন্ধ্যার স্মৃতির, নাগাল পেতে পারি। মূর্তি পুজো ক'রে মানুষে যেমন ভগবানকে পাবার চেষ্টা করে, আমিও ঠিক তেমনিভাবে আপনার দ্বারা সন্ধ্যাকে পাবার চেষ্টা করি। আপনি তো জানেন মিসেস্ মুখার্জি, শুধু physical পাওয়াই পাওয়া নয়, spiritual পাওয়াও খুব একটা বড় রকমের পাওয়া।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনও কথা বললে না, স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। অদূরে মেহগিনি গাছে একটা ঘুঘু নিরবসর ডেকে চলেছিল। তার একটানা করুণ স্বরের পীড়নে বাগানের সে অঞ্চলটা আর্ত হ'য়ে উঠেছিল।

"মিসেস্ মুখার্জী ?"

মুখ তুলে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে।"

"সন্ধ্যার ফটো দেখার পর এখন যখন আপনি অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন তখন আপনার কাছে একটা প্রার্থনা করব কি ? এ কিন্তু এমন অদ্ভুত খেয়ালের কথা যে, শুনে হয়তো আপনি আমাকে পাগল ব'লে মনে করবেন। মনে করলে অবশ্য এমন কিছু অন্যায় করা হবে না, কারণ নিজের স্ত্রীর প্রতি যে আমার মতো গভীর অত্যাচার করতে পারে তার তো পাগল হওয়াই উচিত। যদি ধৃষ্টতা মার্জনা

করেন তা'হলে আমার প্রার্থনাটা নিবেদন করি।" ব'লে প্রিয়লাল উৎসুক নেত্রে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল।

বিহ্বলভাবে প্রিয়লালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কী বলুন।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "আমার প্রার্থনা—একদিনের জন্যে—শুধু একদিনের জন্যে, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ভাবতে অনুমতি দিন যে, আপনি যেন মিসেস্ মুখার্জি নন—আপনি যেন সন্ধ্যা! কালকের দিনই সেই দিন করা যাক। কাল সকালে উঠে প্রথম দর্শনে আপনাকে বলব, 'সুপ্রভাত সন্ধ্যা!' আপনি অবশ্য কোনও উত্তর দেবেন না, চুপ ক'রে থাকবেন। আপনার হবে মূক অভিনয়, আমার হবে মুখর। আমি বলব, 'ওগো কথা কও, কথা কও! তোমার পাষাণের মতো অভিমানের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে অপরাধী স্বামীকে দণ্ড দাও, তিরস্কার করো। শুধু তাকে উপেক্ষা ক'রে দূরে রেখো না!' এই রকম দুঃখে খেদে আরাধনায় সমস্ত দিনটা আমার কেটে যাবে অস্থিরতার চঞ্চলতার মধ্যে। আপনি কিন্তু তার মধ্যে থাকবেন প্রতিমার মতো স্তব্ধ অনড়। ক্রমশঃ আমিও নিশ্চল নীরব হ'য়ে আসব। অবশেষে গভীর রাত্রের কোনো-এক মুহূর্তে অতি সংক্ষেপে বিদায়ের পালা শেষ হবে। শুধু বলব, 'বিদায় সন্ধ্যা, বিদায়!' সেই বিসর্জনের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুনরাগমনের কোনও প্রার্থনা থাকবে না। তার পরদিন সকালে আপনি আবার যে-মিসেস্ মুখার্জি সেই মিসেস্ মুখার্জি! কী বলুন? আমার প্রার্থনা—"

সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "ও কি মিসেস্ মুখার্জি! অমন করছেন কেন?" তারপর সাড়া না পেয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সন্ধ্যার দুই কাঁধ ধ'রে সজোরে নাড়া দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, "মিসেস্ মুখার্জি! মিসেস্ মুখার্জি!"

চকিত হ'য়ে সন্ধ্যা তার নিমীলিতপ্রায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে চেয়ে দেখলে, তারপর রক্তশূন্য ওষ্ঠাধরে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হলো।

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "একটু ভালো বোধ করছেন কি?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "ও-কিছু নয়। নিশ্বাসটা কেমন চেপে এসেছিল তাই শরীরটা একটু বেভাব হয়েছিল।"

"আগে কখনও এ রকম হয়েছিল?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, আর একবার হয়েছিল।" জামসেদপুর থেকে পিতৃগৃহে যেদিন যায় সেদিনকার কথা তার মনে পড়ল।

"ডাক্তার ডাকাব, মিসেস্ মুখার্জি?"

হাত নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, কিছু দরকার নেই।"

"তা হ'লে একটু বিশ্রাম নেবেন চলুন।"

বিশ্রাম নেবার প্রস্তাব কিন্তু আর বেশি দূর অগ্রসর হলো না, পদশব্দে উভয়ে

চেয়ে দেখলে সাধুচরণ আসছে, চক্ষে ভ্রূকুটির তীক্ষ্ণতা, মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নতার অন্ধকার। অজ্ঞাত কারণ বশতঃ প্রথম থেকেই প্রিয়লালকে সাধুচরণের ভালো লাগেনি, সন্ধ্যার সহিত তার এই কয়েক দিনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য ক'রে সেই অপ্রসন্নতা সবিশেষ বর্ধিত হয়েছিল; তারপর আজ দূর থেকে সন্ধ্যার দুই স্কন্ধে প্রিয়লালের হস্তার্পণ দেখে তার পিত্ত জ্ব'লে গিয়েছিল। নিকটে এসে রুক্ষ স্বরে সে ডাকলে, "মা!"

"কী সাধু!"

"টেলিগেরাম এসেছে যে!"

পদান্তের এই 'যে' শব্দটি নিরর্থক নয়, প্রিয়লালের চপল আচরণ অপ্রতিবাদে সহ্য করবার জন্য ইহা সন্ধ্যার প্রতি অনুক্ত তিরস্কারের সংজ্ঞা।

আগ্রহভরে সন্ধ্যা বললে, "কই দেখি?"

নিকটে ছিল ব'লে প্রিয়লাল সাধুচরণের হাতথেকে টেলিগ্রামটা নিতে গেল, সাধুচরণ কিন্তু হাত সরিয়ে নিয়ে প্রিয়লালকে অতিক্রম ক'রে সেটা সন্ধ্যার হাতে পৌঁছে দিলে।

সাধুচরণের এই সুস্পষ্ট অশিষ্টতায় সন্ধ্যা মনে মনে রুষ্ট হলো, কিন্তু টেলিগ্রামটা খুলে পাঠ ক'রে সে এত খুশি হ'য়ে গেল যে, নিমেষের মধ্যে সমস্ত রোষ বিস্মৃত হ'য়ে সে সাধুচরণকেই বললে, "সাধু, উনি এক্ষণি আসছেন!"

শুনে সাধু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল; একটু খাড়া হ'য়ে উঠে বললে, "দেখ দেখি, বাবু আসছেন, আর তুমি—!"

এই 'আর তুমি' কথা দুটিও পূর্বোক্ত 'যে' শব্দের সগোত্র।

প্রমথর আগমনের এই আকস্মিক সংবাদ প্রিয়লালের বোধহয় খুব ভালো লাগল না; মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ গাড়িতে প্রমথ আসছেন মিসেস্ মুখার্জি?"

প্রিয়লালের হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "নটার গাড়িতে,—যে গাড়িতে আমরা এসেছিলাম।" তারপর সাধুচরণকে সম্বোধন ক'রে বললে, "সাধু, সময় একেবারে নেই, শীগ্‌গির মোটর বার করতে বলো, আমি দু' মিনিটে তৈয়ের হ'য়ে আসছি।" ব'লে তার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। যেতে যেতে মনে হলো প্রিয়লালকে স্টেশনে যাবার কথা একবার বলা উচিত। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ডক্টর চৌধুরী, আপনি স্টেশনে যাবেন?"

প্রিয়লাল বললে, "আনন্দের সঙ্গে।"

"বেশ, তা হ'লে আপনিই যান।"

"কেন? আপনি তা হ'লে যাবেন না, না-কি?"

"না। আমি তা হ'লে আর যাইনে।"

"কেন মিসেস্ মুখার্জি, দু'জনেই যাই, চলুন-না?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি গেলে আর আমার যাবার দরকার নেই। আমি বরং

বাড়িতে থেকে ওঁর চা-টার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখি। আপনি একাই যান—কেমন ?"

একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা, তা-ই না হয় যাই।"

প্রিয়লাল যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন গাড়ি ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্মে প্রবেশ করছে। দূর থেকেই দেখতে পেলে প্রমথ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছে।

গাড়ি থামলে প্রমথ তাড়াতাড়ি নেবে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে প্রিয়লালের দুই হাত সজোরে চেপে ধ'রে সহাস্যমুখে বললে, "কেমন আছ বলো ?"

"ভালো আছি। তুমি ?"

"ভালো আছি। উষা কেমন আছে ?"

কিছু পূর্বে সন্ধ্যার যে মোহাবেশের মতো হয়েছিল সেকথা উল্লেখ না করাই সমীচীন মনে ক'রে প্রিয়লাল বললে, "ভালোই আছেন। তোমার বন্ধুর খবর কী ?"

প্রমথ বললে, "বন্ধুর খবর ভালো। এ যাত্রা সুরেশটা ভারি বেঁচে গিয়েছে।"

পথে যেতে যেতে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "উষার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এ কয়েক দিনে একটু ঘনিষ্ঠ হলো তো, প্রিয়লাল ?"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "একটু নয়, বিশেষ রকমই হয়েছে। এত বেশি যে, তিনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, না তুমি আমার বান্ধবীর স্বামী, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।"

মুখে কপট আতঙ্কের ছায়া লেপন ক'রে প্রমথ বললে, "ভাগ্যিস আরও দেরি ক'রে আসিনি! আরও পাঁচ-সাত দিন দেরি ক'রে এলে হয়তো আরও কঠিন কোনও প্রশ্ন তোলা যেতে পারত। কী বল প্রিয়লাল ?"

প্রিয়লাল বললে, "তা হয়তো পারত। কারণ তা হ'লে ক্রমশঃ তাঁর সঙ্গে আমার এমন একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হতো যে, প্রশ্নটা তখন দাঁড়াতে পারত—তিনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, না তুমি আমার আত্মীয়ার স্বামী।" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

আর কোনও উত্তর না দিয়ে প্রমথও হাসতে লাগল।

গৃহে পৌঁছে অল্পক্ষণ সন্ধ্যা এবং প্রিয়লালের সহিত কথাবার্তার পর প্রমথ স্নান করবার জন্য বাথরুমে প্রবেশ করলে। স্নানান্তে চা পান করতে ব'সে সে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয়লাল কোথায়, উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "বাদামতলায় বেঞ্চে ব'সে বই পড়ছেন।"

সকৌতূহলে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, তোমার প্রতি ওর একটুও সন্দেহ হয়নি কি ?"

সন্ধ্যা বললে, "সে কথা পরে বলছি, কিন্তু তার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি এই আটদিন আমাকে এ-ভাবে ফেলে রেখেছিলে কেমন ক'রে ? সুরেশ বাবুকে একটু ভালো দেখার পর এলেও অন্ততঃ তিন চার দিন

আগে আসতে পারতে। আমাকে এইরকম একটা অত্যন্ত গোলমেলে অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত হয়েছে কি ?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "আহা-হা। বুঝতে পারছ না ? তোমাকে একটু পরীক্ষে করছিলাম।"

সন্ধ্যা বললে, "আর একটু বেশি পরীক্ষে করলে হয়তো ফেল হ'তাম।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমথ বললে, "সর্বনাশ। আমার যে যা-কিছু সম্বল সবই তোমার ব্যাঙ্কে জমা। তুমি ফেল হ'লে আমি একেবারে দেউলে হতাম।"

"তবে ?"

কপট অনুতাপের ভঙ্গিতে প্রমথ বললে, "স্বীকার করছি, গোঁয়ার্তুমি করা হচ্ছিল। তবে কি-না—" সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমথ কথাটা চেপে গেল।

সন্ধ্যা কিন্তু কথাটাকে উপেক্ষা করলে না ; বললে, "তবে কি-না কী বল ?"

ভয়ে ভয়ে প্রমথ বললে, "তবে কি-না গোঁয়ার্তুমির ফলে ব্যাঙ্ক ফেল হ'লে একেবারে মন্দও হতো না।"

"কী ভাল হতো, শুনি ?"

"ভালো আর এমন কি হতো, চিরকেলে বৈরিগী মানুষ আবার বৈরিগী হতো।"

"কেন, তুমি কি আমাকে তোমার বাঁধন ব'লে মনে করো ?"

এক চুমুক চা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ ক'রে সজোরে মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "আরে রাম রাম, তাও কখনও করি। তবে একেবারে করিও না যে, তাও বলতে পারিনে। এক এক সময়ে বাঁধন ব'লেই মনে হয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয় বাঁধনটা আর একটু চেপে বসলেও মন্দ হয় না। মনের এই রকম একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা আর-কি।"

সন্ধ্যা বললে, "এই হ-য-ব-র-ল অবস্থা থেকে তোমাকে মুক্তি দেবার উপায় আমার আছে জানো ?"

সন্ত্রস্ত মুখে প্রমথ বললে, "না, তা তো জানিনে। আছে না-কি ? কী উপায় আছে ?"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উচ্ছলোদ্যত হাস্যের আভাসকে গোপন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কেন, নবদ্বীপে গোঁসাই-জীর আশ্রম ?"

প্রমথ বললে, "সর্বনাশ। ও-কথাটা এখনও একেবারে ভোলো নি দেখচি। কিন্তু সেই আশ্রমেই যদি প্রবেশ করলে উষা, তা হ'লে বেচারা আমি কী অপরাধ করলাম বলো ? তবে আশ্রমের পরিবর্তে যদি অন্য কোনও উপায়ের আশ্রয় নিতে তা হ'লে না হয়—" কথা সমাপ্ত না ক'রে প্রমথ বিহ্বল নেত্রে সোজাসুজি সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যা বললে, "চুপ ক'রে রইলে কেন ? 'তা হ'লে না হয়' কী বলো ?"

প্রমথ বললে, "বলা অত্যন্ত কঠিন।" তারপর ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা ক'রে বললে, "তা হ'লে না হয় নিজেকে বেশ খানিকটে—"

কথাটা শেষ করবার সময় পাওয়া গেল না। বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির নিকট হ'তে প্রিয়লালের প্রশ্ন শোনা গেল, "আসতে পারি ?"

"নিশ্চয় পার। তোমার কথাই তো এতক্ষণ হচ্ছিল। এস, এস।" ব'লে প্রমথ প্রিয়লালকে সাগ্রহে আহ্বান করলে।

নিকটে এসে একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "বিশ্রম্ভালাপে কিন্তু বিঘ্ন উৎপাদন করলাম।"

প্রমথ বললে, "উৎপাদন যদি করেই থাক তা হ'লে গুরুতর অপরাধ করনি, কারণ বিশ্রম্ভালাপ ক্রমশঃ বাদানুবাদে পরিণত হ'য়ে কলহের আকার ধারণ করছিল।"

প্রিয়লাল সহাস্য মুখে বললে, "কিন্তু দাম্পত্যকলহটা উপাদেয় জিনিস ব'লেই শোনা আছে। সেই জিনিস থেকে তো আমি তোমাদের বঞ্চিত করলাম।"

প্রমথ বললে, "এ কথার আলোচনা পরে কোনও সময়ে করা যাবে, আপাততঃ তুমি যে আসন্ন কলহ নিবারিত ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছ, সেই কৃতজ্ঞতার বশীভূত হ'য়ে উষা তোমাকে এক পেয়ালা গরম চা অফার করেন কি-না দেখা যাক।"

"এ রকম কায়দা ক'রে কথা বললে, মিসেস্ মুখার্জির পক্ষে অফার করাও শক্ত, না করাও শক্ত।" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

প্রমথর কথার ভণিতায় সন্ধ্যাও হেসে ফেলেছিল ; বললে, "এক পেয়ালা চা দোবো না-কি ডক্টর চৌধুরী ?"

প্রিয়লাল বললে, "স্টেশন থেকে আসার পর তো বড় এক গ্লাস সরবৎ দিয়েছেন, আবার এরই মধ্যে অসময়ে চা'র দরকার নেই।"

প্রমথ বললে, "চায়ের সময়-অসময় নেই, সব সময়েই তার সুসময়। তখন তুমি সরবৎ না খেয়ে এক পেয়ালা চা খেলে আরও ভালো করতে। চা-র বিষয়ে গ্ল্যাডস্টন্ কী বলতেন জান তো ?"

স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "না।"

"গ্ল্যাডস্টন্ বলতেন, 'If you are too hot, it will cool you. If you are too cold, it will warm you. If you are depressed, it will cheer you. If you are too excited, it will calm you.' বৃদ্ধ ভদ্রলোক চায়ের এত অনুরাগী ছিলেন যে, যে-কোনও সময়ে অথবা যে-কোনও স্থানে হোক না কেন, এক পেয়ালা চা কেউ দিলে কখনও অস্বীকার করতেন না।"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "চা যদি এতই উৎকৃষ্ট বস্তু, তা হ'লে না-হয় এক পেয়ালা খাওয়াই যাক।"

টি-পট থেকে সুতপ্ত চা ঢেলে একটা খালি পেয়ালা পূর্ণ ক'রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের সম্মুখে স্থাপিত করলে।

চা পান করতে করতে প্রিয়লাল বললে, "আমি তো আমার প্রতিশ্রুতি পালন করলাম প্রমথ—এবার আমাকে বিদায় দাও।"

প্রমথ বললে, "বেশ কথা; কিন্তু তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করলেই আমি তোমাকে বিদায় দোব, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম কি? তা ছাড়া, উপস্থিত তো তুমি ভবঘুরের জীবন যাপন করছ, কিছু দিনের জন্যে না-হয় আমাদের এখানেই ডেরা-ডাণ্ডা বাঁধলে?"

এ কথার উত্তর দিলে সন্ধ্যা। প্রমথর দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু দেখ, ডক্টর চৌধুরীর কথাই তো শুধু নয়, ফয়জাবাদে ওঁর একটি বন্ধু ওঁকে নাবিয়ে নেবার জন্যে স্টেশনে এসেছিলেন। ডক্টর চৌধুরী ফয়জাবাদে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লাহোরে যাবেন, তারপর সেখান থেকে আরও কয়েকজনে মিলে কাশ্মীর রওনা হবেন, এই ওঁদের কথা আছে। এ অবস্থায় ডক্টর চৌধুরীকে আর আটকে রাখা বোধহয় উচিত হবে না।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রিয়লাল। বললে, "না, ঠিক তা নয়। কাশ্মীর যাওয়া কিছুদিন পেছিয়ে দিলে অথবা একেবারে পরিত্যাগ করলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না—তবে—"

প্রিয়লালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রমথ বললে, "তবে এ কথার মীমাংসা পরে যা হয় করলেই হবে, উপস্থিত যতক্ষণ-না খাবার তয়ের হচ্ছে চল, বাদাম গাছতলায় গিয়ে তিনজনে মিলে আড্ডা জমানো যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "তোমরা যাও। আমি ওদিকে তোমাদের খাবারের তাগিদে একটু যাই।"

প্রিয়লাল বললে, "যে খাবারের তাগিদে যাওয়ার জন্যে আপনার সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত হ'তে হচ্ছে সে খাবারকে কিন্তু আমরা অখাদ্য ব'লে মনে করব মিসেস্ মুখার্জী"

প্রমথ বললে, "অতিশয় সারবান কথা। কাটাবার বৃথা চেষ্টা কোরো না, উষা। হরিয়া!"

হরিয়া নিকটেই অপেক্ষা করছিল, সম্মুখে এসে বললে, "হুজুর?"

"বাদামতলায় তিনটে বেতের চৌকা দে।"

প্রভুর আদেশ পালনের জন্য হরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

চল্লিশ

প্রমথর আসার পর আট দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত প্রিয়লালের যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। এর মধ্যে কয়েকবারই সে যাওয়ার কথা তুলেছে বটে, কিন্তু তাকে নিরস্ত করতে প্রমথর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি; স্তিমিত উত্তাপের অগ্নি সামান্য জলসেচনেই নিভে গেছে। বিদায়ের প্রস্তাবে সন্ধ্যাও আরও বার দুই প্রিয়লালের পক্ষ অবলম্বন ক'রে দেখেছে যে, আলোচনার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্রমশঃ প্রতিপক্ষের দিকে গিয়ে দাঁড়ায়, তার পক্ষ অবলম্বন ক'রে তর্ক করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সে জন্য সে-ও বিশেষ কিছু আর বলে না। তা ছাড়া, প্রমথ আসার পর থেকে গৃহকর্মের অছিলায় দূরে দূরে থাকবার সুযোগও অনেকটা সে পেয়েছে।

একজন প্রতিবেশিনীর গৃহে সামান্য একটা উৎসব ছিল। সন্ধ্যা গিয়েছিল সেখানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে। প্রিয়লালও বাড়ি ছিল না, কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে তার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। একাকী প্রমথর ভাল লাগছিল না,—একটা চিঠি লিখলে; সন্ধ্যার এসরাজ নিয়ে কয়েকটা টান-টুন দিলে; অবশেষে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা ইংরাজি উপন্যাসে মগ্ন হলো। কিছুক্ষণ পরে পদশব্দে চেয়ে দেখলে সাধুচরণ এসে নিকটে দাঁড়িয়েছে। বললে, "কী সাধু, কোনও কথা বলবি না-কি ?"

মাথা চুলকে একটু ইতস্তত: ক'রে সাধুচরণ বললে, "বলতেই তো এসেছি, কিন্তু তুমি রাগ করবে না তো ?"

উপন্যাসের একটা পাতা উল্টে প্রমথ বললে, "রাগ করব কেন ? কী কথা বল না।"

আর একটু প্রমথর সম্মুখে এসে কণ্ঠের স্বর ঈষৎ নিম্ন ক'রে সাধুচরণ বললে, "ডাক্তার সায়েব যেতে চাইলে আটকোনি বাবা, তোমার ও ডাক্তার সায়েব ভালো লোক নয়।"

প্রমথ বললে, "কেন রে, ডাক্তার সায়েব কী দোষ করলে ? তোকে বকসিস্-টকসিস্ পয়সা-টয়সা দেয় না বুঝি ?"

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ বিকৃত ক'রে সাধুচরণ বললে, "আরে, রেখে দাও তোমার বকসিস্ আর পয়সা! তোমার মতো দেনেওয়ালা মুনিব থাকতে আমি কারও পয়সার তোয়াক্কা করি কি-না! তোমার কাছে চেয়ে কখনও কোনও জিনিস পাই নি, বলতে পার ?"

নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে প্রমথ বললে, "তা আসল কথাটা কী খুলে বল না ?"

কী ভাবে কথাটা প্রকাশ করবে মনে-মনে একটু চিন্তা ক'রে সাধুচরণ বললে, "ডাক্তার সায়েবের চরিত্তির ভালো নয়!"

সাধুচরণের' দিকে দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "তা তুই কি ক'রে জানলি ?"

বিস্ময়বিস্ফারিত মুখে সাধুচরণ বললে, "শোনো কথা! দিবারাত্তির বাড়িতে রয়েছি আর জানব না আমি! দিন নেই রাত্তির নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, খালি মা'র পাছে পাছে ঘুরফির ঘুরফির। কানে কানে ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্। কেন রে বাপু, তুই বেটাছেলে, বাড়িতে এত বই রয়েছে, দু-চারখানা নিয়ে লেখাপড়া কর্ না। তা নয়, ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্। তারপর সেদিন দেখি, মা'র দুই কাঁধে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার ভাবলাম, পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দিই এক ঘা বসিয়ে। তারপর ভাবলাম, আমি চাকর, কাজ কি আমার অত দাপটে। চাকরের

মতোই থাকা ভালো। হাতে তোমার টেলিগেরাম ছিল, সেইটে গিয়ে মাকে দিলাম।"

শুনে প্রমথর মুখ মলিন হ'য়ে উঠল; গম্ভীর মুখে বললে, "আচ্ছা সাধু, তুই যা।"

খানিকটা চ'লে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে সাধুচরণ বললে, "মা'র কী দোষ বল? একে মেয়েমানুষ, তায় বাড়িতে দোস্‌রা বেটাছেলে নেই, কী করবে সে ছেলেমানুষে? তুমি আসার পর তবু একটু কমিয়েছিল, আবার দু'দিন থেকে লাগিয়েছে ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্! তুমি ডাক্তার সায়েবকে বিদেয় কর বাবা; আমি তোমাকে পষ্টো বলছি, ও লোক ভালো নয়।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা, হয়েছে সাধু, তুই এখন যা।"

ভন্‌ভন্ ক'রে কী বল্‌তে বল্‌তে সাধুচরণ প্রস্থান করলে।

চুরুট্‌টা বোধহয় ভালো ক'রে তখন ধরেনি, পুনরায় নিভে গিয়েছিল, কী ভাবতে ভাবতে প্রমথ সেটা ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিলে, বইটা মুড়ে পাশের তেপায়ায় রাখলে, তারপর চেয়ারের হাতলে পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মনের একটা দিক অন্ধকার হ'য়ে এসেছে—দুঃখে, না নৈরাশ্যে, না অভিমানে, না অপমানে তা ঠিক বোঝা যায় না। অভিমানেই বোধহয় বেশি। যতই বল-না কেন, দুধের সাধ ঘোলে মেটে না। শাঁস পেলে কে আর খোসা চিবুতে চায় বল। তাই-না তার আট দিনের অনুপস্থিতির কাছে দীর্ঘ চার বৎসরের একত্র বাস পরাস্ত হলো। মেকির বিরুদ্ধে খাঁটি চক্ষের নিমেষে জয়লাভ করলে।

তারপর কিন্তু প্রমথ ধীরে ধীরে তার সবল উদার অন্তঃকরণকে স্বার্থপরতার স্তূপের ভিতর থেকে টেনে বার করলে; মনে মনে সে বলতে লাগল, আহা, হাজার হোক স্বামী তো। রূপে-গুণে অর্থে-বিদ্যায় অমন স্বামীকে কি সহজে প্রত্যাখ্যান করা চলে! দুর্বলতার বশে না-হয় একটা অপরাধই ক'রে ফেলেছিল, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও তো কম করেনি। অনুশোচনার দুঃখ-বেদনায় প্রিয়লাল এখন নির্মল হ'য়ে গেছে, এখন তাকে গ্রহণ করলে সন্ধ্যাকে কোন দোষই দেওয়া যায় না। এ মিলন যাতে সংঘটিত হয় সে বিষয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। নিজের এক বিন্দু স্বার্থপরতা দিয়ে অপরের বৃহৎ মঙ্গলকে বাধা দেবে না। সযত্নে প্রমথ তার অন্তরের একটি প্রচ্ছন্ন তন্ত্রীকে উপচিকীর্ষার সমুদার সুরে বেঁধে নিলে। অপরের কল্যাণ-সাধনের মধ্যে নিজের সমস্ত কুটিল স্বার্থকে নিমজ্জিত কর, লুপ্ত কর!

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন-কক্ষে গিয়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছে কথাটা উত্থাপিত করলে; বললে, "উষা, তোমার সঙ্গে আমার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে। আমার একান্ত অনুরোধ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তুমি কথাটা শোনো।"

প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বিস্মিত হলো। সদানন্দ প্রমথর মুখে

কৌতুকের নামগন্ধ নেই, তৎপরিবর্তে তথায় একটা সুনিবিড় আন্তরিকতার স্তব্ধ প্রশান্তি। বুঝলে কথাটা নিতান্ত সামান্য নয়, জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা ?"

কোনও প্রকার ভূমিকা না ক'রে প্রমথ সোজাসুজি বললে, "প্রিয়লাল আর তুমি মিলিত হও ঊষা, আমি সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখেছি, উপস্থিত অবস্থায় এর চেয়ে মঙ্গলের আর কিছুই হ'তে পারে না। প্রিয়লালের সঙ্গে এই আট দিনের কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পেরেছি তোমার অভাবে সে পাগল হ'য়ে আছে। তোমার যথার্থ পরিচয় পেলে সে যে আকাশের চাঁদ হাতে পাবে, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। একদিন দুর্বলতার বশবর্তী হ'য়ে সে তোমার প্রতি একটা অপরাধ করেছিল বটে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা বাঙলা দেশের স্বামীদের পক্ষে সে যে খুব একটা অসাধারণ অপরাধ, তা নয়। কিন্তু বস্তুতঃ যত বড়ই অপরাধ করুক-না কেন, তার প্রায়শ্চিত্তও সে যথেষ্ট করেছে—এখন যদি তুমি তাকে গ্রহণ কর, তা হ'লে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তোমার কোনও অপরাধই হয় না। আমার কথা যদি তোলো, আমি চিরদিনই তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হ'য়ে থাকব। তোমার আমার মধ্যে যে আত্মীয়তা, তা আর কিছুতেই যাবার নয়। কখনও আমি তোমাদের কাছে গিয়ে বাস করব, কখনও বা তোমরা দু'জনে এসে আমার কাছে বাস কোরো। কোনও দিকই তোমার হারাতে হবে না ঊষা। এর জন্যে আমার পক্ষ থেকে যা কিছু বলবার বা করবার দরকার হবে তা আমি নিশ্চয়ই করব, কিন্তু প্রথমটা তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হ'লেই ভালো হয়। কাল বেলা এগারটার ট্রেনে আমি অভয়ের সঙ্গে দেখা করতে রায়বেরিলী যাব, ফিরব সন্ধ্যা সাতটার গাড়িতে। তুমি তার মধ্যে সুবিধে মতো কোনও সময়ে প্রিয়লালকে তোমার যথার্থ পরিচয় দিয়ো। এ ছাড়া তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আর যা করবার সবই সে করবে। কেমন, রাজি তো, ঊষা ?"

একবার চকিতে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।"

উত্তর শুনে প্রমথ মুখে বললে বটে, "বেশ, বেশ, ভারি খুসি হ'লাম।" কিন্তু মনের মধ্যে এমন প্রবল একটা আঘাত পেলে যার তুলনায় সাধুচরণের অভিযোগ শুনে কিছু পূর্বে যে আঘাত পেয়েছিল তা বিশেষ কিছু নয়। এত শীঘ্র, এত সহজে 'আচ্ছা ?' তার আগে দুটো চা'টে চক্ষুলজ্জার দুর্বল 'না'-ও নয় ? কেনরে বাপু, পালিয়ে তো যাচ্ছিল না ! আমি তো নিজেই হাতে তুলে দিচ্ছিলাম। আশ্চর্য মেয়েমানুষের কঠিন আত্মপরায়ণ মন !

আর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হলো না, প্রমথ তার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি কাটল খণ্ডিত নিদ্রায়। ঘুম আসে না শীঘ্র, এলেও ভেঙে যায় শীঘ্র। কিসের যেন একটা দুর্নিবার অস্বস্তি নিদ্রার জন্য মনকে স্তব্ধ হ'তে দেয় না। বিরক্ত হ'য়ে প্রমথ যখন শয্যা ত্যাগ করলে তখন প্রত্যুষের আলো সবে মাত্র ঘরে প্রবেশ করেছে। নিদ্রিতা সন্ধ্যার সম্মুখে গিয়ে সেই নিষ্প্রভ আলোকে চেয়ে দেখলে

তার মুখে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার প্রশান্তি। মনে মনে বললে, বল কি! চার বৎসরের অবরুদ্ধ দুঃখের আজ অবসান! এ কি সহজ কথা!

নিজের কথাটা মনে হ'তে বললে, তা কী করা যাবে! সুখসৌভাগ্য তো আর নিজের তালুকের ফসল নয় যে, পেয়াদা পাঠিয়ে আমদানি করলেই হলো! তবু অবুঝ মনের মধ্যে রিক্ততার একটা মর্মন্তুদ গ্লানি থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে!

আর একবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে চোখে জল ভ'রে এল। এই স্বর্ণপ্রতিমাকে আজ নিজের হাতে বিসর্জন দিতে হবে! একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মুক্তিলাভ করলে। টেবিলের উপর থেকে সিগারকেস্ আর দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে প্রমথ বারান্দায় গিয়ে বসল।

একচল্লিশ

অপরাহ্ণে চা পানের পর প্রিয়লাল বললে, "গোমতীর ধারে একটু বেড়াতে যাবেন, মিসেস্ মুখার্জী? তারপর সাতটার সময়ে একেবারে স্টেশন থেকে প্রমথকে নিয়ে ফিরলেই হবে?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি মনে করছিলাম বাগানে বাদামগাছ তলায় গিয়ে একটু বসলে হয়—আপনাকে একটা কথা বলবার আছে।"

সকৌতূহলে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "কথা?—কী কথা?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি।" ব'লে সে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে, তারপর দেরাজ খুলে ছোট একটা বাক্সের ভিতর থেকে একটা আংটি বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিলে। এ সেই প্ল্যাটিনমের অভিজ্ঞান আংটি বিবাহের কয়েকদিন পরে যা সে প্রিয়লালের কাছে পেয়েছিল। অলঙ্কার ভাগের সময়ে চিত্রাঙ্কিত ব'লে এবং রৌপ্য-নির্মিত মনে ক'রে এ আংটি আর কেউ গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হওয়ায় গফুরই গ্রহণ করে, এবং খুব সম্ভবতঃ সন্ধ্যার স্বামীর চিত্র মনে ক'রে পরে আমিনা গফুরের কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। বৎসর দুই পূর্বে দৈবযোগে দিল্লী স্টেশনে আমিনার দেওর নাসিরউদ্দীন্ একটি গাড়িতে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে এবং কথায় কথায় লক্ষ্ণৌর ঠিকানা জেনে নেয়। তার কিছুদিন পরে আমিনার নিকট হ'তে সন্ধ্যা ডাকযোগে এই আংটি এবং একটি চিঠি পায়। সেই থেকে এ পর্যন্ত এ আংটি বাক্সে বদ্ধ হ'য়ে ছিল।

প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "চলুন, ডক্টর চৌধুরী।"

সন্ধ্যা'র আদেশে পূর্ব থেকেই বাদামগাছ তলায় দুটো বেতের চেয়ার রাখা ছিল, উভয়ে গিয়ে তথায় উপবেশন করলে।

প্রিয়লালের ঔৎসুক্য বিরতি মানছিল না; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা, মিসেস্ মুখার্জী?"

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততঃভাবে সন্ধ্যা বললে, "কথাটা বড়ই অভদ্র, ভারি রূঢ়। আজ সমস্ত দিন ধ'রে ভেবেচি কী ক'রে আপনাকে বলি—অথচ না ব'লেও উপায় নেই।"

অধীর উৎকণ্ঠায় প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয় বলবেন। অসংকোচে বলুন।"

মনে মনে সন্ধ্যা নিজেকে কতকটা প্রস্তুত ক'রে নিলে, তারপর প্রিয়লালের প্রতি করুণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললে, "দেখুন, আপনি আমাদের মান্য অতিথি, আপনার প্রতি কোন রকম অসম্মান অথবা অবহেলা দেখানো আমাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তবুও অবস্থার অনুরোধে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের এ বাড়িতে আপনার আর না থাকাই ভালো। একমাত্র সংসারের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে যে রূঢ় কথা আপনাকে বলতে হ'লো, আপনি আপনার সহৃদয়তায় অনুগ্রহ ক'রে তা ক্ষমা করবেন।"

দারুণ বিস্ময়ে এবং দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের মুখ একেবারে পাংশু হ'য়ে গেল। বিহ্বলভাবে বললে, "কেন মিসেস্ মুখার্জি, আমার কোনও আচরণ কি আপনার প্রতি গর্হিত হয়েছে ?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না না—একেবারেই না। আপনার আচরণের মধ্যে অন্যায়ের নামগন্ধ নেই।"

"তবে ?"

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা অন্যদিকে চেয়ে নিঃশব্দে কী চিন্তা করতে লাগল।

প্রিয়লাল বললে, "এ কথা অবশ্য আমি বুঝতে পারি যে, অকারণে এ রকম ক'রে আপনাদের বাড়ি প'ড়ে থাকা আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু অন্য লোকে যা-ই ভাবুক-না কেন, আপনি তো ভালো ক'রেই জানেন যে, অকারণ এ একেবারেই নয়। আপনার মধ্যে আমার এমন হারানো জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, যা থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠেছে। সেই জন্যে স্থির করেছি, এখানে আমার থাকবার মতো ছোট খাটো একটা বাড়ি ক'রে নোব। কাল বিকেলবেলা আমার এক বন্ধুর সাহায্যে একটা জমি প্রায় স্থির ক'রেও এসেছি। কলকাতায় তো আমার বাড়ি আছেই, এখানেও একটা হ'লে আর কোনও অসুবিধে থাকবে না। আপনাদের আরও পাঁচজন বন্ধুবান্ধব যেমন মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন, আমিও তেমনি এক-আধ ঘন্টার জন্যে আসব। আশা করি, তাতে এমন-কিছু আপত্তি হবে না মিসেস্ মুখার্জি ?"

নিরন্তর কাছে কাছে বাস করবার প্রিয়লালের এমন পাকা ব্যবস্থার সঙ্কল্প শুনে সন্ধ্যা চিন্তিত হ'য়ে উঠল। অনুনয়ের গভীরকণ্ঠে সে বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ডক্টর চৌধুরী ?"

"কী অনুরোধ, বলুন ?"

"যে জিনিস একেবারে চিরদিনের জন্যে শেষ হ'য়ে চুকে গেছে ব'লে আপনি জানেন, তার স্মৃতি দিয়ে নিজেকে এতটা পীড়ন করবেন না। আপনি সন্ধ্যাকে

ভুলতে চেষ্টা করুন, আর সে জন্যে আমার আকৃতি যদি বাধা মনে হয় তা হ'লে আমার নিকটেও আর আসবেন না। আমাকে দিয়ে আপনার এ কষ্টকর স্মৃতি এমন ক'রে জাগিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই। যে জীবন সমস্তই আপনার প'ড়ে রয়েছে, তা এমন ক'রে নষ্ট করবার জিনিস নয়।"

সন্ধ্যার এ কথাকে একান্তই অবান্তর এবং অসার বিবেচনা ক'রে শুধু সামান্য একটু হাস্যের দ্বারা প্রিয়লাল এর উত্তরের সমাপ্তি করলে, তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, "কিন্তু আপনি তো আসল কথা স্পষ্ট ক'রে এ পর্যন্ত বললেন না, মিসেস্ মুখার্জী?"

স্তব্ধ হ'য়ে সন্ধ্যা একমুহূর্ত নীরবে ব'সে রইল, তারপর মৃদু ব্যথিতকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই বললে, "দরকার না হ'লে যে কথাটা বলব না মনে করেছিলাম, এখন দেখচি না ব'লে উপায় নেই। কথাটা চিরদিনের মতো শেষ ক'রে নেওয়াই ভালো।"

"কী সে এমন কথা মিসেস্ মুখার্জি ?"

সহসা সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মতো আরক্ত হ'য়ে উঠল; চকিত বিহ্বলনেত্রে সে একবার প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দেখলে; তারপর কঠিন কশাঘাতে নিজের চিত্তকে উদ্দীপ্ত ক'রে নিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা আংটিটা খুলে প্রিয়লালের হাতে দিয়ে বললে, "এ আংটিটা আপনার মনে পড়ে ?"

আংটিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই প্রিয়লাল চমকে উঠল; মনে পড়তে এক মুহূর্তও বিলম্ব হলো না; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "এ আপনি কোথায় পেলেন ?"

"একদিন আপনার কাছেই পেয়েছিলাম।"

"আমার কাছে পেয়েছিলেন ?" তারপর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু নেত্রে সন্ধ্যার মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল চীৎকার ক'রে উঠল, "কীঃ!—তুমি সন্ধ্যা ?"

"আমি সন্ধ্যা।"

"কিন্তু আমি যে জানি সে বেঁচে নেই ?"

"না থাকলেই ভালো ছিল, কিন্তু এখনও বোধ হয় অনেক দুঃখ দিতে আর পেতে বাকি আছে, তাই সে হতভাগিনী আজও বেঁচে রয়েছে।"

উত্তেজনায় প্রিয়লালের দুই চক্ষু হ'তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হ'তে লাগল। দুই হাত দিয়ে সজোরে সন্ধ্যার একটা হাত চেপে ধ'রে বললে, "বাজে কথা বন্ধ করো! সত্যি ক'রে বলো তুমি সন্ধ্যা কি-না!"

"হ্যাঁ, সত্যিই আমি সন্ধ্যা।"

বার কয়েক সন্ধ্যার হাতটায় প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "তবে মিথ্যে কথা রটিয়ে আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছিলে কেন? কী আমি এত বড় অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে ?"

দুঃখার্ত নেত্রে প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি তো ও কথা রটাইনি। আপনার মুখেই আমি প্রথমে ও কথা শুনি।"

"তার আগে তুমি কিছু জানতে না ?"

"কিচ্ছু না।"

বাষ্পের অত্যধিক চাপে বয়লার যেমন ক'রে কাঁপে, বিস্ময় বেদনা দুঃখ আনন্দের যুক্ত তাড়নায় তেমনই ভাবে প্রিয়লালের সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। সহসা সন্ধ্যার হাত ছেড়ে দিয়ে সজোরে সে নিজের বুকখানা চেপে ধরলে, তারপর চেয়ারের হাতলে দুই বাহুর মধ্যে মাথা স্থাপিত ক'রে বহুক্ষণ প'ড়ে রইল। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের তাড়নায় মাঝে মাঝে পিঠখানা কেঁপে উঠছিল। অবশেষে অতি কষ্টে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে কতকটা সংযত ক'রে মুখ তুলে আর্তকণ্ঠে ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

আর্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি কি তোমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা করতে পারবে, সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "ক্ষমা করবার তো কিছুই আর নেই। যদিই বা কিছু ছিল, আপনার সঙ্গে এই পনেরো ষোলো দিনের পরিচয়ে তা একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।"

"তবে তুমি আজ রাত্রেই আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো।"

"কেন?"

"আমার লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা করব। মা তোমাকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পাবেন।"

এক মুহূর্ত সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, তা হয় না। তা কেমন ক'রে হবে? এঁকে ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

প্রিয়লালের মুখ মলিন হ'য়ে উঠল; বললে, "বুঝেছি। এ কথাটা আমার আগে মনে হয়নি। তুমি কি এখন তা হ'লে প্রমথর বিবাহিতা স্ত্রী?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"কোনও প্রচলিত পদ্ধতিতে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি?"

"না, তা হয়নি।"

উৎফুল্ল মুখে প্রিয়লাল বললে, "তবে আমার সঙ্গে যেতে তোমার বাধা কোথায় সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "বিয়ে না হ'লেই বাধা থাকতে নেই, এ আপনি কেমন ক'রে বলছেন?"

সন্ধ্যার এই সুদৃঢ় প্রশ্নে সহসা ধৈর্য্য হারিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "প্রমথর সঙ্গে তোমার যখন কোনও সামাজিক বন্ধনই নেই তখন তাকে ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বা কেমন ক'রে বলছ?"

সন্ধ্যা মনে মনে একটু ভেবে নিলে, তারপর শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে, "সামাজিক বন্ধন বলতে কী বোঝায় আমি তা ঠিক জানিনে, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার যে বন্ধন তা যে কোনও বন্ধনেরই চেয়ে কম দৃঢ় নয়, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। কী দুর্দিনে দুঃসময়ে উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আপনি হয় তো

তার সবটা জানেন না। সামান্য একটা সতেরো আঠারো বৎসরের মেয়ে—কিন্তু বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামীর কাছে দাসী হ'য়ে থাকবারও আশ্রয় পেলাম না। অগত্যা মুখুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে আবার জামসেদপুরেই ফিরে গেলাম। কিন্তু কী যে মিথ্যা সন্দেহ সবিতা দিদির মনের মধ্যে ঢুকল, সমস্ত বাড়িটা অশান্তিতে বিষিয়ে গেল। অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। আত্মহত্যা যে অবস্থায় আর পাপ থাকে না, সেই অবস্থা হলো আমার। ঠিক সেই সময়ে আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা অনুভব ক'রে স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে ইনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। সে কি সহজ আশ্রয় দেওয়া। আদরে যত্নে শ্রদ্ধায় সম্মানে এমন ক'রে তুললেন যেন নিজেই একটা আশ্রয় পেলেন, মুখে বলতেনও সেই রকম কথা। মানুষের ওপর অশ্রদ্ধা হ'য়ে আসছিল, এমন সময়ে মানুষ যে এত বড়ও হয় দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। তারপর এই দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যেও তাঁর সে ভাবের ব্যতিক্রম হয়নি। কী মর্যাদা যে আমাকে দিয়েছেন তা আপনাকে কী বলব। আজ আমি তাঁকে ছেড়ে যাই কেমন ক'রে? ন্যায় নেই? বিশ্বাস নেই? ধর্ম নেই?—আপনিই বলুন।"

কলহের লঘু কণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "ধর্মের কথা বলছ, কিন্তু ধর্ম তো আমারই দিকে। তোমার সঙ্গে যে একদিন আমার বিয়ে হয়েছিল, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "ভুলিনি, সে কথা পরে বলছি। আচার অনুষ্ঠান পালনের একটা ধর্ম আছে তা অস্বীকার করছিনে, কিন্তু আমি যে ধর্মের কথা বলছিলাম তা আরও অনেক বড়। সে ধর্ম মানুষের অন্তরের আদিম ধর্ম, যার প্রভাবে ক্রমশঃ মানুষের যা-কিছু আচার অনুষ্ঠান সমস্তই সৃষ্টি লাভ করেছে। তারপর বিয়ের কথা আপনি তুলেছেন, কিন্তু বিয়েকে তো আমরা একটা সত্যিকারের বন্ধন ব'লে মানিনে?"

"কেন মানিনে?"

"আমি তো সেই বন্ধনের দাবীতেই আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি তো আমার সে দাবী অগ্রাহ্য করেছিলেন।"

"অগ্রাহ্য করিনি, স্থগিত করেছিলাম।"

"দরকারের সময়ে স্থগিত করা মানেই অগ্রাহ্য করা নয় কি?"

যুক্তিতে সন্ধ্যার নিকট পরাজিত হ'য়ে প্রিয়লালের ক্রোধ গেল বেড়ে; যুক্তি-তর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে তীব্র কণ্ঠে সে বললে, "তুমি তো প্রমথর বিবাহিতা স্ত্রী নও, তবে মিসেস্ মুখার্জি সম্বোধনে সাড়া দাও কেন? এ পরিচয় কি তোমার মিথ্যা পরিচয় নয়?"

সন্ধ্যা বললে, "এ পরিচয় আমার যতটা মিথ্যা পরিচয় তার চেয়েও অনেক বেশি সত্যি। উনি আমাকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছেন যে, আমাকে মিসেস্ মুখার্জি ব'লে ডাকলে বিশেষ-কিছু অন্যায় করা হয় না। মিসেস্ মুখার্জীর ষোল আনা মর্যাদা উনি আমাকে দিয়েছেন।"

প্রিয়লাল ক্রোধে জ্বলে উঠল। বললে, "মর্যাদা, মর্যাদা তো তুমি তখন থেকে খুব করছ, কিন্তু প্রমথ তোমাকে কী মর্যাদা দিয়েছে জানো?—রক্ষিতার মর্যাদা সে তোমাকে দিয়েছে। তুমি প্রমথর রক্ষিতার একবিন্দু বেশি কিছু নও।"

শান্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "সত্যিই—তা নয় তো আর কী? কিন্তু তিনি এত উদার, এত মহৎ যে, আমি তাঁর রক্ষিতা শুনে একটুও অপমানিত বোধ করছিনে। তিনি আমাকে না রাখলে, কী দুর্গতি যে হতো তা কে জানে!"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল বললে "আমার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ তুমি যখন অস্বীকার করছ তখন তোমার মাথায় সিঁদুর কেন, হাতে লোহা কেন? এ সব পরিহাস কিসের জন্যে?"

সন্ধ্যা বললে, "এ সব বাঙলা দেশের মেয়েদের ভারি গোলমেলে কথা, এ আপনি বুঝতে পারবেন না। আমিও হয় তো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। এ সব আলোচনা না করাই ভালো।"

দুঃখে, নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে পীড়িত হ'য়ে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ যে-দিক থেকে পারলে সন্ধ্যার সহিত এই ভাবে বচসা করলে। তারপর কিছুকাল স্তব্ধ হ'য়ে নীরবে ব'সে রইল। অবশেষে মর্মন্তুদ দুঃখটা আর একবার প্রবল হ'য়ে উঠল। বললে, "তা হ'লে কি আমার কোনও আশাই নেই, সন্ধ্যা? আমার অনুরোধে প্রমথ যদি স্বেচ্ছায় তোমাকে ছেড়ে দেয়, তা হ'লে?"

সন্ধ্যা বললে, "এই যে এতক্ষণ এ সব আলোচনা হলো এ তো তাঁরই অনুরোধে। আপনার কাছে আমার যথার্থ পরিচয় দিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে তিনি রায়বেরিলী গেছেন।"

"তবে?"

"তবে—কী?"

"তবে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "দেখুন, তিনি যা ভালো বুঝেছেন তাই করেছেন ব'লে আমি যা ভালো বুঝব তা করব না, তা তো আর হয় না। তা ছাড়া, যে জিনিস একেবারে অন্যের হ'য়ে গিয়েছে তা আর আপনার কোন কাজে লাগবে বলুন?"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে প্রিয়লাল বললে, "বুঝেছি। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তুমি আমাকে আজ যে প্রচণ্ড আঘাত দিলে, সন্ধ্যা, আমি তা ক্ষমা ক'রে গেলাম এই মনে ক'রে যে, একদিন আমিও তোমাকে নিশ্চয় এমনই আঘাতই দিয়েছিলাম, সুতরাং তোমার প্রতিশোধ নেওয়ায় আমি আপত্তি করতে পারিনে!"

বেদনায় সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল; দুঃখার্ত কণ্ঠে বললে, "একেবারেই নয়, একেবারেই নয়! প্রতিশোধের কোনও কথা এর মধ্যে নেই। আপনি বিশ্বাস করুন, আলোচনার অনুরোধে যেটুকু বলতে বাধ্য হ'য়েছি, শুধু তাই বলেছি, তার বেশি কিছুই বলিনি। তবু নিজের বাড়ি ব'সে আপনাকে যে এই ব্যথা দিতে হলো

তার জন্যে আমার মনে দুঃখের শেষ নেই। 'আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার ওপর আমার মনে বিন্দুমাত্র রাগ, দুঃখ বা অভিমান নেই। আপনি শান্ত হোন, সুখী হোন, একান্ত মনে সেই প্রার্থনাই করি।"

"ধন্যবাদ।" ব'লে প্রিয়লাল উঠে দাঁড়াল; তারপর পুনরায় চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, "আজ রাত্রে এগারোটার গাড়িতে আমি এলাহাবাদ যাব। আমার যাওয়ার জন্যে যেটুকু ব্যবস্থার দরকার তা ক'রে দিয়ো।"

সন্ধ্যা বললে, "আজই তাড়াতাড়ি যাবার এমন কী দরকার আছে, সুবিধে মতো একদিন গেলেই হবে।"

প্রিয়লাল বললে, "না, আজ আমার কোনও অসুবিধে নেই।"

সন্ধ্যা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল।

প্রিয়লাল বললে, "আর একটা কথা সন্ধ্যা। এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজনও নেই, আমার পক্ষে রুচিকরও হবে না। প্রমথ এলে এ প্রসঙ্গটা আর একবার ওঠবার সম্ভাবনা আছে। সেটা যদি আর না ওঠে, আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হব।"

সন্ধ্যা বললে, "নিশ্চয়ই উঠবে না, আমি ওঁকে মানা ক'রে দোবো।"

প্রিয়লাল বললে, "এবার আমি আমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চললাম। তোমাকে এখনও তুমি আর সন্ধ্যা বলছি ব'লে অন্যায় করছি এমন যদি মনে কর, তা হ'লে যতক্ষণ তোমাদের বাড়িতে আছি, আবার তোমাকে মিসেস মুখার্জি ব'লে ডাকতে প্রস্তুত আছি।"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "না, আপনি আমাকে সন্ধ্যা ব'লেই ডাকবেন।"

আর কিছু না ব'লে প্রিয়লাল চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

বিয়াল্লিশ

অভিনয় হ'য়ে গেল শেষ।

বেচারা সন্ধ্যার উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেল তাতে যদি সে একটু নুয়ে প'ড়ে থাকে, সুধী পাঠক, তা'কে ক্ষমা কোরো। কল্পিত অভিনয় দেখে আমরা কেঁদে আকুল হই, আর এ তো সে করলে নিজের বাস্তব-জীবনের মধ্যে প্রধান ভূমিকার মর্মান্তিক অভিনয়। যে স্বামীকে পাবার জন্য একদিন সে উন্মাদিনী হয়েছিল, আজ তাকে হাতের মধ্যে পেয়েও নিজের হাতেই বিদায় করলে। এ কাজ যে কত-বড় কঠিন কাজ, তা জগতের সমস্ত স্বামী-সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীলোক অনুভব করবে।

স্বীকার করি, এ হয়তো সে করলে তার ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ বিচারশীল মনের দৃঢ়তায়—কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের যে আর-একটা অবুঝ দুর্বল মন আছে,

যার ধর্ম দুঃখে কষ্ট পাওয়া, আঘাতে অনুভব করা, সমবেদনায় বিহ্বল হওয়া তা-ও অস্বীকার করতে পারিনে। কর্তব্য আমরা করি, কিন্তু সময়ে সময়ে তার মূল্যও এমনই ক'রেই পরিশোধ করতে হয়। প্রমথর প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতার মহিমায় কাল হয়তো এ ব্যাপার লঘু হ'য়ে যাবে, কিন্তু আজ যে এর আঘাত প্রচণ্ড, তা কেমন ক'রে অস্বীকার করি!

রায়বেরিলী থেকে প্রমথ যখন প্রত্যাবর্তন করলে তখনও প্রিয়লাল তার নিজের ঘরে, আর সন্ধ্যা বাদামগাছ তলায়। মাত্র দুটি লোক তো দু'দিকে স্তব্ধ হ'য়ে আছে, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃশব্দতার চাপে থম্‌থম্ করছে। হরিয়ার কাছে প্রমথ অবগত হলো, প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রিয়লাল দ্বার বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। সন্ধ্যাও অনেকক্ষণ বাদামগাছ তলায় একাকী ব'সে আছে—এ কথাও হরিয়া বললে। শুনে প্রমথ এই অনুমানই করলে যে, সন্ধ্যা এবং প্রিয়লালের মধ্যে অনতি-পূর্বে একটা বোঝাপড়া হয়েছে, কিন্তু তার পরিণতি সন্ধি এবং মিলনের অনুকূল হ'তে পারেনি। চিত্তের ভিতর স্বার্থপরতার গোপন মহলে কয়েকটা দীপ প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠল।

প্রিয়লালকে বিরক্ত করতে প্রমথ সাহস করলে না, সন্ধ্যার উদ্দেশ্যে বাদামগাছ তলার দিকে খানিকটা অগ্রসর হ'তেই দেখলে সন্ধ্যা আসছে। মোটরের শব্দ পেয়ে প্রমথ এসেছে বুঝতে পেরে সে আসছিল।

সন্ধ্যা নিকটে আসতে প্রমথ বললে, "চল, ওখানে গিয়েই বসি।"

সন্ধ্যা বললে, "চল।"

দু'জনে গিয়ে বাদামগাছ তলায় দুটো চেয়ারে উপবেশন করলে।

কথাটা অনেকখানিই বোঝা গিয়েছিল, তথাপি প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয়লালকে তোমার পরিচয় দিয়েছিলে, উষা?"

"দিয়েছিলাম।"

"কী বললে সে?"

"উনি আজ রাত্রে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন।"

"তুমি কি তাহ'লে প্রিয়লালকে গ্রহণ করলে না?"

"না!"

"প্রিয়লাল কী বললে?"

"সে অনেক কথা, আর একদিন বলব অখন।"

এক নিমেষেই প্রমথ সন্ধ্যার অন্তরের সমস্ত বেদনাটা অনুভব করলে। বললে, "তাই বোলো।" মনের মধ্যে নিজের দিক দিয়ে যে তীব্র আনন্দটা জেগে উঠল, আপাতত তা প্রিয়লালের প্রতি দুঃখ এবং সমবেদনার মধ্যে বাসা বাঁধলে।

দু'জনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে রইল। সতেরো আঠারো দিন পূর্বে আর একদিন তারা ভারতী আশ্রম থেকে ফিরে ঠিক এমনই ক'রেই ব'সেছিল।

সেদিন যেন ছিল তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান, আজ যেন সেই বিবাহের কুশণ্ডিকা। কিন্তু কী করুণ, কী মর্মভেদী।

মাধব এসে বললে, "মা, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

প্রমথর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "খাবে চল।"

যেতে যেতে সন্ধ্যা বললে, "দেখ, এ প্রসঙ্গ আর ওঁর কাছে একেবারে তুলো না। উনি নিজেই এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন।"

শুনে প্রমথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে। অনির্বচনীয় বেদনার বস্তুকে কী বচন দিয়ে প্রকাশ করবে, মনে মনে তা ভেবে তার মতো বাক্‌পটু ব্যক্তিও শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল। বললে, "না, তুলব না।"

প্রিয়লালের ঘরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে প্রমথ ডাকলে, "প্রিয়লাল, খাবার দিয়েছে, খাবে এস।"

টেবিলে প্রমথ এবং প্রিয়লালের খাবার দিয়েছিল, গভীর বৈরাগ্যের স্তব্ধতার সহিত প্রিয়লাল আহারে উপবেশন করলে। সে বিষয়ে কোনও প্রকার আপত্তি অথবা বাদানুবাদ করবার মতো চিত্তের যথেষ্ট সচেতনতা তার ছিল না। অখণ্ড মৌনের মধ্য দিয়ে অবিলম্বে আহার সমাপ্ত হলো। আন্তরিক আগ্রহ এবং যত্নের সহিত অল্প কথার অনুরোধে-উপরোধে সন্ধ্যা যতটা পারলে প্রিয়লালকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কী যে সে খেলে, আর কী যে খেলে না তা কিছুই বোঝা গেল না—আহার-সামগ্রী নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খানিকটা নাড়াচাড়া ক'রে উঠে পড়ল।

তার পর বারান্দায় এসে তিনজনে তিনটে চেয়ারে উপবেশন করলে। তখনও তাদের মধ্যে কথাবার্তা কিছুই হলো না। যে বেদনা যে অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে বাক্যের অতীত, তা তিনজনেরই মনের মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে আটকে রইল। এইরূপ নিঃশব্দতার মধ্যে বহুক্ষণ কেটে গেল।

যথাকালে মোটর এসে বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াল। কিছু পূর্বে বসন্ত চৌবে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে প্রিয়লালের জিনিস-পত্র নিয়ে স্টেশনে গিয়েছে। বারান্দা থেকে নেমে তিনজনে মোটরের নিকট উপস্থিত হলো।

মোটরের দরজা খুলে প্রমথ বললে, "ওঠ, প্রিয়লাল।" প্রিয়লাল উঠে বসলে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি ওঠ।" তারপর নিজে সন্ধ্যার পাশে উঠে বসল। তিনজনে পাশাপাশি ব'সে অনড় অবিচল নীরবতার মধ্য দিয়ে সমস্ত পথটা অতিক্রম ক'রে স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল।

এ ট্রেনটা লক্ষ্ণৌ থেকেই ছাড়ে। একটা ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে প্রিয়লালের জিনিস-পত্র তুলে দিয়ে বসন্ত চৌবে নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল। এলাহাবাদের একটা টিকিট কিনে আনবার জন্য প্রিয়লাল তাকে অর্থ প্রদান করল্বে।

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে গাড়িতে উঠে প্রিয়লাল দরজার সামনে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি তার সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু কী যে দেখচে তা বোঝা যায় না। নিচে প্ল্যাট্‌ফর্মে সন্ধ্যা এবং প্রমথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

গার্ড হুইস্‌ল্‌ দিলে, সবুজ বাতি দেখালে ; ড্রাইভার হুইস্‌ল্‌ দিলে, গাড়ি ন'ড়ে উঠল। তখনও প্রিয়লাল সেই ভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

নিকটে এসে প্রমথ প্রিয়লালের দিকে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে বললে, "যখনই ইচ্ছে হবে, আমাদের কাছে এসো, প্রিয়লাল।"

প্রিয়লাল কিছু বললে না, শুধু প্রমথর হাতখানা ধ'রে ধীরে ধীরে বার দুই নাড়া দিলে। তারপর ঠিক তেমনি ভাবেই সমানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবারও সন্ধ্যা অথবা প্রমথর দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে না।

যতক্ষণ দেখা গেল, সন্ধ্যা এবং প্রমথ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ; তারপর অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনখানা অদৃশ্য হ'য়ে গেলে প্রমথ বললে, "চল উষা, এবার ফেরা যাক।"

প্ল্যাট্‌ফর্ম দিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে প্রমথ হঠাৎ দেখতে পেলে সন্ধ্যার দুটি চক্ষু চক্‌চকিয়ে উঠেছে। মুখে কিছু বললে না, কিন্তু অন্তরের সুগভীর সমবেদনায় একটা দীর্ঘশ্বাস বায়ুতে মিশে গেল।

বৈতানিক

বেল-কুঁড়ি

আষাঢ় মাস। ছুটির দিন। সকাল হইতে আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল, অপরাহ্লে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বর্ষণ-সিক্ত তরু-লতা মেঘান্তরিত সূর্যকিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সমরেন্দ্রনাথের গৃহে নিয়মিত বৈঠক বসিয়াছে। ছুটির দিন বলিয়া, এবং সমস্ত দিন নিরবসর বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ আকাশ নির্মুক্ত হইয়া সকলের মনে একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাস উপস্থিত হওয়ায় বেলা চারটা হইতেই বৈঠকীরা আসিয়া জুটিয়াছে।

দুইখানা বড় তক্তপোশ পাশাপাশি স্থাপিত—তাহার উপর পরিচ্ছন্ন ফরাস পাতা। চতুর্দিকে সাত আটখানা চেয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একদিকে টানা-সূতার কাজকরা শুভ্র আস্তরণ আবৃত একটা বেতের গোল টেবিলের উপর কাঠের চার-কোণা বারকোশ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পেয়ালা পেয়ালা চা এবং বর্ষাদিনভোজ্য নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য আসিয়া পড়িতেছে—কাড়াকাড়ি করিয়া সকলে লুটিয়া খাইতেছে।

ফরাসের উপর একটা কালো রঙের বক্স হারমোনিয়ম খোলা পড়িয়া আছে; এক ব্যক্তি—এ বৈঠকের ইনি নিয়মিত গায়ক—খাদ্য এবং পেয়র প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখিয়া অবসর মতো হার্মোনিয়মের একটা চাবি টিপিয়া সুর জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পেয়ালা-পাত্রের টুং টাং ধ্বনি, কথাবার্তার কলরব, হাস্য-পরিহাসের কলোচ্ছ্বাস হার্মোনিয়মের এই একটানা সুরের স্রোতে পড়িয়া ক্রমশঃ যেন বাধ্য হইয়া বাঁধিয়া আসিতেছে।

এমন সময়ে ফণীন্দ্র বলিল, "আজ আর গান নয়, আজ কেউ মজার গল্প বল। গরম চা আর ফুলুরীর সঙ্গে মুখরোচক হবে।"

ইহার উত্তর দিল একটি তরুণ যুবক, নাম মলয়। সরকারি তোষাখানার ইনি একজন উচ্চ কর্মচারী, চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সাহিত্যের মৃদু মন্দাকিনী প্রবাহিত, ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা হিসাবের উত্তাপে এ পর্যন্ত যাহা বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ করে নাই। মলয় বলিল, "গল্পই যদি বলতে হয় তা হ'লে এমন ভাবঘন বর্ষার দিনে মজার গল্প কিছুতেই খাপ খাবে না। তার চেয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবনের গভীরতম অনুভূতির ঘটনা খুলে বলা যাক। এমন হওয়া চাই যা একটা ছোট গল্পের বনেদ হতে পারে।"

ভূপতি নড়িয়া চড়িয়া ভালো করিয়া বসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, এ ব্যবস্থায় বর্ষার সন্ধ্যাটা জমবে ভালো।" এ ব্যবস্থায় ইহার একটু বিশেষ স্বার্থ এই ছিল যে, ইনি একজন মাসিক পত্রের কথা-সাহিত্যিক, যদি কোনও গল্প হইতে প্লটের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তদ্দারা কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন।

এবার কথা কহিল সমরেন্দ্র। বৈষ্ণবতার উদার প্রবাহের সহিত নিজ জীবন-ধারা মিলিত করিয়া ইনি দিনাতিপাত করিতেছেন; নিখিল মানবচিত্ত একীভূত করিবার শক্তি একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম এবং তদন্তর্গত সঙ্কীর্তনের আছে বলিয়া ইনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন।

সমর বলিল, "যে জিনিসটা ধ্রুব জমত সেটা ছেড়ে দিয়ে শেষকালে বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটি না হয়। কীর্তনের চেয়ে বেশি জমে এমন জিনিস কম জানা আছে।"

"অবশ্য, পরনিন্দা ছাড়া।" বলিয়া হর্মোনিয়মটা একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ভূপেন ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া বসিল। গান গাহিয়া এবং শুনাইয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে ছিল তাহাতে বাধা পড়ায় সে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ভূপেনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান মন্তব্যে সকলে হাসিয়া উঠিল।

বৈঠকীদের মধ্যে একজন ছিল যাহার নাম হরিপ্রকাশ। সরকারি কৃষি বিভাগে সে বড় কর্ম করে। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাহাকে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল, সম্প্রতি অসুস্থতা হেতু দীর্ঘ অবসর লইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। সে কহিল—"প্রথম পালা যদি আমাকে দেন, তা হ'লে আমি যখন সাউথ ক্যারোলিনার চার্লস্টন্ সহরে ছিলাম—

প্রস্তাবটা শেষ হইবার অবসর পাইল না। একটা ইজিচেয়ারের অদৃশ্য ক্রোড় হইতে সহসা উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া দৃপ্ত স্বরে যতীন্দ্র বলিল, "সে আবার কোথায় ?"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে যতীন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হরিপ্রকাশ বলিল, "কেন, ইউনাইটেড স্টেটস্ অফ আমেরিকায়।"

"তা হ'লে চল্‌বে না।" বলিয়া যতীন্দ্রমোহন পুনরায় ইজিচেয়ারের গর্ভে মিলাইয়া গেল।

হরিপ্রকাশ প্রবলভাবে ঋজু হইয়া উঠিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উষ্ণ স্বরে বলিল, "কেন চলবে না, শুনি ? আমেরিকায় কি গভীর অনুভূতির কোনও ঘটনা ঘটতে পারে না ?"

যতীন্দ্র বলিল, "না, না, মশায়, আপনি যে কথায় কথায় আমেরিকার কথা ব'লে আমাদের কাবু ক'রে রাখবেন, তা কিছুতেই চলবে না। দেশের কোনও কথা যদি জানা থাকে তো বলুন যে হ্যাঁ বুঝতে পারি। তা নয়, প্রতি কথায় সাগর পারে লাফ দিলে চলবে কেন ?"

কথাটার কি উত্তর দেবে হরিপ্রকাশ বোধ হয় তাই মনে মনে ভাঁজিতেছিল, ইত্যবসরে ভূপতি উত্তর দিল। বলিল, "ক্রম-বিকাশের ফলে যতীনবাবুর একটা দিক কী রকম দুর্বল হ'য়ে গেছে দেখুন। ওঁর বোধশক্তি পর্যন্ত সাগর লঙ্ঘন করতে অনিচ্ছুক, অথচ ত্রেতাযুগে সশরীরে যখন—

যতীন্দ্র পুনরায় স্প্রিংএর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "অ্যানথ্রপলজি কোনো কর্মে আজ চালাতে পারবেন না, তা বলছি! ক্যাটলগের দু-চার পাতা উল্টে পাল্টে আপনি যে ছলে-ছুতোয় সুবিধা পেলেই অ্যানথ্রপলজির বিদ্যে ঝাড়বেন তা হবে না। তা ছাড়া রসিকতা জিনিসটা যত সহজ ব'লে আপনি মনে করেন, সত্যি সত্যিই তত সহজ নয় ভূপতিবাবু। রসিকতার প্রাণ হচ্চে নূতনত্ব। দোহাই আপনার, ত্রেতাযুগের পচা পরিহাস ক'রে কলিযুগের প্রাণান্ত করবেন না!"

"তা হ'লে পরিহাস পরিত্যাগ ক'রে প্রমাণেরই একটা কথা বলি। ক্রম-বিকাশের গুণে বনমানুষ যে ক্রমশঃ মানুষ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ বনমানুষ এখন ক্রমে ক্রমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিসই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—যায় ইজিচেয়ার পর্যন্ত।" বলিয়া ভূপতি মৃদুভাবে হাস্য করিল এবং তাহার সহিত অপর সকলে অপরিমিত হাসিতে লাগিল।

এক পক্ষে যতীন্দ্র এবং অপর পক্ষে পৃথক ভাবে ভূপতি এবং হরিপ্রকাশের মধ্যে যে মানসিক বৃত্তি বর্তমান ছিল ভূপেন তাহার আখ্যা দিয়াছিল অহি-নকুলের সম্পর্ক। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা রণ-প্রবণতা ছিল যে দেখা হইবামাত্র ইহারা মনে মনে তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিত এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রথম সুযোগ পাইলে দ্বিতীয় সুযোগের জন্য কেহ অপেক্ষা করিত না।

অদূরে একটা চেয়ারে নরেশ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; এতক্ষণে সে কথা কহিল; বলিল, "আমি একটা গল্প বলতে পারি যার মধ্যে খুব গভীর কোনও অনুভূতির সন্ধান না পেলেও সামান্য একটু পেতে পার। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ঝগড়াই করবে, না গল্প শুনবে?"

চতুর্দিকে সমবেত ধ্বনি উঠিল—"গল্প শুনব, গল্প শুনব নরেশদা!" দলের মধ্যে নরেশ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সকলে তাহার সহিত জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মতো ব্যবহার করিত।

একজন বলিল, "শিকারের গল্প না-কি নরেশদা?"

নরেশ একজন সুদক্ষ শিকারী—বাঘ ভালুকের মুণ্ড এবং হরিণের চামড়া নির্বিরোধে তাহার বৃহৎ বৈঠকখানার চারটি দেওয়াল এবং কক্ষতল সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া আছে। সে বলিল, "শিকারই একরকম বটে—তবে বনের নয়, মনের।"

কথাটা যে জমাটি, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। "বলুন, বলুন, নরেশদা।" বলিয়া সকলে অশ্রুত কাহিনীর কৌতূহলের প্রত্যাশায় নিবিষ্ট হইয়া বসিল। নরেশ বলিতে আরম্ভ করিল।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন আমরা দেওঘরে থাকি, সবে মাত্র এম্-এ পাশ ক'রে ডেপুটিগিরির জন্যে চেষ্টা করছি। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখের

শেষ। দিনের বেলা ঘরের দোরজানালা বন্ধ ক'রে বন্দী হ'য়ে, আর রাত্রে খোলা মাঠে তাপক্লান্ত অবশ দেহকে মেলে দিয়ে কোনও রকমে দিনাতিপাত করছি—এমন সময় সরকারী চিঠি এল যে, নির্দিষ্ট দিনে মজঃফরপুরে ত্রিহুতের কমিশনার বাহাদুরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে চেহারা আর চাল দেখিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ ডেপুটিগিরির চক্করে জফি ম্যাজিস্ট্রেটের তাড়নায় কতটা দৌড় দিতে সক্ষম হব কমিশনার সাহেব তার একটা আন্দাজ নেবেন। সেই সরকারী চিঠির সঙ্গেই আর একটি বে-সরকারী চিঠি এল কমিশনারের পার্সনাল্ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পরিতোষ মৈত্রের। ইনি বাবার একজন পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু, সরকারী চিঠিখানি রওনা ক'রেই একখানি চিঠি দিয়েছেন যাতে আমি নির্দিষ্ট দিনের কয়েক দিন পূর্বেই, অর্থাৎ অবিলম্বে, মজঃফরপুরে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে একটু দলন-মলন গ্রহণ করি, আর চাল-চলন শিখি। বাবার মুখে শুনলাম তাঁর বন্ধুটি একজন নামজাদা সহিস, স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাঁকে বাহাদুর ব'লে স্বীকার করেছেন। মুখবন্ধেই গল্পটি জমিয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের গর্ভ হইতে উঁচু হইয়া উঠিয়া হরিপ্রকাশের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেমন ? জমছে না মজঃফর-পুরের গল্প ? অনুভূতির আমেজ পাওয়া যাচ্ছে না ? এমন মধুর দেওঘর মজঃফরপুর ছেড়ে কোথায় হার্মস্টন, না কার্মস্টন !—"

তীব্রকণ্ঠে ভূপতি বলিয়া উঠিল, "No interruption please !"

"Silence !" বলিয়া চিৎকার করিয়া যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

হাসির একটা উচ্চ কলরোল উঠিল। নরেশ পুনরায় বলিতে লাগিল।

বাবা বললেন, দেরি না ক'রে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে একেবারেই ইচ্ছা হ'ল না। মনে পড়ল সেই রস-ঘন অমৃতময় বাণী :—

> অসহ্যবাতোদ্গতরেণুমণ্ডলা
> প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।
> ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ
> প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥

প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধ প্রবাসী যে সূর্যাতপতাপিতা মহীর দিকে তাকাতে পারে না আমাকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। বুঝলাম শ্বশুরের আহ্বানের চেয়েও কমিশনারের আহ্বান প্রবল। কিন্তু পঞ্জিকার প্রসাদে একদিন যাত্রা পেছিয়ে গেল, পরদিন পিঠে যোগিনী বেঁধে পকেটে ফুল বেলপাতা পুরে মাহেন্দ্রক্ষণে বেরিয়ে পড়লাম।

শুভক্ষণের অনুরোধে বেরোতে হলো সকাল বেলার গাড়িতে। জশিডি পর্যন্ত একরকম কাটল মন্দ না, কিন্তু তারপর রৌদ্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ এমন বাড়তে লাগল যে, মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীতে কে যেন আগুন লাগিয়ে

দিয়েছে। বেলা দুটো আন্দাজ যখন গাড়ি মোকামা ঘাটে পৌঁছল তখন সত্যই প্রচণ্ডসূর্যাতপতাপিতা মহী।

সুট্‌কেস্ আর হোল্ডলটা একটা কুলির মাথায় তুলে দিয়ে ষ্টিমারে এসে আশ্রয় নিলাম। শুনলাম একটা পূর্বগামী গাড়ি এলে তার প্যাসেঞ্জার নিয়ে তবে ষ্টিমার ছাড়বে, তার এখনও প্রায় দু' ঘণ্টা দেরি। যে দুঃখ থেকে অব্যাহতির কোনও উপায় নেই সে দুঃখ যতটা সম্ভব নির্বিকারচিত্তে বহন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাদা রঙে ইন্টার-মিডিয়েট্ ক্লাস লেখা একটি বেঞ্চের সামনে আমার আসবাব রেখে কুলি বললে বেঞ্চে অবিলম্বে একটি স্থান অধিকার না করলে সারা পথ দাঁড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। হিতবাক্য অবহেলা না ক'রে বেঞ্চের এক প্রান্তে স্থানাধিকার ক'রে বসলাম।

ইচ্ছে হচ্ছিল একটু ঘুরে ফিরে জাহাজের কল-কব্জা লোক-লস্কর দেখে আসি। কিন্তু সাহস হলো না। ফিরে এসে যদি দেখি পরিত্যক্ত স্থানটি অধিকৃত অথবা সুট্‌কেসটি অদৃশ্য হয়েছে তাহ'লে ক্ষোভের অন্ত থাকবে না। অগত্যা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকেই সম্মুখে যা দেখতে শুনতে পাওয়া যায় তাই দেখে শুনেই মনকে যথাসম্ভব উল্লসিত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সময়ের পায়ে কে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছিল, সে যেন কিছুতেই চলতে চায় না। দু' ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে মনে হচ্চে, এমন সময়ে আপার ডেক্ থেকে সিঁড়ি বেয়ে বিলিতি সুট্ পরা একজন বাঙালী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নেমে আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মশায়, ফর্টি-টু ডাউন কখন এখানে ডিউ বলতে পারেন?"

মাথা নেড়ে বললাম, "আমি প্যাসেঞ্জার, গাড়ির নম্বর আর টাইম মুখস্ত নেই তো ;—সুট্‌কেস থেকে টাইম-টেব্‌ল বার ক'রে বলতে পারি।"

"তার আর সময় হবে না।" ব'লে দ্রুতবেগে তিনি কাঠের পুল দিয়ে প্লাটফর্মের দিকে ধাবিত হলেন। গৌর বর্ণ, স্থূল দেহ, মাথার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে টাক—দেখলেই মনে হয় দেহে বহু ব্যাধি এবং ব্যাঙ্কে বহু অর্থ আশ্রয় পেয়েছে।

মিনিট পাঁচেক পরেই ফর্টি-টু ডাউন এসে উপস্থিত হলো, এবং তার থেকে যাত্রীর দল নেমে পিঁপড়ের সারের মতো পুল দিয়ে ষ্টিমারে এসে উঠতে লাগল। ভিড় যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন চোখে পড়ল সেই সুট্-পরা ভদ্র লোকটি আসছেন, পিছনে একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের তরুণী, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, গৌরবর্ণ মুখখানি রোদ খেয়ে বেদানার রঙ ধারণ ক'রেচে, তার মধ্যে নীলচে আভার চোখ দুটি অপরিসীম বিহ্বলতায় চঞ্চল।

ইজি-চেয়ারের গর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া যতীন্দ্রমোহন বলিল, "খাসা জিনিস! ব'লে যান নরেশদা, ব'লে যান।" শুইয়া পড়িবার সময়ে হরিপ্রকাশের দিকে একটা বক্র তীব্র দৃষ্টি ফেলিয়া অর্ধোচ্চস্বরে বলিল, "ফার্মস্টন"!

সুন্দরী তরুণীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, রসভঙ্গের ভয়ে যতীন্দ্রমোহনের কথায় কেহও সাড়া দিল না। নরেশ সহাস্য মুখে বলিতে লাগিল—

শ্রেয় এবং হেয়র প্রভেদ আমি করিনে, এ অপবাদ আমার পরম শত্রুও দেবে না। সুতরাং অবিলম্বে আমার কৌতূহল প্রৌঢ় অভিভাবকটিকে পরিত্যাগ ক'রে তরুণীর উপর ষোল আনা পড়েছিল। তার প্রমাণ পেলাম যখন তারা আমার পাশ দিয়ে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছে তখন দুজনেরই মুখের মধ্যে। একজনের মুখ ক্রোধে লাল, অপরেরজনের লজ্জায় রক্তিম।

মনে মনে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সম্বোধন ক'রে বললাম, আপনি অবশ্য চটছেন, কিন্তু কী করা যায় বলুন। আপনার সঙ্গিনীটি যদি কৃষ্ণবর্ণা স্থূলদেহা হ'তেন তা হ'লে তো কোনো গোলই ছিল না। অমন একটি উপাদেয় বস্তু নিয়ে আপনি অবলীলাক্রমে পথে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়াবেন আর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে চলবে, পৃথিবীকে এত নিরাপদ স্থান মনে করবেন না।

জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর একবার ইচ্ছে হলো আপার ডেকটা একটু ঘুরে আসি। কিন্তু প্রৌঢ় ব্যক্তিটির রোষ উদ্রিক্ত করবার ভয়ে বিরত হলাম। সামান্য অর্থ বাঁচাবার লোভে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনি নি, সেই অনুশোচনায় মন কাতর হ'য়ে উঠল। যা হোক ভবিষ্যতের গর্ভে সৌভাগ্য হয়তো একটু বেশি মাত্রায় নিহিত আছে সেই সান্ত্বনায় মনকে প্রবোধ দিয়ে বেঞ্চের ওপরেই ব'সে রইলাম।

সেমারিয়া ঘাটে ষ্টিমার লাগতেই মাল-সংগ্রহোৎসুক কুলির দল লাফালাফি ক'রে ষ্টিমারে এসে ঢুকল। আমার মাল দুটি একজন কুলির মাথায় তুলে দিয়ে দাঁড়াতেই দেখি ফুলটিকে পিছনে রেখে কাঁটা হ'য়ে ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসচেন—চোখের দৃষ্টি আমার উপর পড়তে গোলাপের কাঁটারই মতো তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল।

নিম্নকণ্ঠে আমার কুলিকে অপেক্ষা করতে বললাম—ভিড় একটু কমুক, তারপর যাওয়া যাবে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ভদ্রলোকটি বক্রকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন—দৃষ্টি কঠোর, উৎসাহজনক তার মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু পুরস্কৃত হ'লাম পরমুহূর্তেই,—মেয়েটি হঠাৎ চেয়ে দেখলে, হয়তো অতর্কিতভাবেই, চোখে চোখে মিলিত হওয়ার পর কিন্তু অতি সুস্পষ্ট ভাবেই গোলাপী মুখখানির উপর একটা রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল—মনে হ'লো তার মধ্যে নিষেধের রক্ত-পতাকা নেই।

মনে হ'ল ভীড় কমেছে। কুলিকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে মেয়েটির পিছনে পিছনে চললাম।

ছেলেবেলা থেকে 'লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ' কথাটা মেনে চলি। ষোল আনা

পেলাম না ব'লে আট আনাকে কখনও উপেক্ষা করিনে। বাঘ না পেলে হরিণ শিকার করি, হরিণ না পেলে পাখী। যে ফুলকে সমুখ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হ'লো না, পিছন দিক থেকে তাকে দেখতে পেলে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিহীনতা বলেই মনে করি। তা ছাড়া, কোন সুন্দরী তরুণীকে অনুসরণ করবার সৌভাগ্য তোমাদের কারও যদি কখনও হ'য়ে থাকে তা হ'লে মনে মনে নিশ্চয় স্বীকার করছ যে, তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গি, আলগা-বাঁধা খোঁপার অপরূপ জটিলতা, সুগঠিত কাঁধ দুটির সুমধুর বক্রতা—কোন কিছুই অবহেলার বস্তু নয়।

একটা যুক্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—"নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়!"

নরেশ বলিল, "বেশ কথা। তা হ'লে আর একটা কথাও পরিষ্কার ক'রে নিই। সুন্দর জিনিসের প্রতি আমাদের চোখ যে আকৃষ্ট হয় সেটা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্মে। সুন্দরী তরুণী যে সুন্দর জিনিস তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং এই মেয়েটির প্রতি আমি এ পর্যন্ত যা মনোযোগ দেখিয়েছি, যে রুক্ষ নীতিশাস্ত্রের মতে তা অসদাচরণ, তাকে কোথায় নিক্ষেপ করা উচিত বল দেখি?"

ভূপেন বলিল, "ভাগীরথী গর্ভে।"

নরেশ বলিল, ঠিক কথা। সে হিসেবে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকেও ভাগীরথী গর্ভে ঠেলে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা না ক'রে স্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে এসে উপস্থিত হলাম। এর মধ্যে ভদ্রলোকটি চার পাঁচ বার ফিরে ফিরে আমাকে দেখেছেন—এবং তার সঙ্গিনীর সহিত আমার সান্নিধ্য লক্ষ্য ক'রে প্রতিবারই আমার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করেছেন।

গাড়ি প্লাট্‌ফর্মে লেগে ছিল এবং সম্মুখেই ছিল ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলি। ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে একটা সেকেণ্ড ক্লাস্ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে নিজে উঠে বসলেন। আমি মনে মনে হেসে বললাম—অত ব্যস্ত কেন হে বাপু! আমি তোমার সঙ্গিনীটিকে হরণ করব না। সে কালও নেই, সে পাত্রও নই।

একখানা কামরার পরেই ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাস ছিল, তাইতে উঠে বসলাম। অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার আগমনী সূচনায় শান্ত হ'য়ে এসেছিল। নদী-তটে, নদী-বক্ষে, আকাশে সন্ধ্যার মায়া ছড়িয়ে পড়েছে। মনটাকে সেই ধূসর স্নিগ্ধতার মধ্যে স্নান করিয়ে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে অবস্থিতা অপরিচিতা সহযাত্রিণীকে মনে মনে সম্বোধন ক'রে বললাম, 'হে মুগ্ধকারিণী, আবার কখনও তোমার দেখা পাব কি না জানি নে। রাত্রির ঘন তিমিরান্তরালে কে কোন দিকের পথে কখন নেবে যাবে তা কেউ জানে না। কিন্তু এ কথা জানি, আমার উৎসুক চিত্তপটে তুমি তোমার

অতল নীল চোখ দুটি স্থাপিত ক'রে যে তারকা রচিত করেছ তা কখন অপসৃত হবে না। তোমার নিরতিসাবধানী অভিভাবক যাই ভাবুন, আমি মনে-মনেও তোমার প্রতি কোন অশিষ্ট আচরণ করি নি—তোমার অপরূপ লাবণ্যের প্রতি অমনোযোগী না হ'য়ে তাকে তার যথার্থ মর্যাদায় স্বীকার করেছি। আমার নীরস কষ্টকর যাত্রা-পথে মাধুর্যের স্বপ্ন-জাল বিস্তার ক'রে তাকে যে মনোরম ক'রে তুলেছিলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

মনটা কিসের বেদনায় ভারাতুর হ'য়ে উঠল। আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি ছাড়লে জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইলাম। তখন সামনের বেঞ্চে ব'সে দুটি বেহারী ভদ্রলোকের মধ্যে প্রবল ভাবে আলোচনা চলছিল যে, ইয়োরোপ কর্তৃক আবিষ্কৃত যত আশ্চর্য বস্তুই বল না কেন—তা সে গ্রামোফোনই বল আর ফটোগ্রাফীই বল—অপূর্ব কিছুই নয়, সবই একদিন আমাদের মধ্যে ছিল। প্রমাণস্বরূপ নব-উদ্ভাবিত এরোপ্লেনের সঙ্গে পুষ্পকরথের অভিন্নতা দেখানো হচ্ছিল। ভদ্রলোক দুটির আমার প্রতি ঘন ঘন ঔৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ দেখে ভয় হলো যে, হয়তো তাঁদের আলোচনায় যোগ দিতে আমাকেও সহসা আহ্বান করবেন। মুখখানা গাড়ীর বাইরে ঝুঁকিয়ে দিলাম।

রাত্রি আটটার সময়ে গাড়ি বারুণী জংসনে পৌছিল। বেহারী ভদ্রলোক দুটি নেমে গেলেন। তার খানিকক্ষণ পরে দেখি সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তাড়াতাড়ি গার্ডের গাড়ির দিকে চলেছেন। মনের মধ্যে কোথায় কোন্ কোণে ঔৎসুক্য কেমন ক'রে লুকিয়েছিল জানিনে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ির দিকে চাইলাম। মনে হ'লো যে-কামরায় মেয়েটির থাকবার কথা তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিঙ্গী উত্তেজিত ভাবে কী বলছে। তাড়াতাড়ি নেবে প'ড়ে সেকেণ্ড ক্লাস কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম অতিশয় উত্তেজিত অবস্থায় মেয়েটি অপর দিকের বেঞ্চে গিয়ে ব'সে রয়েচে—গোলাপ ফুলের মতো মুখখানা অশোক ফুলের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠে এসে মেয়েটি বললে, "দেখুন, এ লোকটা আমার সঙ্গে ভারী অভদ্র ব্যবহার করেচে।"

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করেচে ?"

"আমি যত বলি আমার কাছে টিকিট নেই, বাবার কাছে আছে, ও কিছুতেই শুনবে না—দেখাও! দেখাও! অবশেষে হঠাৎ খপ্ ক'রে—এই পর্যন্ত ব'লে মেয়েটির কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেল।

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, "খপ্ ক'রে কী করলে ? বলুন!"

আরক্ত মুখে মেয়েটি বললে, "খপ্ ক'রে আমার গালে হাত ঘ'সে দিলে!"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠল। চেয়ে দেখি লোকটা এক পা এক পা ক'রে স'রে পড়বার মতলব করছে। ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার বাঁ কাঁধের উপর কোটটা শক্ত ক'রে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে বললাম,

"কাপুরুষের মতো পালাচ্ছ কোথায়, ডেভিল্! আগে হাত জোড় ক'রে মেয়েটির কাছে মাপ চাও—তারপর তোমার নিষ্কৃতি।"

আমার আক্রমণ এবং আস্ফালন দেখে লোকটা ভয়ে যতটা না হোক বিস্ময়ে প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে গেল—তারপর সামলে নিয়ে আমাকে আক্রমণের জন্যে ঘুঁসি তুললে। আমি ক্ষিপ্রবেগে দুহাতে তার দুই মণিবন্ধ সজোরে চেপে ধ'রে একটু মোচড় দিয়ে বললাম, "আর একটু মোচড় দিয়ে এমন করতে পারি যে, এ জীবনে হাত দুখানি আর কখনও তুলতে পারবে না। কিন্তু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাত দুখানায় আমার দরকার আছে। নাও, জোড় হাত কর।" ব'লে তার হাত ছেড়ে দিলাম।

আমার হাতের জোরের একটু পরিচয় পেয়ে সে-যে দ'মে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে, "আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।" মুখে মদের বিকট দুর্গন্ধ।

আমি বললাম, "রেল-কর্মচারী না হ'য়ে তুমি টিকিট দেখতে চেয়েছিলে, পুলিশে তো আমি তোমাকে দোবো। কিন্তু তার আগে যা বলছি তা করো।"

সে সময়ে প্ল্যাটফর্মে বেশি লোক না থাকলেও একজন একজন ক'রে এক সার কৌতূহলী দর্শক জ'মে গিয়েছিল। তাদের ঠেলে আবির্ভূত হলেন মেয়েটির বাবা—হাতে এক চাঙ্গড় বরফ। ঠাণ্ডায় হাতটা বোধ হয় অসাড় হ'য়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি বরফটা মেয়ের হাতে দিলেন। মেয়েটি কী বলবার চেষ্টা করলে সে দিকে কর্ণপাত না ক'রে জনতার মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, "কী হ'য়েচে ? কী হয়েচে ? অ্যাঁ, কী হয়েচে ?" তারপর হঠাৎ আমার উপর দৃষ্টি পড়ায় বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে বললেন, "তুমি এখানে এসে জুটেছ ? তুমি এখানে কেন ?"

লোকটার অকারণ অভদ্রতায় আমি প্রথমটা একটু বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম—তার-পর দৃঢ়স্বরে বললাম' "আপনার অসহায় মেয়েকে অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এখানে।"

কে অপমান করলে, আমিই বা কী রক্ষা করলাম—সে সব বিষয়ে সংবাদ নেওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ না ক'রে অতি ইতরের মত খ্যাকখ্যাকে গলায় লোকটা আমাকে ধমকে উঠল, "পালাও এখান থেকে, কাজিল ছোকরা কোথাকার। সেই মোকামা ঘাট থেকে জ্বালিয়ে মেরে উনি এখন এসেছেন আমার মেয়েকে রক্ষা করতে।—পালাও।"

"বাবা। বাবা। তুমি বড্ড ভুল করছ বাবা।" আর্তকণ্ঠস্বরে চেয়ে দেখলাম মেয়েটির মুখ অপরিসীম কুণ্ঠায় আর বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন।

বাপ মেয়ের দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "থাম, থাম। কিছু ভুল করচিনে। এ রকম লোককে—" বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী কদর্য গালাগালটা মনে পড়ল না ব'লে কথাটা শেষ হ'লো না।

আমি বললাম, "দেহের মধ্যে এক বিন্দুও মনুষ্যত্ব থাকলে এ রকম লোককে, ধন্যবাদ না দিন, অন্ততঃ গালাগাল দিতেন না।"

আমাদের কথা যে মিত্রতা-ব্যঞ্জক নয়, বচসাপ্রসূত, তা বুঝতে পেরে ফিরিঙ্গি লোকটা সাহস পেয়ে এগিয়ে মেয়েটির বাপকে বললে, "এ লোকটা অত্যন্ত চোয়াড়। আপনি যদি বলেন একে পুলিশে দিই।"

"দেওয়া উচিত!"

প্রস্থানোদ্যত ফিরিঙ্গী লোকটিকে হাঁক দিয়ে আমি বললাম, "দেখ, তুমি যে পুলিশ ডাকতে যাচ্ছ না, ছুতো ক'রে স'রে পড়ছ, তা আমি জানি। কিন্তু যদিই পুলিশ ডাকো, আমি ঐ ইণ্টার ক্লাস কামরায় থাকব—ওখানে এসো। আমি পুলিশের সামনে তোমার নাক ভাঙব।"

তারপর মেয়েটির বাপকে সম্বোধন ক'রে বললাম, "দেখুন, আমি অনেক লোক দেখেচি কিন্তু আপনার মতো অভদ্র, ইতর, অপদার্থ লোক একটিও দেখিনি! আপনাকে যে এখনও আপনি ব'লে সম্বোধন করচি সে শুধু আপনার কন্যার খাতিরে। আপনার মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি সুন্দর! তাঁর প্রতি আমার প্রশংসা আর শ্রদ্ধার অন্ত নেই।"

"ছুঁচো কোথাকার! ড্যাম্, স্টুপিড্, রাস্কেল্।"

মনের মধ্যে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব উল্লাস বোধ করতে লাগলাম। আমার দু-মুখো অস্ত্রের দু-দিক দু-রকম। একদিকে লোহার শাণিত ফলক, অন্যদিকে পুষ্পগুচ্ছ;—একদিকে হলাহল, অন্যদিকে সুধা। যে রস মনের মধ্যে উপভোগ করছিলাম তার পরিবর্তে অন্য রস-সৃষ্টি করতে ইচ্ছা হলো না। শান্তভাবে বললাম, "আমি ভাবচি, আপনার মতো পাঁকের মধ্যে আপনার মেয়ের মতো পঙ্কজিনী কী ক'রে হলো।"

শুনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল আর জবা-ফুলের মতো লাল হ'য়ে উঠল। মুখ দিয়ে কথা কিন্তু বেরুলো আগে মেয়ের—"শুনুন, দেখুন!"—আমি তাকিয়ে দেখলাম দুটি চক্ষে সুগভীর বেদনা!—"আমি জোড়হাতে বাবার হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু আর আপনি বাবাকে অপমানিত করবেন না।"

নিমেষের মধ্যে আমার উল্লাস কোথায় লুপ্ত হলো। এ আমি কী করছি! এ যে লোহার ফলাই দুদিকে আঘাত করছে। অত্যন্ত সন্তপ্ত হ'য়ে বললাম, "আমি বুঝতে পারি নি, অন্যায় করেছি—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আর আমি কিছুই বলব না।"

গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়ে সবুজ আলো দোলাচ্ছিল। গাড়ি হঠাৎ চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না পেরে প'ড়ে যাবার মতো হ'লেন, আমি ধ'রে ফেলে গাড়ীর ভিতর ঠেলে দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলাম। তারপর আমার কামরাখানা সামনে এলে উঠে পড়লাম। উঠবার সময়

দেখলাম ফিরিঙ্গিটা কাছাকাছি কোথাও ছিল, টপ ক'রে লাফিয়ে সেই সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গাড়িতে উঠে মুখের ঘাম মুছে জানালার ধারে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসলাম। ভারি হাসি পেতে লাগল। এ-যে রীতিমত একটা একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় হ'য়ে গেল! যবনিকা পড়েছে কি-না কে জানে—কিন্তু পড়লেই ভালো। আর ভালো লাগে না—অমন সুন্দরী চিত্তবিমুগ্ধকারিণী নায়িকা থাকা সত্ত্বেও। না, না—ফিরিঙ্গিটার হৃদয়বৃত্তি আমি অনেকটা বুঝতে পারি,—সে আছে মানুষের সেই আদিম যুগের অবস্থায় যখন অধিকারের কল্পনা মানুষের মনে সবেমাত্র ফুটে উঠছিল, যখন হাতের মধ্যে পাওয়াকেই মানুষ একমাত্র পাওয়া ব'লে মনে করত। তার ভালো লেগেছে, সুতরাং পাশবিক বল প্রয়োগে পেতে গিয়েছে। কিন্তু বাপের এ কী কাণ্ড! মেয়ের অপমানের কথা শুনে জানতে চায় না ব্যাপারটা কী? অথচ যে ভদ্রসন্তান তার মেয়েকে অপমান হ'তে রক্ষা করেচে ব'লে দাবি করচে—অবলীলাক্রমে তাকে অপমানিত করে! ঘৃণায় ও বিরক্তিতে ক্ষুধার উদ্রেক হ'লো—টিফিনকেরিয়ার থেকে খাবার আর ফ্লাস্ক থেকে জল বার ক'রে খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে জানালার ধারে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি একটা ছোট স্টেশনে এসে লাগল। অর্দ্ধালোকিত প্লাট্‌ফর্মের দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিলাম—হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি আর তার বাবা দ্রুতপদে প্লাট্‌ফর্ম দিয়ে আসচে—মেয়েটির হাতে সুট্‌কেস্ আর বাপের হাতে বেডিং। গুরুভারে দুজনেই পীড়িত, কিন্তু তা সত্ত্বেও গতি দ্রুত এবং ভঙ্গি উদ্বিগ্ন।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হলো না। চোখোচোখি হ'লে পাছে মেয়েটি লজ্জা পায় এই ভেবে তাড়াতাড়ি বেঞ্চের মাঝখানে স'রে এলাম। কিন্তু তাতে কোনও ফল হ'ল না, একটু পরে দোরটা খুলে গেল, দেখলাম নিচু প্লাট্‌ফর্ম থেকে মেয়েটি সুট্‌কেস্‌টা গাড়ির ভিতর রাখবার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে সুট্‌কেস্‌টা নিয়ে বেঞ্চের উপর রেখে স'রে এলাম। মেয়েটি আমাকে দেখে আরক্তমুখে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলে, তারপর গাড়ির ভিতর উঠে এসে বাপের হাত থেকে বেডিংটা তুলে নিলে।

গাড়ির ভিতর এসে আমাকে দেখে মেয়ের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বাপ বললে, "দেখে শুনে এই গাড়িতেই উঠলে?"

মেয়েটি বললে, "তুমি বলেছিলে প্রথম ইণ্টার ক্লাসে উঠতে। তাই উঠেছি বাবা।" কণ্ঠস্বরে ভৎর্সনার সুর। মেয়েটি গাড়ির অপর প্রান্তে জানালার ধারে গিয়ে বসল।

আমি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে একহাতে সুটকেস অপর হাতে হোল্ড-অল্ নিয়ে অগ্রসর হলাম। মেয়েটি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "উনি কেন যাবেন বাবা, তা হ'লে আমরাই অন্য কামরায় যাই।"

আমি ফিরে চেয়ে বললাম, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ কামরায় থাকুন, আমি পাশের কামরায় আছি।" ব'লে জিনিসপত্র নিয়ে পাশের কামরায় গিয়ে উঠলাম।

প্রতি স্টেশনে গাড়ির দুপাশে লক্ষ্য রেখে চললাম, কিন্তু কোন স্টেশনেই সে ফিরিঙ্গিটাকে আর দেখতে পেলাম না। সমস্তিপুরে গাড়ি লাগলে দেখলাম সে সেকেণ্ডক্লাস থেকে নেমে সোজা প্লাট্‌ফর্মের অপরদিকে একটা ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়ল। আমাদের গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম—তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরিশ্রান্ত দেহকে একটু এলিয়ে দিলাম।

নিদ্রার মোহন অঙ্গুলিস্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, একটা বড় স্টেশন। কামরায় একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কোন্ স্টেশন মশায় ?"

"মজঃফরপুর। আপনি কোথায় যাবেন ?"

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে আমি বললাম, "আমি এখানেই নাবব।"

ভদ্রলোক ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "তা হ'লে নেবে পড়ুন। গাড়ি অনেকক্ষণ এসেছে।"

একটা কুলি ডেকে নেবে পড়লাম। স্টেশনের বাইরে এসে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া ক'রে ডাকবাঙলায় উপস্থিত হলাম।

প্রাতে উঠে চা খেয়ে পার্‌সনাল্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পরিতোষ মৈত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁকে বাবা ডাকে চিঠি দিয়েছিলেন, তা ছাড়া আমার সঙ্গেও আর একটা চিঠি ছিল। হাকিমের বাড়ি বার করতে বেশি বিলম্ব হলো না। দেখলাম প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রশস্ত বাঙলা—গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত সুরকি-ঢালা পথ, দুধারে কেয়ারি করা ফুলের ও বাহারে-পাতার গাছ। গেটের থামে পিতলের পাতে ইংরাজীতে পরিতোষ বাবুর নাম লেখা।

গেট অতিক্রম ক'রে খানিকটা অগ্রসর হয়েছি, হঠাৎ দেখি পথের বাঁ পাশে একটা বড় বেলফুলের গাছের কাছে ব'সে কালকের রাত্রের সেই মেয়েটি খুরপি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে খুরপি ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, মুখে সলজ্জ হাসি—মুক্তার মধ্যে রঙিন আলোর মতো—তার মধ্যে আনন্দের আভা।

নিরতিশয় বিস্ময়ে বললাম, "আপনি এখানে ?"

অতল নীল চক্ষু দুটির চকিত দৃষ্টি আমার দিকে স্থাপিত ক'রে মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বললে, "এটা আমাদেরই বাড়ি।" একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "কালকের ঘটনার জন্যে আমরা বাড়িশুদ্ধ সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। বাবা আপনার সন্ধানে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। চলুন, বসবেন চলুন।"

আমি বললাম, "আমার সন্ধানে?—আমি যে মজঃফরপুরেই এসেচি তা কেমন ক'রে জানলেন? আমি কে বলুন দেখি?"

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসির ক্ষীণরেখা ফুটে উঠল; বললে, "কাল রাত্রে বাড়ি পৌঁছে বাবা দেখলেন আপনার বাবার চিঠি এসেচে। সে চিঠি পাওয়ার আগেই তিনি মোকামা ঘাট রওনা হ'য়েছিলেন। চিঠিতে লেখা আপনার আসবার দিন সময় থেকে বোঝা গেল আপনিই নরেশ বাবু।"

যে বিচিত্র নাটিকার সমস্তিপুর স্টেশনে যবনিকা পাত হ'য়েছিল ব'লে মনে করেছিলাম, এমন অপরূপভাবে তার নূতন অঙ্ক আরম্ভ হলো দেখে মনে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বললাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বললে, "গৌরী।"

মনে মনে বললাম, তা একশো বার। যুক্ত করে নমস্কার ক'রে বললাম, "আচ্ছা তা হ'লে এখন আসি।"

গৌরী ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "বসবেন না? বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না?"

আমি বললাম, "না।"

দুঃখিতস্বরে গৌরী বললে, "আপনি তা হ'লে এখনও আমাদের ক্ষমা করেন নি!"

আমি বললাম, "দেখুন, ক্ষমা করা সহজ, কিন্তু ক্ষমা করার পরে অনেক জিনিস শক্ত থাকতেও তো পারে। আমি ডেপুটিগিরি চাকরির জন্তে চেষ্টা করব না।"

গৌরী বললে, "কেন?"

একটু ইতস্তত ক'রে বললাম, "এ কথা শুনে যদি মনে কষ্ট পান তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন—ও চাকরির উপর ঘৃণা হ'য়ে গেচে। কাল ট্রেনের ঘটনা যদি অন্য রকম ঘটত তা হ'লে শুধু কমিশনার সাহেবেরই কাছে চাকরী ভিক্ষে ক'রে যেতাম না, তার চেয়ে অনেক বড় একটা ভিক্ষে আপনার বাবার কাছেও ক'রে যেতাম। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।"

আরক্তমুখে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই গৌরী চোখ নত করলে।

আবার নমস্কার ক'রে বললাম, "আচ্ছা, আসি।"

গৌরী বললে, "বাবা, জিজ্ঞাসা করলে আপনি কোথায় উঠেছেন বলব?"

আমি ঈষৎ হেসে বললাম, "বলবেন, সে কথা সে অসভ্য লোকটা কিছুতেই বললে না!" বলে অগ্রসর হ'লাম।

কয়েক পদ অগ্রসর হ'য়ে দেখলাম একটা বেল-ফুলের গাছে এক ডালে দুটি কুঁড়ি খুব বড় হয়ে উঠেছে। দেখে সে দুটি পাবার জন্তে কেমন প্রলোভন হলো। মনের মধ্যে প্রলোভন বৃত্তিটা বোধহয় শাণিত হ'য়ে উঠেছিল, তাই নব-জাত গোখরো সাপের বাচ্চার মতো লোভের বস্তু পেলেই ঠোকোর দিচ্ছিল। পিছন

ফিরে দেখলাম গৌরী আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। বললাম, "ভারি চমৎকার বেল-ফুলের দুটি কুঁড়ি রয়েচে। নিতে পারি?"

"রসুন, আমি দিচ্ছি, ব'লে গৌরী এগিয়ে এসে তার কোমরে-বাঁধা ছোটো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা কাঁচি বের ক'রে নত হ'য়ে কয়েকটি পাতাশুদ্ধ ডালের ডগা কেটে কুঁড়ি দুটি আমার হাতে দিলে।

গৌরীকে তার দানের জন্যে ছোট একটি ধন্যবাদ দিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হলাম। মনের মধ্যে একটা উদাস আনন্দ, বৈরাগ্যের স্তিমিত বেদনা;—কাল রাত্রের অধীর উন্মাদনা ফেনা ম'রে স্থির অতল জলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও লোভ নিঃশব্দ-সঞ্চারে কুমীরের মতো সাঁতার কেটে বেড়াচ্চে! সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

বন্ধুরা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া এক মনে নরেশের গল্প শুনিতেছে, এমন সময়ে সাইকেল করিয়া কম্পাউণ্ডে ম্যাজিস্ট্রেটের আরদালি প্রবেশ করিল।

উদ্বিগ্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যতীন্দ্র বলিল, "মাটি করলে দেখচি গল্পটাকে। কা খবর নিয়ে আসে কে জানে।"

আকস্মিক রসভঙ্গে সকলেই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। আরদালি আসিয়া সেলাম করিয়া সমরেন্দ্রর হাতে চিঠি দিল। চিঠি পড়িয়া সমরেন্দ্র বলিল, "জরুরি কাজে সাহেব ডেকেচেন—আমাকে উঠতে হলো। কিন্তু আপনার গল্প চালান নরেশদা, এঁরা সকলে শুনবেন।"

নরেশ বলিল, "ক্ষেপেচ? আর কি চালাতে আছে? দৈব যেখানে ছেদ দিয়ে দিলে সেইখানেই শেষ।"

মণীন্দ্র বলিল, "সে হবে না নরেশদা, আজ না বলুন, আর একদিন এ গল্পটা বলতে হবে।"

নরেশ বলিল, "আর একদিন আর একটা গল্প বলব।—আজকের ফুল কী দশদিন পরে ফোটাতে আছে?"

একটা অসন্তোষের কলরব উঠিল। মলয় বলিল, "একটা কথা তা হ'লে বলুন, নরেশ-দা। এ গল্পের গৌরীই কি আমাদের বউ-দি?"

রহস্যব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া নরেশ বলিল, "সেটা তোমার বউদিদিকে জিজ্ঞাসা কোরো একদিন। উপসংহারটা ভালো ক'রেই তিনি শোনাবেন।"

ভূপেন বলিল, "বাজে রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। এ গল্পের উপসংহারের দিকে একটি সত্যিকারের রহস্য আছে। রহস্যটি বেলফুলের কুঁড়ি তোলা নিয়ে। নরেশদা যখন কুঁড়ি দুইটি চাইলেন তখন তাঁকে তুলতে না দিয়ে গৌরী যে নিজে এসে তুলে দিলে—তার অর্থ কী? কুঁড়ি ছিঁড়তে গিয়ে গাছ পাছে নষ্ট হয় সেই ভয়ে, না,—নিজের হাতে কুঁড়ি দুটি নরেশদাকে দেবার লোভে? অর্থাৎ, নরেশদাদার প্রতি প্রেমে, না,—গাছটির প্রতি মমতায়?"

ভূপতি বলিল, "নরেশদার প্রতি প্রেমে।"

যতীন ইজিচেয়ারে উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, "কখনও না,—গাছটির প্রতি মমতায়। গাছের প্রতি যার যত্ন আছে সে গাছের ডাল টেনে ছেঁড়া পছন্দ করে না, গাছকে কষ্ট দেওয়ার ভয়ে কাঁচি দিয়ে কাটে।"

হরিপ্রকাশ বলিল, "আর নরেশদার প্রতি যার প্রেম হয়েছে সে নরেশদার হাতে কাঁচি দেওয়া পছন্দ করে না, নিজহাতে উপহার দেবার লোভে কাঁচি দিয়ে কাটে।

হরিপ্রকাশের বিচারে সকলে উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

বিভ্রম

এক

প্রথম চাকরি পাইলাম, শিমলা পাহাড়ে। বিবেচনা এবং পরামর্শ উভয়েই উপদেশ দিল যে, অজ্ঞাত বিদেশে একেবারে প্রথমেই স্ত্রীটিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। সুন্দরী অল্পবয়স্কা স্ত্রী আজকালকার দিনে বিপজ্জনক না হইলেও সুবিধাজনক নহে। কারণ তাঁহার সমস্ত ভার আমাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু আমার কোনও ভার তাঁহাকে বহন করিতে দেওয়া আজকালকার সভ্যযুগে ভদ্রোচিত হইবে না। বহুজন্মের কুসংস্কারের প্রভাবে অদ্যাবধি আমাদের স্ত্রী-গণ আমাদিগের দ্বারা জুতার লেস বাঁধাইয়া লইতে একটু ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণ হস্ত হইতে দৈবাৎ রুমালখানি পড়িয়া যাইলে আমরা তাহা উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা হইতে আশা হয় যে, অচিরাৎ আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ হ্যাট্‌কোট এবং আমাদের গৃহলক্ষ্মী-গণ মেম হইয়া উঠিবেন।

আমার স্ত্রী ততটা সভ্য না হইলেও বর্তমান যুগের প্রভাব তাঁহাতে কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছেই। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তা'হলে হ্যাট-কোট প'রে ব্যাগওয়ালা সাজি, আর তুমিও যা হয় একটা জড়িয়ে নিয়ে মেম হ'য়ে পড়—না হ'লে এমন বেশে সেখানে গিয়ে তো আর হোটেলে উঠতে পারব না।"

অগত্যা স্ত্রী বলিলেন, "তবে শিমলায় গিয়ে একটা বাড়ী ঠিক ক'রে মাস খানেকের মধ্যেই কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"তথাস্তু!"

দুই

তখন এপ্রিল মাসের প্রথম। দুর্জয় শীত। অফিসের পরিশ্রম হইতে যেটুকু অবসর পাইতাম, সেটুকু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং বাড়িতে পত্র লিখিয়া কাটাইতাম। শিমলার প্রশান্ত এবং বিরাট সৌন্দর্য আমার চক্ষে ঠিক ভালো লাগিত না; তাহার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য যেন আমার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া থাকিত। বক্রগতিতে পার্বত্য পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর দিয়া উটের শ্রেণী এবং 'বয়েল' গাড়ি চলিয়াছে; চালকদের গম্ভীর বদন এবং বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন কোন রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া প্রবাস-দৃশ্য দেখিতেছি। আমিও যে সেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তাহারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছি, তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম না। ধূমাস্পষ্ট গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন দেখিতাম, পর্বত এবং উপত্যকা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গিয়া তৎপরিবর্তে কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ পল্লী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; সেই পল্লীর মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলি, এবং তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার গবাক্ষে দুইটি উৎসুক নয়ন। কিন্তু সে ক্ষণিকের মোহ। রিক্সর শব্দে চমকিত হইয়া দেখিতাম, সেই পর্বত এবং সেই উপত্যকা তাহাদের গাম্ভীর্য এবং নির্জনতা লইয়াই প্রকাশ রহিয়াছে! কোথায়ই বা কলিকাতার গলি এবং কোথায়ই বা উৎসুক নয়ন! একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শিমলার শীত-বায়ুতে মিশিয়া মিলাইয়া যাইত।

সেদিন রবিবার। অফিসের উপদ্রব ছিল না। ভৃত্য টেবিলের উপর চা-এর পেয়ালা রাখিয়া গেল। সেই তপ্ত তরল পদার্থটুকু নিঃশেষ করিবার পর কা করিয়া সময় নষ্ট করিব মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম—"বাবুজী, ফুল!"

চাহিয়া দেখিলাম, ফুলের গুচ্ছ হস্তে লইয়া একটি পাহাড়ী বালিকা আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে নীলবর্ণের পায়জামা এবং কুর্তী, এবং গাত্রে একখানি পীতবর্ণের অঙ্গাবরণ। বিসদৃশ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে সবল সুগঠিত দেহ এবং সরল সপ্রতিভ মুখখানি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার বয়স আনুমানিক পঞ্চদশ বৎসর হইবে।

তাহার হস্ত হহতে ফুলের গুচ্ছটি লইয়া দেখিলাম, পাহাড়ী গোলাপ এবং ফার্ণ দিয়া সেটি প্রস্তুত। টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া মনিব্যাগ হইতে একটি দুয়ানী লইয়া বালিকাকে দিলাম। বালিকা দুয়ানী দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "বাবুজী, ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র। আপনি আট পয়সা দিতেছেন।"

তাই তো! দর দস্তর না করিয়া একেবারে আট পয়সা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু একবার দিয়া ফিরাইয়া লওয়াও ভালো হয় না। বলিলাম, "তা হোক, তুমি আট পয়সাই লও।"

কিন্তু সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অন্যায় মূল্য সে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। অগত্যা একটা রফা করিতে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি দুয়ানীটি লইয়া যাও, তাহার পরিবর্তে আমাকে আটদিন ফুল দিয়া যাইও।

আমার প্রস্তাব তাহার মনঃপূত হইল। "আচ্ছী বাৎ", বলিয়া দুয়ানীটি লইয়া সে চলিয়া গেল।

তিন

পরদিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে বালিকাটি ফুল দিতে আসিত। আমাকে যেদিন সম্মুখে পাইত আমার হস্তে দিয়া যাইত, যেদিন আমাকে দেখিতে পাইত না টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গি তেমনই অবাধ গতি। সে যেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা কহিত, তেমনই অবলীলাক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিত।

সেরূপ সহজ সপ্রতিভতার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি বাঙলা দেশের হিন্দিতে তাহার সহিত কথা কহিতাম, সে পাহাড়ী হিন্দিতে তাহার উত্তর দিত। কতকটা সেও আমার প্রশ্ন বুঝিত না, এবং কতকটা আমিও তাহার উত্তর ভুল বুঝিতাম। কিন্তু মোটের উপর আমাদের কথাবার্তা একরকম চলিয়া যাইত।

তাহার নাম জান্‌কী। খড্‌এর অর্ধপথে তাহাদের বাড়ী। তাহার পিতা জঙ্গল দফতরে (Forest Office) জমাদার। তাহারা তিনটি ভগিনী এবং চারিটি ভাই। তাহার বড় ভাই তিন মাস হইল 'সরকারে' চাকরি পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতাম দেখিয়া জান্‌কী বলিত, "বাবুজী, তোমার এখনই এত ঠাণ্ডা বোধ হয়, বরফে তুমি কী করিয়া থাকিবে ?"

'বরফ' অর্থাৎ শীতকাল। শীতকালে শিমলায় তুষারপাত হয় বলিয়া সহজ কথায় শীতকালকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

আমি বলিতাম, "বরফ পড়িবার দুইমাস পূর্বেই আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

জান্‌কী আশ্চর্য হইয়া বলিত, "বাবুজী, তুমি বরফে থাকিবে না ?"

বলিয়া সে বরফের গল্প আরম্ভ করিত। সে কী সুন্দর! যখন পাহাড় পর্বত গাছ পালা সমস্ত বরফে একেবারে সাদা হইয়া যায়, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক্‌ ঝক্‌ করিতে থাকে, তখন তাহারা কী আনন্দের সহিত বরফের উপর বেড়াইয়া বেড়ায়—বরফ লইয়া খেলা করে! বেই বরফকে বাবুজীর এত ভয়!

তাহার উত্তরে আমি কলিকাতার গল্প করিতাম। শিমলার মতো ত্রিশটা সহর একত্র করিলেও কলিকাতার মতো বড় হয় না—সেখানে কত লোক, কত গাড়ি, কত আনন্দ। যে 'হাওয়াগাড়ি' শিমলায় একটা দেখিলে জান্‌কী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, সে 'হাওয়াগাড়ি' কলিকাতার পথে গনিয়া শেষ করা যায় না। মাঠে মনুমেণ্ট, পথে ট্রামগাড়ি, গঙ্গায় জাহাজ।

সমস্ত শুনিয়া জান্‌কী বিস্মিত হৃদয়ে কলিকাতার ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিত। সকলের চেয়ে তাহার আশ্চর্য লাগিত হাওয়াগাড়ির কথা শুনিয়া। এখানে যত রিক্স আছে, কলিকাতায় তাহার অধিক সংখ্যক হাওয়াগাড়ি আছে, কী আশ্চর্য! কিন্তু তাহা হইলে কী হয়, কলিকাতায় শীতকালে বরফ পড়ে না। জান্‌কী মাথা নাড়িয়া বলিত, "বাবুজী, শিমলাই ভালো।"

এমনই করিয়া দিনে দিনে জান্‌কীর সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ ফুলের তোড়া উপলক্ষ মাত্র হইল—গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যুষে উঠিয়া বারান্দায় নিস্তেজ রৌদ্রকিরণে বসিয়া সম্মুখের পর্বতগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। কালো কালো পাহাড়গুলি দেখিয়া মনে হইত যেন আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যগণ তাহাদের বিরাট দেহ লইয়া অলসভাবে লেজ গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। মনের মধ্যে কেমন একটা পীড়া অনুভব করিতাম। প্রভাতসূর্যোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের তলায় হিমজর্জর পর্বতগুলি কেমন খাপছাড়া বলিয়া মনে হইত—এমন সময় একমুখ হাসি এবং একতোড়া ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইত—"বাবুজী, ফুল!"

ফুলের প্রসঙ্গ সেই পর্যন্ত শেষ—তাহার পর জান্‌কী গল্প করিতে বসিয়া যাইত।

এই সরল-হৃদয় সপ্রতিভ পাহাড়ী বালিকাটিকে আমার কেমন বিশেষ-একটু ভালো লাগিত। কঠিন বন্ধুর পর্বতের মধ্যে চতুর্দিকের গাঢ়নিবদ্ধ গাম্ভীর্য এবং কঠোরতার সহিত তাহাকে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইত। তাহার মধ্যে যে প্রফুল্লতা এবং চাপল্য তাহাকে নিরন্তর উদ্বেলিত করিয়া রাখিত—তাহার উপমা পর্বতের মধ্যে আমি আর কোনও পদার্থে পাইতাম না—একমাত্র গিরিনির্ঝর ছাড়া! মনে হইত, সে যেন নির্মম পাহাড় ভেদ করিয়া তরল প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া উপায় নাই—গল্প বলিতে সে যেমন মজবুত—গল্প শুনিতেও তাহার তেমনই আগ্রহ। তাহার কথা শ্রবণ করা এবং তাহার সহিত কথা কওয়া—এই দুই প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণতি হইতেছে হৃদ্যতা।

দুয়ানীর হিসাব যে দিন শেষ হইল, তাহার পরদিন ফুল লইয়া আসিলে আমি জান্‌কীকে বলিলাম, "জান্‌কী, তোমার দু আনার ফুল দেওয়া হয়ে গেছে—আজ থেকে আবার নূতন হিসাব।" বলিয়া তাহাকে পুনরায় একটি দুয়ানী প্রদান করিলাম।

জান্‌কী ভুয়ানীটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, আর তাহাকে পয়সা দিতে হইবে না, আজ হইতে সে বিনামূল্যেই ফুল দিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম—"তাও কি হয়—!"

কিন্তু তাহাই হইল। সে বলিল, ফুল বিক্রয় করা তাহার ব্যবসায় নহে—ফুল এবং পাতা বিনামূল্যেই সে পর্বতগাত্র হইতে লইয়া আসে, অতএব পয়সা না লইলেও তাহার ক্ষতি নাই। ফুলের পরিবর্তে 'বাবুজীর' অনুগ্রহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলাম, ফুলের মূল্য প্রদান করিলে জান্‌কীকে ক্ষুণ্ণ করাই হইবে এবং পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাকে রাজি করিতে পারিবার মতো ক্ষমতা ছিল না, সম্ভাবনাও ছিল না। অগত্যা বিনামূল্যেই ফুল লাভ করিতে লাগিলাম।

চার

দিনের পর দিন শেষ হইয়া তিন মাস কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিনও জান্‌কী আমাকে ফুল দিয়া যাইতে ভুলে নাই। যেদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে পাই, সেদিন বৈকালে আসিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই তিন মাসের মধ্যে সে আমার সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে, যাহার মাত্রা আমার মনে হয়, ক্রমশ সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে শুধু ফুল দিতে আসে না, সে আমার জন্য আসে; ফুল তাহার উপলক্ষ—আমিই তাহার লক্ষ্য!

কী আশ্চর্য! এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও সেই প্রেম স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে! এ শুধু হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া, বেড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় না—এ আবার ভালোও বাসে! ক্ষুধার সময় আহার, এবং শয়নের সময় নিদ্রালাভ করিয়াই ইহার বাসনা সমাপ্তি লাভ করে না—তাহারও সীমা লঙ্ঘন চলে!

কিন্তু আমি তো এই পর্বত-বালিকাকে ভালোবাসি নাই—শুধু অমিশ্র সহৃদয়তা ভিন্ন আমি আর কিছুই তো ইহাকে দান করি নাই। আমার নিকট হইতে এমন কী পদার্থ সে লাভ করিয়াছে, যাহার বিনিময়ে তাহার হৃদয় লইয়া সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম সে ফুল লইয়া আমার উপাসনা করিতে আসিত।

আমি এই হৃদয়ের খেলা দেখিয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতাম। কেমন ধীরে ধীরে, অথচ অনন্যগতিভরে এই উদ্দাম এবং চঞ্চল হৃদয়খানি আমার নিকটে আসিয়া ধরা দিল! কিসের প্রভাবে? কিসের আকর্ষণে? আমার মধ্যে এমন কী শক্তি আমার অগোচরে বিরাজ করিতেছে, যাহার অদৃশ্য প্রভাব হইতে এই বালিকা কোন ক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিল না! সময়ে সময়ে আত্মমহিমায় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু তাহা হউক, ইহাকে রোধ করিতে হইবে, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই অপরিণতবুদ্ধি বালিকা যে মিথ্যা আশাকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন নিজেকে বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে, আমার কর্তব্য তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করা। এই হৃদয়সংঘাতের মধ্যে আমার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই—কিন্তু বেচারী জানকী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে যখন তাহাকে এই অপরিণাম-দর্শিতার ফলভোগ করিতে হইবে। আমার নিকট হইতে সহৃদয়তার অধিক যতটুকু সে আশা করিবে, ততটুকুর জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে।

স্থির করিলাম জানকীকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কী তাহাকে বলিব, কেমন করিয়া তাহাকে সাবধান করিব। সে তো একদিনও প্রকাশ করিয়া আমাকে বলে নাই যে আমাকে ভালোবাসে। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলি যে, আমাকে ভালোবাসিও না—ভুল করিও না। বিশেষত সে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাবে গল্প করিতে থাকে, তখন নির্বিবাদে তাহার গল্প শুনা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে, এবং তাহার অকৃত্রিম সারল্যে বাধা দিয়া তাহাকে পীড়ন করা নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে একটা কোন প্রতিকার না করিলেই নয়। দুই এক জন বন্ধু বান্ধব জানকীর বিষয় লক্ষ্য করিতে ভুলিল না; এবং তদুপলক্ষে আমাকে পরিহাস করিতেও ছাড়িল না। ভৃত্য এবং পাচকও যেন জানকীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে কী কথা বলাবলি করে। আমার সন্দেহ হয় তাহারা আমারই বিষয়ে আলোচনা করে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি, জানকীকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত নহে।

অবশ্য এ কথা বলিলে জানকীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হইবে। কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনস্থলে আঘাত না করাই অন্যায়, কষ্ট না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা।

স্থির করিলাম, জানকীকে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করিতে হইবে। ফুলের মূল্য গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে ফুল লওয়া হইবে না। বিনামূল্যে ফুল গ্রহণের সুযোগে তাহার সহিত যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, মূল্য দিয়া গ্রহণ করিলে তাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

পাঁচ

সেদিন প্রভাতে এক পশলা শ্রাবণের বর্ষণ খাইয়া কেলুগাছগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ছিন্ন মেঘের অবকাশ দিয়া সূর্যের কিরণ, আকাশ এবং পর্বতকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ফুল লইয়া জানকী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার পশ্চাতে একজন পাহাড়ী যুবক পৃষ্ঠে মস্তবড় বোঁচকা লইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম আজিকার ফুলের তোড়াটি সকল দিন অপেক্ষা বৃহৎ—নানাবিধ পুষ্পলতায় গ্রথিত। নিমেষের মধ্যে আমার মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম, এবং কর্তব্য জ্ঞানকে বিশেষভাবে সচেষ্ট করিয়া তুলিলাম।

বলিলাম, "জানকী ফুলের দাম তুমি যদি না লও তো আর আমি ফুল লইব না।"

জানকীর প্রফুল্ল মুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। "কেন, বাবুজী?"

আমি কহিলাম, "তা বলিতে পারি না, কিন্তু দাম তোমাকে লইতে হইবে।"

জানকী একটু দুঃখিতস্বরে কহিল, "বাবুজী, আমি যদি অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনাকে আর বিনামূল্যে ফুল লইতে হইবে না, আপনাকে আমি আজ শেষ ফুল দিতে আসিয়াছি।"

অন্তরের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিলাম, তাড়াতাড়ি কহিলাম, "কেন?"

জানকী কহিল, "আমি আজ বিদেশ যাইতেছি, এখান হইতে একবেলার পথ; ইনি আমার স্বামী।"

জানকীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "জানকী তোমার বিবাহ হইয়াছে একদিনও বল নাই তো! কতদিন তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

জানকী কহিল, "পাঁচ বৎসর।"

দেখিলাম বর্ষার অনুজ্জ্বল সূর্যকিরণের মধ্যে জানকার মুখখানি অম্লান পবিত্রতায় নির্মল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জানকী নীরবে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে পাহাড়ী যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় আমাকে অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল, "বাবুজীর যদি অনুগ্রহ হয়, একবার আমাদের গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন—পথ ভালো—আমি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইব।"

আমি কহিলাম, "ছুটি পাইলে আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরের দ্বারা সংবাদ দিব।"

জানকী এবং তাহার স্বামী সকৃতজ্ঞনেত্রে আমার দিকে চাহিল।

বিদায়কালে জানকী বলিল, "বাবুজী আপনার দয়া এবং ভালোবাসার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আপনি আমাকে যে দুয়ানিটি দিয়াছিলেন, সেটি আমি আপনার দয়ার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছি, খরচ করি নাই।" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে দুয়ানিটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

জানকী এবং তাহার স্বামী খদের পথে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল আমি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

তখন আকাশ আরও মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং চতুর্দিক রৌদ্রপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

জানকীর সরল স্নেহপূর্ণ আচরণকে যে বিকৃত আকার দিয়া মনে মনে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল কাল হইতে "বাবুজী ফুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না, তখন একটা অদৃশ্য বেদনায় মনটা নিপীড়িত হইয়া উঠিল।

সেইদিন অফিসে গিয়া বলিলাম, "সাহেব আমাকে দশ দিনের ছুটি দাও, স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"

সাহেব বলিলেন—তথাস্তু।

শ্বশুর-রাজ

এক

পলাশডাঙ্গার প্রতাপান্বিত জমিদার রাজীবলোচন চৌধুরীর একমাত্র পুত্রের স্ত্রী মালতী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্ত। রাজীবলোচনের বিচারে অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হয় নাই, বৈবাহিক পরেশনাথের সহিত কলহে অপদস্থ হইয়া তিনি পুত্রবধূ মালতীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্যার মুখ চাহিয়াও কঠিন পরেশনাথ বৈবাহিকের অন্যায়াচরণের কাছে নত হন নাই। তিন বৎসর হইল পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রাজীবলোচনের ক্রোধ উপশমিত না হইয়া বাড়িয়াই গিয়াছিল—পরেশনাথের শ্রাদ্ধে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার বর্তমানতায় পলাশডাঙ্গার জমিদার-গৃহে মালতীর স্থান হইবে না, তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাই হউক-না কেন। মালতীর পক্ষে সে সুযোগের কিন্তু আশু সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না; রাজীবলোচনের সুস্থ সবল দেহ দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মাখনের নিত্য-পুষ্টি আহরণের দ্বারা কালের আক্রমণকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়াই চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুত্র অজলোচন পিতৃভক্তি ব্যক্তি;—তাহা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে সে প্রবল অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার উপর তাহার নিজের, তাহার পিতার অথবা তাহার স্ত্রীর কোন হাত নাই—নহিলে এমনই বা ঘটিবে কেন? দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করার পর সে স্থির বুঝিয়াছে যে, যে যাহাই বলুক, Theory of Predestination মানা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দার্শনিক

তন্ধের এই বর্মাবৃত্ত মনের মধ্যেও সে যে মাঝে মাঝে বেদনা অনুভব করিত না, তাহা নহে ; কিন্তু ইহাকে সে মনের ব্যাধি বলিয়া মনে করিত। দেহের ব্যাধি আছে, মনের ব্যাধিই থাকিতে নাই ? ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে মনে পড়িয়া যাইত—'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।" সত্যই বিচিত্র—নহিলে এমনই বা ঘটিবে কেন ?

রাজীবলোচনের আচরণের সমালোচনা করিতে অব্জলোচনের পর সংসারে আর কেহ ছিল না। গৃহিণী বহুকাল গত হইয়াছেন, একমাত্র দুহিতা সুলোচনা অবিবাহিতা বালিকা—তাহা ছাড়া আর যাহারা, তাহারা আশ্রিত, তাহাদের সাহসই বা কোথায় আর প্রয়োজনই বা কতটুকু !

কিন্তু সুলোচনার বিবাহের কিছু পরেই কথাটা একজন তুলিল। সে সুলোচনার স্বামী ইন্দ্রনাথ। পদার্থ-বিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিলাত যাইবার জন্য সে ব্যগ্র। জামাতার বিলাত যাওয়ায় রাজীবলোচনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তবে বিলাত যাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবেন ইন্দ্রনাথের ধনী পিতা, সুতরাং অনিচ্ছার মতো আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিয়াই ইন্দ্রনাথ অব্জলোচনের কাছে কথাটা তুলিল। বলিল, "বিনা অপরাধে আপনারা বউদিদিকে নির্বাসনে দিয়েচেন কেন, দাদা ?"

অব্জ বলিল, "আপনারা বলছ কেন ? আমি তো দিই নি, বাবা দিয়েচেন।"

ইন্দ্র বলিল, "বাবা দিয়েছেন বটে—কিন্তু আপনি তাতে আপত্তি করেন নি, করবেন ব'লেও মনে হয় না।"

অব্জ বলিল, "না, তা করব না। কিন্তু সেটা কি তুমি আমার অপরাধ বলো ? পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ—এ কথা তুমি শোন নি ?"

ইন্দ্র ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে অব্জর দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর বলিল, "শুনেছি ; কিন্তু এ কথার যে এই অর্থ হয় তা জানতাম না। পিতার অন্যায় আচরণ পুত্র সমর্থন করলে যে-দেবতারা প্রীত হন, তাঁদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই দাদা।"

মৃদু হাসিয়া অব্জ বলিল, "তোমার যে নেই তা তো বুঝতেই পারচি—কিন্তু আমার আছে। রাজ্যাভিষেকের বদলে রামকে চোদ্দ বছর বনবাস করবার অনুরোধ ক'রে দশরথ যে সমীচীনতার পরিচয় দেন নি, তুমি তো তা বলবেই,—কিন্তু রামচন্দ্র সে-কথা, মুখে তো দূরের কথা, মনের মধ্যেও আনেন নি। পিতার ইচ্ছাকে নির্বিবাদে বরণ করা তিনি কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন।"

ইন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "রামায়ণ প'ড়ে কি আপনি এই শিক্ষা পেয়েচেন দাদা ?"

অব্জ হাসিয়া বলিল, "তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ ?—সাগর লঙ্ঘনের ?"

এই সাগর লঙ্ঘনের উল্লেখ যে তাহার বিলাত যাইবার কথা লইয়া তাহা বুঝিতে ইন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না, কিন্তু সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া ত্রেতাযুগের উপমাটাই চালাইয়া সে বলিল, "মহাবীর ব'লে আমাকে যদি মনে হয় তা হলে রামচন্দ্র হ'য়ে একবার আদেশ করুন না দাদা, কলিকাতা পুরী থেকে সীতা উদ্ধার ক'রে আনি!"

অজ বলিল, "উদ্ধার তো ক'রে আনবে—কিন্তু অগ্নি পরীক্ষার কথাটা ভুলে যাচ্চ, ভাই।"

ইন্দ্রনাথ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "শুধু কি তাই? তার পরেও হয়তো আবার নির্বাসন দেবেন, তারপর আবার ডেকে এনে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার কথা তুলবেন—তারপর হয় তো একেবারে পাতাল প্রবেশ।"

অজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে?"

ইন্দ্রনাথ বিরস মুখে বলিল, "না থাক—কাজ নেই!"

দুই

স্টার ফিল্ম্ কোম্পানী কলিকাতার একটি প্রধান ফিল্ম্ ব্যবসায়ী। ইহাদের বায়োস্কোপ গৃহ এবং ফিল্ম্ প্রস্তুত করিবার কারবার—দুই-ই আছে। বহুলক্ষ টাকা কারবারে খাটিতেছে। কোম্পানীর ফাইন্যান্সিং পার্টনার সুরেশ মিত্র উদ্যমশীল যুবক। ইংলণ্ড ও জার্মানী গিয়া বায়োস্কোপ সম্বন্ধে সর্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশে আসিয়া সে উন্নত পদ্ধতিতে বায়োস্কোপ গৃহ এবং ফিল্ম তৈয়ারীর কারবার খুলিয়াছে।

সকালে বায়োস্কোপের অফিস-রুমে একা বসিয়া সুরেশ একটা নূতন সিনারিয়োর পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় ইন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

খাতাখানা মুড়িয়া রাখিয়া সুরেশ বলিল, কী ইন্দ্রনাথ, এত সকালে কী মনে ক'রে?—বক্স্-টক্স্ কিছু চাই নাকি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "রেখে দাও তোমার বক্স্। আমার শালাজটিকে নিয়ে টানাটানি করছ—তোমার কান বক্স্ করতে এসেচি।"

সিগার-কেস্ হইতে একটি সিগার নিজে লইয়া এবং অপর একটি ইন্দ্রনাথকে দিয়া সুরেশ বলিল, "রহস্যজাল আর বেশি বিস্তার কোরো না—খুলে বল তোমার শালাজই বা কে, আর আমিই বা কেমন ক'রে তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছি।"

"কেন, তাঁকে তোমার ফিল্মের একজন আর্টিস্ট করে।"

সবিস্ময়ে ইন্দ্রনাথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, "সে কি হে? আমার আর্টিস্টদের মধ্যে তোমার শালাজ আবার কে? মাধুরী দেবী না কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ব্যাপারটা খুবই সিরিয়স,—চলো, তোমার প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে কথাবার্তা হবে।"

সুরেশ বলিল, "এখানে এখন কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই—তবু চলো, চেম্বারেই যাই।"

কথাটা শেষ হইতে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগিল। ইন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "এখন তা হ'লে চললাম, সুরেশ।"

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এসো। আমার দ্বারা যতটা হবার তার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ধন্যবাদ!"

তিন

এ ঘটনার দিন তিনেক পরে হঠাৎ একদিন বৈকালের দিকে ইন্দ্রনাথ শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ধমান হইতে পলাশডাঙা প্রায় সাত ক্রোশ পথ, তাহার মধ্যে দুই ক্রোশ কাঁচা সড়ক, পূর্ব হইতে পাল্কি অথবা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা না রাখিলে হাঁটিয়া যাইতে হয়। নূতন জামাই দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসায় জমিদার গৃহে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

রাজীবলোচন বলিলেন, "একটু খবর দিলে না কেন বাবা, তা হ'লে বর্ধমান স্টেশনে লোক-জন পাল্কি সবই হাজির থাকত।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "হঠাৎ এলাম ব'লে খবর দিতে পারি নি;—তা-ছাড়া শীতকালে দু ক্রোশ পথ হাঁটা তো একটুও কষ্টকর নয়।"

সন্ধ্যার পর রাজীবলোচন বৈঠকখানায় বসিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে, বাবা। সেইজন্যেই আমার আজ তাড়াতাড়ি আসা।"

মুখ হইতে নলটা খুলিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তোমার বিলেত যাওয়া সংক্রান্ত কিছু?"

"আজ্ঞে না, এর তুলনায় সে তো তুচ্ছ কথা। এ সত্যিই অতি গুরুতর ব্যাপার যার মধ্যে আপনার বংশ-মর্যাদা, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও, একান্তভাবে জড়িত।"

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় রাজীবলোচনের হাত হইতে আলবোলার নল খসিয়া পড়িল; ইন্দ্রনাথের নিকট একটু সরিয়া আসিয়া মৃদু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বউমাকে নিয়ে কোনও কথা না কি?" এই কথাটা সর্বদা তাঁহার মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া থাকিত।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "তাঁকে নিয়েই। স্টার ফিল্ম কোম্পানী নামে কলকাতায় খুব বড় একটা বায়োস্কোপের কারবার আছে। তারা "শ্বশুর-রাজ" নামক

দিয়ে একটা প্লে খুলচে—বৌদিদিকে আপনাদের পরিত্যাগ করার ব্যাপারটা তার আখ্যান-ভাগ। পলাশডাঙাকে করেচে পলাশপুর, অজদাদার নাম দিয়েছে পদ্মলোচন, আপনারও নাম ঐ রকম কী একটা দিয়েছে যাতে আপনাকে বুঝতে কষ্ট হয় না। "শ্বশুর-রাজে" বউদিদি প্রধান স্ত্রী-ভূমিকার পার্ট গ্রহণ করেচেন।"

আরক্ত নয়নে রাজীবলোচন বলিলেন, "ভূমিকা কী ?"

"চরিত্র—character.।"

রাজীবলোচন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "চুলোয় যাক—যা ইচ্ছে হয়, করুক। আমি তাকে একেবারে ত্যাগ করলাম। মাঘ মাসে অজর আবার বিয়ে দেবো !"

ইন্দ্রনাথ সবিনয়ে বলিল, "কিন্তু তাতে তো আর তারা নূতন ক'রে জন্ম হবে না, বাবা—তারা তো ধ'রেই রেখেছে যে, সম্বন্ধ চিরদিনের জন্যে ছিন্ন হয়েচে। অথচ আমাদের একটা কলঙ্ক-কাহিনী যুগ যুগ ধ'রে লোকচক্ষুর সামনে অভিনীত হবে। বৌদিদির পবিত্র মূর্তি অভিনেত্রীর রূপে সমস্ত পৃথিবীর ভদ্র-অভদ্র জনসাধারণের চোখে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে তো বলবে ইনি পলাশডাঙার সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের বউ !"

অস্থির ভাবে আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া লইয়া দুই তিন বার সজোরে টান দিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "কবে তারা অভিনয় আরম্ভ করবে ?"

"খুব সম্ভবতঃ বড়দিনের সময়ে ?"

"প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল এসব দিয়েচে ?"

"এখনও দেয়নি, কিন্তু আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেবে।"

"প্রোপ্রাইটারদের নামে নালিশ দায়ের ক'রে injunction পাওয়া যায় না ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "সে পরামর্শ আমি আমাদের একজন আত্মীয় উকিলের কাছে নিয়েছিলাম। তিনি বলেন, নালিশ করলে কোন ফল হবে না ; কারণ, প্রথমতঃ, ফিল্ম তোলানো আইনের চক্ষে গর্হিত কর্ম নয়—এবং দ্বিতীয়তঃ, বউদিদিকে ত্যাগ ক'রে তারপর তাঁর কার্যে হস্তক্ষেপ করবার আপনাদের কোনও অধিকার নেই। তা ছাড়া, নালিশ করলে কথাটাতো দেশময় জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।"

ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তুমি তা হ'লে কী করতে বল ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "আমি বলি, স্টার ফিল্ম কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার সুরেশ মিত্রকে এ বিষয়ে অনুরোধ ক'রে অভিনয় বন্ধ করানো। সুরেশের সঙ্গে আমারও একটু আলাপ আছে—আমিও তাকে চেপে ধরতে পারি। সে সত্যিই এক জন ভদ্রলোক।"

বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শের পর স্থির হইল পরদিন প্রাতে আহারাদি করিয়া

রাজীবলোচন ইন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা যাইবেন এবং সেখানে সুরেশ মিত্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া অভিনয় বন্ধ করাইবার চেষ্টা করিবেন।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে পাকা সড়কের মোড়ে একটা ট্যাক্সি হাজির রাখিবাব জন্ম রাত্রেই একজন লোক বর্ধমান চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারে বসিয়া অজ বলিল, "বাবা যে কথাটা আমার কাছেও ভাঙতে চান না—তোমাদের মতলবখানা কী বল দেখি, ইন্দ্রনাথ? রামায়ণের পালা নয় তো?"

মাছের মুড়া খাইতে খাইতে ইন্দ্রনাথ ক্ষণকাল বিষম খাইল, তাহার পর বলিল, "ক্ষেপেচেন দাদা? রাম বাদ দিয়ে কখনও রামায়ণ হয়?"

অজ বলিল, "তোমাদের পালায় সবই হয়।"

চার

পরদিন বেলা দুইটার কিছু পূর্বে ইন্দ্রনাথের সহিত রাজীবলোচন সুরেশ মিত্রের সিনেমায় পৌঁছিলেন। ইন্দ্রনাথের মুখে রাজীবলোচনের পরিচয় পাইয়া সুরেশ প্রভূত ভাবে রাজীবলোচনের সংবর্ধনা করিল,—আহার্য পানীয় আনাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া রাজীবলোচন সংযত ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু, তাঁহার দেহের মধ্যে প্রাচীন অভিজাত বংশের গর্বোদ্ধত ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সুরেশের আতিথ্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না—কাজের কথার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথের মুখে সকল কথা সবিস্তারে শুনিয়া সুরেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, "অনেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেচি—তা ছাড়া বড়দিনের তো আর মাস খানেকও দেরি নেই—নূতন ফিল্মের কী ব্যবস্থা করব সেও ভাবনার কথা।

রাজীবলোচনের যত্ন-নিরুদ্ধ ক্রোধ আর মানা না মানিয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ইন্দ্রনাথের আপনি বন্ধু ব'লেই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি—নইলে মর্কদমা দায়ের ক'রে শুধু এ পালাই নয়, আপনার বায়োস্কোপই বন্ধ ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রে যেতাম। আমার ব্যাঙ্কও এখানে—অ্যাটর্নি ব্যারিস্টারও এখানে।"

রাজীবলোচনের কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিয়া সুরেশ বলিল, "ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আপনার যেমন বিপদ আমারও তেমনি বিপদ দেখচি। আপনি যদি ইন্দ্রনাথের শ্বশুর না হতেন তা হ'লে আপনার এ অনুরোধ শুনে আপনাকে বসবার জন্যে চেয়ারও দিতাম না, চৌধুরী মশায়। আপনি ইন্দ্রনাথের শ্বশুর ব'লে আমার মান্য অতিথি,—আপনাকে রূঢ় কথা কিছুতেই বলব না—কিন্তু আপনি যদি এই কথাটা ভুলে না যান যে, কলকাতা পলাশডাঙা নয়, আর আমি আপনার প্রজা নই—তা

হ'লে আমার সঙ্গে কাজের কথাবার্তাগুলো ঢের সহজে হবার আশা আছে। মকর্দমার কথা আপনি বলচেন—কিন্তু—মকর্দমা করবার আপনার পক্ষের খরচাটাও যদি আমি বহন করি তা হ'লেও আমার লোকসান হয় না—কারণ মকর্দমা দায়ের হ'লে "শ্বশুর-রাজ" দেখবার জন্য কলকাতা ভেঙে পড়বে—এমন কি পলাশ-ডাঙা থেকেও লোক আসবে। কাজের কথা যদি কিছু থাকে তো বলুন, চৌধুরী মশায়। আমরা কুলি-মজুর মানুষ, আমাদের খেটে খেতে হয়, পলাশডাঙার ধনী জমিদারের মতো সময় নষ্ট করবার সুবিধে আমাদের নেই।"

রাজীবলোচন দেখিলেন সুরেশ শক্ত পাল্লা—পলাশডাঙার জলবায়ুর কোনও ক্রিয়া ইহার মধ্যে ফলে নাই, সুতরাং কাজের কথা হওয়াই ভালো। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, যে দশহাজার টাকা সুরেশ মালতীকে রয়ালটি স্বরূপ দিয়াছে তাহা রাজীবলোচন সুরেশকে প্রত্যর্পণ করিলে সুরেশ অভিনয় বন্ধ করিবার অঙ্গীকারপত্র রাজীবলোচনকে লিখিয়া দিবে।

এই কুৎসিত ব্যাপার যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া পলাশডাঙায় ফিরিবার জন্য রাজীবলোচন ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি পকেট হইতে চেক-বই বাহির করিয়া সুরেশের নামে দশ হাজার টাকার চেক্ লিখিয়া দিলেন।

সুরেশ বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে আপনার পুত্রবধূর বড় দাদার মতটা নেওয়াও একবার দরকার। অ্যাটর্নি মানুষ—কী জানি কোন্ দিক থেকে শেষে আপত্তি তুলবেন।" বলিয়া টেলিফোন তুলিয়া ডাকিল।

ক্ষণকাল কথাবার্তা কহিয়া সুরেশ বলিল, "ত্রিপুরাবাবু বলছেন, আপনি যদি দয়া ক'রে তাঁর ভগিনীকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দেন তা হলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। এর মধ্যে জীবিকা-অর্জনের কথাও রয়েচে কি না। পলাশডাঙার জমিদার বাড়ির পুত্রবধূ হ'য়ে অন্নবস্ত্রের জন্যে ভাইয়ের শরণাপন্ন হ'তে তাঁর আত্ম-সম্মানে আঘাত ক'রে।"

একটা কঠিন বাক্য একবারে ওষ্ঠের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু এই কুলিমজুর শ্রেণীর লোকটির জিহ্বার অসংবৃততা স্মরণ করিয়া তাহা রোধ করিলেন। আরক্তনেত্রে বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা,—তাই হবে।"

সুরেশ কোম্পানীর ছাপানো চিঠির কাগজে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া রাজীব-লোচনের হাতে দিয়া নত হইয়া রাজীবলোচনকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন, চৌধুরী মশায়—কিন্তু ভারী সুখী হয়েচি। আপনি যে ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিলেন তা আপনার মতো মহৎ বংশজাতরই উপযুক্ত!"

রাজীবলোচন কিছু বলিলেন না, পকেট হইতে তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া চাপা দিবার পূর্বেই চোখ দিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এত বড় পরাজয় তাঁহাকে জীবনে কোনও দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কাহারও আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিলেন না—সুরেশেরও না—ইন্দ্রনাথেরও না। হাওড়া স্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তিনি

চার দিনের মধ্যে একটা ভালো দিন দেখে অজকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো—বউমাকে নিয়ে যাবে। সঙ্গে তুমিও যেও।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "যাব।"

রাজীবলোচনের মনটা ভালো ছিল না—আর বিশেষ কথাবার্তা না কহিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথেরও উপর তাঁহার মনটা তেমন প্রসন্ন ছিল না।

পাঁচ

দিন পাঁচেক পরে বৈকাল চারটার কিছু পূর্বে মালতী, অজ ও ইন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশনে আসিয়া দিল্লী এক্সপ্রেসের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠিয়া বসিল। সে কামরায় আরো কয়েকজন মাড়োয়ারী প্যাসেঞ্জার ছিল।

অজ বলিল, "ইন্দ্রনাথ, তুমি যে মহাবীর তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু সীতা-উদ্ধারেই রামায়ণ শেষ হয় নি তা তো জানো।"

ইন্দ্র বলিল, "ও-সব অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না দাদা—কিন্তু আপনি আমার উপর অযথা প্রশংসারোপ করছেন। আপনি বরং সীতাদেবীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন যে, কোনও হনুমান কোনও দিন তাঁর অশোক-বনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল কি-না।"

অজ বলিল, "কলিকালের সীতা দেবী কি সহজে সে-কথা স্বীকার করবেন? হয় তো ব'লে বসবেন, তোমার একথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার কোথায়?"

উভয়ের কথা শুনিয়া মালতীর বোধহয় হাসি পাইতেছিল, সে জানলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়াইতে তিনজনে দেখিল, গাড়ির সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়াইয়া রাজীবলোচন। সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বধূকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছেন, মুখে কিন্তু সে-রূপ উৎসাহের চিহ্ন নাই।

মালতী গাড়ি হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরের পদধূলি লইল। রাজীবলোচন হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

অজ বলিল, "শরীরটা তেমন ভালো যাচ্চে না, এতখানা পথ না এলেই ভালো করতেন। যাবার সময় ঠাণ্ডা লাগবে।"

রাজীবলোচন বলিলেন, "আমি বেনারস এক্সপ্রেসে আজ কাশী যাচ্ছি, অবু।"

সবিস্ময়ে অজ বলিল, "কেন?"

রাজীবলোচন বলিলেন, "এখন কিছুদিন কাশী বাসই করব মনে করেছি। বউমা এলেন—সংসার বাঁধল—আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।" বলিয়া গ্রহণকালের রৌদ্রের মতো হাসিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ বুঝিল সত্যই রামায়ণ এখনও শেষ হয় নাই—এখনো পালা বাকি। সে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

অজলোচন এবং ইন্দ্রনাথ উভয়ে মিলিয়া অনেক বুঝাইল। অজ বলিল, "যেতেই যদি হয় কিছুদিন পরে না হয় যাবেন।" রাজীবলোচন কিন্তু কিছুতেই রাজি হইলেন না; বলিলেন, "আজ দিন ভালো আছে; তা ছাড়া উষ্‌খুস ক'রে বেরিয়ে পড়েছি—কাশীতেও বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। তোমরা চা-টা খাবে তো যাও। আমার গাড়ি আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি—আমি ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসি। বউমাও আমার সঙ্গে চলুন—তোমরা প্রস্তুত হ'লে ওঁকে নিয়ে যেও।"

ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়া মালতী কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "বাবা, আমি আসচি ব'লেই আপনি কাশী চ'লে যাচ্ছেন—কিন্তু বাবা, আমি তো আপনার কাছে কোন অপরাধ করিনি।"

রাজীবলোচন বলিলেন, "না অপরাধ ঠিক করো নি—কিন্তু তোমার কাছে আমি পরাজিত হয়েচি, বউমা। যার কাছে আমি পরাজিত হয়েচি তার সঙ্গে এক গৃহে বাস করবার মতো সহ্য-শক্তি আমার নেই।

মালতীর মুখে-চক্ষে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; আর্তস্বরে বলিল, "আপনি পরাজিত হবেন কেন, বাবা? আমি তো জানি আমাকে ক্ষমা করেচেন।"

"ও-রকম কদর্য উপায় অবলম্বন করলে কি ক্ষমা পাওয়া যায়, বউমা?"

"কি কদর্য উপায়, বাবা?"

"বায়োস্কোপে অভিনয় করা।"

"সে কি কথা, বাবা?"

রাজীবলোচন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন, তুমি স্টার ফিল্ম কোম্পানীতে দশ হাজার টাকা নিয়ে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র হ'য়ে তোমার ছবি তোলাও নি?"

মালতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে দুঃখার্ত কণ্ঠে বলিল, "এই অপরাধ আমি করেচি মনে ক'রে আপনি অভিমান ক'রে কাশী যাচ্ছিলেন, বাবা?—তা হ'লে তো আমাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করাই উচিত ছিল। নিশ্চয়ই কেউ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, বাবা!"

ক্ষণকাল মালতীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তুমি সে-রকম প্রতারণার কথাই কিছু জান?"

"কিছুমাত্র না। তবে আসবার আগে দাদা একটা মোড়া খাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, তাতে একটা দশহাজার টাকার চেক্ আছে—তিন মাস পরে আপনাকে দিতে। তা হ'লে খুব সম্ভবতঃ সেটা—"

বাহিরে জুতার শব্দ হইল—অজ বলিল, "বাবা, আমরা আসব?"

রাজীবলোচন নিম্নকণ্ঠে মালতীকে বলিলেন, "যে-সব কথা তোমার সঙ্গে হলো কাউকে বোলো না।" তারপর উচ্চ স্বরে বলিলেন, "এস।"

অজ ও ইন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে রাজীবলোচন বলিলেন, "কাশী যাওয়া বন্ধ করলাম—বউমার অনুরোধে। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা কর, নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।"

অপরিমেয় বিস্ময়ে ও আনন্দে অজ ও ইন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

কামনাদেবীর মন্দির

এক

সুবোধচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পড়িতেন এবং স্ত্রী মালতীর সহিত প্রণয়চর্চা করিতেন। মালতীর বয়স পনের বৎসর—দুই বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই দুইটি প্রাণীর পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণ তাহাদের কলহের সংখ্যা অনুপাতে নিরূপেয়। দিনের মধ্যে কারণে এবং অকারণে তাহাদের কলহ হইত দশবার; কারণ দশবারই কলহ মিটিয়া যাইবার সুযোগ পাইত। প্রতি দিবসের এই সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্য দিয়া প্রত্যহ উভয়ের মধ্যে যে জিনিসটা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা পরস্পরের প্রতি সুনির্মল প্রেম। ইস্পাতকে কঠিন করিতে হইলে যেমন একবার অগ্নিতে তপ্ত, এবং পরক্ষণেই জলে শীতল করিতে হয়, ঠিক সেই প্রণালী অনুরূপ, এই দ্বন্দ্ব ও সন্ধির দ্বারা তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম ক্রমশ সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

শরৎকালের আকাশকে যেমন বিশ্বাস নাই, এই মেঘমুক্ত, সুনির্মল, পরক্ষণেই সহসা কোথা হইতে মেঘ আসিয়া বৃষ্টিপাত করিয়া যায়—তেমনই এই দুইটি প্রাণীর হাসি এবং অশ্রুর বিষয়ে কোনও প্রকার নিশ্চয়তা ছিল না। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, প্রবল অভিমানভরে সুবোধ অঙ্ক কষিতেছে এবং মালতী পান সাজিতেছে—তাহার দুই ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সুবোধ হৃষ্টমনে কাব্য পাঠ করিতেছে এবং মালতী নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতেছে।

তখন কলিকাতা সহরে বেরীবেরী রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। একদল লোক যথার্থই রোগে এবং অপর একদল লোক বেরীবেরী রোগের অমূলক আশঙ্কায় ভুগিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও হয়তো কোনদিন একটু পদস্ফীতি বোধ হইয়াছিল, কাহারও বা হৃদয় একটু দুর্বল মনে হইয়াছিল। তাহাতেই তাহারা একটা মানসিক রোগের কল্পনা করিয়া ঐকান্তিক চিত্তে ভুগিতেছিল। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সুবোধ কোন শ্রেণীতে ভুগিতেছিল তাহার যখন কোন প্রকারেই মীমাংসা হইল না—তখন স্থির হইল যে সুবোধ কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু-

পরিবর্তনের জন্য যাইবে। সুবোধ যদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তো তাহাতে তাহার শরীর আরোগ্য লাভ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার মন সুস্থ হইবে। অতএব উভয়তই স্থান পরিবর্তনে সুবিধা আছে।
সুবোধের ধারণা হইয়াছিল, তাহার যথার্থই বেরীবেরী হইয়াছে। কিন্তু তাহার পিতামাতা এবং মালতীর ধারণা, চিকিৎসকগণের মতের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দাঁড়াইয়াছিল। সুবোধ ভাবিল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অধিক কি, স্ত্রী পর্যন্ত যখন তাহার রোগ অবিশ্বাস করিল, তখন বিদেশ যাওয়াই শ্রেয়। সেখানে অন্তত একজনও বিশ্বাস করতে পারে, এবং সেখানকার ডাক্তারগণ হয়তো কলিকাতার ডাক্তারগণের মতো মূর্খ না হইতেও পারে। এখানকার ডাক্তারেরা মৃত্যুর পূর্বে রোগ নির্ণয় করিতে পারে না—মৃত্যু দেখিয়া তখন রোগ স্থির করে।

সুবোধের বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ শিমলা শৈলে লাট সাহেবের অফিসে কর্ম করিতেন। স্থির হইল, সুবোধ শিমলায় যাইবে এবং তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিবে।

যাত্রা করিবার সময়ে মালতী সুবোধের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "ভগবান তোমার শরীর নীরোগ করে দিন—তুমি শীঘ্র বাড়ি এস।"

সুবোধ বলিল, "শরীর নয়, মালতী, মন। তোমরা তো বল আমার শরীর বেশ আছে, অসুখ আমার মনে। কিন্তু এ শরীর যদি আর না ফিরে আসে—অন্তত: তখন মনে করো যে, সত্য সত্যই—"

মালতী বাধা দিল। কী বলিয়া মালতী বাধা দিয়াছিল, কী কথা সে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং কী বেদনা সে ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার বক্ষ ফুলিয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল, উত্তরে সুবোধ কী বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে মালতী কী বলিয়াছিল, সে সকল কথা লেখা বাহুল্য মাত্র। স্ত্রী পশ্চাতে ফেলিয়া যে সকল পাঠক কখনও দূর দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা সে তথ্য সঠিক অবগত আছেন; এবং যাঁহারা অবগত নহেন তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

অবসন্ন মন এবং অসম্ভব-অধিক দ্রব্যাদি লইয়া সুবোধচন্দ্র পাঞ্জাব মেলের একটি বেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিল। পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া রেলগাড়ি যখন নক্ষত্রবেগে ছুটিল, তখন আত্মীয়-স্বজন, মালতী এবং বাংলা দেশকে সুবোধের উৎসাহ-হীন মন বারংবার নিষ্ফল প্রয়াসে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না! আপনারই অর্থব্যয়ে সে এমন ব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে তাহার দেহ, চিত্তের যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও, অতি দ্রুতগতিতে দূর হইতে দূরে ছুটিয়া চলিল।

দুই দিন অবিশ্রাম ধাবনের পর তৃতীয় দিন বৈকালে শিমলা স্টেশনে পৌঁছিয়া সুবোধ দেখিল, তাহার বন্ধু দেবেন্দ্র তাহার জন্য প্লাটফর্মে অপেক্ষা করিতেছে। দেবেন্দ্র সুবোধকে লইয়া গৃহে পৌঁছিল।

দেবেন্দ্রর গৃহ জ্যাকো (যক্ষ) পাহাড়ের পশ্চিমে, কার্ট-রোডের নিম্নে অবস্থিত। পূর্বে সুবিশাল জ্যাকো পাহাড়; তদুপরি অসংখ্য সরল দীর্ঘ কেলুগাছ তাহাদের ঘন বর্ণ লইয়া দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। দক্ষিণে উপত্যকা বেষ্টন করিয়া পর্বতমালা, দূরে পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত তারাদেবী রেলস্টেশন; পশ্চিমে বহুদূরে বালুগঞ্জের গৃহগুলি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, এবং উত্তরে ম্যালরোড পর্যন্ত শিমলা শহর স্তরে স্তরে উর্ধে উঠিয়াছে। সেই অপূর্ব স্নিগ্ধ-গম্ভীর দৃশ্য বঙ্গদেশাগত সুবোধের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিল।

দুই

"ভাই, আর তো শিমলা পাহাড় ভালো লাগে না। তুমি তো সমস্ত দিন অফিসে কাগজে কলমে যুদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরবে। এদিকে নিতান্ত সঙ্গীহীন হয়ে সমস্ত দিন কাটাতে আমার প্রাণান্ত হয়।"

প্রত্যূষে চা পান করিতে করিতে দুই বন্ধুতে গল্প হইতেছিল।

দেবেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়েছে। দুপুরবেলাটা তোমার নিতান্ত কষ্টে কাটে।"

সুবোধ বলিল, "ব্যবস্থা আমি নিজেই এক রকম করেছি। তোমাদের প্রতিবেশী ভদ্রলোকটির সহিত তোমাদের তো এ পর্যন্ত আলাপ হলো না। কিন্তু আমার সহিত কাল তাঁর আলাপ হয়েছে। তিনিও আমার মতো এখানে বেড়াতে এসেছেন। তিনি আজ আমাকে তিনটার সময় চা পানের নিমন্ত্রণ করেছেন।"

দেবেন্দ্র কহিল, শুনেছি, তিনি এলাহাবাদের একজন উকিল। এখানে সপরিবারে স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য এসেছেন। তাঁর কয়েকটি সুন্দরী কন্যা আছে। বড় মেয়েটি অতি সুন্দরী; বোধ হয় অবিবাহিতা। দেখো ভাই, একটু সাবধানে চা পান করো।" বলিয়া দেবেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

সুবোধ বলিল, "তুমি যে আমাকে সতর্ক করে দিলে, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। আমার জন্য তোমার কোনো শঙ্কা নেই।

অতি সুকঠিন হৃদয় আমার, অতি সুকঠিন চিত্ত,
এ নহে ময়ূর যে, মেঘ দেখিয়া অমনই করিবে নৃত্য।"

চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ নামাইয়া দেবেন্দ্র বলিল, "কিন্তু যদি হঠাৎ নৃত্য আরম্ভ করে, তখন যে থামান দায় হবে। 'শঙ্কা যেথা করে না কেউ, সেইখানে হয় জাহাজডুবি।' মালতী ফুল ভালো লাগা সত্ত্বেও যদি পাহাড়ী গোলাপ তোমার মন আকর্ষণ করে তো আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।"

সুবোধ কহিল, "আর যদি না আকর্ষণ করে, তা হলে বিস্মিত হবে

তো? হে বীর, তুমি কি এই আশঙ্কায় ভদ্র-লোকের সহিত এতদিন আলাপ পর্যন্ত কর নি? ছি, ছি, দুর্বল হৃদয়!

পাপের খোঁজে যেওনা ভাই চায়না কিংবা জাপান;
মনের মাঝেই পাপ মহাশয় দিবারাত্র লাফান।"

দেবেন্দ্র কহিল, "হে সবল হৃদয়, তোমার হৃদয়ের সবলতা দিন দিন বর্ধিত হোক—চায়ের পেয়ালা যেন কোন প্রকারে তার ব্যতিক্রম না করে, এই আমার প্রার্থনা!"

দেবেন্দ্রর কথায় সুবোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্তর্হিত দম্ভ ছিল যে, তাহার কঠিন মনকে সহজে বিচলিত করিতে পারে, পৃথিবীর মধ্যে এমন বিচিত্র বস্তু অতি অল্পই আছে। প্রতিবেশীর সুন্দরী কন্যা তো নিশ্চয়ই নহে, তা সে যতই সুন্দরী হউক না কেন। অভিমানে আঘাত পাইয়া সুবোধ বলিল, "তুমি নিজের দুর্বলতা দিয়ে আমাকে মাপবার চেষ্টা করছ!"

দেবেন্দ্র উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল।

তিনটা বাজিবার কিছু পূর্বেই পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য করিয়া সুবোধ তাহার প্রতিবেশী বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। বিপিনবাবু সুবোধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সুবোধকে অতিশয় যত্ন-সহকারে আহ্বান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গল্প করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধ বাবু, আপনার সহিত আজ জ্যাকো প্রদক্ষিণ করা যাবে। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। আর বিলম্ব করে কাজ নেই।"

সুবোধ আগ্রহ-সহকারে বলিল, "বেশ তো, আমারও জ্যাকো প্রদক্ষিণ করবার বিশেষ আগ্রহ আছে।"

বিপিনবাবু একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "চারু, আমাদের জন্য দু পেয়ালা চা দিয়ে যাও।"

সুবোধ ভাবিতে লাগিল, চারু কি বিপিনবাবুর পুত্র, না কন্যা? যদি কন্যা হয় তো চারুই কি দেবেন্দ্র-কথিত সেই সুন্দরী বালিকা?

একটি রূপার ট্রের উপর দুই পেয়ালা চা লইয়া চারুবালা কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবোধ দেখিল, দেবেন্দ্র একেবারে মিথ্যা বলে নাই—বিপিন বাবুর গৃহে চা পান করা সম্পূর্ণ নিরাপদ না হইতেও পারে। চারুবালার অনুপম শ্রী দেখিয়া সুবোধ স্নিগ্ধ হইয়া গেল। চারু ষোড়শ-বয়স্কা বালিকা—সুগঠিত সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেহে লাবণ্যের বর্ণটুকু সুবর্ণ পাত্রে গোলাপী মদিরার ন্যায় প্রভাময় বোধ হইতেছিল। সরল সুন্দর মুখে সলজ্জ হাস্যটুকু বর্ষাদিনান্তের রক্তাভ সূর্যকিরণের ন্যায়ই মনোরম!

বিপিনবাবু বলিলেন, "রাখ মা, এই টেবিলের উপর রাখ। সুবোধবাবু, এইটি আমার বড় মেয়ে চারু, আর এইটি আমার মেজ মেয়ে সুধা।"

একটি রূপার থালে কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া সুধা টেবিলের নিকট দাঁড়াইল

সুবোধ বলিল, "বিপিনবাবু, এ দুটি আপনার লক্ষ্মী আর সরস্বতী।"

চা-পানান্তে বিপিনবাবু বলিলে, "চলুন সুবোধবাবু এবার 'জ্যাকো-রাউণ্ড' দেওয়া যাক।"

সুবোধ বলিল, "চলুন—"

'জ্যাকো-রাউণ্ড' করিতে করিতে বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধবাবু, এই স্থানের নাম সন্‌জৌলি। এমন সুন্দর দৃশ্য বোধ হয় আপনি শিমলায় এসে পর্যন্ত দেখেন নি।"

সুবোধ বলিল "না।"

"সুবোধবাবু, আপনি Mathematics-এ কোন গ্রূপ নিয়েছেন?"

"B."

"আপনার বিবাহ হয়েছে কি?"

সুবোধের মাথার মধ্যে কি খেয়াল হইল, সে বলিয়া বসিল, "না"।

গৃহপ্রত্যাগমনের সময় বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধবাবু, আমার গৃহে আপনার চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ রইল—প্রত্যহ এবং যখন ইচ্ছা আসবেন।"

সস্মিতমুখে সুবোধ বলিল, "আমার সৌভাগ্য।"

তিন

সুবোধ যখন গৃহে ফিরিল, তখন দেবেন্দ্র আপাদ-মস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া সুবোধের সহিত চা পান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

দেবেন্দ্রকে দেখিয়া সুবোধ কহিল, "দোহাই তোমার, অন্ততঃ মাথা থেকে কাপড়টা খুলে ফেলো। তুমি যে শিমলা বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় আছ—দেহ যেন সেটা মধ্যে মধ্যে টের পায়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "আর তুমি যে শিমলা বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় এসেছ—সেটা যেন আমরা মধ্যে মধ্যে টের পাই। ধন্য তোমাকে! অক্টোবর মাসের দারুণ শীতে এই রাত্রি পর্যন্ত বেড়িয়ে বেড়াও! আমি তো অফিস থেকে আসতে আসতে কাঁপি।"

সুবোধ বলিল, "ভাই, আমাদের হৃদয়ে এখনও দাসত্বের দুর্বলতা প্রবেশ করেনি—তাই শীত সহজে কাঁপাতে পারে না—তোমাদের অবসন্ন মন, অবসন্ন—"

দেবেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা থাক—বিপিনবাবুর গৃহে কেমন চা পান করলে, বল?'

সুবোধ অত্যন্ত বেসুরা স্বরে বলিল, "সখা, কি কহব অনুভব মোয়, চা পান করিতে গরল ভখিনু পলে পলে নূতন হোয়।"

দেবেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, "বাঃ—পদাবলী একেবারে নির্ভুল কণ্ঠস্থ আছে!"

সুবোধ বলিল, "যাহোক—আমার অবস্থা বুঝলে তো ? হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো, নাচেরে, হৃদয় নাচেরে।"

দেবেন্দ্র বলিল, "অতি সুকঠিন চিত্ত, তাহলে অতি সহজেই নৃত্য আরম্ভ করলে ?"

ভৃত্যের হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তা করেছে, স্বীকার করতেই হবে।

শুনেছি, শুনেছি, কী নাম তাহার শুনেছি শুনেছি তাহা,
চারু, চারুবালা, চারুবালা, চারু, কেমন মধুর আহা।"

দেবেন্দ্র বলিল, "বড় মেয়েটির নাম চারুবালা, বুঝি ?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া গেল,

"চারুবালা চারু বাজিছে শ্রবণে,
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম ;
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে,
চারু, চারুবালা, মধুর নাম।"

দেবেন্দ্র সহাস্যে বলিল, "দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়,

পরিহাস করি' প্রণয়ের কথা,
বোলোনাক সখা বোলো না,
পরিহাস যদি করি' পরিহাস
পরিশেষে করে ছলনা।"

সুবোধ বলিল, "ছলনা করে তো নিতান্ত মন্দ হয়না, আমি প্রস্তুত আছি। একবৃন্তে যদি দুটি ফুল ফুটতে পারে তো এক হৃদয়ে কি দুজনের স্থান হ'তে পারে না ?"

দেবেন্দ্র বলিল "এ ঔদার্যের হিসাব তোমার গণিতশাস্ত্রের মধ্যে কোথাও লেখা আছে কিনা জানি না। যা হউক, বিপিনবাবুর বাটির চায়ের আস্বাদ শুধু চিনির দ্বারাই মিষ্ট নয়, তার মধ্যে অন্য রসেরও ক্রিয়া আছে।"

দেবেন্দ্রের কথাই ঠিক হইল। চিনির পরিমাণ সমান থাকা সত্ত্বেও, বিপিন বাবুর চা দিনের পর দিন মিষ্ট হই.ত মিষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সুবোধ ক্রমশ ঘড়ির কাঁটার মতো বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। গল্প গুজব, ক্রীড়াকৌতুক, পানাহারের মধ্য দিয়া বিপিনবাবু ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সহিত সুবোধের পরিচয় অতি অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রত্যুষে উঠিয়া সুবোধ বিপিনবাবুর গৃহে চা পান করিতে যাইত; মধ্যাহ্নে গল্প করিতে যাইত; এবং বৈকালে বিপিনবাবু ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সহিত একত্র ভ্রমণ করিত।

ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা বিচিত্র কিছুই ছিল না। কলিকাতায় পরস্পর-পার্শ্ববর্তী দুই পরিবারের মধ্যে দশ বৎসরেও যে পরিচয়টুকু ঘটিয়া উঠে না, বহুদূর

প্রবাসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা জাগিয়া উঠে। কলিকাতার পথে যাহার সহিত সহস্র বার সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং সহস্র বারই যাহাকে অপরিচিত বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছি, দূর প্রবাসের পথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে আর উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তখন তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সুখ-স্বাস্থ্যের সন্ধান লইয়াছি, এবং পরিশেষে হয়তো তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। কর্মহীন অখণ্ড অবসরের মধ্যে সুবোধকে লাভ করিয়া বিপিনবাবু তাহাকে সমগ্র অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলেন; এবং সুবোধের প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট উদাসীন মনও শিমলার পার্বত্য বিশালতার মধ্যে ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, বিপিনবাবু এবং তাঁহার আনুষঙ্গিক নানা-প্রকার বিচিত্রতার অভিনব আস্বাদ পাইয়া সুবোধও তাহা হইতে নিজেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করিল না।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সুবোধ, চারুবালা, এবং চারুবালার পিতামাতা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে সর্বাপেক্ষা চারুবালারই প্রতি সুবোধের মনোযোগ দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে। চারুবালার তাহাতে লজ্জা করিত, ভালোও লাগিত; চারুবালার মা মধ্যে মধ্যে বিরক্তি বোধ করিতেন; চারুবালার পিতা উপেক্ষা করিতেন; এবং সুবোধ নিজেকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না!

চারুবালার প্রতি সুবোধের আকর্ষণ যদি প্রথম দর্শনেই পূর্ণ আকারে সঞ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা সুবোধের পক্ষে কতকটা সহজ হইতে পারিত। কিন্তু কঠিন ব্যাধির ন্যায় তারা প্রতিদিনই অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার গতি যেমন ধীর তেমনই অব্যর্থ। তাহাকে সহজে অনুভব করা যায় না বলিয়াই সহজে তাহার প্রতিকার করিবার উপায় নাই! যখন সুবোধ স্পষ্টভাবে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল, তখন তাহা প্রায় দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একদিন বিপিনবাবুর স্ত্রী বিপিনবাবুকে বলিলেন, "সুবোধ চারুর সঙ্গে সময়ে সময়ে একটু বেশি মাখামাখি করে, অতটা আমার উচিত মনে হয় না।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আমি তো সুবোধের কোনও রকম অন্যায় আচরণ দেখিতে পাই নে। সুবোধ শিক্ষিত, বড়লোকের ছেলে, সুশ্রী; সুবোধের সহিত চারুর বিবাহ হলে কেমন হয় বল দেখি? চারুর প্রতি সুবোধের একটু ভালোবাসা পড়ে গেলে সেটা সহজেই হ'তে পারবে!"

বিপিনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "এর মধ্যেও যে তোমার ওকালতী বুদ্ধি আছে, তা জানতাম না। কিন্তু চারুর অদৃষ্ট কি এত ভাল হবে?"

যতদিন চারুবালার প্রতি সুবোধের আসক্তি কোনও প্রকার অসঙ্গত ভাব ধারণ করে নাই, ততদিন সুবোধ কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু আকর্ষণ যেমন উত্তরোত্তর ন্যায় এবং সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল, সুবোধ সেই অনুপাতে ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিল। একদিকে চারুবালার স্নিগ্ধ মূর্তি, সুমিষ্ট

হাস্য এবং সুমধুর বাক্য সুবোধকে নেশার মতো চাপিয়া ধরিল; অপর দিকে নিরপরাধা মালতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে নির্মমভাবে দংশন করিতে লাগিল। এক একদিন বিপিনবাবুর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুবোধ প্রতিজ্ঞা করে, পরদিন কোন-মতেই চারুবালাদের বাড়ি যাইবে না; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতেই শয়তান তাহার কানে কানে বলে, 'চল, চল, চারুবালার সুন্দর মুখের শোভা দেখিবে চল, সুমিষ্ট কথা শুনিবে চল, চারুবালার প্রচ্ছন্ন প্রেম উপভোগ করিবে চল। মালতী তো চিরদিন আছে এবং চিরদিন থাকিবে, চারুবালা দুদিনের সৌভাগ্য, দুদণ্ডের শোভা, ক্ষণিকের খেলা! যে দিন তাহার সৌন্দর্য উপভোগ না করিবে সে দিনই ব্যর্থ; যে মুহূর্তে তাহার কথা চিন্তা না করিবে সে মুহূর্তই বিফল! সন্ধ্যার মোহ যেমন অলক্ষ্যে মাতালকে মদের দোকানে উপস্থিত করে, সেইরূপ সকল তর্ক এবং সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া সুবোধ যে স্থানে উপস্থিত হইত, তাহা বিপিনবাবুর গৃহ; এবং যাহাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সে চারুবালা ভিন্ন অপর কেহই নহে।

দেবেন্দ্র বলিল, "অন্ধভাবে, সে যেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তেমনিই তাকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তুমিও প্রেমে অন্ধ হয়ে ভাবছ, তোমাকে কেউ বুঝতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সবাই তোমাকে বুঝতে পেরেছে।"

সুবোধ বলিল, "সেজন্য আমি সবাইকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে চাচ্ছিনে। সবাই নিজ নিজ বুদ্ধি নিয়ে তথ্য আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকুক, আমি ততক্ষণ আপনার সুখ নিয়ে সুখী হই।"

দেবেন্দ্র বলিল, "তুমি যাকে সুখ বলছ, সেটা যথার্থ সুখ কি না, সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি।"

সুবোধ বলিল, "দোহাই তোমার, সুখকে অত বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন দর্শন শাস্ত্রের মধ্যেই হয়, জীবনের মধ্যে হয় না। সুখ বলিতে কী বুঝায়, সেই তো একটা প্রহেলিকা, তার উপর আবার যথার্থ সুখ কী তাই নিয়ে তর্ক করলে যথার্থ সুখ অন্তর্হিত হয়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "বাঙালী যুবকদের এ একটা মস্ত দুর্বলতা যে, কোন সুন্দরী বালিকার সংস্পর্শে আসলে, তাকে ভালোবাসতেই হবে। আমার কথা শোন, হৃদয় নিয়ে এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করো। মালতী এবং চারুবালা উভয়ের প্রতিই তুমি সমান অন্যায় আচরণ করছ!"

সুবোধ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি কথা, এ নিষ্ঠুর খেলার সমাপ্তি যত শীঘ্র হয়, ততই ভালো; কিন্তু এর একমাত্র প্রতিকার—শিমলা ত্যাগ করা। আমি ভাই, কাল কলকাতা যাব।"

দেবেন্দ্র হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "আমার কথায় যদি তোমার মনে কষ্ট হয়ে থাকে তো আমাকে ক্ষমা করো, কিন্তু তোমার ব্যাধির

চেয়ে প্রতিকার ভীষণ। চারুবালার মোহ কি এতই কঠিন, এবং তোমার মন কী এতই দুর্বল যে শিমলা ছেড়ে পালানো ভিন্ন উপায় নেই।"

বাস্তবিক অন্য উপায় ছিল না। সুবোধ চেষ্টা যে করে নাই, তাহা নহে। অনেকবার সে আপনাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সক্ষম হয় নাই। চারুবালার মুখে কী মাদকতা আছে, তাহার বাক্যে কী সুধা ক্ষরিত হয় যে তাহা হইতে সুবোধের কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। চারুবালা যখন বলে, সুবোধবাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন, তখন এই সামান্য কথার শব্দ ও অর্থে সুবোধের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠে। তাহার মনে হয়, বিশ্বজগতের মধ্যে তাহার যাহা কিছু কামনার আছে, তাহা যেন চারুবালার রূপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে; বলিতেছে—কাল আরও একটু শীঘ্র শীঘ্র এই সৌন্দর্য পান করিতে আসিয়ো, এই আকাশের মতো স্বচ্ছ ও উদার চক্ষু দুটির মর্মস্পর্শী দৃষ্টি গ্রহণ করিতে, এই প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ মুখখানির সলজ্জ হাস্য দর্শন করিতে, এবং এই কণ্ঠনির্গত বীণাবিনিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিতে। পরদিন নানা-প্রকার তর্ক, চিন্তা, গবেষণা এবং ইতস্ততঃ করিয়া সুবোধ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হয়।

চার

বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় সুবোধ ও বিপিনবাবু উভয়ে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এবং চারুবালা ভ্রমণে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রিক্শর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিপিনবাবুর মনোযোগ ছিল সুবোধের প্রতি, এবং সুবোধের মনোযোগ ছিল চারুবালার প্রতি।

চারুবালাকে আজ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। একটি নীলাম্বরী শাড়ি চারুবালার দেহকে সুন্দরভাবে বেষ্টন করিয়া বর্ণের গৌরব শত গুণ বর্ধিত করিয়াছিল; মনে হইতেছিল, চারু যেন একটি মেঘ-বেষ্টিত চন্দ্র। যত্নবদ্ধ বেণীর চারিপাশে সুগন্ধ নারগেশ (নারসিসাস্) পুষ্পের মাল্য জড়িত, এবং পদদ্বয় শুভ্রবর্ণ মোজা এবং জুতায় আবৃত। চারুবালার গণ্ডদুটি শীত-বায়ুর প্রভাবে সুপক্ক আপেলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মুগ্ধনেত্রে সুবোধ তাহাই দেখিতেছিল।

বিপিনবাবু বলিলেন, "দেখুন, সুবোধবাবু, শিমলায় অনেক রকম গাছ দেখা যায়, তার মধ্যে চারটেই প্রধান—কেলু, চিড়, বরাস, বাণ। বাণ কী জানেন?—ওক। আপনার হাতে ওটা ওকেরই ছড়ি। এখানে কুসুমটি বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে অতি সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়।"

সুবোধ বলিল, "একদিন আপনার সঙ্গে কুসুমটি যাওয়া যাবে।"

বিপিনবাবু আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "বেশ তো, কালই যাওয়া যাবে। আজ আমার শরীরটা ভালো নেই, আজ বেরোব না মনে করছি। চারু, তোমার রিক্শ

এসেছে, তুমি বেড়িয়ে এস। সুবোধবাবু, আপনি যদি অনুগ্রহ করে চারুর সঙ্গে বেড়াতে যান তো ভালো হয়। একা যাওয়া ভালো নয়। শিশিরও বাড়ি নেই।"

শিশির বিপিনবাবুর বিংশতি-বৎসর-বয়স্ক পুত্র।

সুবোধ আগ্রহ ভরে বলিল, "নিশ্চয়ই যাব। চারু, আজ তোমার কোনদিকে যাবার ইচ্ছা?"

চারু হাসিয়া বলিল, "যে দিকে হয় চলুন।"

সুবোধ বলিল, "চল, আজ এলিশিয়ম্ রাউণ্ড দেওয়া যাক।

বিপিনবাবু বলিলেন, "তাই বেশ হবে।"

চারু রিক্‌শ করিয়া চলিল, এবং সুবোধ তাহার পাশে পাশে পদব্রজে চলিল।

চারু বলিল, "সুবোধবাবু, এলিশিয়ম্ তো অনেকদিন গিয়েছি, আজ আমাকে প্রস্পেক্টে নিয়ে চলুন, সেখানে শুনেছি কামনাদেবীর মন্দির আছে।"

প্রস্পেক্ট শিমলার দুই মাইল পশ্চিমে বালুগঞ্জে একটি অতি মনোরম গিরিশৃঙ্গ। তাহার শিখরদেশে কামনাদেবীর মন্দির এবং খানিকটা সমতল ভূমি। তথা হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য যেমন বিশাল, তেমনই গম্ভীর, তেমনই সুন্দর! প্রস্পেক্টের শিখর হইতে সূর্যাস্ত দেখিতে অতি মনোহর।

প্রস্পেক্ট যাইবার কথা শুনিয়া সুবোধ মনে করিল, অতদূরে একাকী চারুবালাকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না, বিপিনবাবু শুনিলে মনে মনেও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু শয়তান পুনর্বার কানে কানে বলিল, 'চারুবালাকে লইয়া একাকী প্রস্পেক্টের শিখর হইতে সূর্যাস্ত দেখার সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর হইবে না, চেষ্টা করিলেও হইবে না। এ সৌভাগ্য পরিত্যাগ করিলে পরে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে।, সুবোধের অত্যন্ত লোভ হইল; সে চারুবালাকে বলিল, "তোমার বাবা যদি রাগ করেন?"

চারু বলিল, "আপনার সঙ্গে গেলে কখনও রাগ করবেন না।"

সুবোধ তৎক্ষণাৎ আর একটা রিক্‌শ ভাড়া করিয়া তাহাতে নিজে উঠিয়া বসিল। দুইখানা রিক্‌শ দ্রুতবেগে বালুগঞ্জের দিকে ছুটিল।

প্রস্পেক্টের শিখরে আরোহণ করিতে হইলে অর্ধ পথ পর্যন্ত রিক্‌শ করিয়া যাওয়া চলে; তাহার পর আর রিক্‌শ চলে না, হাঁটিয়া যাইতে হয়।

রিক্‌শ হইতে নামিয়া সুবোধ বলিল, "চারু, তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমার হাত ধরে চল।" বলিয়া সুবোধ চারুবালার হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিল। শীতল বায়ুতে সুবোধের হস্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। চারুবালার হস্ত হইতে তড়িৎ প্রবাহ সুবোধের দেহমধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, এবং তাহার বিপরীত প্রবাহ চারুবালার বক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া হৃদয়ের স্পন্দন বর্ধিত করিয়া তুলিল। অনেক সময় হৃদয়ের কথা হৃদয় যেমন নীরবে অনুভব করিতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করিলে তদপেক্ষা স্পষ্টতর হয় না। সুবোধ যাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব

করিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া চারুবালা লজ্জিত হইতেছিল, এবং চারুবালা লজ্জিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া সুবোধ উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

উভয়ে যখন প্রস্পেক্টের শিখরদেশে পৌছিল তখন সূর্য অস্তাচলে নিমগ্ন হইবার কিছুক্ষণ বিলম্ব ছিল। চারুবালা প্রথমে কামনাদেবী দর্শন করিল। তৎপরে সুবোধ চারুকে লইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিয়া শিখরস্থ মুক্তস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য অনির্বচনীয় সুন্দর। নিম্নে গভীর উপত্যকার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের শস্যক্ষেত্র ও ছোট ছোট গ্রামগুলি সুদক্ষ শিল্পীর তুলিকার দ্বারা চিত্রিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। উপত্যকার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া বিশাল পর্বত শ্রেণী, গগন ভেদ করিয়া উর্ধে উঠিয়াছে। পর্বতের গাত্র দিয়া বক্রগতি রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন এক প্রকাণ্ড সরীসৃপ অলস ভাবে পর্বতগাত্র বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। সম্মুখে বহুদূরে স্তূপীকৃত চুনের মতো তুষার-মণ্ডিত পর্বতমালা, সুনীল গগনের পৃষ্ঠে পবিত্রতার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, এবং পশ্চাতে বড় শিমলার অসংখ্য গৃহ-শ্রেণী পর্বতগাত্রে গ্যালারীর মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত।

দেখিয়া চারুবালা মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার বদনে বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার দেখিয়া সুবোধ বলিল "চারু, কেমন দেখচ?"

চারু নিশ্চল রহিয়া বলিল, "চমৎকার!"

সুবোধ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে দূরে একটা পাহাড় দেখচ, উহার পিছন দিকে 'তালপাহাড়' বলে একটা পাহাড় আছে; সেখানকার দৃশ্য আরও চমৎকার, দেখলে যেন পরীদের দেশ বলে মনে হয়।"

কিছু দূরে একটা বেঞ্চ ছিল, সুবোধ সেটা বহন করিয়া আনিয়া সুবিধা মতো করিয়া স্থাপন করিল। তখন সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে। সুবোধ বলিল, "চারু এই বেঞ্চিতে বসে সূর্যাস্ত দেখ।"

চারু উপবেশন করিলে সুবোধ তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

"চারু, অত কাঁপছ কেন? তোমার কি শীত কচ্ছে?

চারু বলিল, "না।"

"আমার গায়ের কাপড়টা তোমার গায়ে দিয়ে দেব?"

পুনর্বার চারু বলিল, "না।"

"না, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে," বলিয়া সুবোধ নিজের গাত্রবস্ত্র চারুবালার দেহে জড়াইয়া দিল। কিন্তু চারুবালার সহিত কথা কহিতে সুবোধের কণ্ঠস্বর কেন কাঁ[illegible]তেছিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সামর্থ্য চারুবালার ছিল না, সাহসও ছিল না।

অস্তমান সূর্যের রক্তাভ কিরণপাতে চারুবালার মুখের অপূর্ব শোভা হইয়াছিল, সুবোধ মুগ্ধ নেত্রে তাহাই দেখিতেছিল। সে রক্তবর্ণের মধ্যে কতখানি সূর্যকিরণের দ্বারা এবং কতখানি লজ্জার দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। সুবোধ সে হিসাব পরিত্যাগ করিয়া শুধু তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

তখন সূর্য পর্বতের অন্তরালে অর্ধ-নিমজ্জিত হইয়াছে। চতুর্দিক রক্তবর্ণ ধারণ

করিয়াছে। দিবস যেন বিদায়কালে পশ্চিম আকাশকে শেষ চুম্বন দান করিতেছে, সেই লজ্জায় পশ্চিমাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

অলক্ষ্যে সুবোধের হস্ত চারুবালার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং অলক্ষ্যে সুবোধের মুখ চারুবালার কর্ণের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইল। সুবোধ ধীরস্বরে ডাকিল, "চারু।" মন্ত্রচালিতের মতো চারুবালা ধীরে ধীরে সুবোধের দিকে মুখ ফিরাইল। তখন মুহূর্তের মধ্যে সুবোধের মন হইতে বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হইল। আকাশ, পর্বত, বিপিনবাবু, মালতী, দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত লুপ্ত হইল। রহিল কেবল চক্ষের সম্মুখে চারুবালার সুধামিশ্রিত রক্তিম অধর! মুহূর্তের জন্য সুবোধের লোলুপ অধর চারুবালার অধরে স্থান লাভ করিল। কিন্তু সে মুহূর্তেরই জন্য। সচকিত হইয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল পশ্চাতে মন্দিরের সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বলিল, "পরসাদ লেও, মায়ী।"

চারুবালা ভক্তিভরে হস্ত পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল—কয়েকটি বাতাসা এবং কিসমিস।

তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

পাঁচ

সুবোধ বলিল, "আমি অকপটে সমস্ত কথা তোমাকে বলেছি; তা শুনে, আমি যদি কাল চলে যাই, তোমার দুঃখ করা উচিত নয়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "উচিত অনুচিত বিচার করে দুঃখ বোধ হয় না! দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেই দুঃখ বোধ হয়। তুমি যে কারণেই চলে যাও-না কেন, তোমার অভাব আমাকে একই মাত্রায় কষ্ট দেবে।"

সুবোধ বলিল, "আমি মালতীর প্রতি অন্যায় করেছি, বিপিনবাবুর প্রতি অন্যায় করেছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায় করেছি চারুবালার প্রতি। তাকে নিয়ে দুদিন নিষ্ঠুরভাবে খেলা করে, অবশেষে তাকে অবহেলায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। এত জঘন্য স্বার্থপরতা আর কী হতে পারে! সে যখন দুদিন পরে সব জানতে পারবে, তখন ভাববে, একটা নিষ্ঠুর জানোয়ার শিমলা পাহাড়ে বেড়াতে এসে তার হৃদয় নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে চলে গেছে!"

দেবেন্দ্র সুবোধকে একটু সান্ত্বনা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "তুমি এমন কিছু অন্যায় আচরণ করনি, যার জন্য এতটা অনুশোচনা করতে পার। এ দুদিনের কথা দুদিনেই সকলে ভুলে যাবে।"

সুবোধ বলিল, "সবাই ভুলে যাবে, কেবল ভুলবে না দুটি প্রাণী—যে অন্যায় করেছে, এবং যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আমি চারুবালার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি চারুবালার আছে।"

দেবেন্দ্র বলিল, "সব তো হ'ল। তোমার বেরীবেরীর সংবাদ কী? সে পাপ গিয়েছে তো?"

সুবোধ বলিল, "সে অনেক দিন গিয়েছে। বৃহৎ পাপের মধ্যে ক্ষুদ্র পাপের লয় হয়েছে। এখন এ পাপের কবল থেকে উদ্ধারের জন্যে কাল বাংলা দেশে পালাতে হবে। পাহাড়ের উপর এর একটা সম্ভব মতো মিটমাট হবার কোন উপায় নেই।"

রাত্রে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে সুবোধ অস্থির হইয়া উঠিল। নিজ হৃদয়ের দুর্বলতা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে বিবাহিত, মালতী তাহার স্নেহময়ী সুন্দরী পত্নী, তবে তাহার এ মূঢ়তা হইয়াছিল কেন? সুবোধ নিশ্চল হইয়া মালতীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অসুখের সময় মালতীর প্রাণপণ সেবা, সুবোধের মানসিক উত্তেজনার সময় মালতীর সুমধুর সান্ত্বনা, শিমলা আসিবার দিন বিদায়কালে মালতীর সকরুণ ব্যবহার, আরও কতদিনকার কত সুখময় স্মৃতি! এমন গুণবতী স্ত্রীর প্রতি সুবোধ নির্মমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছে! সুবোধ হৃদয়ের মধ্যে বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করিল।

আর একটি নির্মল কুসুম চারুবালা, শরৎকালের শিশিরস্নাত শেফালির মতো ঢল ঢল করিতেছিল; সুবোধ তাহাকে মলিন করিয়াছে, তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াছে —শুধু ক্রীড়াচ্ছলে, শুধু নির্দয়ভাবে। প্রস্পেক্টের ঘটনা চারুবালার চিরদিন স্মরণ থাকিবে, চিরদিন সে সুবোধকে অসচ্চরিত্র প্রবঞ্চক বলিয়া মনে রাখিবে, চিরদিন তাহার হৃদয়ে সুবোধের স্মৃতি মসীময় হইয়া থাকিবে। হায়, অজ্ঞান-হৃদয়া, সরলা বালিকা! সে নিষ্পাপ অন্তঃকরণে সুবোধকে বিশ্বাস করিয়াছিল, সুবোধ সে সুযোগের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে! তাহার শিক্ষাকে ধিক্, তাহার সভ্যতাকে ধিক্, তাহার রুচিকে ধিক্! কিছুই তাহার দুর্বল হৃদয়কে রক্ষা করিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে যখন দেবেন্দ্র সুবোধের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সুবোধ মহা উৎসাহের সহিত পোর্টম্যাণ্ট, ক্যাশবাক্স, বিছানা-পত্র গুছাইয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মুখ হইতে পূর্বরাত্রের সে অস্থিরতার চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্র বলিল, "আজই নাকি?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "আজই।"

দেবেন্দ্র বলিল, "এ কঠিন মন দুদিন পূর্বে কোথায় ছিল? তা হলে তো কোন গোলই হতো না। যত কাঠিন্য কি শিমলা ত্যাগ করবার সময়েই জুটল?"

সুবোধ বলিল, "পূর্বকাল অবহেলা করে যেই জন,
পশ্চাত তাহারে ব্যথা দেয় অনুক্ষণ।

পূর্বে যদি একটু কঠিন হতে পারতাম, তা হলে এখন এত কঠিন হবার কোনও প্রয়োজন হতো না। মন্দ ছেলের মতো স্কুল ছেড়ে পালানো ভিন্ন আমার আর কোনও উপায় নেই, অত্যন্ত পেছিয়ে পড়েছি।"

দেবেন্দ্র বলিল, "সে হচ্ছে না। তুমি যে ভীরুর মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবে, তা হবে না। আরও কিছুদিন এখানে থেকে, শরীর এবং মন দুই সুস্থ করে তবে তুমি যেতে পাবে। শুধু তোমার মন নয়, চারুবালার মনও সুস্থ করে দিয়ে যেতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "দোহাই তোমার, আমি অত বড় বীর নই! তা যদি হতাম, তাহলে প্রথম যুদ্ধেই অমন শোচনীয় পরাজয় হতো না। আমি কাপুরুষ, আমাকে কাপুরুষের মতো পালাতে দাও; বাধা দিও না।"

কিন্তু সশরীরে বাধা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একটি বাবু এসেছেন," এবং তাহার পশ্চাতে বিপিনবাবুর পুত্র শিশির প্রবেশ করিল।

শিশির উভয়কে নমস্কার করিয়া বলিল, "সুবোধবাবু, আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ি আপনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। আজ অন্য দিনের মতো নয়, আজ একটু বিশেষভাবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি।"

সুবোধ বলিল, "বিশেষভাবে কী রকম?"

শিশির হাসিয়া বলিল, "সে এখন বলব না, যথাসময়ে টের পাবেন।"

সুবোধ বলিল, "কিন্তু আমি যে আজ কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করছিলাম।"

শিশির কক্ষ-মধ্যস্থ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কই, আমরা তো কিছু জানতাম না; হঠাৎ আজকে চলে যাচ্ছিলেন যে?"

কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া সুবোধ বলিল, "হঠাৎ একদিন এসেছিলাম, হঠাৎ একদিন চলে যাচ্ছি।"

শিশির বলিল, "আজ আপনার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। আজ রাত্রে আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।"

সুবোধ অর্ধ-সজ্জিত পোর্টম্যাণ্টুর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবেন্দ্র বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় সুবোধ আপনাদের বাড়ি নিশ্চয়ই যাবে। আপনারা নিমন্ত্রণ করে ভালোই করেছেন। না করলেও আজ সুবোধের যাওয়া হতো না। আমি সুবোধের জন্য দায়ী রইলাম।"

শিশির বলিল, "তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

দেবেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই।"

শিশির প্রস্থান করিলে সুবোধ বলিল, "বিশেষভাবে নিমন্ত্রণের কী অর্থ, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে। চারু কি সব কথা বলে দিয়েছে? শেষ কালে বিশেষভাবে প্রহার খেয়ে আসতে হবে না তো?"

দেবেন্দ্র বলিল, "বাস্তবিক, বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা কী, আমিও ঠিক বুঝতে পারচিনে।"

সুবোধ বলিল, "আমি যেমন যাচ্ছিলাম, চলে যাই। তুমি সন্ধ্যার সময় আমার প্রতিভূ হয়ে নিমন্ত্রণে যেয়ো।"

দেবেন্দ্র বলিল, "মন্দ নয়, আগাগোড়া কাব্য তুমি উপভোগ করে পালাবে, আর প্রহারের নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করব! মধু এবং কণ্টক, দুই-ই তোমাকে সহ্য করতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "আমি আজ নিশ্চয়ই চলে যেতাম, কিন্তু আজ রাত্রের ব্যাপারটা না দেখে যেতে পারছিনে। কালই যাব।"

সুবোধের মনে চারুবালার মোহ আবার নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার চারুবালাকে দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইল। কামনাদেবী পর্বতের ঘটনার পর চারুবালার কী প্রকার ভাবান্তর হইয়াছে, সুবোধের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে কী কথা বলিবে, কেমন করিয়া তাহার মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিবে, কী কথা সে ভাষায় প্রকাশ করিবে না, এবং কী কথা সে ভাবে ব্যক্ত করিবে ইত্যাদি জানিবার জন্য তাহার অতিশয় কৌতূহল হইতে লাগিল। উৎসুক হৃদয়ে বোধ সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় রহিল।

সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত সুবোধচন্দ্র বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। প্রথমেই বারান্দায় বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাত।

বিপিনবাবু বলিলেন, "এস সুবোধ, ঘরের মধ্যে গিয়ে বস, আমি এখনই আসছি।"

বিপিনবাবুর সম্ভাষণ শুনিয়া সুবোধ একটু বিস্মিত হইল। অবশ্য বিপিনবাবুর সহিত সুবোধের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একদিনও তো তিনি 'সুবোধ' এবং 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করেন নাই; আজ সহসা পরিবর্তনের কী অর্থ? তবে কি চারুর সহিত বিবাহের জন্য বিপিনবাবু আজ সুবোধকে অনুরোধ করিবেন? তাহা হইলে তো মহাবিপদের কথা!

চিন্তিত হৃদয়ে সুবোধ ঘরে গিয়া বসিল। কিন্তু বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সুধা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জামাইবাবু, মা আপনাকে বাড়ির ভিতর ডাকছেন।"

শুনিয়া সুবোধের বিশ্বাস হইল না। সে মনে ভাবিল, হয় সুধা ভুল বলিতেছে, নয় কর্ণ ভুল শুনিতেছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কী বলছ, তুমি?"

সুধা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল, "মা আপনাকে বাড়ির ভিতর ডাকছেন। আপনি আসুন।"

সুবোধের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। সমস্ত ব্যাপার তাহার নিকট দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তবে কি ইহারা চারুর সহিত তাহার বিবাহ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন! না, আর কোন রহস্য ইহার ভিতর নিহিত আছে? না, সুবোধ স্বপ্ন দেখিতেছে? না, সুধা প্রলাপ বকিতেছে?

বারান্দা হইতে বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধ, বাড়ির ভিতর যাও।"

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সুবোধ সুধার সহিত অন্দরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে বিপিন-বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে সে প্রথমে নত হইয়া প্রণাম করিল। বিপিনবাবুর স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারুবালা মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। দেখিয়া উদ্বেগে ও বিস্ময়ে সুবোধের মস্তক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, এবং ললাট নভেম্বর মাসের শীতেও স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তুমি যে আমাদের এত আপনার, তাতো পূর্বে জানতাম না। কাল সন্ধ্যার সময় মালতীর চিঠি পেয়ে টের পেলাম।—কয়েকদিন হলো চারু মালতীকে চিঠি লিখেছিল, সে তার উত্তর দিয়েছে। সে জানত না যে আমরা শিমলা এসেছি। তোমার একটা ফটোও পাঠিয়ে দিয়েছে।"

বিপিনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মালতী আমার ভাগ্নী; তোমার বিবাহের সময় আমরা তো উপস্থিত হতে পারিনি, সেই জন্য তোমাকে দেখে চিনতে পারিনি। আর আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে তুমি অবিবাহিত। তুমি বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে একদিন আমাকে সেইরূপ বলেছিলে।"

লজ্জায়, ঘৃণায়, সঙ্কোচে সুবোধের মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। ছি, ছি, মামা-শ্বশুরের সহিত প্রতারণা এবং শ্যালিকার সহিত প্রেম! বিপিনবাবুর প্রচ্ছন্ন ভৎর্সনা সুবোধকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল।

কোন প্রকারে আহার সমাপন করিয়া সুবোধ যখন বিশ্রামের জন্য একটু বসিল, তখন তাহার নিকট চারু এবং সুধা ভিন্ন অপর কেহ ছিল না।

সুবোধ বলিল, "চারু, মালতীর চিঠিটা একবার দেখাবে?"

চারু মালতীর পত্র আনিয়া সুবোধকে দিল। অন্যান্য কথার মধ্যে তাহাতে লেখা ছিল—"তোমার জামাইবাবু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র শিমলায় চেঞ্জে গেছেন! তাঁর সন্ধান পাবার তোমাদের কোন সম্ভাবনা নেই। আমি তাঁর একটা ফটো পাঠালাম। তাই দেখে যদি তাঁকে বার করতে পার!"

সুবোধ বলিল, "ফটোটা দেখি।" চারু সুবোধের হস্তে ফটো দিল।

সুবোধের সর্বোৎকৃষ্ট ফটোটি মালতী চারুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ফটোর পশ্চাৎভাগে লিখিত—"সস্নেহে চারুবালাকে প্রদান করিলাম।" দেখিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। ফটো ও পত্র চারুকে প্রত্যর্পণ করিয়া সুবোধ বলিল, "সুধা, একটা পান আন তো।"

সুধা পান আনিতে চলিয়া গেল।

"সুবোধ বলিল, "চারু, আমি তোমার নিকট অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।"

শুনিয়া চারুবালার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সুবোধ দেখিল, এ সেই কামনাদেবী পর্বতের সূর্যাস্তকালের মুখ!

সুবোধ যখন দেবেন্দ্রর গৃহে ফিরিল, তখন দেবেন্দ্র আহার সমাপন করিয়া

সুবোধের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। সুবোধকে দেখিয়া সে বলিল, "কী হে ব্যাপারখানা কী ?"

সুবোধ সমস্ত ঘটনা দেবেন্দ্রকে বলিল।

দেবেন্দ্র বলিল, "বল কি হে, এমনতর অদ্ভুত ঘটনা তো উপন্যাসের মধ্যেও ঘটে না।" বলিয়া দেবেন্দ্র অর্ধঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত হাস্য করিল; এবং সেই অবসরে, পরদিন এগারটার গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে, সুবোধ তাহার অবশিষ্ট দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইল।

সাত

পরদিন শিমলার নিকট ও চারুবালার প্রেমের নিকট মনে মনে বিদায় লইয়া, সুবোধ কলিকাতা যাত্রা করিল। রেল যখন বক্রগতিতে পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম করিয়া কাল্‌কার দিকে নামিয়া চলিল, তখন সুবোধের দুর্বল চিত্ত বারংবার বলিতেছিল,—'হে মুগ্ধকারিণি বিদায়, বিদায়। তোমার দৃষ্টি হইতে বিদায়, কিন্তু স্নেহ হইতে নহে। তোমার প্রেম হইতে বিদায়, কিন্তু স্মৃতি হইতে নহে। এ দীনকে স্নেহ করো, এবং এ দুর্ভাগ্যকে মনে রেখো।' প্রস্পেক্ট পর্বতের শিখরদেশ যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ সুবোধ নির্নিমেষ নয়নে তাহাই দেখিল। অবশেষে তাহা যখন দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া গেল, তখন একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পর্বতের শীতল পবনের মধ্য দিয়া কোন দুর্বলহৃদয়া বালিকার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে বিচলিত করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে!

যতক্ষণ সুবোধ পর্বতপুঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল, শিমলার আকর্ষণ, চারু-বালার মোহ, তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া রহিল। কিন্তু কাল্‌কায় পৌঁছিয়া সুবোধ যখন কলিকাতার গাড়িতে আরোহণ করিল, তখন সহস্র মাইলের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া, তাহার মনে হইল, যেন সে কলিকাতায় মালতীর নিকট প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। রেল যখন নক্ষত্রবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিল, তখন প্রখর সূর্যকরে তুষার যেমন ধীরে ধীরে গলিয়া গিয়া ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন তরু, লতা, পর্বত প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া উঠে, তেমনি সুবোধের মন হইতে চারুবালার প্রভাব ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া মালতী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সুবোধ মনে মনে বলিতে লাগিল, 'হে অভিমানিনী, তোমার প্রতি আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, সে বিশ্বাস আমি পুঃনস্থাপিত করিব। তোমার প্রতি আমি উৎপীড়ন করিয়াছি, প্রকাশ্যভাবে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিব।' সুবোধ মনে মনে স্থির করিল যে, সকল কথা সে মালতীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে।

কিন্তু সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সুবোধ যখন কলিকাতায় পৌঁছিল, তখন অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহার তিন দিবস পূর্বেই সহসা মালতী,

ইহলোকের সব সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করিয়া, চলিয়া গিয়াছে। সুবোধ তাহার নিকট হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, তাহার জন্যও অপেক্ষা করে নাই। কেহ তাহাকে কিছু বলে নাই, অথচ সে যেন সব মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল ; তাই অভিমানিনী যথাসময়ে জীবনের লীলাভূমি হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে। কাহাকেও অভিযোগ করে নাই, কাহাকেও অনুযোগ করে নাই ; শুধু সকল দ্বন্দ্ব, সকল অশান্তির মধ্য হইতে নিজেকে লুপ্ত করিয়া, অপরের জন্য পথ নিষ্কণ্টক করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সুবোধ যখন শুনিল, মালতী চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার মনে হইল যে, সে যেন কয়েকমাস হইতে এক ভীষণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা হইতে তাহার আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। ক্রমশই অন্ধকার হইতে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ ; ক্রমশই দুঃখ হইতে দুঃখের মধ্যে নিমজ্জন। দুঃখে শোকে সুবোধ এমন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেল যে, তাহার বন্ধু বান্ধব এবং নিকট আত্মীয়গণ পর্যন্ত তাহা অসঙ্গত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিল। তাহারা সুবোধের অন্তরের ব্যথা জানিত না; তাহারা শুধু ধূম্র দেখিয়া নিন্দা করিল, বহ্নির কথা বুঝিল না।

মালতীর মৃত্যুর দুইমাস পরে সুবোধ বিপিনবাবুর এক পত্র পাইল। বিপিন-বাবু লিখিয়াছেন, "তোমার চিত্তের এরূপ অশান্ত অবস্থার সময় তোমাকে যে কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি, তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আমার কন্যা চারু-বালার সহিত তোমার বিবাহ হয়, তাহা তোমার পিতামাতা এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা। এ বিবাহ না হইলে আমার কন্যার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তাহার কারণ তুমি কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবে। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তোমার অভিমত আমাকে জানাইয়ো।"

বিপিনবাবুর পত্র পাঠ করিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! কিছুদিন পূর্বে যাহাকে পাইয়া সুবোধ সামান্য ক্রীড়ার বস্তুর ন্যায় খেলা করিয়াছে, কী মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া সে আজ কঠোর সত্যরূপে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন তাহাকে লইয়া খেলা করা চলে না, অথচ সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করাও যায় না। বৃক্ষে যখন শুধু ফুল ফুটিয়াছিল, তখন তাহার সৌন্দর্যে সুবোধের নয়ন মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার সৌরভে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা লইয়া সুবোধ অবহেলার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিল। কিন্তু এখন সেই বৃক্ষে পুষ্প অন্তর্হিত হইয়া ফল ফলিয়াছে। সেই ফলের অম্ল মধুর রসের মধ্যে সুধা না গরল, কী নিহিত আছে তাহা চিন্তা করিয়া সুবোধ অস্থির হইয়া উঠিল! অবিবেচকের ন্যায় শুধু আর খেলা করা চলে না এখন ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তখন শীতকাল, লাট সাহেবের অফিসগুলি কলিকাতায় উপস্থিত। দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া সুবোধ বিপিনবাবুর পত্র দেখাইল। পত্রপাঠ করিয়া দেবেন্দ্র

বলিল, "উপস্থিত ক্ষেত্রে চারুবালাকে বিবাহ করাই সর্বতোভাবে তোমার পক্ষে কর্তব্য বলে আমার মনে হয়।"

সুবোধ বলিল, "কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কর্তব্য।"

দেবেন্দ্র বলিল, "কঠিন বলে যদি কর্তব্য ত্যাগ কর, তা হলে জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ কর্তব্যগুলিই ত্যাগ করতে হয়। শিমলায় চারুবালার প্রতি তোমার যে কর্তব্য ছিল, তা তুমি কর নি। পুনর্বার যদি তার প্রতি কর্তব্য হ'তে বিচ্যুত হও, তা হ'লে তুমি দ্বিতীয়বার চারুবালার প্রতি অবিচার করবে।"

প্রথমে বিপিনবাবুর প্রস্তাবের প্রতি সুবোধের মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল, কিন্তু নিরপরাধা চারুবালার কথা মনে করিয়া সুবোধ ভাবিল যে, সে চারুবালার প্রতি যে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছে, চারুবালাকে বিবাহ করিলে তাহার কতকটা প্রতিকার হয়। এক মাত্র তাহারই দোষে যে জটিল গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, চারুবালাকে বিবাহ করিলে তাহার মোটামুটি একটা রক্ষা হইবার সম্ভাবনা। সুবোধ বিপিনবাবুকে পত্রোত্তরে লিখিল, চারুবালার কোন আপত্তি না থাকিলে সে চারুবালাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছে।

আট

সুবোধের সহিত চারুবালার বিবাহ হইয়া গেল।

যে সকল বন্ধু-বান্ধব মালতীর মৃত্যুর পর সুবোধের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারা সুবোধকে এত শীঘ্র পুনর্বার বিবাহ করিতে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা ভিতরকার কথা কিছুই বুঝিল না; শুধু সুবোধকে অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি বলিয়া মনে করিল। সে যেমন সহজে কাঁদিতে পারে তেমনি সহজে হাসিতে পারে!

কিন্তু চারুবালার সহিত বিবাহের পর হইতে সুবোধ যে দুঃসহ যন্ত্রণা হৃদয়ে বহন করিতেছিল, তাহার সংবাদ কেহও জানিত না। সে ইচ্ছাপূর্বক চারুবালাকে বিবাহ করে নাই, এবং বিবাহ করিয়াও সে সুখী হইতে পারিল না। মালতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সুবোধ যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার দণ্ড মালতীর মৃত্যুতেই নিঃশেষ লাভ করে নাই; চারুবালার সহিত বিবাহও সেই প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। কঠোর নিয়তি সুবোধের স্বহস্ত-নির্মিত অস্ত্রে সুবোধকে আঘাত করিয়াছে; চারুবালাই তাহার সমগ্র অপরাধ এবং অনুশোচনাকে অহরহ সুস্পষ্টভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহার বিস্মৃতি নাই, সমাপ্তি নাই, বিরাম নাই।

শিমলায় চারুবালার প্রতি সুবোধের যে তীব্র মোহ ছিল, তাহা আকাশের নীলিমায় ইন্দ্রধনুর বর্ণের মতো নিঃশব্দে কখন মিলাইয়া গিয়াছে। এখন চারুবালাকে দেখিলে সুবোধ মনে করে, সে যেন পরকালে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে বলিয়াই

অদৃষ্ট চারুবালাকে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে তাহার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। চারুবালার হাসির মধ্যে যেন অশ্রু, সোহাগের মধ্যে যেন অনুযোগ, এবং ভালো-বাসার মধ্যে যেন বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সুবোধকে নিপীড়িত করে। সুবোধ তাহার দুর্বল হৃদয়ের সমগ্র শক্তি সঞ্চয় করিয়া চারুবালাকে ভালোবাসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয় না। মালতীর স্মৃতি তাহাদের উভয়ের মধ্যে এক অনতি-ক্রমণীয় বাধার মতো উভয়কে পৃথক করিয়া রাখে; কোনমতেই কাছাকাছি আসিতে দেয় না।

বিবাহের ছয়মাস পরে একদিন শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে শিমুলতলার এক ফুলবাগানে বসিয়া সুবোধ চারুবালার সহিত গল্প করিতেছিল।

সুবোধ বলিল "চারু, আমার সর্বদা মনে হয়, আমার সহিত বিবাহে তুমি সুখী হতে পারনি।"

চারু বলিল, "তোমার সহিত বিবাহ হয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, কিন্তু একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয়, আর বড় কষ্ট হয়।"

সুবোধ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কী কথা ?"

চারুবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, সে বলিল, "আমিই বোধ হয় মালতী দিদির মৃত্যুর কারণ।"

"কেন ?"

"শিমলায় কামনাদেবী পাহাড়ের কথা তোমার সব মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"তোমার মনে আছে, ফিরে আসবার সময় আমি আর একবার ইচ্ছা করে মন্দিরে ঢুকেছিলাম ?"

সুবোধ রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "আছে।"

চারুবালা বলিল, "তোমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আমার তখন অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। আমি মন্দিরে প্রবেশ করে সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলাম যে, তুমি ভিন্ন আর যেন কেউ আমার স্বামী না হয়; মালতীদিদির জীবন দিয়ে আমার সে কামনা পূর্ণ হলো। কিন্তু আমি যদি জানতাম, তুমি মালতীদিদির স্বামী, তাহলে কখনই—"চারুর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চারুবালার কথা শুনিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ঘটনার দিনই সন্ধ্যার পর বিসূচিকা রোগে মালতীর মৃত্যু হইয়াছিল। সুবোধ সে কথা চারুবালাকে বলিল না।

হৃদয় পরীক্ষা

এক

ডাক্তার সুশীলকুমার তাঁহার গৃহাগত রোগিগণের ব্যবস্থা শেষ করিয়া 'কলে' বহির্গত হইবেন এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক যোগেন্দ্রনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুশীলকুমার নিতান্ত অনুৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কী সংবাদ?"

যোগেন্দ্র কহিল, "সরলার শরীরটা কয়েকদিন থেকে একটু খারাপ হয়েছে, বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা বোধ করে—নিশ্বাস ফেলতে বড় কষ্ট হয়—"

সুশীলকুমার বাধা দিয়া বলিল, "তা হরেন মিত্রের দ্বারা তার চিকিৎসা তো চলছে—আবার কেন?"

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি খবর পেয়েছ দেখচি।"

সুশীল কহিল, "কিন্তু খবর আপনাদের বাড়ির কারও দ্বারা আমার নিকট পৌঁছেচে বলে মনে করবেন না—"

যোগেন্দ্র কহিল—"যা হোক এখন তো আমি খবর এনেছি, তুমি আজ বৈকালে একবার নিশ্চয় যেয়ো।"

সুশীল বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র একটু ব্যস্ততা সহকারে বলিল, "বৈকালে যাচ্ছ তো হে! আমার আবার কোর্টের সময় হয়ে এল।"

সুশীল কহিল, "দেখুন একটা কথা আছে, আপনি আমাকে কী ভাবে ডাকছেন, সেটা আমার জানা আবশ্যক। আপনি যদি আমাকে আত্মীয়তার সূত্রে ডাকেন তা হলে আমি নিশ্চয়ই যাব না—তবে আপনি যদি আমাকে একজন ডাক্তার বলে 'কল' দেন, আমি অবশ্য আমার ব্যবসার অনুরোধে যেতে বাধ্য।"

তাহার পর বাদানুবাদ আরম্ভ হইল—অর্ধ-ঘণ্টা-কালব্যাপী বাদানুবাদ—কিন্তু সুফল হইল না। সুশীলের সেই এক কথা—ডাক্তার হইয়া সে যাইতে পারে, আত্মীয়-রূপে নহে।

অবশেষে যোগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হলে আমি তোমাকে ডাক্তার বলেই 'কল' দিয়ে যাচ্ছি।"

সুশীল চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ক'টার সময় যেতে হবে?"

"বৈকাল পাঁচটার সময়।"

সুশীল পকেট বুক বাহির করিয়া লিখিয়া লইল।

যোগেন্দ্র বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র চলিয়া যাইলে সুশীল নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া একটু দুঃখিত হইল। যোগেন্দ্রের সহিত ব্যবহারটা ঠিক ভদ্রতাসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ যোগেন্দ্র বয়সে অনেক বড়।

কিন্তু একটু সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাস আছে, যাহা সুশীলকুমারের এই রুক্ষ ব্যবহারকে, অন্তত কিয়ৎ পরিমাণেও সমর্থন করিতে সক্ষম। কোনও একটা প্রসঙ্গ লইয়া পত্নী সরলার সহিত সুশীলকুমারের কিছুদিন হইতে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য চলিতেছিল। এমন অবস্থায় একদিন হরেন মিত্রের নিকট সুশীল অবগত হইল যে তাহার স্ত্রী অসুস্থ, এবং হরেন ডাক্তারই তাহার চিকিৎসা করিতেছে। তাহার পর দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে সরলাও কোন পত্র লিখে নাই, অথবা সুশীলের শ্বশুরবাটী হইতে অন্য কেহও সংবাদ দিয়া যায় নাই। ইহা হইতে সুশীল মনে করিয়াছিল যে এ সমস্তই সরলার কাজ। সে নিজেও কোন খবর দিতেছে না, এবং অপরকেও সে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই পনের দিনের সঞ্চিত অভিমান লইয়া সুশীল আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই প্রথমেই যোগেন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া তাহারই উপর সে সমগ্র আক্রোশ প্রয়োগ করিল।

কিন্তু অভিমান যখন তাহার অনেকখানি বিষ উদ্গীরণ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তখন সুশীলকুমার একটু অপ্রতিভ হইল এবং স্থির করিল, বৈকালে শ্বশুরালয়ে যাইয়া তাহার দোষটুকু সংশোধন করিয়া লইবে।

দুই

গৃহে ফিরিয়া যোগেন্দ্র যখন সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন সকলে মিলিয়া সংকল্প করিল যে, সুশীলকুমার যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে একটা কিছু শিক্ষা দিতেই হইবে।

সরলার বড় বোন তরলা বলিল, "দাদা, আমাদের উপর ভার দাও, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করবই যাতে ডাক্তার মশায়কে বিলক্ষণ একটু নাকাল হতে হবে।"

সরলার ছোট বোন অমলা বলিল, "আমি চারটা রাংতার টাকা তৈয়ার করে রাখব, ডাক্তার বাবুকে ভিজিট দিতে হবে।"

যোগেন্দ্র বলিল, "রাংতার টাকা নয়, তাকে আমি আরও একটু বেশি শিক্ষা দিতে চাই; চারটে আসল রূপার টাকা তাকে দিতে হবে। সে যেমন ডাক্তার হয়ে আসচে, আমরাও তার সঙ্গে ডাক্তারের মতন ব্যবহার করব। সে যখন সরলাকে নিজের স্ত্রীর মতো দেখতে আসতে স্বীকার হচ্ছে না—তখন আমিও আমার বোনকে তার সামনে বের হতে দেব না—সরলা পর্দার আড়ালে থাকবে।"

যোগেন্দ্রের প্রস্তাবই সকলের অত্যন্ত পছন্দ হইল। ইহার মধ্যে যেমন একটু পরিহাসের কৌতুক আছে, তেমনই একটু প্রতিশোধের আনন্দও আছে। শুধু শিক্ষা নহে, ইহার মধ্যে শাস্তিরও কতকটা অংশ বর্তমান।

গৃহসুদ্ধ লোকে যখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মতলবটা পরিপক্ক করিবার জন্য ব্যস্ত হইল তখন সরলা মনে মনে বুঝিল, অন্য লোকের পক্ষে যাহাই হউক, তাহার পক্ষে বিপদ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। স্বামী এবং ভ্রাতার অভিমান লইয়া যে যুদ্ধের সূচনা হইতেছে, তাহাতে উলুখড়ের মতো তাহারই নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অমলারই বা কী, আর তরলারই বা কী? তাহারা শুধু কৌতুকের দিকটাই দেখিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আর একটা আশঙ্কাজনক দিক আছে, তাহার কথা মনে করিয়া সরলা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

সরলা তরলার নিকট গিয়া বলিল, "দিদি, তোমরা কি পাগল হয়েছ? আমি কখনও পরদার আড়াল থেকে হাত দেখাতে পারব না—"

তরলা হাসিয়া বলিল, "কেন আড়াল থেকে দেখাতে লজ্জা করবে না কি? তবে সামনে এসেই দেখাস।"

সরলা বলিল, "সেটা বড় অন্যায় হবে।"

তরলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বটে? সে দাদাকে এমন করে অপমান করতে পারলে তা অন্যায় হলো না, আর আমরা তাকে একটু ঠাট্টা করলেই ভারি অন্যায় হবে?"

সরলা বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর দিদি, আমাকে শুধু এর মধ্যে রেখো না—একে তো আমার উপর রাগ রয়েইচে, তার উপর আমি যদি এরকম ব্যবহার করি তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। আর আমার ওরকম করা উচিতও নয়।'

তরলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা বটে, তোর এর মধ্যে না থাকাই ভালো। কিন্তু জব্দ তাকে করতেই হবে। তোর হয়ে না হয় আমিই অভিনয় করব। পর্দার আড়াল থেকে আমি হাত বের করে দেখাব, সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না।"

সরলা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু দেখো, দিদি শেষ রক্ষে তোমাকেই করতে হবে।'

তরলা কহিল, "সে তুই কিছু ভাবিস নে, নাটকটা মিলনান্তই হবে।"

তিন

ঘড়িতে যখন পাঁচটা বাজিতেছে সুশীলকুমারের গাড়ি আসিয়া তাহার শ্বশুরালয়ের দ্বারে লাগিল। সুশীল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই যোগেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"ওরে ডাক্তার বাবু এসেছেন, বাড়ির ভিতর খবর দে।"

সুশীল বুঝিতে পারিল, সকাল বেলাকার আঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কিছু বলিল না। সে মনে করিল কতকটা লাঞ্ছনা এবং বিদ্রূপ তাহাকে সহ্য করিতে হইবেই; বিশেষতঃ যখন উভয় পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধটা পরিহাস এবং বিদ্রূপের পক্ষে স্বভাবতই উপযোগী।

অমলা আসিয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু, বাড়ির ভিতর চলুন।" সুশীল মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"চল।" কিন্তু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া সুশীল বুঝিতে পারিল ব্যাপারটা একটু গুরুতর আকার গ্রহণ করিয়াছে। চিরপদ্ধতি অনুযায়ী তাহার শ্যালকপত্নিগণের মধ্যে কেহও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল না, সকলেই অন্তরালে রহিল। এমন কি বাড়ির পুরাতন দাসীটা পর্যন্ত তাহাকে দেখিয়া অপরিচিতার মতো মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

অমলা বলিল, "ডাক্তারবাবু, চেয়ারে বসুন।" একখানি চেয়ার তথায় ছিল, সুশীল তাহাতে উপবেশন করিল। চেয়ারের সম্মুখে সবুজ রঙের একখানি পর্দা।

অমলা বলিল, "মেজদিদি, ডাক্তারবাবু এসেছেন, হাত দেখাও।"

অলঙ্কারসিঞ্জিত একখানি শুভ্র হস্ত পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কিছু পূর্ব হইতেই সুশীলকুমারের মন পুনরায় বিরূপ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পর উপস্থিত ব্যাপার দেখিয়া সে অপমানে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

চারিদিক হইতে কৌতুকের একটা রুদ্ধ অস্ফুট হাস্যধ্বনি বহিয়া গেল, এবং দুষ্ট অমলা অন্যমনস্কতার ভান করিয়া হস্তস্থিত চারিটা টাকা অবিরত বাজাইতে আরম্ভ করিল।

সুশীলের মুখমণ্ডল মার্জিত তাম্রের মতো রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং তীব্র অপমানের বেদনায় মস্তিষ্কের মধ্যে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী টন্ টন্ করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল সজোরে টান মারিয়া পর্দাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একটা ঘোরতর কিছু কাণ্ড করিয়া বসে। তাহার স্ত্রী যে এই অপমানের অভিনয়ের মধ্যে সর্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পীড়ন করিবে ইহা তাহার নিকট একেবারেই অসহ্য।

টাকা বাজাইতে বাজাইতে অমলা বলিল, "ডাক্তার বাবু, কী ভাবচেন? হাত দেখুন?"

সুশীল তাহার সাময়িক উত্তেজনাকে কতকটা সংবৃত করিয়া মনে মনে স্থির করিল অন্য প্রকারে সে ইহার একটা চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবে, কিন্তু উপস্থিত যেমন ডাক্তারের মতো দেখিতে আসিয়াছে তেমনি দেখিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে সঙ্গত; এখন অন্য কোন প্রকার আচরণ করিতে গেলে তাহাকেই লঘু হইতে হইবে। সে যখন স্বয়ং ডাক্তার ভিন্ন অন্য কোন রূপে নিজেকে স্বীকার করিতে চাহে নাই, তখন অন্য লোকে যদি তাহাকে ডাক্তার

বলিয়াই মানিয়া লয় তাহাতে সে অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারে না। তাহার আহত অভিমান পরে দশগুণ বর্ধিত হইবার অপেক্ষায় আপাততঃ রুদ্ধ হইয়া রহিল।

নিতান্ত শিথিলভাবে সুশীল হস্ত গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার পর প্রস্থানের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমলা তাড়াতাড়ি বলিল—"ডাক্তার বাবু এখনও হয়নি, মেজদিদির হার্ট একজামিন করে দেখতে হবে। হার্টে একটা কী রকম ব্যথা বোধ করেন।"

সুশীল অত্যন্ত বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিল। উপস্থিত অবস্থায় হার্ট একজামিন কী রূপে করা যাইতে পারে, তাহা কিছুতেই ধারণায় আসিতেছিল না।

কিন্তু অমলার তৎপরতার শেষ ছিল না। সে বলিল, "মেজদিদি, উঠে দাঁড়াও, ডাক্তার বাবু তোমার হৃদয় পরীক্ষা করবেন। তারপর সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার ঐ যে স্টেথোস্কোপ না কি যন্ত্র আছে, এইখানটা দিয়ে চালিয়ে দিন", বলিয়া পর্দার মধ্যে একটা ছিদ্র বাহির করিয়া সুশীলের সম্মুখে ধরিল।

আবার একটা অস্ফুট হাস্যধ্বনি বহিয়া গেল।

জলন্ত অঙ্গারের মতো সুশীল লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু উপায়ও কিছু ছিল না।

হৃদয় পরীক্ষার হাস্যকর অভিনয় শেষ হইলে অমলা বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনার ফি নিন," বলিয়া চারিটা টাকা সুশীলের হস্তে প্রদান করিল।

টাকাগুলা পকেটে ফেলিয়া সুশীল উর্ধ্বশ্বাসে বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিশোধের চিন্তায় তাহার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এমন একটা প্রতিশোধ লইতে হইবে যাহাতে চিরজীবনের মতো সরলার একটা অনুতাপ থাকিয়া যায়। এত দম্ভ! এত অহঙ্কার!

সুশীল গাড়িতে উঠিতে যাইবে এমন সময় তাড়াতাড়ি অমলা আসিয়া উপস্থিত হইল। অমলার হাত হইতে তাহার এখনও পরিত্রাণ নাই—এখনও তাহার সমগ্র বিষ শেষ হয় নাই।

"ডাক্তার বাবু, প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্?"

সত্যই তো! সুশীল ফিরিয়া আসিয়া একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ লিখিয়া দিল। ডাক্তারের কোনও কর্তব্য হইতে সে স্খলিত হইতে পারে না।

সুশীল প্রস্থানের উপক্রম করিলে, অমলা বলিল, "ডাক্তার বাবু, কেমন দেখলেন?"

সুশীল বলিল, "চমৎকার!"

অমলা বলিল, "কী রোগ?"

সুশীল বিদ্রূপের সুরে বলিল, "দুর্বুদ্ধি!"

চার

মুক্ত ছাদের উপর বসিয়া তরলা জ্যোৎস্না এবং সান্ধ্যসমীর উপভোগ করিতেছিল, সরলা আসিয়া বলিল, "দেখ দিদি, কী কাণ্ড হয়েছে।"

"কী হয়েছে রে ?"

"এই দেখ, কী চিঠি লিখেছে", বলিয়া সরলা তরলাকে একখানা পত্র দিল।

জানলা দিয়া ছাদের একস্থানে উজ্জ্বল আলোক আসিয়া পড়িয়াছিল, তরলা তথায় যাইয়া পত্র পাঠ করিল। সুশীল সরলাকে পত্র লিখিয়াছে।

সরলা,

কিছুদিন হইতে তোমার হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে যে এত গরল সঞ্চিত ছিল, তাহা জানিতাম না—আজ তাহার পরিচয় পাইলাম। তোমার আত্মীয়বর্গের সহিত যোগ দিয়া তুমি আজ উৎকটভাবে আমাকে অপমানিত করিয়াছ। যথার্থ কাহারা তোমার আপন এবং তাহাদের তুলনায় আমার মর্যাদা কতটুকু তাহা তুমি আজ সুন্দরভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ। যাহাই হউক, তুমি যখন আমাকে মুখ দেখাইতে অস্বীকৃত, তখন আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে আর তোমার মুখদর্শন করিব না। আজ হইতে তোমার ও আমার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ লুপ্ত হইল। তুমি এখন স্বাধীন, স্বতন্ত্র, যেমন ইচ্ছা থাকিতে পার, যাহা ইচ্ছা করিতে পার। ইহার মধ্যে কোনও সন্দেহ নাই, কোনও সংশয় নাই। তুমি হয়তো জান না, আমার কথা এবং কার্যে কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এ জীবনের মতো তোমার উৎপীড়ন হইতে বিদায়, ইতি,

তোমার বিচ্ছেদসুখোৎফুল্ল
সুশীল।

সুশীলের পত্র পাঠ করিয়া তরলা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে সুশীল যে এতটা রাগিয়া যাইবে তাহা তরলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা হইতে সরলা এবং সুশীলের মধ্যে যদি একটা চিরস্থায়ী মনোমালিন্য রহিয়া যায়, তাহা হইলে তরলাই সম্পূর্ণভাবে দোষী হইবে, কারণ সরলা প্রথমেই এই বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিল এবং তরলাকে সতর্কও করিয়া দিয়াছিল।

চিন্তিত মুখে তরলা বলিল, "এতটা যে রাগ করে বসবে, তা আগে বুঝতে পারি নি।"

সরলার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল। সে বলিল, "কী হবে দিদি ?" তাহার মনে হইতেছিল, এ বিপদ হইতে তাহার যেন আর কোন ক্রমেই রক্ষা নাই।

তরলা সরলাকে সাহস দিবার জন্য বলিল, কী আবার হবে ? তুই তো বাস্তবিক সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে যখন সব জানতে পারবে, তখন আর তোর উপর কোনও রাগ থাকবে না, তাকে এখানে আনতে পারলে আমি সব ঠিক করে নিতে পারি।"

সরলা বলিল, "দিদি, তুমি দাদাকে বল, আজকে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।"

তরলা বলিল, "সে কখনও হতে পারে না, তা হলে আরও খারাপ হবে।"

তরলা ও সরলার কথাবার্তা হইতেছিল, এমন সময় যোগেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইল।

যোগেন্দ্র বলিল, "তোমরা সুশীলকে আজকে একেবারে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলে দেখছি, তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে যে প্রেসক্রিপশন্ লিখে দিয়ে গেছল, সেটা বাইরের ঘরে টেবিলের উপর পড়েছিল। একটু আগে হরেন ডাক্তার সরোর খবর নিতে এসেছিল। সে প্রেসক্রিপশনটা দেখতে পেয়ে পড়ে বললে, 'সর্বনাশ! সুশীলবাবু একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে প্রেসক্রিপ্শন করেছেন দেখছি—এ যে একেবারে উগ্র বিষ প্রস্তুত হয়েছে, এর মধ্যে এমন দুটো ওষুধ দিয়েছেন, যে দুটো একত্র হলে একটা ভয়ানক বিষ প্রস্তুত হয়।' সে তো আর ভেতরকার ব্যাপার জানে না, তাই বলছিল—'এই জন্যে নিকট আত্মীয়দের চিকিৎসা ডাক্তারেরা নিজে করতে চায় না।'

তরলা বলিল, "ভাগ্যে আমাদের পক্ষে এটা একটা মিথ্যা প্রেসক্রিপ্শন্, এটা যদি আসল হতো, তা হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল।"

যোগেন্দ্র বলিল, "কখন কখন এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। হরেন ডাক্তার বলছিল, প্রেসক্রিপ্শন্টা একবার সুশীলবাবুর নিকট পাঠিয়ে দেবেন, তিনি দেখলেই বুঝতে পারবেন আর বদলে দেবেন। ভেতরকার রহস্যটা সে তো আর জানে না।" বলিয়া যোগেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

তরলা বলিল, "দাদা প্রেসক্রিপ্শন্টা কোথায় আছে?"

"আমার কাছেই আছে।"

"আমাকে দেবে?"

যোগেন্দ্র বলিল, "কেন? আর একবার তাকে জ্বালাবার ইচ্ছা আছে বুঝি?"

তরলা বলিল, "জ্বালাব না, তার জ্বলুনী যাতে ঠাণ্ডা হয় তার ব্যবস্থাই করব।"

যোগেন্দ্র প্রস্থান করিলে তরলা সরলাকে বলিল, "আর তোর কোন ভয় নেই, তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ফুলের মালা গাঁথগে যা, আজই তার গলায় পরিয়ে দিবি।"

সরলা বলিল, "কী জানি ভাই, আমার তো আতঙ্ক হচ্ছে, আবার তুমি কী কাণ্ড পাকিয়ে তোলো।"

তরলা সস্নেহে বলিল, "না রে না—কাণ্ড পাকিয়ে তুলেছিলাম, এবার সেই পাক খুলে দেব।"

সরলা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী করবে, দিদি?"

তরলা বলিল, "সে এখন বলব না।"

পাঁচ

রাত্রি তখন দশটা। সুশীলকুমার তাহার গৃহের বৈঠকখানায় একটা আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া চিন্তায় মগ্ন ছিল। সরলার ব্যবহারের কথা মনে করিয়া সে শুধু ক্রুদ্ধ হয় নাই, বিস্মিতও হইয়া গিয়াছিল। সেই স্নেহময়ী লজ্জাশীলা নম্র সরলা, সে কেমন করিয়া তাহাকে এতটা অপমান করিতে প্রবৃত্ত হইল? সরলার ভালবাসা, লজ্জা, সংকোচ, সকলেই সহিত তাহার আচরণ এতদূর বিসদৃশ হইয়াছে যে সুশীলের বিস্ময় ক্রমশ বেদনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইয়া সরলা যদি এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে? কিন্তু তাহা হইলেও সরলাকে ক্ষমা করা যায় না। অভিমানকে এতদূরে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কখনই উচিত নহে, যেখানে তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া যায়, যেখানে তাহা আর অভিমান থাকে না, অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু আর একটা কথা। সরলা যদি অনিচ্ছার সহিত ওরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে? যোগেন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধে সে যদি ওরূপ অন্যায় আচরণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে? সুশীল ভাবিয়া দেখিল তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে বরং সকল দিক হইতে তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সরলার পক্ষে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ অভিনয় করা যেমন অস্বাভাবিক, যোগেন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধ অতিক্রম করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াও তাহার পক্ষে তেমনি কঠিন।

মুক্ত বাতায়ন দিয়া যে তিনটি জিনিস সুশীলের কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটিও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিবার পক্ষে অনুপযোগী নহে; প্রথমত শীতল সমীরণ, দ্বিতীয়ত চন্দ্র-কিরণ এবং তৃতীয়ত ফুলের গন্ধ। এই তিনটির যুক্ত ক্রিয়ার গুণে সুশীলের তপ্ত মস্তিষ্ক ক্রমশ অনেকখানি শীতল হইয়া আসিয়াছিল, এমন কি যেন একটা অনির্দিষ্ট সূক্ষ্ম অনুশোচনা ফুলের গন্ধ এবং চন্দ্র-কিরণের সহিত মিলিত হইয়া সুশীলের সান্ত্বনাহীন চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আনিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সহসা মুক্তদ্বার অতিক্রম করিয়া চতুর্থ সংখ্যক যে পদার্থটি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা সুশীলের অবসন্ন মনকে মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে চকিত এবং বিব্রত করিয়া তুলিল। সে পদার্থটি আর কিছুই নহে, তরলা কর্তৃক লিখিত একখানি পত্র সুশীলের শ্বশুরবাড়ির একজন ভৃত্য বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে পত্রে লিখিত—

সুশীল,

সরলার জন্য যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলে, সে ঔষধ একদাগ খাওয়ানর পর হইতে হঠাৎ সরলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। তোমার প্রেসক্রিপ্‌শন-খানি পত্র মধ্যে পাঠাইলাম, তুমি পড়িয়া দেখিবে, কোনও উগ্র ঔষধের জন্য এরূপ

হইয়াছে কিনা। তুমি পত্রপাঠমাত্র আসিবে এবং ব্যবস্থা করিবে। বিলম্ব করিলে আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়িব। ইতি

তরলা।

প্রেসক্রিপ্‌শন্ পাঠ করিয়া সুশীল লাফাইয়া উঠিল, "কী সর্বনাশ! এ যে স্ত্রী হত্যা! হায় সরলা, হায় প্রিয়তমে,—ওরে কে আছিস্, শীঘ্র একখানা গাড়ি নিয়ে আয়!"

শ্বশুরবাড়ির ভৃত্য কানাই বলিল, "বাবু, আমি একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

সুশীল মহাব্যস্ততার সহিত আলমারি খুলিয়া একটা পম্প এবং কতকগুলা ঔষধ পকেটে ভরিয়া লইল এবং কানাইকে প্রায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া এক লম্ফে গাড়িতে গিয়া বসিল। "চালাও—জোরসে—বক্‌শিশ মিলেগা।"

ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া একখানি গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। তরলা সরলাকে বলিল, "চুপ করে শুয়ে থাক, খবরদার হাসিসনে।"

"দিদি—"

তরলা বলিল, "ফের গোল করছিস। টের পেলে সব মাটি হবে।"

সরলা বলিল, "দেখো, আবার যেন—"

তরলা বলিল, "না, তোর কোন ভাবনা নেই, চুপ করে শুয়ে থাক।"

তরলা সরলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। কানাইয়ের সহিত সুশীল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, "দিদি, এখন কেমন আছে?"

তরলা অত্যন্ত বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "খুবই খারাপ, দেখবে চল।"

স্বপ্নবিহ্বলের মতো সুশীল তরলার সহিত কক্ষে প্রবেশ করিল। সরলা শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল।

অতি সন্তর্পণের সহিত সরলার শয্যার উপর বসিয়া সুশীল সরলার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "দিদি, নাড়ী তো বেশ ভালো দেখচি।"

তরলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "নাড়ী দেখে তুমি কিছু বুঝতে পারবে না, নাড়ী দেখতে তো তুমি জান না ভাই।"

বিস্মিত হইয়া সুশীল বলিল, "কেন, বলুন তো?"

তরলা কহিল, "কেন, তা তোমার রোগীর নিকটেই জানতে পারবে। আমি চললাম, এখন তুমি ভালো করে রোগীর সেবা কর।" এই বলিয়া তরলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সুশীল ভাবিল, নাড়ী দেখিয়া যখন কিছু ভালো বোঝা যাইতেছে না, তখন একবার হার্টটা ভালো করিয়া দেখা যাক। দুই কর্ণে স্টেথোস্কোপ লাগাইয়া সরলার বক্ষে প্রয়োগ করিতে যাইবে, এমন সময় সহসা রোগিণীর দুই উৎক্ষিপ্ত

বাহু উত্তমরূপে ডাক্তারের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো ডাক্তারকে অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল।

সরলার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সরলা বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার ওষুধ খাইনি—"

স্তম্ভিত সুশীল বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল—সে অধীরভাবে বলিল, "খাও নি?"

সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া সরলা বলিল, "আমাকে তুমি যদি তেমন ভালোবাসতে, তাহলে দিদির হাত দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতে যে, সে আমার হাত নয়। আমি কিন্তু তোমার একটি নখ দেখলে বলে দিতে পারি।"

সুশীল বলিল, "আমাকে ক্ষমা করো, সরো।"

তখনও রোগিণীর বক্ষের ভিতর ডাক্তার আবদ্ধ হইয়া ছিল, এবং স্টেথোস্কোপটা উভয়ের বক্ষের মধ্যদেশে বর্তমান থাকিয়া ঈষৎ পীড়নচ্ছলে উভয়ের তীব্র আনন্দকে সচেতন করিয়া রাখিয়াছিল।

কক্ষের বাহিরে একটা স্পষ্ট হাস্যধ্বনি শোনা যাইতেছিল, কিন্তু এখন আর পূর্বের মতো তাহাতে বিষের জ্বালা মিশ্রিত ছিল না এবং প্রগলভা অমলা দ্বারের নিকট মুখ রাখিয়া বারংবার বলিতেছিল, "ডাক্তার বাবু, বেরিয়ে আসুন না, সমস্ত রাত ধরে হৃদয় পরীক্ষা চলবে নাকি?"

সমালোচক

এক

এম, এ পাশ করিয়া ল ক্লাসে ভর্তি হইলাম। প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিয়া খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে কলেজের সময় হইয়া আসিত। নয়টা হইতে ক্লাস্ আরম্ভ হইত। কোন প্রকারে সাড়ে নয়টা অথবা পৌনে দশটার সময় কলেজে পৌঁছিয়া, বাকি সময়টুকু কলেজের কেরানীর সহিত বচসা করিয়া বা বন্ধু-বান্ধবদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম। ঘণ্টা বাজিলে দ্বারদেশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে একবার Present Sir বলিয়া আফিস-গমনোন্মুখ বিরাট কেরানি স্রোত ঠেলিয়া গৃহে ফিরিতাম।

দ্বিপ্রহরের অধিকাংশকাল আমার বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় কাটিত। বাল্য-কাল হইতেই আমার প্রবল অভিলাষ ছিল যে, কবি হইব; কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভাগ্য ফেরে, কেমন করিয়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না, ক্রমশ কবি না হইয়া অলক্ষ্যে কবির শত্রু, সমালোচক হইয়া পড়িলাম। অদৃষ্ট যখন সর্বপ্রথম তাহার বিচিত্র দণ্ড আমার মস্তকোপরি ঘুরাইয়া আমাকে সমালোচক

করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনকার একটি ঘটনা মনে পড়িলে আজও হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

তখন এনট্রান্স পড়িতাম। আমার জনৈক বন্ধু সুশীলচন্দ্র কবিতা লিখিত; এবং আমারই দুর্ভাগ্যবশত আমাকে রসগ্রাহী স্থির করিয়া প্রত্যহ নব নব রচিত কবিতা শুনাইতে আসিত এবং আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করিত। ভালো লাগিলেও আমি প্রকাশ করিতাম না, এবং কবিতাগুলি বিবিধ প্রকারে সংশোধিত করিয়া দিতাম। কোন স্থানে ছন্দোভঙ্গ, কোনস্থানে অর্থবিভ্রাট, কোন স্থানে ব্যাকরণ-অশুদ্ধি এবং কিছু না পাইলে শ্রুতিকটু হইয়াছে বলিতাম। ক্রমশঃ আমার সমালোচনায় সুশীলচন্দ্রের সন্দেহ জন্মিল। কয়েক দিন আর সে কবিতা শুনাইতে আসিল না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় সহসা সুশীল আসিয়া উপস্থিত। পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "ভাই, অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখেছি, কেমন হয়েছে দেখ।"

আমারও অনেকদিন সমালোচনা না করিয়া সমালোচনার প্রবৃত্তি সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সোৎসুকভাবে তাহার হস্ত হইতে কবিতাটি লইয়া সংশোধন-কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কবিতাটি অনুমান বিশ ছত্রের হইবে। অন্যূন চল্লিশটি সংশোধন করিয়া সুশীলের হস্তে দিয়া বলিলাম, "তেমন সুবিধা হয় নাই।"

চাহিয়া দেখিলাম, সুশীলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে কোন কথা না কহিয়া পকেটের মধ্য হইতে নীরবে একখানি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন পুস্তক বাহির করিল।

লক্ষ্মীছাড়া আমাকে মজাইবার জন্য রবিবাবুর কোন প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে কয়েক লাইন লিখিয়া আনিয়াছিল, আমি তাহারই উপর অবাধে কলম চালাইয়াছি! অসংলগ্ন ভাষায় কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার চেষ্টায় যাহা বলিলাম, তাহা নিতান্ত নির্বোধের উক্তির ন্যায় শুনিতে হইল। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সুশীলের বোধহয় দয়া হইল, সে বাড়ি চলিয়া গেল।

এইখান হইতেই সমালোচকের পথ পরিত্যাগ করিলে বোধহয় মন্দ হইত না। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করে। ক্রমশঃ আমি রীতিমত সমালোচক হইয়া দাঁড়াইলাম। নিয়মিতভাবে আমার সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

দুই

চেষ্টা করিয়াও কবি হইতে পারি নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, কবি ও কবিতার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ খর দৃষ্টি আছে, আক্রোশ বলিলেও বোধহয় নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। আমি জানি আমার নির্মম সমালোচনার তাড়নায় কয়েকটি শিশু কবি শান্ত ছেলের মতো বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটি নূতন কবিকে লইয়া আমি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিগত মাস ছয়েক হইতে "সন্ধ্যাকাশ" নামক মাসিকপত্রে মাঝে মাঝে শ্রীমতী তরুবালা দেবী স্বাক্ষরিত কোন মহিলার কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছে। কবিতাগুলি সাধারণতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার ন্যায়ই বিশেষত্বহীন, ছন্দোবদ্ধ, কোমল বাক্যসমষ্টি। অন্তত আমার তাহাই ধারণা।

চার পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হইবার পর, "অবসর চিন্তা" পত্রিকায় আমি কবিতাগুলির কিঞ্চিৎ তীব্র সমালোচনা করিলাম; যথা,—"এক সময় অবশ্য ছিল যখন মহিলামাত্রেরই রচনা অতিরিক্ত এবং অনেক সময় অযথা প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু সে সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমান কালে বঙ্গভাষায় সুলেখিকার সংখ্যা অল্প নহে এবং সাধারণ লেখিকা প্রচুর। এরূপ অবস্থায় বর্তমান লেখিকাকে আমরা অকারণ উৎসাহ দিতে ইচ্ছা করি না। জীবনের মধ্যে কবিতা-রচনাই চরম সফলতা নহে। আরও বহুবিধ কর্তব্য আছে যাহা পালন করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে পারি" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম, কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া শ্রীমতী তরুবালা সন্ধ্যাকাশের পরবর্তী সংখ্যায় আরও দুই তিনটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা কিছু বিদ্রূপাত্মক, এবং কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্বক বিবেচনা করিলে মনে হয়, সে বিদ্রূপ যেন আমারই প্রতি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এমন চতুরতার সহিত প্রচ্ছন্ন যে, সহজে কাহারও তাহা বোধগম্য হইবার নহে।

তীব্রতর সমালোচনা করিলাম। বহুপ্রকারে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া পরিশেষে লিখিলাম, ভগবান কাহাকেও কাব্য রচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও কাব্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন; সকলকে কাব্য রচনা করিবার ক্ষমতা কেন দেন নাই, সে রহস্য শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু যাহাকে শক্তি দেন নাই, তাহাকে লালসা কেন দিয়াছেন, তাহা আরও রহস্যপূর্ণ। সমালোচনা সমাপ্ত হইলে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি বারটা বাজিয়াছে।

সুইচ্ টিপিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। শুইয়া কেবলই সমালোচনার কথা মনে হইতে লাগিল; ভাবিয়া দেখিলাম, প্রকৃত পক্ষে তরুবালার কবিতার নিরপেক্ষ সমালোচনা করি নাই। দোষটুকু দেখাইবার পক্ষে কোন ত্রুটি করি নাই, কিন্তু যাহা প্রশংসার যোগ্য, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়াছি। দীপহীন কক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কাল্পনিক তরুবালার কাতর মুখমণ্ডল আমার চক্ষের সম্মুখে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক মমতায় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অজ্ঞাত কুঞ্জবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পুষ্প তাহার যতটুকু সাধ্য সুগন্ধ প্রেরণ করিতেছে, আমি কেন অকারণে তাহাকে ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই! স্থির করিলাম, সমালোচনা পরিবর্তিত না করিয়া পাঠাইব না।

তিন

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, ঘর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে অন্ধকারের নিবিড়তায় যাহা স্থির করিয়াছিলাম, দিনের আলোকে তাহা অতি সহজে লুপ্ত হইয়া গেল। সমালোচনা একটা কভারে মুড়িয়া "অবসর চিন্তা" সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিয়া মিঃ মুখার্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য বাহির হইলাম! মিঃ মুখার্জি ব্যারিস্টার, এবং আমাদের ল প্রোফেসর। তাঁহার পুত্র সুবোধ শৈশবকাল হইতে আমার বন্ধু।

সেদিন রবিবার। প্রতি রবিবার আমি নিয়মিতভাবে মিঃ মুখার্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য উপস্থিত হইতাম। মিঃ মুখার্জির পুত্র ইংলণ্ডে সিভিল সারভিস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং তাঁহার রুগ্না পত্নী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দার্জিলিঙে অবস্থান করিতেছেন। কেবল মাত্র কন্যা নিরুপমা পিতার পরিচর্যার জন্য কলিকাতায় আছে। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বারান্দায় চা-টেবিলের পার্শ্বে মিঃ মুখার্জি তাঁহার কন্যা ও জনৈক বন্ধুসহ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জি তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নিরুপমা আমায় বলিল, "প্রকাশবাবু, এবারের "সন্ধ্যাকাশে" আবার তরুবালার কয়েকটা কবিতা বের হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখেচেন ?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, দেখেছি বই কি! কাল রাত্রেই তার সমালোচনাও করে ফেলেছি। আজ সকালে "অবসর চিন্তায়" পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার বোধহয় তরুকে মরুতে মারা পড়তে হবে!"

শুনিয়া নিরুপমা হাসিতে লাগিল।

অবসর চিন্তায় আমি নাম পরিবর্তন করিয়া সমালোচনা প্রকাশ করিতাম। সে কথা কেবল নিরুপমাই জানিত। বাংলা কাব্য সম্বন্ধে নিরুপমার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইত, বিশেষতঃ তরুবালার কবিতা সম্বন্ধে। তরুবালার কবিতা নিরুপমার আদৌ পছন্দ হইত না। বাংলা সাহিত্যে নিরুপমার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। কারণ মিঃ মুখার্জি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি তত দৃষ্টি না দিয়া সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে নিরুপমাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

নিরুপমা ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "আঁপনি কি খুব তীব্র সমালোচনা করেচেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বোধ হয় একটু অতিরিক্ত কঠিন হয়েচে। কিন্তু তার কারণ আছে। 'ক্ষমা' কবিতাটা ভালো ক'রে পড়ে দেখেছ ?"

নিরুপমা হাসিয়া বলিল, "দেখেছি, সেটা যে আপনাকে লক্ষ্য করে লেখা তা বেশ বোঝা যায়।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ সেই জন্যই 'ক্ষমার' লেখিকাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম না।"

নিরুপমা বলিল, "বেশ করেছেন। স্ত্রীলোক হয়ে এত কিসের গর্ব যে, যা ইচ্ছে তাই লিখবে।"

আমি বলিলাম, "আর কিছুই নয়, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। তোমাদের মতো শিক্ষিতা মেয়েরা যদি বাংলা লেখে, তা হলে ভালো জিনিসই পাওয়া যেতে পারে। তুমি এত ভালো বাংলা জান, একটু একটু লিখতে আরম্ভ কর-না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিল, "কেন? তা হলে কি আপনি তরুবালাকে ত্যাগ করে নিরুপমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন?"

আমি কহিলাম, "না নিরু, তুমি যদি কবিতা লেখ তা হলে আমার কলম থেকে অন্য প্রকার সমালোচনা বের হবে।"

নিরুপমা কহিল, "এরূপ পক্ষপাতী সমালোচক পেলে কবিতা লিখতে প্রলোভন হয় বটে, কিন্তু প্রকাশবাবু, পক্ষপাতিত্ব সমালোচকের পক্ষে একটা মস্ত দোষ।"

আমি ঈষৎ রঙ্গচ্ছলে বলিলাম, "তা নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যদি তোমার পক্ষপাতী না হই, তা হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু দোষ নয়, পাপ হবে।"

নিরুপমার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। "কিন্তু বেচারী তরুবালা আপনার কাছে এমন কী অপরাধ করেছে যে, আপনি তার এমন ঘোরতর বিপক্ষ হয়ে উঠেচেন?"

আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম, "তা বলতে পারিনে—কিন্তু যে রকম ক'রেই হোক, হয়ে উঠেছি তা ঠিক।"

ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর গৃহে ফিরিলাম।

প্রায় মাসাবধি পরে একদিন সন্ধ্যাকালে মিঃ মুখার্জির ড্রয়িং রুমে বসিয়া দার্জিলিং হইতে সদ্য-প্রত্যাগতা মুখার্জি পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলাম, এবং নিকটে বসিয়া নিরুপমা এলবামে দার্জিলিঙ হইতে সংগৃহীত ফার্ন সাজাইতেছিল।

মুখার্জি পত্নী বলিলেন, "প্রকাশ, প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে তোমার চিঠি পেতাম বলে দার্জিলিঙে অনেকটা সুস্থচিত্তে কাটাতে পেরেছিলাম। তোমার পরীক্ষার সুফল সেখানে জানতে পেরে মনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ হয়েছিল। বি, এল পরীক্ষায় তুমি যে সর্বপ্রথম হবে, তা আমরা বরাবরই আশা করতাম। ইনি তো সর্বদাই তোমার সুখ্যাতি করতেন যে, ক্লাসের মধ্যে তুমিই সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র।"

একজন ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপর একটা কাগজ রাখিয়া গেল। দেখিলাম সন্ধ্যাকাশ।" খুলিয়া দেখিলাম "তরু" স্বাক্ষরিত লেখিকার "সমালোচক" নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। কবিতার মর্ম এইরূপ—কোন এক চিত্রকর একটি সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এক মূর্খ সমালোচক সেটিকে উল্টা করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, ইহাতে বর্ণের সংগতি আছে, তুলিকার চাতুর্য আছে, কিন্তু ভাবের অত্যন্ত বিপর্যয় ঘটিয়াছে; কারণ এই চিত্রটিতে সুন্দরীর পদদ্বয় ঊর্ধ্বদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে চিত্রটি সর্বতোভাবে অস্বাভাবিক হইয়াছে।"

কবিতা পাঠ করিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন—এবং নিরুপমা কার্ন সাজাইতে ব্যস্ত।

রুক্ষ স্বরে আমি বলিলাম, "তোমার সন্ধ্যাকাশ এসেছে।"

নিরুপমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এবার বোধহয় তরুবালার তিরোভাব!"

আমি বলিলাম, "না—অতিশয় অভদ্র ভাবে আবির্ভাব। এই নাও, পড়।"

অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আমার হাত হইতে সন্ধ্যাকাশ লইয়া নিরুপমা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িয়া বলিল, "অন্যায়, ভারি অন্যায়! প্রকাশ বাবু, আপনি এর একটা প্রতিকার করুন! অত্যন্ত কড়া করে এর একটা উত্তর দিতে হবে। স্ত্রীলোকের এতটা অভদ্রতা অত্যন্ত অগৌরবের কথা।"

আমি বলিলাম, "না, এ ব্যাপারটাকে আমি একেবারে লঘু করে দিতে চাই। এ জঘন্য কবিতার উত্তর দিলে নিজেকেই ছোট হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্চে যে তরুবালা স্ত্রীলোক নয়—কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়ে এ সব লিখছে। স্ত্রীলোক এতটা নির্লজ্জ হতে পারে আমার মনে হয় না।"

অন্যমনস্কভাবে নিরুপমা বলিল, "তা হবে।"

চার

চার পাঁচ দিন পরে মিঃ মুখার্জির এক পত্র পাইলাম। পত্রে নিরুপমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব।

পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না। কারণ আমার কতকটা ধারণা ছিল যে, একদিন সম্ভবত এ প্রস্তাব আসিবে। কিন্তু আনন্দিত হইলাম। অমিশ্র আনন্দ কাহাকে বলে, তাহা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মিঃ মুখার্জীর ভৃত্যের হস্তেই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলাম। সংক্ষেপে লিখিলাম, "আপনার স্নেহসিক্ত প্রস্তাব অদ্য আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক কথা লিখিয়া আমাকে অপ্রতিভ করিয়াছেন মাত্র। আশীর্বাদ স্বরূপ আপনার শুভ-ইচ্ছা আমি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমার মনে হয়, এ বিষয়ে নিরুপমার সম্মতি লওয়াও আবশ্যক।"

বৈকালে মিঃ মুখার্জির পত্র পাইলাম—সন্ধ্যার সময় চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মিঃ মুখার্জি পত্নীসহ বেড়াইতে গিয়াছেন। গৃহে আমার জন্য নিরুপমা অপেক্ষা করিতেছে। উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু দুই একটা কথাবার্তার পর বুঝিতে পারিলাম যে, নিরুপমা এ কথা এখনও জানে না।

নিরুপমা বলিল, "প্রকাশ বাবু, চা খেয়েই পালাতে পারবেন না। বাবা বলে গেছেন, তাঁদের ফেরা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "তা হলে চিনির সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে দাও, নিমকহারামিটা আর করতে পারব না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এমন অনেক লোক আছে, যাদের বাধ্য করতে হলে শুধু মিষ্ট রসে হয় না, অন্য প্রকারে রসেরও প্রয়োজন হয়।"

ভৃত্য একটা ট্রে করিয়া চায়ের জল, দুগ্ধ ও চিনি আনিয়া রাখিল। নিরুপমা আমার জন্য চা তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত হইল এবং আমিও একবার ভালো করিয়া নিরুপমাকে দেখিয়া লইতে ব্যস্ত হইলাম। ভালো করিয়া, অর্থাৎ নূতন ভাবে—নূতন চক্ষে! মিঃ মুখার্জির প্রস্তাব নিরুপমাকে আমার নিকট আজ নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। জানি, আজ প্রভাত হইতে আমার চক্ষে এক নব জ্যোতির সঞ্চার হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব আমার নিকট নব প্রভায় উদ্ভাসিত মনে হইতেছে! কিন্তু নিরুপমা যে এত সুন্দরী, তাহা জানিতাম না! মৃদু সঞ্চালনে নিরুপমার কর্ণলগ্ন হীরক খণ্ড পর্যন্ত নির্মল পুণ্যের ন্যায় ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। কী সুন্দর! হীরকের উপর নূতন করিয়া আমার শ্রদ্ধা হইল!

চায়ের পেয়ালা আমার সম্মুখে রাখিয়া নিরুপমা বলিল, "প্রকাশ বাবু, খান। আপনি আবার গরম না হ'লে খেতে পারেন না।"

মনে মনে বলিলাম, প্রকাশ বাবু, এখন যে সুধা পান করছেন, তার নিকট চা অত্যন্ত তুচ্ছ। এবং দ্রুত রক্ত-সঞ্চালনে শরীর এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে, গরম খাবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

"নিরু!" কণ্ঠস্বর কিছু অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত হইয়া গেল।

নিরুপমা বিস্মিত হইয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করিল। কী বলছেন?"

কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিলাম, "তুমি আর আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করো না।"

প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে নিরুপমা বলিল, "কেন?" বোধহয় আমার দেহ হইতে তাহার দেহেও তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

"আপনি শব্দটা বড় কর্কশ। দু'জনের মধ্যে তাতে কেমন একটা ব্যবধান রেখে দেয়। 'তুমি' শব্দ পরস্পরকে নিকট আনে। নিরুপমা, তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে, যার উপর আমার জীবনের সব আশা আনন্দ নির্ভর করছে!"

নিরুপমা উপবেশন করিল। দেখিলাম, তাহার সর্ব-শরীর কাঁপিতেছে। পকেট হইতে মিঃ মুখার্জির পত্রখানা বাহির করিয়া নিরুপমার হস্তে দিয়া বলিলাম, "এই আমার আবেদন।"

নিরুপমা ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে পত্রখানি ফিরাইয়া দিল।

আমি বলিলাম, "তোমার কোনও আপত্তি আছে?"

নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে মুখ নত করিল।

"লজ্জা করো না, নিরুপমা, এ লজ্জার সময় নয়। তোমার আপত্তি থাকলে, তোমাকে বিয়ে করে আমি কখনই তোমার কষ্টের কারণ হব না।"

"আমার একটা কথা আছে।"

"কী কথা, বল।"

নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, পরে দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "আমিই তরুবালা।"

"তার অর্থ?"

"সন্ধ্যাকাশে তরুবালা নাম দিয়ে আমার কবিতাই বের হতো।"

হৃদয়ে একটা আঘাত অনুভব করিলাম। সুশীলের কবিতা সমালোচনার কথা মনে পড়িল। পুনরায় তদপেক্ষা গুরুতর ঘটনা!

আমি বলিলাম, "সমালোচক কবিতা হলে তুমিই লিখেছিলে?"

নিরুপমা দৃঢ়ভাবে বলিল, "না, আমার লেখা নয়। কার লেখা, তা আমি জানি নে।"

"ক্ষমা?"

মুখ নত করিয়া নিরুপমা বলিল, ক্ষমা আমিই লিখেছিলাম। ভারি অন্যায় কাজ হয়েছিল, সে অনেক দিন আগেই বুঝেছি, তার জন্য আমি আপনার—"

বর্ষার আকাশে মেঘ ঘন হইয়া জমিয়া থাকে, একটু শীতল বায়ুর সংস্পর্শেই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে। দেখিলাম, নিরুপমার চক্ষুপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মনের মধ্যে আঘাত পাইলাম। বলিলাম, "নিরু, আমাকে ক্ষমা কর। সমালোচক কবিতা তোমার লেখা কি না, তা জিজ্ঞাসা করেও আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। আমি তোমার কবিতার অন্যায় সমালোচনা করতাম, আমার মতো নিষ্ঠুর জগতে নেই। আমাকে ক্ষমা কর, নিরু। এ বিবাহে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তা হলে বুঝব যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ! তোমার আপত্তি আছে কি?"

নিরুপমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আপত্তি নাই।

"তা হলে বুঝলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ!"

নিরুপমা মুখ তুলিয়া বলিল, "আর আপনি?"

"আমি কী?"

"আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন?"

"না, করি নি।"

"কেন?"

"তুমি এখনও আমাকে 'আপনি' বলছ বলে।"

নিরুপমা রক্তিম হইয়া উঠিল।

টুং টাং করিয়া গাড়ির বেলের শব্দ হইল, মিঃ মুখার্জি এবং তাঁহার পত্নী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "প্রকাশ, এখনও তোমার চা পড়ে রয়েছে! খাও নি?" বোধ হয়, ব্যাপারটা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "নিরু, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বদলে দাও।"

নিরুপমা আমার পত্নী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কবিতা লিখিতেছে। কিন্তু আমি সমালোচনা করা ছাড়িয়াছি। নিরুপমা মাঝে মাঝে সমালোচনা লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। বোধ হয়, পরিহাস করিয়াই বলে। আমি কিন্তু শপথ করিয়াছি, আর কখনও বেলতলায় যাইব না।

সন্ধি-পত্র

এক

বাঙ্গালীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্লাব 'মোহনবাগান' এবং ইংরাজদের প্রখ্যাত দল 'ক্যালকাটার' মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার দিন সর্বপ্রথম যখন মোহনবাগান ক্যালকাটাকে 'গোল' দিল, তখন দেশীয় দর্শকবর্গ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালের পথের কর্দম এবং আকাশের জলকে উপেক্ষা করিয়া যে-সকল দর্শক তাহাদের প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার কর্তব্য পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব হইতে স্থান সংগ্রহ করিয়া উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা তাহাদের স্বজাতিদলের বিজয়-সম্ভাবনায় অধীরভাবে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। বিশ সহস্র ছত্র এবং যষ্টির শূন্যমার্গে একত্র সঞ্চালন এবং বিশ সহস্র কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বিরাট 'গোল' শব্দের মধ্য দিয়া যে উত্তেজনা মূর্তিমান হইয়া উঠিতেছিল, তাহা যে-কোন যুদ্ধ-জয়ের পক্ষেও উপযুক্ত হইতে পারিত। অপর পার্শ্বে ইংরাজ দর্শকগণের বিমর্ষতা, আলোকের পার্শ্বে ছায়ার তুলিকা-ঘাতের মতো, সমগ্র চিত্রখানিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।

এ যেন সামান্য ফুটবল খেলা নয়, এ যেন জাতির সহিত জাতির সংঘর্ষ, এ যেন সম্মান লাভ এবং সম্মান রক্ষার জন্য সুতীব্র সংগ্রাম!

"আদর্শ নিবাস" মেসের কয়েক জন ছাত্র একত্র গ্যালারিতে বসিয়া খেলা দেখিতেছিল। মোহনবাগান 'গোল' দেওয়াতে তাহারা সকলেই উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল, শুধু তাহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র সে-আনন্দে অন্তরের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিল না; সে যেন ক্ষণে ক্ষণে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল। প্রাণপণ করিয়া

আপনার শক্তিহীন মনকে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা সে করিতেছিল। কিন্তু মনের ধর্মই তাহা নহে। সে যখন একবার অবসন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে কঠিন করিবার চেষ্টা তাহার অবসন্নতাকে আরও বাড়াইয়া দেয়।

মোহনবাগানের পূর্ব কয়েক দিনের খেলা দেখিয়া হরিশের ধারণা হইয়াছিল যে, ক্যালকাটাকে মোহনবাগান কোন প্রকারেই পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। সেই ভরসায় ক্যালকাটার জয়ের উপর নির্ভর করিয়া সে একেবারে পঞ্চাশ টাকা বাজি ধরিয়াছিল। ক্যালকাটা জিতিলে তাহার একশত টাকা লাভ হইবার কথা।

লাভ নাই হউক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই; কিন্তু এই যে মেস খরচ হইতে পঞ্চাশ টাকা দিয়া সে রিক্ত-হস্ত হইয়া পড়িল, তাহার কী উপায় হইবে? মাসের সমস্ত ব্যয় পড়িয়া রহিয়াছে, কলেজের মাহিনাটি পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই, তিন দিন মাত্র হরিশের পিতা টাকা পাঠাইয়াছেন, হরিশের নিকট সর্বসুদ্ধ পাঁচ টাকাও নাই। এখন সে কেমন করিয়া তাহার পিতাকে পুনরায় টাকা পাঠাইবার জন্য লিখে? অথচ কালই লিখিতে হইবে, না লিখিলেই নয়।

হরিশের পিতা দরিদ্র নহেন, কৃপণও নহেন, কিন্তু অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং হিসাবী লোক। ন্যায্য ব্যয় করিতে তিনি যেমন মুক্তহস্ত, অপব্যয়ে এবং অতিব্যয়ে তিনি তেমনই বিমুখ, বিশেষত প্রবাসী অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে যথেষ্টর অতিরিক্ত অর্থ পাঠাইতে তিনি একেবারেই নারাজ। এমন অবস্থায় তিনি যদি সংবাদ পান, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র জুয়া খেলিয়া অর্থ নষ্ট করিতেছে তাহা হইলে—কী হয়, না ভাবিয়াই হরিশ শিহরিয়া উঠিল।

লালমাধবের কথা হরিশের মনে পড়িল। সেই শুধু হরিশের বাজি রাখার কথা জানিত। সে অনেক করিয়া হরিশকে নিষেধ করিয়াছিল—"হরিশদা, ও কাজ করো না,—হারলে অর্থ নষ্ট, জিতলেও জুয়াখেলা। কোন দিক দিয়েই কাজটা ভালো নয়।" কিন্তু হরিশ লালমাধবের কথায় কর্ণপাত করে নাই। বোধ হয়, তখন তাহার স্কন্ধে শয়তানই আবির্ভূত হইয়াছিল, নহিলে তাহার এরূপ দুর্মতি হইবে কেন?

যদুনাথ বলিল, "মোহনবাগান যে রকম খেলছে, শীঘ্র আরও দুটো গোল দেবে।"

রামগোপাল বলিল, "ক্যালকাটার আর কোনও আশা নেই।"

হরিশ দেখিল, বাস্তবিক আর আশা নাই। মোহনবাগান অদম্য উৎসাহের সহিত খেলিতেছে, ক্যালকাটা আত্মরক্ষা করিতেই বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সহসা কালকাটা একটা গোল দিয়া মোহনবাগানের গোল পরিশোধ করিল। তখন উত্তেজনায় দর্শকমণ্ডলী অস্থির হইয়া উঠিল। এইবার যে পক্ষ গোল দিতে সমর্থ হইবে, তাহারাই জয়ী রহিবে, কারণ সময় অল্প হইয়া আসিয়াছে, এখন আর পরিশোধের আশা অল্প।

হরিশ আশান্বিত হইয়া উঠিল। যদি ক্যালকাটা আর একটা গোল দিতে পারে। ওঃ তাহা হইলে সে কী পরিত্রাণটাই না পায়!

হরিশের করুণ প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ করিলেন। ক্যালকাটা আর একটা গোল দিল। সমগ্র ইংরাজ-মণ্ডলী বিজয়ানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। দেশীয় দর্শকবৃন্দ বিষাদে মূক হইয়া রহিল; শুধু হরিশ উচ্চৈঃস্বরে 'গোল' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। হরিশ ইচ্ছা করিয়া বলে নাই, প্রায় তার অজ্ঞাতসারেই কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অন্তরে সে যাহা কামনা করিতেছিল, মুখ অকপটে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে!

বিস্মিত রামগোপাল হরিশের মুখে তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "সে কি হে! অ্যাঁ—?"

হরিশ অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিল।

সুরেন বলিল, "তোমার বুঝি এখন আনন্দ প্রকাশের সময় পড়ল?"

যদুনাথ কহিল, "হরিশ হচ্ছে একেবারে খাস্ বিলিতী সাহেব, নেটিভের পরাজয়ে তার তো আনন্দ হবারই কথা।"

কিয়ৎদূর হইতে একজন অপরিচিত বলিয়া উঠিল, "দাও, স্বজাতিদ্রোহীটাকে কান ধরে বার করে দাও।"

অগত্যা হরিশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। অপরিচিতের কথার সে কোনও প্রত্যুত্তর দিল না, যদুনাথকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সাহেব আর নেটিভের কথা হচ্ছে না। যে জয়ী হবে, সেই সম্মান পাবার অধিকারী Fair field and no favour. এ বিষয়ে কোনও দলাদলি নেই।"

প্রমথ বলিল, "আশ্চর্য! বিশহাজার বাঙালীর মধ্যে সে জ্ঞানটা তোমারই আছে দেখা যাচ্ছে!"

রামগোপাল বিদ্রূপের সহিত কহিল, "চুপ কর হরিশ, চোরের মুখে ধর্মের কাহিনীতে আর কাজ নেই।

হরিশ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। কহিল, "নিজের সংকীর্ণ মন নিয়ে আমাকে অপমানিত করবার তোমার কোনও অধিকার নেই। ফুটবল খেলা Bengal Partition নয় যে, এর মধ্যেও একটা দলাদলির সৃষ্টি করতে হবে।"

রামগোপাল কহিল, "দলাদলি করবার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটুখানি স্বজাতিপ্রীতির জন্য পিনাল কোডের ধারায় কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা লেখে না। অতএব মোহনবাগানের পরাজয়ে একটু দুঃখিত হলেও তোমার ডেপুটিগিরির সম্ভাবনায় কোনও ব্যাঘাত হতো না।"

হরিশ রক্তবর্ণ হইয়া কহিল, "নিজেদের সংকীর্ণতা প্রকাশ করবার পক্ষে তোমরা যথেষ্ট নির্লজ্জ, যথেষ্ট ইতর।"

খেলা শেষ হইয়া গেল; কিন্তু তর্ক শেষ হইল না। পথ চলিতে চলিতেও তর্ক

চলিতে লাগিল। পথ চলার জন্য তর্কের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিতে দেখা গেল না, বরং তর্কের জন্য পথচলার পদে পদে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে সুরেন্দ্র সকলকে বুঝাইল যে, মেসে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এবং তথায় পৌঁছিতে পারিলে নিরাপদে তর্ক করিবার পক্ষে যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে, তৎপরিবর্তে গতিশীল মোটরকারের চাকার তলায় গিয়া পড়িলে তর্কের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবারই সম্ভাবনা। সুরেন্দ্রর অকাট্য যুক্তিতে বাকী পথটুকু নীরবে অতিক্রম করাই সঙ্গত বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিল।

হরিশ মনে করিল, বাজির কথা যদি রামগোপাল প্রভৃতি কোন প্রকারে জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার লজ্জার সীমা থাকিবে না। মোহনবাগানের পরাজয়ের সহিত তাহার এত বড় একটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে প্রকাশ পাইলে যে ঔদার্যের দোহাই দিয়া সে পরিত্রাণ-লাভের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা তাহার সমস্ত গুরুত্বের সহিত তাহারই মাথার উপর চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। একমাত্র লালমাধব বাজির কথা জানে। ভাগ্যে আজ সে খেলা দেখিতে আসে নাই! হরিশ মনে করিল, মেসে গিয়া প্রথমেই লালমাধবকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে, সে যেন কাহাকেও বাজি রাখার কথা না বলে।

দুই

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়িল। রামগোপাল প্রভৃতি মেসে পৌঁছিলে প্রথমেই লালমাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লালমাধব তাহাদের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া ছিল।

লালমাধব আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, কী খবর?"

সুরেন্দ্র বলিল, "খবর মন্দ! মোহনবাগান এক গোলে হেরেছে।"

লালমাধব দুঃখিত স্বরে বলিল, "এঃ, তাই তো! হেরে গেল!" কিন্তু পরক্ষণেই উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "কী হরিশদা, তোমার তো আজ খুব লাভ হয়েছে, খাইয়ে দিতে হবে।"

হরিশ চাপা সুরে বলিল, "আঃ, লালমাধব, চুপ কর।" ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

লালমাধব সহাস্যে বলিল, "সে হচ্ছে না! ফাঁকি দিলে চলবে না।" বলিয়া সন্দিগ্ধ রামগোপাল প্রভৃতির দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমরা জান না, হরিশদা ক্যালকাটায় পঞ্চাশ টাকা বাজি ধরেছিল, আজ এক শ টাকা লাভ মেরেছে!"

ব্যস্! আর কোথায় যায়? রামগোপাল প্রভৃতি বিজয়দৃপ্ত নেত্রে হরিশের দিকে কটাক্ষপাত করিল। অপমান ও লজ্জায় হরিশ পাণ্ডু হইয়া গেল।

রামগোপাল সগর্বে বলিল, "কী হরিশ, আমি ইতর, না তুমি ভণ্ড? আমি সংকীর্ণ হৃদয়, না তুমি প্রবঞ্চক?"

যদুনাথ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "Fair field and no favour, সেখানে কোন দলাদলি থাকতে পারে না।"

সুরেন্দ্র সুরসংযোগে বলিল, "ওহে সকলেরই মূলে আছ টাকা ব'লে মধুময় এ সংসার।"

রামগোপাল উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ হইয়া হরিশ তাহাকে ইতর বলিয়া গালি দিয়াছিল। স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছিল। অর্থলোভী উদার অন্তঃকরণের গর্ব করিতেছিল।

রামগোপাল বলিল, "হরিশ, তোমার স্বজাতিপ্রীতির মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়, পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করলেই তোমার স্বদেশপ্রেমকে কিনে নেওয়া যেতে পারে, অথচ তুমি আমাকে ইতর বলে গালি দিচ্ছিলে। আমি যদি ইতর হই, তা' হলে তোমার বিশেষণ অভিধানে কী হয় তা বলতে পার?"

লালমাধব সবিস্ময়ে বলিল, "হঠাৎ যুদ্ধং দেহি বলে তোমরা যে কোমর বাঁধলে, এর মানে কী? আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।"

হরিশ এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু রামগোপালের কঠোর বচনগুলি তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার স্বদেশপ্রেমের মূল্য পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তোমাদের পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ওঠে কি না, তার কোন প্রমাণ নেই।"

রামগোপাল বলিল, "তার প্রমাণ যখন নেই, তখন যে তা পঞ্চাশ টাকার কম, তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। তোমার বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, তুমি পঞ্চাশ টাকাতেই কাহিল। পঞ্চাশ টাকার ক্ষতির আশঙ্কায় যে স্বজাতির অনিষ্ট কামনা করে এবং স্বজাতির পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তাকে আমি অগ্রাহ্য করি, তাকে আমি ঘৃণা করি।"

হরিশ বলিল, "অর্থনাশের সম্ভাবনা না থাকলে অর্থের অকিঞ্চনত্বের বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু পকেটে হাত দিতে হলেই তখন দেখা যায় যে, অর্থ ততটা সামান্য জিনিস নয়। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ যে পঞ্চাশ টাকা হেরে এসে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার?"

যদুনাথ বলিল, "টাকাটা না হয় খুব মস্ত বড় ব্যাপারই হলো, তবে সে কথাটা পূর্বে স্বীকার না করে বিশ্বপ্রেম আর নিরপেক্ষতা নিয়ে টানাটানি করছিলে কেন?"

প্রমথ কহিল, "আর একটা তুচ্ছ প্রশ্ন আছে। তখন 'গোল' বলে চিৎকার করে না উঠলে তোমার টাকা পাবার বিষয়ে কোন গোল হতো কি?"

এ দুইটা প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া কঠিন। হরিশের তর্ক করিতে আর ইচ্ছা হইতেছিল না। হতভাগা লালমাধবটা তাহাকে একেবারে মজাইয়াছে। হরিশ বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

তিন

সন্ধ্যার পর রামগোপালের ঘরে একটা সভা বসিল। সেখানে কেবল লালমাধব উপস্থিত হয় নাই। গোলযোগ দেখিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রামগোপাল মেসের মেম্বরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, "ক্যালকাটার" পক্ষে হরিশের গোল বলিয়া চিৎকার করাটা অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা অবশ্য এমন গুরুতর অপরাধ নহে, যাহার জন্য বিশেষ করিয়া একটা কোন প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু নানা প্রকার জটিলতার মধ্য দিয়া সেই ব্যাপারটা এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যেখানে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করা যায় না। অর্থনাশের আশঙ্কায় বিমর্ষতা, এবং অর্থলাভের সম্ভাবনায় আনন্দ প্রকাশ করা, উভয়ের মধ্যে একটাও নিশ্চয়ই নিন্দনীয় নহে, দণ্ডনীয় তো নহেই। কিন্তু কোন অর্থলোভী ব্যক্তি যদি অর্থলিপ্সাকে বিশ্বপ্রেমের আবরণে লুকাইতে চেষ্টা করে, এবং তদভিপ্রায়ে অন্যান্য ব্যক্তিকে সংকীর্ণ-হৃদয় এবং ইতর বলিয়া গালি দেয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। তাহার জন্য নিশ্চয়ই কিছু দণ্ড নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অদ্যকার ঘটনার জন্য হরিশের প্রতি কোন প্রকার দণ্ড বিধান করা কর্তব্য কি না, উপস্থিত বন্ধুবর্গের তাহাই বিচার্য।

বন্ধু জুরীগণ যখন একবাক্যে হরিশকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তখন অপরাধীর জন্য কী দণ্ড নিরূপিত করা হইবে, তাহা লইয়া গুরুতর আলোচনা উপস্থিত হইল। নানা প্রকার তর্ক, যুক্তি, গবেষণা এবং চিন্তার পর স্থির হইল যে, মেসের মেম্বরগণ দিবসত্রয় হরিশের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখিবেন।

সে রাত্রে হরিশ সভার বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু পরদিন প্রভাতেই হরিশ বুঝিতে পারিল যে, মেসের মেম্বরগণ যুক্তি করিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া বন্ধ করিয়াছে।

এত স্পর্ধা! এত অহঙ্কার! পরামর্শ করিয়া অপরাধীর মতো তাহার প্রতি দণ্ড-বিধান! অপমানের বেদনায় হরিশ অস্থির হইয়া উঠিল! রামগোপাল, সুরেন, প্রমথ প্রভৃতি যাহাদিগকে হরিশ অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিত, তাহাদের এমন জঘন্য আচরণ! তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্তন করিয়া হরিশ মেস্ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

স্নানাহারের সময়ও হরিশ প্রত্যাবর্তন করিল না। মেসের সকলেই একে একে বাহির হইয়া গেল, শুধু লালমাধব সে দিন কলেজে গেল না, সে হরিশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। কেন, তাহা ঠিক নির্দেশ করা যায় না—তবে মেসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হরিশের প্রতি লালমাধব অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিদ্রার পূর্বে এবং জাগরণের পরে হরিশের সহিত গল্প করিয়া, হরিশের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়া, একত্র পাঠ করিয়া লালমাধব অন্তরের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করিত, একমাত্র স্ত্রীর পত্র পাওয়া ভিন্ন অন্য কিছুতেই সে তেমন আনন্দ লাভ করিত না।

হরিশও লালমাধবকে সহোদরের মতো স্নেহ করিত এবং বন্ধুর মতো ভালবাসিত। লালমাধবের দ্বারা বাজি রাখার কথা প্রকাশ হওয়ায় সেইজন্য লালমাধব বিশেষভাবে দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বেলা বারোটার পর দুই তিনজন মুটে লইয়া হরিশ বাসায় উপস্থিত হইল।

লালমাধব বলিল, "হরিশদা, ব্যাপার কী? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এরা কে?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "এরা যে মুটে, তা এদের ঝাঁকার দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছে।"

লালমাধব বলিল, "তাতো বুঝলাম, কিন্তু এদের কী দরকার?"

হরিশ বলিল, "ভারি জিনিস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে হলে এদের দরকার হয়।"

লালমাধব বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

হরিশ বলিল, "লালমাধব, এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি এখনই এ মেস থেকে চলে যাব; হ্যারিসন রোডে, 'বান্ধব নিকেতনে' আমি সীট ঠিক করে এসেছি। তুমি আছ, ভালোই হয়েছে। মেসের প্রাপ্য তোমার কাছে রেখে যাব।"

লালমাধব কহিল, "না হরিশদা, সে কিছুতে হবে না। মেস্ ছেড়ে তুমি যেতে পাবে না।"

হরিশ কহিল, "এই অন্যায় অপমান মাথায় নিয়ে তুমি আমাকে এখানে এক দিনের জন্যও থাকতে বল? এই সব বন্ধুদের মধ্যে, যারা আমার সহিত একটা আসামীর মতো ব্যবহার করেছে? কেন, কলিকাতায় কি আর দ্বিতীয় আশ্রয় পাওয়া যাবে না? না, আমার দেহ থেকে আত্ম-সম্মান-বোধ একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে?"

হরিশ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুলিদিগকে দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে আদেশ দিল।

লালমাধব দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, হরিশদা, আমার দোষেই তোমার—"

হরিশ লালমাধবকে বাধা দিয়া বলিল, "মিথ্যা দুঃখ করো না লালমাধব, এর মধ্যে তোমার কিছুমাত্র দোষ নেই। তুমি মিথ্যা কথাও বল নি, গুপ্ত কথাও প্রকাশ কর নি।"

লালমাধব বলিল, "তা না হলেও, যে রকম করে হোক, এ অপ্রীতিকর ব্যাপারের উৎপত্তি আমার দ্বারাই ঘটেছে।"

হরিশ বলিল, "একান্ত যদি তাই হয়ে থাকে তো কিছু উপকার করে সে অপকার স্খালন কর। উপস্থিত জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেবার বিষয়ে একটু সাহায্য কর। আর দিনান্তে অন্তত একবার করে 'বান্ধব নিকেতনে' দর্শন দিয়ো।

লালমাধবের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "হরিশদা, তুমি যেখানেই থাক-না, লালমাধব তোমারই কাছে থাকবে।

চার

সন্ধ্যার সময় রামগোপাল প্রভৃতি আসিয়া যখন শুনিল যে, হরিশ মেস্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারা অন্তরে একটু আঘাত অনুভব করিল। হরিশ তাহাদের অনেকের বাল্যবন্ধু শুধু তাহাই নহে, নানাবিধ গুণের জন্য হরিশকে মেসের সকলেই অত্যন্ত ভালোবাসিত। ফুটবলের ব্যাপার লইয়া হরিশকে মেস্ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, হরিশকে সামান্য শিক্ষা প্রদান করা, তাহার তপ্ত দাম্ভিকতায় কিঞ্চিৎ জলসেচন করা।

ক্ষমাপরায়ণ প্রমথ বলিল, "ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। হরিশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যাক।"

যদুনাথ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "অর্থাৎ কি না প্রমাণ করা যাক যে, আমরাই অপরাধী, আমরাই তার প্রতি উৎপীড়ন করেছি। আমাদের এখন ত্রুটি স্বীকার করে তাকে সাধনা করে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "যদু, ক্ষমা বলে একটা জিনিস আছে, যার মহত্ত্ব তুমি অস্বীকার করছ।"

যদুনাথ কহিল, "ক্ষমার দ্বারা ন্যায়কে খর্ব করা উচিত নয়, আমার মনে হয়, ক্ষমাশীলের চেয়ে ন্যায়বানের স্থান উচ্চে।"

সুরেন্দ্র বলিল, "যেখানে বাধ্য হয়ে ক্ষমা করতে হয়, সেখানে ক্ষমা আর পরাজয় একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাকে জোর করে ক্ষমা করতে যাচ্ছ, সে তো তোমাদের ক্ষমার জন্য কিছুমাত্রও লালায়িত নয়।"

প্রমথ চুপ করিয়া রহিল। সে দেখিল, জমি এখনও যথেষ্ট কঠিন রহিয়াছে, বীজ নিক্ষেপ করিলে অঙ্কুরের কোন প্রত্যাশা নাই!

রামগোপাল বলিল, "হরিশ, মেস্ ছেড়ে চলে যাওয়াতে আমরা সকলেই দুঃখিত হয়েছি বটে, কিন্তু এখন দেখতে হবে, তার মেস্ পরিত্যাগ করে যাওয়া আমাদের পক্ষ হতে তাকে ক্ষমা করবার একটা উপযুক্ত কারণ বলে স্থির করা যায় কি না। আমার মনে হয়, উপযুক্ত কারণ বলে স্থির করা যায় না, কারণ তার মেস্ ত্যাগ করে যাওয়া আমার কাছে আত্মগ্লানির পরিচায়ক বলে মনে হচ্ছে না, বরং মেস্ ত্যাগ করে সে প্রকাশ করতে চাচ্ছে যে, আমরাই তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছি, সেই জন্য সে আমাদের সঙ্গ বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই আমার মনে হয়, হরিশকে ক্ষমা করবার পক্ষে এখনও কোন কারণ উপস্থিত হয় নি। যে দণ্ডে উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হবে, সেই দণ্ডেই আমরা হরিশকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করব।"

রামগোপালের সিদ্ধান্তই সকলের মনঃপূত হইল। স্থির হইল, অযাচিতভাবে হরিশকে মেসে ডাকা হইবে না।

লালমাধব উভয় পক্ষের মধ্যে সখ্য পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সফলতার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রামগোপাল প্রভৃতি বলে, এমন কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে তাহারা অগ্রসর হইয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে পারে। হরিশ বলে, যাহারা তাহার সহিত বৈরীর ন্যায় আচরণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইবার পক্ষে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ এবং বিচ্ছেদ যখন অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিল, তখন সন্ধি-স্থাপনের বিষয়ে লালমাধব হতাশ হইয়া পড়িল। অগত্যা দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় 'বান্ধব নিকেতনে' অতিবাহন করা ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর রহিল না।

পাঁচ

সেদিন রবিবার। সকাল হইতে মাঝে মাঝে এক পশলা করিয়া বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে। সমগ্র কলিকাতা শহর অনুজ্জ্বল আলোক এবং পথের কর্দমে নিরানন্দ ভাব ধারণ করিয়াছে। হরিশ আপনার ঘরে বসিয়া তাহার স্ত্রীকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিতেছিল। মেস পরিবর্তনের পর তাহার স্ত্রীকে আজ সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। তাহার পিতাকে সে লিখিয়াছিল যে, নূতন মেস কলেজের নিকটে হওয়ায় এবং অপরাপর সুবিধার জন্য সে মেস পরিবর্তন করিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীকে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া লিখিল। ফুটবল ম্যাচের কথা, বন্ধুদিগের সহিত বিবাদের কথা, মেস ত্যাগ করার কথা, সমস্ত লিখিয়া পরিশেষে লিখিল, "বাজি রাখিয়া আমি যে টাকাটা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারা কোন একটা দ্রব্য খরিদ করিয়া আমি তোমাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। তুমি পত্রোত্তরে, তোমার কি জিনিস পছন্দ, আমাকে লিখিয়া জানাইয়ো, পূজার সময় আমি খরিদ করিয়া লইয়া যাইব।"

পত্র প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় লালমাধব আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিশ বলিল, "কী লালমাধব, কেমন বর্ষা পড়েছে, বল ?"

লালমাধব কহিল, "বর্ষার কথা আর বলো না, হরিশদা, বর্ষার জন্য ছাড়ে পর্যন্ত ছাতা ধরবার উপক্রম হয়েছে। কী হরিশদা, অষ্টাদশ পর্ব চিঠি বউদিকে লেখা হ'লো বুঝি ?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সুদে-আসলে এত বড় হ'য়ে পড়েছে। প্রায় মাসখানেক পরে বোধ হয় আজ চিঠি লিখছি।"

লালমাধব আশ্চর্য হইয়া বলিল, "মাসখানেক কি, হরিশদা। এই যে ১৫ই তারিখে লিখেছিলে, এখনও পনের দিন হয় নি।"

হরিশ বলিল, "লালমাধব, এই স্মৃতিশক্তিটা ইতিহাসের তারিখ মুখস্থ করতে প্রয়োগ করো, উপকার হবে।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া লালমাধব বলিল, "মহাভারতের কথা অমৃত সমান, আমরা একটু শুনতে পাই না, হরিশদা ?"

হরিশদা হাসিয়া বলিল, "না, কাশীরামদাস এটা পুণ্যবানকে শোনাতে অনিচ্ছুক।"

অভিমানী লালমাধব ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "কোন্ পাপের জন্য পুণ্যবানকে আজ বঞ্চিত হতে হ'লো তাতো বুঝতে পারচিনে। মেস্ ছাড়ার পর প্রথম চিঠিই আমার পক্ষে গুপ্ত হ'য়ে দাঁড়াল ?"

হরিশ পত্রখানি লালমাধবের নিকট নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "পুণ্যবান নিজে পাঠ করতে পারেন।"

পত্রখানি শেষ করিয়া সহাস্য মুখে লালমাধব তাহা প্রত্যর্পণ করিল, বলিল, "অবশেষে তাহলে বউদিদিরই লাভ দাঁড়াল, হরিশদা ?"

হরিশ কহিল, "কোন্ বিষয়ে তাঁর যে লোকসান দাঁড়ায়, তা তো জানিনে।"

বারোটা বাজিলে লালমাধব প্রস্থানের জন্য উঠিয়া পড়িল।

হরিশ তাহার স্ত্রীর পত্রখানা লালমাধবের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "যাবার সময় চিঠিখানা ডাকঘরে দিয়ে যেয়ো।"

কিন্তু ডাকঘরে চিঠি ফেলিবার পূর্বে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ লালমাধবের মাথায় একটা মতলব আসিয়া উপস্থিত হইল। লালমাধবের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিন মাস ধরিয়া ক্রমাগত অভ্যাস করিয়া লালমাধব হরিশের স্ত্রীর হাতের লেখা অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিল। হরিশের সহিত কথা ছিল যে, একদিন লালমাধব হরিশের স্ত্রীর হাতের লেখার অনুকরণে চিঠি লিখিয়া হরিশকে প্রতারিত করিবে। হরিশ বলিয়াছিল যে লালমাধব কোন প্রকারেই তাহাতে সক্ষম হইবে না। আজ লালমাধব স্থির করিল যে, সে উক্ত পরীক্ষা করিবে এবং তাহাতে যদি সফল হয় তাহা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অবলীলাক্রমেই রামগোপাল প্রভৃতির সহিত হরিশের বিবাদ মিটিয়া যাইবে। এক শরে দুই পক্ষী বিদ্ধ হইবে।

হরিশের পত্রখানি পকেটে পুরিয়া লালমাধব মেসে উপনীত হইল।

স্নানাহার সমাপন করিয়া লালমাধব হরিশের স্ত্রীর হাতের লেখার অনুকরণে হরিশের পত্রের একখানি উত্তর লিখিল। লালমাধব দেখিল, অনুকরণ চমৎকার হইয়াছে, হরিশের সাধ্য কী যে বুঝিতে পারে! ফুটবল-সংক্রান্ত বিষয়ে লালমাধব নিম্নলিখিত ভাবে লিখিল। "ফুটবল ম্যাচ ও বাজি রাখা লইয়া তোমার বন্ধুগণের সহিত বিবাদ হওয়ায় আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। সামান্য কারণে তোমার বাল্যকালের বন্ধুগণের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া নিতান্ত কষ্টের বিষয়। আমার ক্ষুদ্র

বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তোমার তো কোন দোষ নাই, তোমার বন্ধুদেরও দোষ নাই ; পরস্পর বুঝিবার ভুলে এরূপ ঘটিয়াছে। বাজি জিতের টাকায় তুমি কোন দ্রব্য খরিদ করিয়া আমাকে উপহার দিবে, লিখিয়াছ। তোমার গভীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই ইচ্ছা আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু প্রিয়তম, এ বিষয়ে আমার এক নিবেদন আছে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়ো। তোমার বন্ধুবিচ্ছেদের সহিত যে অর্থ জড়িত, সে অর্থ দিয়া তুমি আমাকে উপহার কিনিয়া দাও, তাহা আমার ইচ্ছা নহে। আমার প্রস্তাব যদি তোমার মনঃপূত হয়, তাহা হইলে সেই মত কার্য করিয়ো। এই অর্থ প্রাপ্তির সহিত যখন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তখন এই অর্থ একটা পুণ্যকর কার্যে—যেমন দরিদ্রকে দান করায় —ব্যয় হইলেই ভালো হয়। সেই উপলক্ষে তোমার সহিত তোমার বন্ধুদের পুনর্মিলন অনায়াসে হইতে পারিবে। তোমার প্রতি আমার একান্ত মিনতি, আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়ো—"ইত্যাদি, ইত্যাদি—

পত্রখানি একটা খামে ভরিয়া, খামের উপর পাশের বাটী হইতে লালমাধব হরিশের নাম এবং ঠিকানা টাইপ করাইয়া লইল। একখণ্ড কাগজে লিখিল "ভাই বিভূতি, যে পত্রখানি এই পত্রমধ্যে পাবে, কালই ডাকে দিয়ো, যেন পরশু কলিকাতায় পৌঁছায়। অন্যথা করো না।"

একখানি বড় খামের মধ্যে পত্র এবং কাগজের খণ্ডটুকু ভরিয়া দিয়া লালমাধব তাহার বন্ধু বিভূতির নিকট উহা বহরমপুরে পাঠাইয়া দিল। তখন হরিশের স্ত্রী বহরমপুরে তাহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছিল।

ছয়

দুই দিন পরে লালমাধব যথাসময়ে হরিশের মেসে উপস্থিত হইল। নানা কথার পর লালমাধব সহজ ঔদাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হরিশদা, বউদিদির চিঠি পেলে ?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ হে, ভারি মজার এক চিঠি পেয়েছি।

ঔৎসুক্যের ভান করিয়া লালমাধব কহিল, "কী রকম ?" অন্তরে কিন্তু সে কৌতুকের তাড়নায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

হরিশ একখানি পত্র বাহির করিয়া লালমাধবের হস্তে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

স্বলিখিত জাল পত্র পড়িতে পড়িতে হাস্য চাপিয়া রাখা লালমাধবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিরীহ হরিশ বেচারার ভাব দেখিয়া তাহার মনে একটু কষ্টও হইতেছিল। হায় পক্ষী! আনন্দে পাখা নাড়িতেছ, কিন্তু জান না, তোমার চতুর্দিকে জাল ঘিরিয়া গিয়াছে।

লালমাধব পত্র শেষ করিয়া বলিল, "বাঃ হরিশদা, কী চমৎকার পত্র। কী

উদার মনের পরিচয়। সত্য বলছি, বউদিদির গুণে তোমার উপর আজ আমার আবার নূতন করে ভক্তি হচ্ছে। যার এমন স্ত্রী, বাস্তবিক সে ধন্য!"

বিপ্রলব্ধ হরিশও কতকটা মুগ্ধ হইয়া লালমাধবের প্রশংসাবাদ শুনিতেছিল। বাস্তবিক, স্ত্রীর গুণ-কার্তন শুনিলে কাহার না আনন্দ হয়!

হর্ষোৎফুল্ল মুখে লালমাধব বলিল, "তুমি কী করবে, স্থির করেছ?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি।"

বিস্ফারিত নেত্রে লালমাধব বলিল, "বল কী, হরিশদা, এখনও ঠিক করতে পারছ না? এ পত্র পাবার পর কি দ্বিধা করবার আর কোন কারণ থাকতে পারে? বউদিদির মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করোনা।" লালমাধব পত্রখানি পকেটে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করব। এ পত্র অনায়াসে সকলকে দেখান যেতে পারে। আমি রামগোপালদের কাছে চললাম!"

হরিশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "লালমাধব, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে একটা পরামর্শ করা যাক—"

তখন লালমাধব ফুটপাথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সাত

হরিশের স্ত্রীর পত্র পাঠ করিয়া রামগোপাল, সুরেন, প্রমথ প্রভৃতি মুগ্ধ হইয়া গেল।

প্রমথ বলিল, "কী সুন্দর স্বার্থত্যাগ! কী উদার অন্তঃকরণের পরিচয়!"

সুরেন বলিল, স্বামীর দান প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তার মধ্যেই স্বামীর প্রতি কেমন প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি ব্যক্ত হচ্ছে!"

লালমাধব বলিল, "তা তো হলো, এখন তোমরা কী স্থির করছ?"

রামগোপাল বলিল, "আমাদের যে বন্ধুর স্ত্রী এমন গুণবতী, এমন উদার-অন্তঃকরণ, সে বন্ধুকে আমরা কোনমতেই ত্যাগ করতে পারি না। আমরা স্থির করেছিলাম যে, উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হলেই আমরা হরিশকে ক্ষমা করব। হরিশের স্ত্রীর পত্র আমরা যদি উপযুক্ত কারণ বলে বিবেচনা না করি, তা হলে আমরা একজন উদার-হৃদয়া মহিলার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করব।"

রামগোপালের কথা সকলেই আনন্দ-সহকারে সমর্থন করিল; এবং স্থির হইল তখনই তাহারা হরিশের মেসে যাইয়া হরিশকে লইয়া আসিবে।

রামগোপাল, সুরেন, প্রমথ এবং লালমাধব যখন 'বান্ধব নিকেতনে' উপস্থিত হইল, তখন হরিশ সন্ধ্যা-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

রামগোপাল সর্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া হরিশকে আলিঙ্গন করিল। তৎপরে সুরেন, তাহার পর প্রমথ। লালমাধব সেই অবসরে অমিশ্র কৌতুক উপভোগ করিতেছিল

প্রমথ বলিল, "আমি শেষে আলিঙ্গন করলাম বলে মনে করো না হারুণ, যে তিনজনের মধ্যে আমার আগ্রহই কম।"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "অপরকে প্রথমে অবসর দিয়ে শেষের জন্য অপেক্ষা করা, আগ্রহের একটা মস্ত লক্ষণ।"

রামগোপাল বলিল, "তুমি তা হলে বলছ যে, আমার আগ্রহই সকলের চেয়ে কম?"

হরিশ বলিল, "সকলকে ঠেলে ঠুলে যে প্রথমে অগ্রসর হয়, তার আগ্রহ প্রমাণ করবার জন্য কোন লক্ষণ খুঁজে বার করতে হয় না।"

লালমাধব বলিল, "হরিশদা, আজ যে দু হাতে মিষ্টান্ন বিতরণ করছ!"

সকলে হাসিতে লাগিল।

রামগোপাল বলিল, "সুরেন, একখানা গাড়ি ডেকে নিয়ে এস।"

হরিশ বলিল, "এত তাড়াতাড়ির দরকার কী?"

প্রমথ বলিল, "দরকার কী, তা যদি তোমাকে বোঝাবার দরকার হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, আমাদের মনের মধ্যে এখনও গোল রয়েছে।"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "তা যদি হয় তো তোমাকে বোঝাতে হবে না।"

সুরেন গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল, লালমাধব এবং প্রমথ হরিশের দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিয়া গেল, এবং হরিশ ও রামগোপাল গল্প করিতে লাগিল।

আট

সন্ধ্যার পর রামগোপালের ঘরে আবার এক সভা বসিল। পূর্ববর্তী সভায় যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহার অধিকন্তু হরিশ ও লালমাধব এবার উপস্থিত। সকলেই উৎফুল্ল, সকলেই হরিশের সহিত কথা কহিতে উৎসুক।

রামগোপাল বলিল, "আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সামান্য কারণে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল, এবং তার ফলে আমাদের প্রিয়তম সুহৃৎ হরিশের সঙ্গ হতে কিছুদিনের জন্য আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম। আমরা যে তাতে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলাম, সেটা আমরা শুধু অন্তরেই বোধ করি নি, মুখেও প্রকাশ করেছিলাম। আমরা সকলেই পুনর্মিলিত হবার একটা উপলক্ষের অপেক্ষায় ছিলাম। বন্ধুগণ, আজ সেই উপলক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।" পকেট হইতে রামগোপাল হরিশের স্ত্রীর পত্রখানি বাহির করিয়া বলিল, "এই আমাদের সন্ধি-পত্র, হরিশের স্ত্রী পাঠিয়েছেন। একে মাল্যের দ্বারা জড়িত করলেও যথেষ্ট সম্মান দেখান হয় না—একে পুষ্প নির্যাসে সিক্ত করলেও আমাদের মন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হবে না। এরপর আমরা যদি সন্ধি করতে মুহূর্তের জন্যেও বিলম্ব করি, তা হলে Internationl Law অনুযায়ী আমরা সভ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হবার যোগ্য।"

একবাক্যে সকলে বলিল, "নিশ্চয়ই!"

রামগোপাল বলিল, "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার মতো বিবাদ করেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করেন নি। তিনি আমাদের অর্থ পাঠিয়েছেন, আর আদেশ করেছেন, সেই অর্থ যেন কোন সৎকার্যে ব্যয় করা হয়। এখন আমাদের বিচার্য, কী কাজে সেই অর্থ ব্যয় করা হবে!" পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া রামগোপাল বলিল, "এই এক শ' টাকার নোট। হরিশ আমাকে সভা বসবার আগেই দিয়েছে।"

তখন ঘোরতর আলোচনা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, মোহনবাগান ক্লাবের উন্নতির জন্য এক শত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হউক। কেহ বলিল, এই টাকায় নূতন একটা ফুটবল কাপের সৃষ্টি করা হউক। কেহ বলিল, টাকাটা কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়া দাও।

রামগোপাল বলিল, "যখন আমরা এ বিষয়ে একমত হতে পাচ্ছিনে, তখন দেখা যাক, এ বিষয়ে হরিশের স্ত্রী, যিনি বাস্তবিক টাকাটা দান করছেন, তাঁর কোন প্রস্তাব আছে কি না। তাঁর পত্রমধ্যে আছে, 'কোন পুণ্যকর কার্য, যেমন দরিদ্রকে দান করা।' অতএব আমরা যদি এই টাকায় কাঙালী বিদায় করি, তা হলে কেমন হয়? কাঙ্গালী বিদায় নিশ্চয়ই একটা পুণ্য কার্য।"

স্থির হইয়া গেল যে কাঙালী-বিদায় হইবে, এবং পরদিন যখন সকলেরই ছুটি আছে, তখন পরদিনই কাঙ্গালী বিদায় হউক।

নয়

পরদিন কারেন্সী হইতে একশত টাকা ভাঙাইয়া ষোল শ এক-আনী আসিল। এবং সমস্ত দিন ধরিয়া আদর্শ নিবাসের ছাত্রগণ অদম্য উৎসাহের সহিত প্রায় দেড় হাজার কাঙালীকে এক-আনী বিতরণ করিল। হঠাৎ মেসের ছাত্রগণের পক্ষে কাঙালী বিদায় করিবার কী কারণ ঘটিল, তাহা বিস্মিত পল্লীবাসিগণ কোন প্রকারেই নির্ণয় করিতে সক্ষম হইল না। মেসের ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শুধু বলে, সৎকার্যের আবার কারণ-অকারণ কী?

সন্ধ্যার পর হরিশ তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিল, তাহাতে সে লিখিল, "তোমার ইচ্ছামতো আজ এক শত টাকা কাঙালী বিদায় হইয়া গেল। আমার বন্ধুদের মুখে তোমার অসীম সুখ্যাতি শুনিয়া তোমার উপর আমার প্রায় হিংসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে!"

হরিশের পত্র পাইয়া হরিশের স্ত্রী বিস্মিত হইয়া গেল। সে লিখিল, "তোমার পত্রের মর্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাঙালী বিদায় কেন, এবং আমার সুখ্যাতিই বা কিসের? সব কথা খুলিয়া লিখিবে।"

স্ত্রীর পত্র পাইয়া হরিশ আরও বিস্মিত হইল। তাহার সন্দেহ হইল, হয়তো

লালমাধবের ইহার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে। লালমাধব তখন মেসে ছিল না। লালমাধব আসিলে হরিশ তাহার স্ত্রীর পত্র দেখাইয়া বলিল, "ব্যাপার কী, এখন খুলে বল তো ?"

লালমাধব হাসিয়া বলিল, "বলছি", বলিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া তুইটি দ্রব্য বাহির করিয়া সে হরিশের সম্মুখে রাখিল। প্রথমটি হরিশের পত্র, যেখানি সে তাহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিল, এবং অপরখানি মখমলের কেসে রক্ষিত একটি হীরক অঙ্গুরী ; তাহার সহিত সংলগ্ন একখণ্ড কাগজে লেখা, "যাঁহার পবিত্র নাম ব্যবহার করিয়া আমাদের মধ্য হইতে বন্ধু-বিচ্ছেদ নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি-উপহার প্রদত্ত হইল।"

হরিশ বলিল, "আর সে চিঠিখানা ?"

লালমাধব করুণভাবে বলিল, "সেখানা আমিই নকল করেছিলাম। হরিশদা, এখন তুমি যদি সহজভাবে আমাকে আলিঙ্গন দাও, তা হলে জানব, আমাদের পুনর্মিলন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।"

হরিশ বলিল, "নিশ্চয় লালমাধব, তোমার সম্পূর্ণ জিৎ। তবে রহস্যটা প্রকাশ করো না।" বলিয়া হরিশ লালমাধবকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

প্রতিশোধ

এক

শ্যামাশঙ্কর রায় যখন বর্তমান ছিলেন, তখন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য হরিদাসের কর্তৃত্ব সামান্য দাসদাসীগণকে অতিক্রম করিয়া প্রভুর পুত্রকন্যাগণ, এমন কি, গৃহিণী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিচক্ষণ শ্যামাশঙ্কর পুত্র অপেক্ষা হরিদাসকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, এবং দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা তাহাকে অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন। কোনও সংকট উপস্থিত হইলে শ্যামাশঙ্কর গোপনে হরিদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যটির বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়া অবধি বিজ্ঞ শ্যামাশঙ্কর সংসারের অর্ধেক কার্যের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

আজ এক মাস হইল শ্যামাশঙ্কর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিপর্যস্ত শোকাকুল সংসারের মধ্যে এখনও সে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে নাই। ভূমিকম্পের পর কোন নগরের যেমন অবস্থা দাঁড়ায়, রায়-পরিবারের বর্তমান অবস্থাও কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্বের সে অভগ্ন সংযত অবস্থা কোথাও নাই ; সব গ্রন্থি, সব বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কিন্তু সংসারের নিয়ম, ভূমিকম্পের

পর আবার নগর গঠিত হয়; ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত কিছুই অসমাপ্ত থাকে না। সেই নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ রায়-পরিবারের রন্ধনশালায় রন্ধনের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, গোয়ালে যথারীতি গোসেবা হইতেছে, অর্থলোলুপ দাস-দাসিগণের অবিশ্রান্ত চৌর্যবৃত্তিতে বাধা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, দ্বিপ্রহরে বধূ হেমলতার নির্জন কক্ষে তাস হস্তে প্রতিবেশিনী বালিকাগণের প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে, এবং সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় পরেশনাথের বন্ধুর সংখ্যা ও হারমোনিয়ম্-তবলার শব্দ দিনে দিনে বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

ইহাই সহজ ও চিরন্তন নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন অনুযোগ ছিল না। কিন্তু হরিদাসের চক্ষে এই অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য পরিবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। কর্তার জীবদ্দশায় তাঁহার অগোচরে তাস খেলাও চলিত এবং সময়ে সময়ে হারমোনিয়মও বাজিত—কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট সংকোচ ও সম্ভ্রমের ভাব ছিল। শ্যামাশঙ্কর অন্দর হইতে বহির্বাটীতে আসিলে অন্দরে তাস চলিত; এবং গ্রামান্তরে গমন করিলে হারমোনিয়ম বাজিত। এখন সে সংযত ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে—যখন ইচ্ছা, অন্দরে তাস চলিতেছে, এবং বাহিরে হারমোনিয়ম বাজিতেছে। এত দিন হারমোনিয়ম ও তাস শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুর অপেক্ষায় যেন প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন অবসর পাইয়া তাহারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছে; যেন তাহারা শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুশোক-সময়ের মধ্যেও অসঙ্গত দাবি স্থাপন করিতে চাহে। ব্রাহ্মণের ঘর না হইলে এত দিনে যে অশৌচও শেষ হইত না।

পরেশনাথ ও হেমলতার হৃদয়হীনতার নির্মম আঘাতে ক্ষুব্ধ হরিদাস অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কাহাকে সে দোষ দিবে, কী বলিয়া সে অভিযোগ আনিবে, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

দ্বিপ্রহরে হেমলতা যখন সঙ্গিনীগণের সহিত তাস খেলায় মগ্ন থাকে—হরিদাস ভাবে,—সে গিয়া বলে—"বউ মা! কাজটা ভালো হইতেছে না।" কিন্তু কেন ভালো হইতেছে না, তাহা সপ্রমাণ করা বড় কঠিন হইবে। হৃদয়ের এত সূক্ষ্ম অদৃশ্য অপরাধের নিকট তর্ক নিশ্চয় পরাস্ত হইবে। এ কথা যে স্বয়ং বুঝিতে না পারে, যুক্তির দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। হেমলতা যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "কেন ভালো হইতেছে না?" তাহা হইলে সেই দণ্ডেই হরিদাসকে পরাজয় মানিতে হইবে। সংসারের একজন ভৃত্যের এরূপ আচরণ দেখিয়া রহস্যরসভোগিনী সঙ্গিনীগণের পক্ষে হয়তো হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হেমলতা হয়তো এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিবে, যাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে হরিদাসকে রায় পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।

সন্ধ্যার পর যখন পরেশনাথ বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হারমোনিয়মের সহিত গান ধরে, তখন হরিদাস পার্শ্বের ঘরে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে। হারমোনিয়মের সাতটা সুর সপ্তরথীর মতো তাহার ক্ষুব্ধ চঞ্চল হৃদয়কে চারিদিক

হইতে আক্রমণ করে। তাহার ইচ্ছা হয়, পরেশনাথের অসাক্ষাতে গোপনে তাহার শখের হারমোনিয়ম চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং তাহার তবলার সটান চর্মের মধ্যে একটা বড় ছিদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু পরেশের উক্ত প্রকার ক্ষতি হইবার পূর্বে তাহারই হৃদয়ের কতকটা চূর্ণ ও কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়। এখনও মাসাধিক হয় নাই পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ইহারই মধ্যে পুত্রের এরূপ আচরণ দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত মর্মাহত হইত। বউমা তো পরের বাড়ির মেয়ে, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু পরেশনাথের এ আচরণ হরিদাস কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

দুই

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেমলতা পরেশনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "দেখ, হরি আমার শ্বশুরের পুরোনো চাকর, কিন্তু আমিও তো তাঁরই পুত্রবধূ। আমি তো সংসারে ভেসে আসি নি!"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "এ দুটোই ধ্রুব সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে তৃতীয় সত্য—তোমার পিতৃকুলকে তুমি ভাসিয়ে এসেছ!"

অন্য সময় হইলে হেমলতা এ কথা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিত। তাহার বিবাহের সময় অর্থ লইয়া তাহার দরিদ্র পিতার প্রতি অন্যায় উৎপীড়নের বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক ও যুক্তি দ্বারা অর্ধঘণ্টাকাল বচসা করিত, এবং হয়তো সেই উপলক্ষে দুই তিন দিবস স্থায়ী মান-অভিমানের একটা বিষম গোলযোগ বাধিয়া যাইত। কিন্তু এখন মনের অবস্থা অন্যরূপ। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হেমলতা বলিল, "রঙ্গ রেখে কথাটা শুনবে?"

ঘাড় নাড়িয়া পরেশ বলিল, "রঙ্গ রাখলাম, কথাটাও শুনব, অতএব বল।"

কথাটা সহজভাবে প্রকাশ করিতে হেমলতা একটু সংকোচ বোধ করিল। পরেশের নিকট সে যে-অভিযোগ রুজু করিতে আসিয়াছে, তাহাতে যে তাহার কোন অপরাধ নাই, সে বিষয়ে সে যেন ঠিক নিঃসন্দেহ নহে। প্রভু ও ভৃত্যের বিবাদে যে বেসুরা কর্কশ স্বর বাজিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে—তাহার বাঁশি যেন হরিদাস নির্মাণ করিয়াছে এবং হেমলতা যেন সেই বাঁশিতে ফুঁ দিয়াছে। হেমলতার মনে হইতেছিল, বিচারে বোধহয় এক-তরফা ডিক্রি তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাই কথাটা একটু ঘুরাইয়া সে বলিল, "তোমার চাকর, তোমার স্ত্রীর আদেশ পালন করা কর্তব্য বলে মনে করে না।"

পরেশ বলিল, "বল-কি? যাঁর আদেশ পালন করতে পারলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি, আমার ভৃত্য তাঁর আদেশ পালন করা কর্তব্য বলে মনে করে না!"

বিচারকের এরূপ শোচনীয় গাম্ভীর্যের অভাব ও লঘুত্ব দেখিয়া বাদিনীর কপোল দুটি লাল হইয়া উঠিল। আপনার অলকের গুচ্ছ টানিয়া দিয়া সে বলিল, "তুমি যদি আর ঠাট্টা কর তো আমি—"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "মাটি! একেবারে অত বড় শপথটা করে ফেললে। আচ্ছা, তবে আসল কথাটা খুলে বল।"

"আমি আজ বাজারের ফর্দের সঙ্গে একজোড়া তাস কিনতে দিয়েছিলাম; হরি ফর্দ থেকে তাসের জায়গাটি কেটে দিয়ে ফর্দ আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং বলে পাঠিয়েছে যে, কর্তার আমলে কেউ কখনও তাকে তাস কেনবার আদেশ দেয়নি। কর্তার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে যদি তাকে তাসের দোকানে ঢুকতে হয়, তা হলে অল্প দিনেই তার দুর্দশার সীমা থাকবে না; সে তাস কিনতে পারবে না। দেখ দেখি, এ কি চাকরের কথা!"

পরেশ বলিল, "না, ঠিক চাকরের কথা নয়; কিন্তু এইটে মনে রেখো হেম, এই চাকরটিই কয়েক বৎসর পুর্বে তোমার স্বামীকে সকল বিষয়ে শাসন করত এবং এখনও প্রয়োজনকালে ক'রে থাকে। এটা ভেবে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার। যাই হোক, এ কথাটা বলা হরির ভালো হয়নি।"

"ভালো যে হয়নি, সেটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।"

"কাজ নেই; পুরোনো লোক, মনে কষ্ট পাবে। আমাদের শাসন করতে পারে মনে করে ও যদি একটু সুখ পায়, তাতে ক্ষতি কী?"

এ কথার উপর কিছু বলিতে যাইলে স্বামীর সহিত বচসা করিতে হয়। রায়টা হেমলতার মোটেই পছন্দ হইল না। বিচারে হরিদাসেরই সম্পূর্ণ জিৎ হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, আর যদি কখনও হরিদাসের সহিত বিবাদ হয় তো পরেশের নিকট সে বিচারের জন্য আসিবে না, স্বয়ং তাহাকে শাসন করিবে।

এই ঘটনার পর হইতে প্রায়ই হরিদাসের সহিত হেমলতার বিবাদ বাধিতে লাগিল। অতি সামান্য কারণ পাইলেই হেমলতা তাহাকে অপমান করে, এবং হরিদাসও এই অল্পবয়স্কা পরগৃহাগতা দাম্ভিকা বধূর অসঙ্গত কর্তৃত্ব কোনও প্রকারেই সহ্য করিতে পারে না। হেমলতা যখন তাহার অবগুণ্ঠন একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে দুইটা অপমানের বাণী শুনাইতে যায়, তখন হরিদাস এমন একটি কথা বলিয়া প্রস্থান করে যাহা শুনিয়া হেমলতার একবার স্বামীর নিকট যাইতে ইচ্ছা হয় এবং একবার পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা হয়। কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে, হেমলতা দশটা কথা বলিলে হরিদাস একটা কথা বলে; কিন্তু এমনই একটা গুরুতর কথা বলে, যাহার কঠিন আঘাতে হেমলতার দশটা কথা চূর্ণ হইয়া যায়, রাগে ও অপমানে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই প্রকার ছোট ছোট অবিশ্রান্ত পরাজয়ে বধূ হেমলতার অন্তরে যে বহ্নি প্রত্যহ সঞ্চিত হইতেছিল, একদিন সহসা তাহা সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

হেমলতার বিশ্বস্তা পরিচারিকা গোলাপ হেমলতার আদেশ অনুসারে হরিকে বলিল, "হরিদাস, মা বললেন, তুমি বাজারের জন্য যেমন পয়সা নাও, তেমন জিনিস আসে না।" দুই একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ঢোঁক গিলিয়া আবার বলিল, "মা বললেন, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

ক্রোধে ও ক্ষোভে হরিদাসের সর্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সামান্ত একটা দাসীর মুখে এমন স্পর্ধা ও অপবাদের কথা শুনিয়া তাহার হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। হরিদাস গর্জন করিয়া বলিল, "কিসের বাড়াবাড়ি রে? তুই যদি আর কোনও কথা মুখে আনবি তো তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে দেব।"

ক্ষণভঙ্গুর দেহ-রক্ষার জন্ম মুণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দাসীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, এবং সমুণ্ড দেহের মায়াও তাহার অল্প ছিল না। সেই সযত্নরক্ষিত দেহের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কাজনক প্রস্তাবের পর গোলাপ দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া বিবেচনা ও সতর্কতার পরিচয় দিল।

তিন

ঠিক সেই সময় ফুলবাগানের দিকে দক্ষিণের বারান্দায় একটা বেঞ্চের উপর হেমলতা ও পরেশ উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের সবটুকু সুখ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুশীতল স্নিগ্ধ পবনে বাগানের সব ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সপ্তমীর শশাঙ্কের ক্ষীণালোকে সমস্ত বাগানটি মায়াজালে জড়িত এক অস্পষ্ট স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় দেখাইতেছে; এবং দূরে মালীর ঘরে মালীর এক কন্যা উচ্চ স্বরে ছড়া পড়িতেছে।

হেমলতার হস্ত ধারণ করিয়া পরেশ বলিল, "জীবনটা যদি ঠিক এইখানে আটকে যায় তো মন্দ হয় না। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা, ফুলের বাগান, চাঁদের আলো, আর তুমি।"

হেমলতা অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, গোলাপের নিকট অপমানিত হইয়া হরিদাস কী করিবে। তাহার মনে একটু ভয়ও হইতেছিল। শ্বশুরের এই অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি সে যেমন দিন দিন নির্মম হইয়া উঠিতেছিল, তেমনই তাহাকে একটু ভয়ও করিত। এই স্বতন্ত্র প্রকৃতির নির্ভীক স্পষ্টবাদী ভৃত্যকে অতি যত্নেও হেমলতা সামান্য একটা বেতনভোগীর মতো মনে করিতে পারিত না। রূঢ় আচরণের দ্বারা সে সেই ভাবই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু অন্তরের মধ্যে মনে হয়, সে যেন অন্ততঃ তাহার এক জন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ একটা অসহনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৃদয়ে বহন করিতেছিল বলিয়াই হেমলতা স্থির করিয়াছে যে, এবারে এরূপ একটা বাণ নিক্ষেপ করিতে হইবে, যাহার তাড়নায় হরিদাসের বিশাল গর্বস্ফীত বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া তাহার ভৃত্যত্বের দীন মূর্তি সকলের সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে এবং হেমলতার প্রভুত্ব এই নিরুপায় লাঞ্ছিত ভৃত্যত্বকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে। নারীহৃদয়ের কোন্ অজ্ঞেয় প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সামান্ত কৌতূহলের বিষয় নহে। সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া সে-ও হয় তো আপনার দুর্বলতার বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল, তাই স্বামীর সোহাগ বচনের সবটা

তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। লজ্জিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আমি—কী ?"

তাহার কবরীর মধ্য হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া পরেশ বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী।"

"সেটা কি আজ প্রথম অনুভব করলে ?"

"প্রথম না হলেও প্রথমদিনকার মতোই যেন আজ অনুভব করছি," বলিয়া পরেশনাথ হেমলতার রক্তিম কপোল আরও একটু রক্তিম করিয়া দিল।

কঠোর আদান-প্রদান-ময় কর্কশ গন্ধপূর্ণ্য সংসারের মধ্যে এতটা কাব্যের সৃষ্টি বোধ হয় সীমা অতিক্রম করিতেছিল, তাই ভাগ্যদেবতার অভিশাপস্বরূপ সমস্ত কবিত্ব নষ্ট করিয়া পশ্চাতে ক্রোধকম্পিত গুরুগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল "বউমা, গোলাপকে দিয়ে তুমি কী বলে পাঠিয়েছ ? আমি চোর ? আমি তোমার বাজারের পয়সা চুরি করি ?

পূর্ব হইতে কতকটা প্রস্তুত থাকিলেও, হেমলতা বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রেমের সুশীতল বারিসেচনে তাহার অন্তর যখন বেশ সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এক ক্রুদ্ধ উৎপীড়িত অন্তঃকরণ সুযোগ পাইয়া সেই অসংযত হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে! অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কিছু কঠিন। হেমলতা নির্বাক ভাবে বসিয়া রহিল। পরেশের পক্ষে ব্যাপারটা আরও আকস্মিক, সে এ বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না।

হরিদাস বলিল, "এত বয়সে মা তোমার তো বালিকার সঙ্গে ঝগড়া করতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু তুমি যে কথা আজ আমাকে বলেছ, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তোমার শ্বশুর একদিনও আমাকে সে রকম কথা বলেন নি।"

হেমলতা এতক্ষণে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি আজ আমার চাকর; তোমাকে যা ইচ্ছা বলতে পারি—তুমি চোর, তুমি বেয়াদপ!"

ক্রোধে হরিদাস চারিদিক অন্ধকার দেখিল; বলিল, "অন্যায় কথা বলো না, বউমা; তুমি স্ত্রীলোক, পরেশের স্ত্রী, তোমাকে আজ ক্ষমা করব, প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু বেশি রাগিও না মা—রক্তটা আমার গরম, কী জানি, যদি তোমার সম্মান রেখে না চলতে পারি।"

পরেশ বলিল, "দেখ হরি, তোমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছি—কিন্তু আর তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। তোমার এত বড় স্পর্ধা, তুমি আমার সম্মুখে আমার স্ত্রীকে অপমান কর? যাও, দূর হয়ে যাও।" কথাটা এরূপ কঠিন ভাবে বলিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কাঠিন্য অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িল।

স্থিরভাবে হরিদাস বলিল, "যাব ভাই, যাব। তবে যাবার আগে বউমাকে

দুটো কথা বলে যেতে চাই। দেখ, বউমা, তোমার মা, আমি অনেক চুরি করেছি। আজ এক মাস আমি তোমার চাকর, এই একমাসের মধ্যে যখন যা সুবিধা পেয়েছি, চুরি করেছি। মোটামুটি একটা হিসেবে চুরিটার শোধ দেবার জন্য এক শ' টাকা এনেছি। কিছু যদি কম পড়ে তো ক্ষমা করো। ত্রিশ বৎসরের একটা পাকা চোর আজ তোমার হাতে ধরা পড়ে বিদায় নিচ্ছে। আজ থেকে তোমার সংসার নিষ্কণ্টক হলো।"

বারান্দার আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া হরিদাসের দীর্ঘ দেহ সরিয়া গেল। হেমলতা ও পরেশনাথ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল। কাহারও কথা বলিবার শক্তি ছিল না। তাহাদের পদতলস্থিত টাকার থলির মধ্য হইতে প্রত্যেক মুদ্রা তাহাদিগকে কশাঘাত করিতে লাগিল।

সেই রাত্রেই হরিদাস রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেল। এতকালের পুরাতন ভৃত্যের অভাব বোধ করিয়া পরেশনাথ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিল এবং হেমলতাও, বোধ হয়, একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই তাহারা এই কষ্টটুকু ভুলিয়া গেল, এবং সুখে দুঃখে বিজড়িত হইয়া তাহাদের সংসার আবার পূর্বের মতো চলিতে লাগিল।

চার

কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন সহসা এই সুখ-দুঃখ-মিশ্রণের মধ্যে দুঃখের অংশটা চূড়ান্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। গ্রামে একটা হত্যা হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইল যে, প্রাতঃস্মরণীয় শ্যামাশঙ্কর রায়ের কুলাঙ্গার পুত্র পরেশনাথের দ্বারা এই প্রণয়ঘটিত দুষ্কর্ম ঘটিয়াছে।

তদন্তের জন্য পুলিশ যখন সদলবলে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পরেশের এক দল শত্রু হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা স্বচক্ষে পরেশকে হত্যা করিতে দেখিয়াছে। পুলিশ সন্তুষ্ট চিত্তে পরেশনাথকে চালান দিলেন।

এই আকস্মিক বিপদে, ভয়ে ও ভাবনায় হেমলতা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কী উপায়ে তাহার নির্দোষ স্বামী এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহা কোন মতেই তাহার বুদ্ধিতে আসে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যখন কোনও উপায়ই সে করিতে পারিল না তখন তাহার পিতাকে লিখিল, "বাবা, অভাগিনীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর, নহিলে বিষ খাইয়া মরিব।"

অজস্র অর্থব্যয় ও পিতার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ফল হইল না; বিচারপতি পরেশনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মোকর্দমা সেশনে দিলেন।

সেশন-জজের নিকট পরেশনাথের বিচারের শেষ দিন বিচারালয় লোকারণ্য। বিচারের ফল জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। এই অতি-বিপন্ন ভদ্রসন্তানটির দুঃখে সকলেরই মন বিষণ্ণ। সকলেই বলিতেছে, আহা, এ যেন বাঁচিয়া যায়! পরেশনাথের

পক্ষাবলম্বী ব্যারিস্টার সাধ্যমতো তাঁহার কর্তব্য শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে হেমলতার পিতা হরমোহন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতেছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত ও মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া বিচারক পরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষ হইতে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারি না, প্রতিকূল প্রমাণের বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড স্থির হইল।"

গৃহমধ্যে সহসা বজ্রাঘাত হইলেও সকলে সেরূপ চমকিত হইত না। সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, পরেশনাথ একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না; কিন্তু এরূপ ভীষণ দণ্ড তাহাকে বহন করিতে হইবে, তাহা কেহই মনে করে নাই। হরমোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এবং পরেশনাথ স্তম্ভিত হইয়া নির্বাক নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা এক মুহূর্তের মধ্যে সহসা তাহার আকৃতির মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন ঘটাইয়া দিল, যাহা দেখিয়া সম্মুখে একটা দর্পণ থাকিলে পরেশনাথের উন্মত্ত হইতে বিলম্ব ঘটিত না। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল, চক্ষের আলো নিভিয়া আসিল। মনে হইল, বিশ্বসংসারের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত সম্পদ, একটা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া নির্মম কঠিন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেছে! মনে হইল বহির্জগতের অপরিমেয় বায়ুরাশির সহিত তাহার শ্বাসনালীর সংযোগ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভয়ে ও নৈরাশ্যে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু ধক্ ধক্ করিতে লাগিল।

হস্তে পৈতা জড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হরমোহন বলিল, "ভগবান! আমার নির্দোষ জামাইকে রক্ষা কর, আমার অসহায় কন্যার সহায় হও। এ কথা শুনিলে সেও দড়িতে ঝুলিবে।"

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিল। সহসা জনতার মধ্যে হইতে ঠেলিয়া ঠুলিয়া আরক্ত নয়নে ঘর্মাক্ত কলেবরে হরিদাস প্রবেশ করিয়া বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সুদীর্ঘ দেহ উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছে, মুখে উৎকট চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তের দৃঢ় চিহ্ন অঙ্কিত এবং চক্ষু দুইটা আবেগে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সে কহিল, "ধর্মাবতার! আপনি বিচার করুন, আমি আর পাপ লুকিয়ে রাখতে পারছি নে; যন্ত্রণায় আমাকে পাগল করে দেবে। এ খুন আমি করেছি। ধর্মাবতার, আর একটা খুনের দায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। পরেশের কোনও দোষ নেই, যারা তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা মিথ্যা বলেছে। এতদিন ভয়ে কিছু বলি নি—আজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সত্য কথা বলে ফেললাম—আমাকে দণ্ড দিন, আমার বেঁচে সুখ নেই।"

পরেশের কৌঁসুলি উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন, "Here is the culprit—the devil!" হরমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "ভগবান, মুখ

তুলে চাও।" জজ হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কথা বলছ, তার প্রমাণ কী?"

ভীষণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে আসিয়াছে, তাহার আবার প্রমাণের অভাব। সে এমন ভাবে গুছাইয়া বানাইয়া কৌশলে মিথ্যার রাশি বলিয়া গেল যে, তাহার যুক্তি ও সঙ্গতি দেখিয়া আদালত কক্ষে উপস্থিত পরেশনাথের পরম শত্রু কয়েকজন মিথ্যা সাক্ষী আশঙ্কায় দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিল।

তাহার পর কেমন করিয়া একমাস কালব্যাপী পুনর্বিচারের ফলে পরেশের প্রাণদণ্ড রহিত হইয়া হরিদাসের মৃত্যুদণ্ড হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ গল্পের পক্ষে অবান্তর কথা।

পাঁচ

সন্ধ্যাকাল। শুভ্র জ্যোৎস্নায় জেলখানার ফুলের বাগানটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নীড়ে প্রত্যাগত পক্ষিগণ তখনও তাহাদের ক্ষুদ্র বাসায় রাত্রিযাপনের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া লইতে পারে নাই, আম্রশাখার অন্তরালে তাহাদের পাখার ঝাপট শুনা যাইতেছে। এক ঝাড় কামিনী ফুল ফুটিয়া জেলখানার সমগ্র প্রাঙ্গণ গন্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। দূরে আলোকজ্জ্বল দ্বিতল কক্ষে ইংরাজ জেলরের কন্যা পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছে। বন্দীরা সকলেই কারাকক্ষে আশ্রয় লইয়াছে—কেবল হরিদাসকে এক জন প্রহরী ফুলবাগানের এক নির্জন প্রান্তে লইয়া আসিয়াছে।

হরিদাস নীরব অত্যন্ত উদাসীন। অনন্ত আকাশের নীলিমার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়। এই অনাদি অনন্ত বিশ্বসংসারের কোন প্রান্তে, কোন কোণে তাহার বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে। সে বিশ্রাম কত দিন স্থায়ী, কোথায় কবে তাহার শেষ। আবার কি কোনও জগতে তাহাকে জন্ম লইতে হয়। মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কত মুক্ত, কত সুখী! তার পর যেমন দিন দিন তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, এক একটি করিয়া গ্রন্থি আসিয়া কেমন একটি সম্পূর্ণ জাল তাহার চতুর্দিকে বুনিয়া দিয়া যায়; কোনও দিকে তাহা মুক্ত নহে—একটি সম্পূর্ণ সমগ্র জাল। এই জাল বুনিতে বুনিতেই জীবনের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জাল ছিন্ন করিবার পালা। সমগ্র জীবনের গ্রথিত জাল এক মুহূর্তে ছিন্ন করিতে হইবে! জীবনের এ অংশটা এত কঠিন, এত ভয়ানক কেন করেছ, ভগবান!

এই রাত্রি শেষ হইলেই একটা কঠিন রজ্জুর গ্রন্থির দ্বারা তাহার জীবনের সব গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেই নির্মম জীবনান্তক গ্রন্থির সাহায্যে কল্য হইতে তাহাকে যে নূতন সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আকার, প্রকার, দৈর্ঘ্য,

গতি তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবার কাল প্রভাতে পৃথিবীতে নিত্যকার মত সূর্য উঠিবে, নিত্যকার মতো জেলখানার বাগানে ফুল ফুটিবে—নিত্যকার মতো বিশ্ব-বাসীর সমস্ত তুচ্ছ ও মহৎ কার্য চলিতে থাকিবে। কেবল তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া, চল্লিশ বৎসরের অভ্যস্ত, চিরপরিচিত সূর্যালোকিত আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিয়া একটা সংশয়পূর্ণ আশঙ্কাপূর্ণ অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই দুইটি অতি-পরিচিত ও অতি-অজ্ঞাতের সন্ধিস্থলে কেবল দুইটি তুচ্ছ কাঠ ও এক-গাছি অকিঞ্চিৎকর রজ্জু। তাহারাই অবলীলাক্রমে এই দুইটা অসামান্য বিপর্যয়ের সুযোগ ঘটাইয়া দিবে।

পার্শ্বের প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল। একজন প্রহরীর সহিত পরেশনাথ প্রবেশ করিল। প্রহরী দুইজন কিছু দূরে গিয়া বসিল। পরেশ আসিয়া হরিদাসের পার্শ্বে বসিল। হরিদাস ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন এমন করে তুমি এখানে আসো? কেউ জানতে পারলে আবার যদি কোনও বিপদ হয়। যাও—তুমি বড় ছেলেমানুষ!"

এই আশঙ্কাজনিত স্নেহের ভর্ৎসনায় পরেশের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। বলিল, "হরি, আমার সমস্ত জীবনটা শূন্য ক'রে দিয়ে গেলে।

হরিদাস শান্ত কণ্ঠে বলিল, "উপায় যে ছিল না ভাই, মানুষে কি সহজে প্রাণের মায়া ছাড়ে? কী করব বল, সব ভগবানের ইচ্ছা।"

"তুমি আমার জন্য প্রাণ দিলে হরি, আমি তোমার কিছু করতে পারলাম না! এই রকম করে কি উপকার করতে হয় ভাই? প্রত্যুপকার করবার আর অবসর দিলে না!"

শুনিয়া হরিদাসের গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মনটা মহাশূন্য নীলিমার রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার জালে গ্রন্থি দিতে আরম্ভ করিল! বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন জীবনটা কত সুখের, আর পৃথিবী কত সুন্দর মনে হইত! বাপ মা'র মুখ তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু যে দিন রায়-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। কর্তার পিতার ন্যায় স্নেহ, গৃহিণীর মাতার ন্যায় যত্ন। আহা, তাঁহারা যেন দেবতা ছিলেন! সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন কর্তা ও গৃহিণীর উদ্যোগে তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু কত দিনের জন্যই বা! সে এখন কোথায় আছে, কে জানে! তাহার পর একদিন পরেশ জন্মগ্রহণ করিল—একটি ফুটফুটে চাঁদ! তাঁহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিল, তার আবার একদিন বিবাহ হইল। গৃহিণীর মৃত্যু, তাহার পর কর্তার মৃত্যু। আহা, সেদিন কী দুঃখের দিন! তাহার পর হেমলতার ব্যবহারের কথা মনে পড়িল। সে দিন কী ভয়ানক, যেদিন সে অপমানে পীড়িত হইয়া পর্বতপ্রমাণ অভিমান লইয়া রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কিন্তু মাথার উপর ভগবান আছেন! সেই অন্যায় অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবার সুযোগ উপস্থিত হইল! এ লোভ কি সংবরণ করা যায়! হরিদাস সেই অপমানের আজ

প্রাণান্তক প্রতিশোধ লইয়াছে। হেমলতার আজ সম্পূর্ণ পরাজয়! আত্মপ্রসাদে হরিদাস সর্বান্তঃকরণে হেমলতাকে ক্ষমা করিল।

"হরি!"

"কী ভাই?"

"একটা কথা বলব?"

"বল।"

"সে এসেছে।"

"কে বৌমা?"

"হ্যাঁ, সে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

হরিদাস জিভ কাটিয়া বলিল, "ও কথা ব'লো না, পাপ হবে। কিন্তু তাঁকে এখানে এনে ভালো করনি।"

"তাকে নিয়ে আসব? কোনও ভয় নেই।"

"অন্যায় করেছ ভাই, তুমি বড় ছেলেমানুষ। বৌমাকে এখানে এনো না, তুমিও যাও।"

"তবে তুমি তাকে ক্ষমা করো নি?"

"ভাই, ক্ষমা না করলে কি প্রাণের মায়া ত্যাগ করতাম? তুমি যাও, তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।"

দূরে কিসের শব্দ হইল। প্রহরী বলিল, "চলা আও বাবু, চলা আও সাহেব আতা হ্যায়।"

হরিদাস যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "হরি ভাই, ক্ষমা করো—"

"আর জ্বালা দিস নে ভাই, আমি চললাম।"

আর এক দিনের মতো হরিদাস আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সে দিন হরিদাস চোর ছিল না, কিন্তু চোরের অপবাদ বহন করিয়াছিল। আজও সে খুনী নয়, কিন্তু আজ সে মিথ্যাবাদী।

টোপ

এক

বৈদ্যনাথ চাটুয্যে যখন জীবিত ছিল তখন পার্বতীপুর গ্রামে অর্থে এবং প্রতাপে অপর কোন পরিবারই চাটুয্যে পরিবারের সমকক্ষ ছিল না। বৈদ্যনাথ কলিকাতায় ইংরেজ বণিকের অফিসে ছিল গুদামবাবু, বেতন পেত মাসিক ত্রিশ টাকা, কিন্তু দেশে এলেই একটা না একটা এমন কিছু কাজ ক'রে যেত যার মধ্যে মাসিক ত্রিশ টাকার কোন পরিচয়ই থাকত না। থাকত যে টাকার, লোকে বলত বৈদ্যনাথ সে টাকা তার অফিস থেকেই উপার্জন করে, কিন্তু তার জন্যে অফিসের কেশিয়ারকে রসিদ লিখে দিতে হয় না। অংশীদারদের লাভের ভাঁড় ফুটো ক'রে মালগুদামেই তার উৎপত্তি, এবং মাসতুত ভাইদের সাহচর্যে নিরাপদ তার গতি।

ঈর্ষাতুর ব্যক্তিরা বলত, অধর্মের অর্থ স্থায়ী হবে না, দেখতে দেখতে কর্পূরের মতো উবে যাবে। কিন্তু এ অভিশাপ অন্ততঃ বৈদ্যনাথের জীবদ্দশায় ফলেনি। অধর্মের অর্থে উৎপন্ন ইমারতের বনেদে অথবা পুষ্করিণীর জলে তার মৃত্যুর বহুদিন পর পর্যন্ত কোনো গোলযোগ লক্ষ্য করা যায় নি। যখন গেল, ততদিনে ধর্মের অর্থও ভোগে ও ভাগে ক্ষীণ হয়ে আসে।

যে সময়কার কথা বলছি তখন বৈদ্যনাথের ভিটায় দুই শরিক বাস করত—পশুপতি এবং পশুপতির জাঠতুত ভাইয়ের পুত্র মাধব। বৈদ্যনাথের অর্জিত অর্থের কিয়দংশ পশুপতির ঘরে আটক পড়েছিল, কিন্তু মাধবদের অংশে সত্যই তা কর্পূরের মতোই উবে গেছল। অধর্মাচরণেব দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল ষোল আনা তাদেরই। কিন্তু এই পাপস্খলনের পুণ্যে মাধব যে-দেবতাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল তিনি বাগীশ্বরী। তাঁর প্রসাদে সে একদিন এম. এ. পাশ ক'রে একটা সোনার মেডেল নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। পশুপতি সেই মেডেলটা হাতে নিয়ে লুফে লুফে তার ভার পরীক্ষা করে বললে, "গালালে দেড় ভরি সোনাও হবে না। শীতকালে এক মাস গুড় চালান দিলে এমন চারখানা মেডেল কামিয়ে নেওয়া যায়। সাধে কি ছেলেগুলোকে বলি, ওরে লেখাপড়া করিস নে, তার চেয়ে মজুরী কর। লেখাপড়া ক'রে এই তো ফল। অথচ এর জন্যে কত টাকাই না ঢালা হয়েচে! বলতে গেলে একরকম সর্বস্বান্ত!" ব'লে পাশের তারিণী ভটচার্য্যির দিকে চেয়ে এক চোট ফিকে হাসি হেসে নিলে।

মেডেলখানা ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে রেখে মাধব বললে, "এ সব পাগলামীর কথা কাকা, হিসেবের কথা নয়। এমন পাগলামী আপনারও তো এক-আধটা আছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে পশুপতি বললে, "আমার? কখ্খনো নয়; তেমন বান্দাই আমি নই।"

মাধব বললে, "আছে বই কি। আপনার পেতলের রাধাশ্যাম মূর্তি নেই? গালিয়ে পেতল ক'রে বেচলে যে পয়সাটা হবে সেটা সুদে খাটালে মাসে আধ পয়সাও সুদ আসবে না। অথচ তার জন্যে আপনি কত টাকা খরচ ক'রে মন্দির তৈরী করিয়েছেন, তারপর নিত্য কত নৈবেদ্যি, কত কাঁসোর ঘণ্টা বাজানো! কত তার সামনে ঢিপঢাপ ক'রে প্রণাম, কত নাক মলা কান মলা! কিন্তু আসলে তো সাড়ে চার আনা পয়সার পেতল।"

মাধবের কথা শুনে হতবাক হয়ে ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে পশুপতি বললে, "শোন কথা! তার সঙ্গে আর এর সঙ্গে এক হলো?"

"হলো বই কি কাকা, হলো। একটু ভেবে দেখবেন, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন, হলো।" ব'লে হাসতে হাসতে মাধব প্রস্থান করলে।

পশুপতি বললে, "বাপরে! যেন ইস্পিরিটের বোতল! মুখের কাছে একটা ম্যাচকাঠি ধরেছ কি একেবারে দপ! দু' পাতা ইংরিজি বই উল্টে দেমাকটা একবার দেখেছ, তারিণী খুড়ো?"

তারিণী খুড়ো তখন লোলুপ নেত্রে পশুপতির চালের উপর অবস্থিত, গোটা চার পাঁচ চালকুমড়ো দেখছিলেন এবং নারিকেল সংযোগে তদ্দ্বারা কী রূপ উপাদেয় ব্যঞ্জন হ'তে পারে সেই কথা মনে মনে চিন্তা করছিলেন। বললেন, "আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! তুমি তাই গুড়ের ব্যবসার কথা বললে, আমি হ'লে চালকুমড়োর কথা বলতাম।"

চালকুমড়োর উল্লেখ শুনে চমকিত হয়ে তারিণী ভটচার্য্যির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পশুপতি উঠে পড়ল। বললে, "খ্যাঁচ ক'রে পিঠে কী একটা ব্যথা ধরল, বাড়ির ভিতর চললাম খুড়ো। একটু মালিস করাই গে।"

অন্নে এবং সম্পত্তিতে পৃথক হ'লেও পশুপতি এবং মাধবদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের একটা বিদ্বেষ বরাবরই ছিল, সেটা বৃদ্ধি পেল মাধবের এম. এ. পাশ করার পর থেকে; অর্থাৎ যখন থেকে পশুপতিদের পক্ষে হিংসা করবার একটা বস্তু সত্যসত্যই জন্মগ্রহণ করলে। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বিদ্বেষটা কপট সদাচরণের বালুকার নিম্নেই বইত, কিন্তু একটুখানি বালুকা অপসৃত করলেই সেটা চোখে পড়তে বিলম্ব হতো না। অর্থ বড়, না বিদ্যা বড়, এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায়ই হাসি ঠাট্টা, কৌতুক বিদ্রূপ চলত।

কোজাগার পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মীপুজার নিমন্ত্রণে মাধব পশুপতির গৃহে এলে পশুপতি বলত, "অমন মাথা উঁচু ক'রে সেলাম না ক'রে একটু হেঁট হ'য়ে প্রণামই

কর-না, বাবাজী। তাতে তোমার মা সরস্বতী একটু রাগ করলেও মোটের ওপর লাভ হবে।" এর উত্তর মাধব দিত বসন্ত পঞ্চমীর দিন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তাদের বাড়ি পশুপতি নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলে মাধব তার হাতে একটু নির্মাল্যের ফুল গুজে দিয়ে বলত, "কাকা, এ ফুলটুকু গোবরার মাথায় ছুঁইয়ে দেবেন। বামুনের ঘরের ছেলে একেবারে 'ক অক্ষর গোমাংস' হ'য়ে থাকবে। একটু যদি উপকার হয়। আপনি তবু থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন, এ যে ফোর্থ ক্লাসেও গেল না।" আরক্ত নেত্রে নির্মাল্যের ফুল হাতে নিয়ে পশুপতি গৃহে ফিরত। গোবরা পশুপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কিন্তু অবশেষে কিছুদিন পরে মাধবকেই কমলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হলো। তহবিল শূন্য প্রায়, সুতরাং অচিরে অচল হবে ব'লে সংসার নোটিস দিয়েছে। মাধব পশুপতিরই শরণাপন্ন হলো। বললে, "কাকা, টাকা জিনিসটাকে উপেক্ষা করা চলে না, তা বুঝেচি।"

পশুপতি একটু বিস্মিত হ'য়ে বললে, "হঠাৎ এ শুভবুদ্ধি হলো যে?"

"সংসার অচল হয়েচে, টাকা দিয়ে তাকে চালাতে হবে।"

"তা কী করবে মনে করছ?"

"ব্যবসা।"

"কিসের ব্যবসা?"

"কলকাতায় বইয়ের দোকান করব স্থির করেছি।"

"তা, আমার কাছে কেন?"

"আপনাকে তার জন্যে আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে হবে।"

ক্ষণকাল নীরবে মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পশুপতি বললে, মাধব, এম. এ. পাশ ক'রে তুমি যে বেকুবি করেছ, তার জন্যে আমাকে পাঁচ শ' টাকা জরিমানা দিতে হবে বলতে চাও?"

মাধব বললে, "টাকাটা আমি অমনি চাইচি নে, ধার চাইচি।"

"টাকা আমার নেই।"

"কিন্তু আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে পলাশপুর তালুক কেনবার কথাবার্তা করচেন, তা আমি জানি।"

"সে টাকা আমি ধার ক'রে তুলব।"

"তা হ'লে এ টাকাটাও ধার ক'রেই তুলুন।"

মাধবের কথায় পশুপতি কী বলবে তা প্রথমটা ভেবে পেলে না, পরে মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বললে, "দেখ মাধব, একটা গল্প চলিত আছে, তুমি সেটা জানো কিনা জানিনে। এক জন লোকের একটা মইয়ের দরকার হয়েছিল; সে তার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে অল্পক্ষণের জন্য তার মইটা চাইলে। বন্ধু বললে, 'সে কি কথা! তুমি চাইচ, সামান্য একটা মই তোমাকে দেবো না? নিশ্চয় দেবো। তবে কি জানো ভাই? মইখানা ক্যাস বাক্সে রেখেছিলাম, ক্যাসবাক্সের চাবিটা হারিয়ে

গেছে, খুঁজে পাচ্ছিনে।' এমন অদ্ভুত আপত্তি শুনে লোকটি বললে, 'অত বড় মই ছোট্ট একটা ক্যাসবাক্সে রেখেছ এ কথা বলাতে সত্যিই আমি দুঃখিত হলাম।' তাতে বন্ধু বললে, 'বুঝলাম, কিন্তু সোজা কথায় মইটা তোমাকে দেবো না বললেই কি সুখী হ'তে ?' তা মাধব, তুমিও কি আমাকে—"

পশুপতিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে মাধব বললে, "না কাকা, আমি আপনাকে মইয়ের মতো অদ্ভুত একটা কিছু বলাতে চাইনে। টাকা পেলাম না বটে, কিন্তু গল্পটা শুনে সত্যিই খুশি হলাম। চমৎকার গল্প।" ব'লে মাধব প্রস্থান করল।

তিন

এ ঘটনার দিন দশেক পরের কথা। পশুপতি তার বৈঠকখানায় ব'সে ছিল, এমন সময় প্রবেশ করল গোষ্ঠ ডাকপিওন। এলাকার পোস্ট অফিস অনেক দূরে, তাই নিত্য বিলির ব্যবস্থা নেই,—সপ্তাহে তিন দিন ডাকপিওন চিঠি বিলি করতে আসে।

গোষ্ঠ পশুপতিকে প্রণাম ক'রে একখানা চিঠি দিলে, তারপর বললে, "বড়বাবু, ছোট বাবুর নামে একখানা টেলিগেরাম ছিল। কিন্তু ছোট বাবু তো বাড়ি নেই। তা টেলিগেরামটা আপনাকেই দিয়ে যাব কি ?"

কৌতূহল উদগ্র হ'য়ে উঠল। মাধবের নামে টেলিগ্রাম!—তবে চাকরি-টাকরি কিছু হলো না কি ? তেমন বড় চাকরি হ'লে তো মুখে একেবারে চুণকালি। কৌতূহলের প্রকাশ দমন ক'রে উদাসভাবে পশুপতি বললে, "তা দাও, দিয়ে দেবো অখন।"

টেলিগ্রাম দিয়ে সই নিয়ে গোষ্ঠ চ'লে গেল। টেলিগ্রামের খামটা তেমন ভালো করে মোড়া ছিল না, সামান্য চেষ্টাতেই খুলে গেল। যেটুকু ইংরেজি ভাষার জ্ঞান পশুপতির ছিল তা দিয়ে কোন রকমে টেলিগ্রামের মর্ম উপলব্ধি ক'রে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। দেহ কাঁপতে লাগল। তারা! তারা! ব'লে সে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শয্যার উপর শুয়ে পড়ল। টেলিগ্রামের মর্ম, মাধব ডার্বির দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ ক'রে কলিকাতা টার্ফ ক্লাব থেকে চৌদ্দ লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েচে। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারা দেহ ভিজে উঠল, মাথা গেল ঘুরে। মোটামুটি হিসেবে চৌদ্দ লক্ষ টাকার সুদ মাসিক সাত হাজার টাকা হয়। সর্বনাশ! এর পর আর কি গ্রামে বাস করা চলবে ? যে সরস্বতীকে নিয়ে কত পরিহাস বিদ্রূপ সে করেছে, সেই সরস্বতীর পাশে এত সমারোহের সঙ্গে লক্ষ্মী গিয়ে বাসা বাঁধলেন! এখন ঠাট্টা বিদ্রূপ ওপক্ষ থেকেই আসতে আরম্ভ করবে। নাঃ, গ্রাম ছাড়া না ক'রে ছাড়লে না।

আঘাতের প্রথম চোটটা কেটে গেলে পশুপতি অমঙ্গলের মধ্য থেকে কোনও

মঙ্গল টেনে বার করা যায় কি না সেই চিন্তাই করতে লাগল। বিপদের মধ্যে যে সম্পদের পথ খুঁজে বার করতে পারে সে-ই বুদ্ধিমান। ঘরই যদি পুড়ল তো সে ছাই ক্ষেতে ফেলতে পারলে তবুও সারের কাজ করবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল পলাশপুর তালুকের কথা। ঘর থেকে বার না ক'রে মাধবের কাছ থেকে যদি ঐ পঁচিশ হাজার টাকাটা যোগাড় করা যায় তা,হলে তবুও দুঃখসাগরে একটা ছোটখাট সুখের দ্বীপে গিয়ে ওঠা যেতে পারে। মাধব ছেলে ভালো; মুখটা একটু খোলা, কিন্তু মনটাও তেমনিই উদার। ধার বলে চাইলে চৌদ্দ লক্ষের ভিতর থেকে পঁচিশ হাজার না দিয়ে পারবে না। তারপর সে ধার যে শোধ করে তার নাম পশুপতি চাটুয্যে নয়।

কিন্তু এই কয়েকদিন আগে মাধব যে তার কাছ থেকে পাঁচ শো টাকা ধার চাইতে এসে তাড়না খেয়ে ফিরে গেছে, তার কী করা যায়? একটু ভাবতেই বুদ্ধি খুলল। পাশের বাড়িতে মাধবের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। কয়েকদিন পূর্বে ডিক্রি-জারির একটা টাকা আদায় হয়ে এসেছে—বারো শো টাকা। এখনও সে টাকাটা খাটাবার ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। সেই বারো শো টাকা থেকে হাজার টাকার নোট একটা পুঁটলিতে বেঁধে পশুপতি উঠে পড়ল। টোপ ফেলতে কৃপণতা করলে বড় মাছ ছিপে উঠবে কেন? বিশেষত যে মাছ একবার তাড়া খেয়ে পালিয়েছে তাকে ধরবার টোপ একটু বড় করেই ফেলতে হবে।

মাধব তখন তার বৈঠকখানায় ব'সে ছিল, পশুপতিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। "আসুন কাকা, আসুন।"

একটা চেয়ারে উপবেশন করে পশুপতি বললে, "এম-এ পাশ করে তুমি খুব বিদ্বান হয়েছ স্বীকার করি মাধব, কিন্তু আমার পরীক্ষেয় তুমি ফেল করেছ।"

বিস্ময়ের সহিত মাধব বললে, "আপনার পরীক্ষা কী, তা তো বুঝতে পারলাম না, কাকা?"

পশুপতির মুখে মৃদু চাপা হাসি ফুটে উঠল। বললে, "আন্দাজ কর দেখি?"

"কোনও আন্দাজই করতে পারছিনে।"

পশুপতির নিঃশব্দ হাসি শব্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বললে, "আমার কাছে পাঁচ শো টাকার জন্যে গিয়েছিলে, কিন্তু একবার তাড়া খেয়ে আর তো গেলে না?"

"আবার কী করতে যাব? আপনি তো টাকা দেবেন না বললেন।"

পশুপতি আবার হাসতে লাগল; বললে, "ওই খানেই তো পরীক্ষে। ভাবলাম, ব্যবসা করতে চলেছে, কী রকম নাছোড়বান্দা স্বভাব একবার যাচাই ক'রে দেখি। কিন্তু টেঁকলে না বাবাজি, পরীক্ষেয় টেঁকলে না। ওরে বাবা, যে দিনকাল পড়েছে, কেউ কি কিছু দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ব'সে আছে? কেড়ে নিতে হয়; সাধ্য-সাধনা কাকুতি-মিনতি এমন কি ছল-চাতুরী ক'রে ছিনিয়ে নিতে হয়। ব্যবসার বাজারে সকলেরই তো মুখে 'না' বাক্যি লেগে আছে! সেই 'না' কে যে 'হ্যাঁ'

করাতে পারে তারই তো লাভের বাক্স দেখতে দেখতে ভারী হ'য়ে ওঠে। আমি তো শেষ পর্যন্ত দোবোই, কিন্তু সকলেই তো তোমার কাকা নয় যে, একবার চাইলেই দেবে। ব্যবসা করতে চলেছ, এ শিক্ষেটা মনে রেখো—নাছোড়বান্দা হতে হবে।"

মাধব নীরবে ক্ষণকাল পশুপতির দিকে চেয়ে থেকে বললে, "কাকা, টাকাটা কি আপনি সত্যি-সত্যিই আমাকে দেবেন মনে করেছেন ?"

"করেছি, কিন্তু আজ নয়, সেই দিনই। তুমি যে লেখাপড়া শেষ ক'রে এক বছর বেকার ব'সে রয়েছ তার জন্যে আমার মনে কোনও চিন্তাই নেই বলে মনে কর ? টাকাটা আমি এনেছি, কিন্তু পাঁচ শ নয়, পুরোপুরি হাজার। ব্যবসা যখন করবে স্থির করেছ খাটো করে কোর না। তুমি বিদ্বান, চরিত্তিরবান,—তোমার হাতে টাকা নষ্ট হবে না সে আমি জানি।" ব'লে বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে পুঁটলিটা বার ক'রে খুলে গুণে গুণে দশখানা এক শো টাকার নোট মাধবের সম্মুখে স্থাপন ক'রে বললে, "নাও, তুলে ফেল। আর শুভস্য শীঘ্রং, আজই লেগে যাও।"

নোট সত্য—সে সম্পর্কে পশুপতির যা মন্তব্য, তার মধ্যে অর্থের গোলযোগ বিন্দুমাত্র নেই, কিন্তু তথাপি মাধব বিহ্বলকণ্ঠে বললে, "কাকা, আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছিনে।"

পশুপতি বললে, "এখন পারবে না—পারবে, যখন ছেলে হবে, ভাইপো হবে, তখন। বলি, সম্পর্কটা তো আর পাতানো নয় ?—আমাকে গঙ্গায় দিয়ে কাছা না নাও, খালি পায়ে দশ দিন বেড়িয়ে বেড়াতে হবে তো ?—তবে ? তোমার কষ্টে আমি স্থির থাকতে পারি কি ?"

পারা হয়ত উচিত নয়, কিন্তু সে পক্ষে পূর্ব ইতিহাসটা এমন অসন্তোষজনক যে, সহসা সায় দিতেও লজ্জাবোধ করে। তথাপি আপাতদৃষ্টিতে যখন কোন ছল চাতুরী দুরভিসন্ধি দেখা যাচ্ছে না, তখন বলতেই হ'ল দু'চারটে কৃতজ্ঞতার কথা। টাকাটা তুলে রেখে মাধব বললে, "কাকা, টাকাটার জন্যে একটা যা হয় কিছু লিখে দিই ? কেমন ?"

মাধবের কথা শুনে পশুপতি ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "দেবে দাও, সেই জুতোটা নিয়ে বাড়ি বাড়ি দেখিয়ে বলে বেড়াই ভাইপোর হাত থেকে পেয়েছি। দুর্গাঃ—এবার দেখছি গোবরা কোন দিন টাকা পেয়ে রসিদ লিখে দিতে চাইবে।" তারপর হঠাৎ মাধবের হাত সজোরে চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা মাধব, সত্যি ক'রে বল দেখি পলাশপুরের যে পঁচিশ হাজার টাকার জন্যে জনা-জনার কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছি, তোমার যদি টাকা থাকত তুমি তা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু লিখিয়ে নিতে পারতে ?"

এ কথার প্রকৃত উত্তর মাধব মনে মনে দিলে—প্রথমত টাকাই দিতাম না, আর দিলেও নিশ্চয়ই লিখিয়ে নিতাম। কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকার উদাহরণটা

যখন সম্পূর্ণ অলীক এবং কাল্পনিক, এবং সত্তলব্ধ হাজার টাকাটা যখন বাস্তব ব'লেই মনে হচ্চে তখন পশুপতির প্রশ্নের উত্তরটাও অলীক হ'লে অন্যায় হবে না মনে ক'রে সে বললে, "ক্ষেপেচেন ? কথনোই নয়।"

"তবে তুমিই বা ক্ষেপেচ কেন ?" ব'লে উচ্চহাস্য করে পশুপতি উঠে পড়ল। বললে, "শুভস্য শীঘ্রং—আজই কলকাতা রওনা দাও।"

আর একটি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ ক'রে মাধব মনে মনে বললে, তা আর বলতে ? বহবশ্চ বিঘ্না :—কী জানি হঠাৎ মতি পরিবর্তিত হ'য়ে যদি ফিরেই চায়। সান্নিধ্য বর্জন করাই শ্রেয়।

গৃহে ফিরতে ফিরতে পশুপতির মনটা একবার করুকরু ক'রে উঠল—হাজার হাজার টাকা একেবারে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে এলাম। কিন্তু পরক্ষণেই টোপের উদাহরণ মনে পড়ল—না ফেললে উঠবেই বা কেন ?

টেলিগ্রামের রসিদে পশুপতি তারিখ দিয়েছিল, কিন্তু সময় দেয়নি। মনে মনে স্থির ক'রে রাখলে মাধব কলকাতা রওনা হ'লেই টেলিগ্রামটা ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, তা হ'লে পরে এ একথা বলাও চলবে যে মাধবকে টাকা দেওয়ার পর সে টেলিগ্রামটা সই ক'রে নিয়েছিল।

বলা বাহুল্য মাধব সেইদিন অপরাহ্নেই কলিকাতা রওনা হ'লো।

চার

সাত দিন আগে গোবরা কলিকাতা গিয়েছিল, দিন তিনেক পরে এল।

দ্বিপ্রহরে পশুপতি মধ্যাহ্ন-ভোজন করছিল, স্ত্রী জ্ঞানদাবালা এসে বললে, "ওগো, তুমি বলছিলে মাধব ব্যবসা করতে কলকাতা গিয়েছে,—ব্যবসা না ছাই। ও গোবরা ফন্দী ক'রে ওকে কলকাতা পাঠিয়েছে।"

জ্ঞানদাবালার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে পশুপতি বললে, "কী রকম ?"

পাশের ঘরেই গোবর্ধন ছিল, হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললে, "সে ভারি মজা হয়েচে, বাবা। দশ টাকা দিয়ে একটা লটারির টিকিট কিনে মাধবদা ভারি রাজা-উজির মারত—বিশ লাখ পাব, তো ত্রিশ লাখ পাব, হ্যানো করব, তো ত্যানো করব। কলকাতা গিয়ে সতীশ মামাকে দিয়ে লিখিয়ে দিয়েছি এক মিথ্যে টেলিগ্রাম ঠুকে যে চোদ্দ লাখ টাকা পেয়েছে। ছুটেছে তাই কলকাতা—"

পশুপতি গাঁক্ ক'রে একটা শব্দ ক'রে উঠল অভিধানে যার কোনও অর্থ লেখে না। চক্ষু বিস্ফারিত, মুখ আরক্ত।

ভয়ে জ্ঞানদা চিৎকার ক'রে উঠল, "ওমা, কী হবে গো। গলায় কাঁটা লাগল না কি ? ভাত খাও, ভাত খাও।"

পশুপতি ধমকে উঠল, "থামো। কাঁটা নয়, তোমার গুণধর পুত্তুর শেল

দিয়েছে!" তারপর গোবরার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ওরে ইষ্টুপিট্, তোর এ দুর্মতি কেন হয়েছিল রে ইষ্টুপিট্! একেবারে সব্বোনাশ করলি!"

শুনে গোবরার হঠাৎ রাগ হয়ে গেল; বললে, "ভালো হবে না বলছি বাবা, শুধু শুধু ইষ্টুপিট্ ইষ্টুপিট্ কোরোনা!"

ভয়ার্তমুখে জ্ঞানদা বললে, "ওগো, বকা-ধমকা এখন রাখ, কী হয়েচে আগে বল-না ছাই!"

দশ-পনেরো মিনিট আপসা-আপসির মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে কাহিনীটা শেষ হবার পর জ্ঞানদা বললে, "ইশ্, ভারি দম দিয়ে টাকাটা বার ক'রে নিয়েছে তো!"

জ্ঞানদার মন্তব্যে গোবরা আরও চ'টে উঠল; বললে, "সে কোথায় দম দিলে? দম দিতে গিয়েছিল তো বাবা। এখন বেকুব হ'য়ে গেছে। বললে রাগ করবে, কিন্তু ইষ্টুপিট্ ও নিজে—পরের টেলিগেরাম চুরি ক'রে কেন খোলে? না খুললে তো এ ব্যাপার হয় না।"

কথাটা গোবরার মুখ থেকে নির্গত হ'লেও এর মধ্যে যে যুক্তি ছিল তার বিরুদ্ধে সহসা পশুপতি অথবা জ্ঞানদা কেহ কোনও কথা বলতে পারলে না।

পশুপতি উঠে দাঁড়াতে জ্ঞানদা ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওমা, উঠলে কেন? খাওয়া তো কিছুই হয় নি। আগে খাও।"

মুখ বিকৃত ক'রে পশুপতি বললে, "উনুন থেকে খানিকটা ছাই এনে দাও, তাই খাই।"

হাত মুখ ধুয়ে পশুপতি একেবারে শয্যাশ্রয় করলে। বিছানায় শুয়ে টোপের উপমাটা আর একবার মনে পড়ল। উঠল বটে, কিন্তু মাছ তো নয়ই,—কচ্ছপও নয়, কাঁকড়াও নয়, একেবারে কাঁকড়া বিছে! জ্বলুনীতে প্রাণ যায়!

সেই দিনই অপরাহ্ণ চারটের সময় দেখা গেল পশুপতি এবং গোবর্ধন, পিতা-পুত্রে, হন্ হন্ ক'রে সাত মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনের অভিমুখে চলেছে। উভয়েরই মনের মধ্যে আশঙ্কা—এতক্ষণে বোধহয় মাধবটা আলমারী আর বই কিনে দোকান সাজিয়ে বসল।

———

স্মৃতিকথা

এক

জীবনের সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে যে সংখ্যাতীত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বহু সংকল্প এবং পরিকল্পনা যেমন কার্যে পরিণত হ'তে পারে নি, তেমনই এমন অনেক কিছু ব্যাপার শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে যার মূলে কোনও দিন কোনও প্রেরণা ছিল না; এমন কি, হয়তো ঔদাসীন্য অথবা অনিচ্ছাই ছিল। স্মৃতিকথা নাম দিয়ে যে লেখা আজ আরম্ভ করলাম তা যদি কোনও দিন সত্য সত্যই পরিণতি লাভ করে, তা হ'লে তা শেষোক্ত শ্রেণীরই আর একটি দৃষ্টান্ত ব'লে পরিগণিত হবে, সে কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

জীবনী অথবা জীবনকথা পড়তে আমার ভালো লাগে, কিন্তু লিখতে একেবারেই না। নিজের তো কথাই নেই, অপরেরও নয়। নিজের জীবনী লেখবার কথা মনে হ'লে মনে হয়, সে যেন কতকটা নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই ক'রে যাওয়ার মতো হবে। অপরের লিখতে সংকোচ এসে বাধা দেয়। যে মানুষ সারা জীবন কল্পনার রেখাঙ্কনের উপর শিল্পকলার রঙ চড়িয়ে নরনারী সৃষ্টি ক'রে ক'রে হাত পাকালে অথবা কাঁচালে, সে যদি হঠাৎ একদিন রক্তমাংসে গঠিত অরুণকান্তি সরকারের জীবন-চরিত লিখতে ব'সে নিজের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে বা কল্পনার রঙের পাত্রে তুলি ডুবিয়ে অরুণকান্তির উপর এক পোঁছ অবান্তর রঙ চড়িয়ে অরুণ-কান্তিকে তরুণকান্তি ক'রে বসে, তা হ'লে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। সুতরাং কোনও অরুণকান্তি সরকারের জীবনী লেখবার প্রস্তাবে সংকোচ এসে কখনও যদি আমাকে বাধা দিয়ে থাকে, তা হ'লে সে সংকোচকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

আমার জীবনে একবার মাত্র এমনই একটা সংকোচ আসবার কারণ ঘটেছিল প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর। শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয়, আবাল্য বন্ধু; আমাদের উভয়ের গার্হস্থ্য এবং সাহিত্য জীবনের একটা বিশেষ অংশ একত্রে এক গৃহে অতিবাহিত হয়েছিল; 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত লেখাই প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সকল কারণ বশত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। একটি বড় প্রকাশকের পক্ষ থেকে এজন্য লোভনীয় পারিশ্রমিকের প্রস্তাবও আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু পাছে জীবনীর মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খাড়া করতে গিয়ে শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়কে খাড়া ক'রে বসি, সেই ভয়ে ঐ প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হই নি।

অনেকের মতে আমার জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই মতের সহিত আমার মতেরও খানিকটা ঐক্য যে নেই, তা নয়। অবশ্য এভারেস্টের শিখরে

আরোহণ করি নি আর সাগরগর্ভের সুগভীর অতলেও ডুব মারি নি; কিন্তু এই দুই চূড়ান্তের মধ্যস্থলে যে বিশাল সমতল ভূমি আছে, তার একটা অংশে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এই সকল অভিজ্ঞতা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেছে-বুছে একটা কোনও পদার্থ খাড়া করার জন্য যে-সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন এখন কোনো সুদূর বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি গৌরবজনক পদ অধিকার ক'রে আছেন, এবং অপর একজন এই কলিকাতা নগরেই উত্তরোত্তর সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা অর্জন এবং সাহিত্য-পণ্যশালার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রে চলেছেন। তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতেও এত বিলম্ব ক'রে ফেলেছি যে, এখন যদি তাঁরা ব'লে বসেন, 'কই, এমন অনুরোধ আমরা করেছিলাম বলে তো মনে পড়ে না', তা হ'লে তাঁদের দোষ দিতে পারব না।

স্মৃতকথা লেখবার পূর্বে একটা কথা স্বীকার ক'রে রাখছি যে, যে-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে স্মৃতিকথা লেখবার কথা, সেই স্মরণশক্তিরই আমার যথেষ্ট দৈন্য আছে। শুধু যে আজই আছে, তা নয়; চিরকালই ছিল। স্কুল-কলেজে অধ্যয়নকালে ইতিহাস আমার ভালো লাগত না, তার নাম-স্থান আর তারিখের কণ্টকাকীর্ণতার জন্যে। শিবাজী মহারাজ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ কথাটা আমার কাছে মুখ্য ছিল না; আমার কাছে মুখ্য ছিল, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে ছাত্রকে ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, তার পক্ষে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দই মুখ্য কথা। শিবাজী যদি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতেন, তা হ'লে সে ছাত্রের পক্ষে কোনো আপত্তিই থাকত না, যদিও আমার পক্ষে থাকত; কিন্তু যে মুহূর্তে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন, সেই মুহূর্তেই ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে শিবাজীর জন্মগ্রহণের সন-তারিখ হ'ল অপরিহার্য জিনিস—কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে ভুলে-না-যাবার অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু। এমন অনেক সুখময় দিনের স্মৃতি আমার মনে সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে, যার সন-তারিখ সম্পূর্ণ ভুলে মেরে দিয়েছি। কিন্তু তার জন্য মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

তাহারে বাসিয়াছিনু ভালো,
সে কথায় পূর্ণ আছে মন।
কোন্ সনে কী তারিখে বাসিয়াছিলাম,
সে প্রসঙ্গে কী বা প্রয়োজন।

সন-তারিখ যে আমার মনের মধ্যে দয়া ক'রে দল বেঁধে বসবাস করছে না, সেজন্য আমি তাদের কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ। ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষিবৃন্দের চিত্তজগৎ তাদের পক্ষে প্রশস্ত এবং যথার্থই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান। সুতরাং আমার মতো অর্বাচীন লেখকের চিত্তে তাদের স্থান না হ'লে দুঃখ করবার কিছু নেই।

আর একটা কথা। এই স্মৃতিকথা লিখতে আমি সময়ের ক্রমিকতা কঠোর-ভাবে মেনে চলব না। আমরা যখন একান্ত মনে চিন্তা করি, তখন বিভিন্ন চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে সময়ের ক্রম ধ'রে আসে না,—আসে এলোমেলো ক্রমে; এক বিষয়বস্তু থেকে অপর বিষয়বস্তুতে চিন্তা যায় অনেক সময়ে অবান্তরের প্রণালী ডিঙিয়ে। স্মৃতিকথা লিখতে আমি অনুসরণ করব সেই অলস চিন্তারত মনের পদ্ধতি। ১৩৪০ সালের কথা লিখে চলেছি ব'লে ১৩৩০ সালের কথা পুনরায় লিখব না, এমন দুর্বলতা আমার লেখার মধ্যে দেখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কথা লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্রের কোনো কথা যদি অনিবার্য বেগে মনের রুদ্ধ দ্বারে এসে ধাক্কা মারে, তা হ'লে হয়তো দুয়ার খুলে তাকে অভ্যর্থিত ক'রে নেব; এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কোনো এক প্রবলতর কথা অলক্ষিতে স্মৃতি-মন্দিরে ঢুকে পড়ে, তা হ'লে সে কথাকে প্রথম প্রাধান্য দেব না এমন কথাও বলতে পারি নে।

সুতরাং এরূপ অবস্থায় কোনো ঐতিহাসিক অথবা জীবনীকার যদি আমার এ লেখা থেকে তাঁদের লেখার মাল-মসলা সংগ্রহ করতে ইতস্তত করেন, তা হ'লে ক্ষুণ্ণ হব না। কিন্তু রসিক পাঠকের কানে কানে ব'লে রাখি, তাঁরা যেন এ কথায় সত্য-সত্যই বিচলিত না হন। আমার এ লেখায় কাহিনী-অংশ যতটুকু থাকবে তা হবে একান্ত নির্ভরযোগ্য; আর সন-তারিখ যেখানে যতটুকু পাওয়া যাবে তা যদি একান্ত নির্ভরযোগ্য না-ও হয়, তথাপি নির্ভুলতার যথাসাধ্য কাছাকাছি যাবে, এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। অর্থাৎ, কোনও ঘটনা যদি গ্রীষ্মকালের ঘাম-ঝরা দিনে ঘ'টে থাকে তো বড়-জোর তাকে বসন্তকালের ফুল-ফোটা দিনে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাই ব'লে শীতকালের পাতা-ঝরা দিনে কখনো নয়। আর, কাহিনীর বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, কাহিনী আমি যথাযথভাবেই বিবৃত করব, কিন্তু তাতে যদি সাহিত্যের একটু রসান চ'ড়ে ব'সে, তা হ'লে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেই রসানকে ক্ষমা করবেন, যেমন তাঁরা ক্ষমা করেন উৎকৃষ্ট কড়া-পাকের বরফি সন্দেশের উপরকার রূপালি পাতকে। রূপালি পাতের দ্বারা সন্দেশের শোভা বাড়ে, কিন্তু স্বাদ কমে না।

আমাদের সংসারে বস্তুর উপর এইরূপ রঙ-চড়ানোর প্রথা অনেক ব্যাপারেই প্রচলিত আছে। স্বর্ণকার সোনার অলঙ্কারের উপর রঙ চড়ায়। তামা-পিতলের সামগ্রীর উপর সোনা, রূপা ও নিকেলের জল চ'ড়ে গৃহের চতুর্দিকে উজ্জ্বল হ'য়ে ছড়িয়ে থাকে। আমাদের সভ্যতার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের বেশ খানিকটা অংশ অসত্যের বাণী অধিকার ক'রে সমস্ত জিনিসকে মোলায়েম ক'রে থাকে। নিমন্ত্রণ গৃহে কদর্য খাদ্য আহার ক'রেও আমরা প্রসন্নমুখে বলি, খাসা খাওয়া গেল! ক্রোড়পতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে করজোড়ে আবাহন ক'রে বলেন, আমার গরিবখানায় পদার্পণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করবেন; আপনার দৌলতখানার কুশল তো? যদিও ক্রোড়পতি নিজেই অবগত আছেন যে, দৌলতখানায় দু-বেলা

ঠিকমতো অন্ন জুটছে না। শুধু ব্যঞ্জনেই আমরা ফোড়ং দিই নে, বাক্যেও দিই। বৈষ্ণবপদকর্তার আসল পদের উপর আখর চড়িয়ে আমরা কীর্তন-গান করি। পদ যদি হয়, 'মনের বেদনা মরমীয়া জানে সই'—কীর্তন-গায়ক তার উপর চড়ান, "এ আট পশুরীর মন নয় ক', ষোড়শী-কিশোরী মন।'

রঙ-চড়ানোর এরূপ দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে রাশি রাশি ছড়িয়ে আছে। এ সকল যখন সহ্য করার, এমন কি ভালো লাগার অভ্যাস আমাদের আছে, তখন আশা করি আমার স্মৃতিকথায় যদি সামান্য একটু সাহিত্যের রঙ প্রকাশ পায়, তা হ'লে খুব বেশি আপত্তিকর হবে না।

যাঁরা গুরুপাক গাঢ় দ্রব্যের খদ্দের, যাঁরা প্রজ্ঞা-মদিরার পিপাসু, তাঁরা আমার স্মৃতিকথার মধ্যে তাঁদের পছন্দসই পাকা মালের সন্ধান পাবেন কি না বলতে পারি নে, কারণ জীবনে তেমনভাবে সাধুসঙ্গ করবার সুযোগও পাই নি, দুস্তর মরু-পর্বত অতিক্রম ক'রে দুর্গম তীর্থভ্রমণও করি নি, আর ভারতবর্ষের সীমান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে দেশ-বিদেশের চিন্তানায়কগণের সহিত জগৎ-তত্ত্ব ও বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে সুনিবিড় আলাপ-আলোচনাও চালাই নি। যাঁরা হাল্কা রসের রসিক, অতি-প্রত্যূষের সুমিষ্ট খেজুর রস—যা মত্ততা আনে না, কিন্তু তৃপ্তি দেয়—যাঁরা অবহেলা করেন না, আমাদের প্রতিদিনকার সামান্য এবং সংকীর্ণ জীবন-পরিধিও সমগ্র বিশ্বের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের জন্য আমার এই লেখা। দুনিয়া এমনই আজব জায়গা যে, এমন অনেক ঘটনাও ঘটা সম্ভব যা হনলুলু অথবা কামস্কাটকায় না ঘ'টে আমাদের এই নগণ্য বাংলা দেশে ঘটলেও আমাদিগকে পুলকিত করে, এমন কি, সেই ঘটনাগুলিকে স্মৃতিকথার অন্তর্ভুক্ত করলেও গুরুতর অপরাধ হয় না।

দুই

মানুষের স্মৃতি জীবনের কত সুদূর অতীত পর্যন্ত পরিচালিত হ'তে পারে তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য কী, তা আমি জানি নে। কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে আমার মনে পড়ে সে-সব দিনের কিছু কিছু কথা, যখন আমার বয়স ছিল তিন কিংবা সাড়ে তিন বৎসর। তার পূর্বের কোনও কথাই তেমন মনে পড়ে না, একমাত্র জননীর স্নেহনিষিক্ত মুখাবয়ব ছাড়া। প্রতিদিন নিয়মিত বেশ-কিছুক্ষণ গভীর আনন্দভরে সে মুখ নিরীক্ষণ করার ফলে বোধ হয় তার ছবি মনে রাখবার অভ্যাস আমার মস্তিষ্কের মধ্যে পাকা হ'য়ে গিয়েছিল।

শৈশব ও বাল্যকালের কথা অনেকদিন পর্যন্ত যে সুস্পষ্টভাবে আমাদের স্মৃতি অধিকার ক'রে থাকে, বোধ হয়, তার কারণ, আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরকার যে চাকতি (Disc) অথবা কোষের (Cell) উপর ঘটনার রেখাগুলি মুদ্রিত হ'য়ে অবস্থান করে, শৈশব এবং বাল্যকালে সেই কোষ অথবা চাকতিগুলি সর্বাপেক্ষা

নরম থাকে ব'লে তাদের উপর চিন্তা অথবা অনুভূতির রেখাও গভীরতম রন্ধ্রে মুদ্রিত হয়, ও সেই কারণে সহজে মুছে যায় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত চাকতি অথবা কোষগুলি ক্রমশঃ কঠিন হ'য়ে আসে। সুতরাং তাদের উপর অনুভূতির ছাপ পড়তে থাকে ক্রমশঃ অগভীর রন্ধ্রে। সেইজন্য বৃদ্ধবয়সের কথা আমাদের তত মনে থাকে না, যত মনে থাকে তরুণবয়সের কথা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা এই পর্যন্তই থাক, এখন যে কথা বলছিলাম তা বলি। আমার যখন তিন অথবা সাড়ে তিন বৎসর বয়স তখন আমরা সাময়িক-ভাবে কিছুকালের জন্য বাস করছিলাম বেহার প্রদেশের বক্সার শহরে। আমার পিতৃদেব মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ণিয়ায় চাকরি করতেন। পূর্ণিয়ার ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে প্লীহা ও যকৃতের সাংঘাতিক বিকার বশত আমার ফুলদাদা নগেন্দ্রনাথের সংকটাপন্ন অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। হালে পানি না পেয়ে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন বায়ু-পরিবর্তনের। অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ব'লে তখনকার দিনে বক্সারের প্রসিদ্ধি ছিল। রৌদ্রবায়ুনন্দিত একটি উন্মুক্ত পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া নিয়ে আমরা বক্সারে বাস করতে আরম্ভ করলাম।

চাকরির জন্য পিতাঠাকুর মহাশয় বক্সারে বেশি থাকতে পারতেন না। পুরুষ অভিভাবক স্বরূপ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও মেজদাদা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মাঝে মাঝে থাকতেন, কিন্তু কলেজের পড়াশুনার জন্য তাঁরাও সর্বদা থাকতে পারতেন না। সেজন্য অবশ্য বিশেষ কিছু অসুবিধাও ছিল না। আমার মাতাঠাকুরাণী মনোমোহিনী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং সংসারসুদক্ষা রমণী ছিলেন। মাত্র তাঁর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সাহস ও কর্মপটুতার উপর নির্ভর ক'রে অমন সংকটাপন্ন রোগী নিয়েও বিদেশে বাস করা চলতে পারত। কিন্তু বক্সারে আমাদের একজন স্থায়ী এবং পাকা পুরুষ অভিভাবকেরও অভাব হয় নি। তিনি কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বক্সারের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল।

কান্তিবাবু ছিলেন আমাদের পল্লীজামাতা, অর্থাৎ ভাগলপুরের বাঙালীটোলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে তিনি বিবাহ করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সহিত আমাদের পরিচয়; আর, সেই পরিচয়ের প্রভাবেই তিনি বাড়ি ভাড়া ক'রে দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে বক্সারে আমাদের বসবাসের সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রতিদিন তিনি নিয়মিত ভাবে আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন ও দেখাশুনা করতেন।

এ সকল তো গেল শোনা কথা—শ্রুতি; স্মৃতি নয়। এবার স্মৃতির কথা বলি। বক্সারের তিনটি কথা আমার মনে পড়ে; খুব স্পষ্টভাবে না হ'লেও খুব অস্পষ্টভাবেও নয়।

পরবর্তী কালে ভাগলপুরে কান্তিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। কিছুকাল তথায় এক সঙ্গে ওকালতিও করেছিলাম। কান্তিবাবু ছিলেন উদার-হৃদয় খাড়া-স্বভাবের গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ; কথা কইতেন কম,

হাসতেন তার চেয়েও অনেক কম ; আর, কদাচিৎ কখনও যদি হাসতেন, সে হাসির বারো আনা মারা যেত ঘনবিস্তৃত গুম্ফশ্মশ্রুর নিবিড়তার মধ্যে। বক্সারে বাসকালে তরুণ বয়সে গোঁফদাড়ির অত বাড়বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হয় নি। কিন্তু গম্ভীর-বদন তিনি তখনও ছিলেন, সে কথা সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন কান্তিবাবু আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, কাজে কাজেই তাঁর মুখ আমার বিশেষ পরিচিত হ'য়ে গিয়েছিল, তাঁর নামও আমি শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে-সব দিনের প্রতিদিবসের দেখা তাঁর মুখ আমার একটুও মনে পড়ে না ; শুধু মনে পড়ে একদিনকার অট্টহাস্যনিনাদিত কৌতুকোজ্জ্বল মুখ। বোধ করি, সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা ব্যতিক্রমই আমার মনের উপর গভীর ছাপ মেরেছিল। কান্তিবাবু সে হাসির হেতু ছিলাম আমিই। সুতরাং কথাটা একটু খুলে বলি।

চাকরের সহিত আমি মাঝে মাঝে বৈকালের দিকে কান্তিবাবুর বাড়ি বেড়াতে যেতাম। সে-সব সময়ে কান্তিবাবু প্রায়ই কাছারিতে থাকতেন। একদিন সকালের দিকে, বোধ হয় কোনও প্রয়োজন বশত, মাতাঠাকুরাণী আমাদের চাকরকে কান্তিবাবুর বাড়ি পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে আমাকেও সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কম্বিনেশন স্যুট প'রে ফিটফাট সাজগোছ ক'রে কান্তিবাবুর বাড়ি উপস্থিত হ'য়ে দেখি, প্রশস্ত বারান্দায় মক্কেলদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে কান্তিবাবু কাজ করছেন। বোধ হয় সে দিন ছুটির দিন ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল মুখে কান্তিবাবু বললেন, "এস খোকা, আমার কাছে এসে ব'স।" গম্ভীর মুখে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো একটা বেঞ্চে একজন মক্কেলের পাশে বসলাম।

আমার সহিত দু-চারটে কথাবার্তার পর কান্তিবাবু পুনরায় কাজে মন দিলেন এবং মক্কেলদের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হলেন। ক্ষণকাল আমি ধৈর্য ধ'রে নিঃশব্দে ব'সে রইলাম। কিন্তু ক্রমশ বিরক্তি বোধ হ'তে লাগল। মক্কেলদের সঙ্গে আমাকে এমন ক'রে বার-বাড়িতে বসিয়ে রাখার কোনও অর্থই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা কথা কইতে বাধ্য হলাম।

"কান্তিবাবু!"

সকৌতূহলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কান্তিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "কী বল তো ?"

"কই, সে সব কিছু হচ্ছে না ?"

"কী সব ?"

"খাওয়া-দাওয়া ?"

আমার এই কথায় কান্তিবাবু সেই অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন, যা আজও আমার স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। মক্কেলরাও দেখাদেখি হাসতে আরম্ভ করেছিল। হাসি থামলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে কান্তিবাবু বললেন, "নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া

হবে।" তারপর চাকর ডেকে খাবার দেবার কথা ব'লে দিয়ে আমাকে অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

অন্দর-মহলের প্রতি আমার আস্থা ছিল। বোধ হয় সেখানে সুখাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না, আর মক্কেলরূপী অবান্তর বস্তুর একান্ত অভাব ছিল, সেই দুই অভিজ্ঞতার ফলে। মক্কেলদের মধ্যে শুকনা ডাঙায় বসিয়ে রেখেই কান্তিবাবু হয়তো আমাকে বাইরে বিদায় করবেন, সেই ভয় থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে আশ্বস্ত চিত্তে অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলাম।

সেদিন কান্তিবাবুর হাসি দেখে আমি কতটা লজ্জিত হয়েছিলাম তা জানি নে, কিন্তু প্রচুর বিস্মিত হয়েছিলাম বোধ হয় এই কথা ভেবে যে, এমন নির্বিকার খোলের মধ্যেও এমন হাসির তুবড়ি থাকতে পারে।

বক্সারের দ্বিতীয় কথা—তিনটি তালগাছের কথা। আমাদের বাড়ির সদর দরজা নিষ্ক্রান্ত হ'য়েই ডান দিকে এই তিনটি সমবয়সী এবং সমদৈর্ঘ্যের তালগাছ যেন নিবিড় সৌহার্দ্যে পরস্পরের অতি কাছাকাছি তেড়া-বেঁকা ভাবে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ানাড়ি করত। তাদের মাথা নাড়ানাড়ি দেখে আমার মনে হতো, সে যেন শুধু মাথা নাড়ানাড়িই নয়, কথা কওয়াকয়িও বটে। বাড়ির ভিতরের বারান্দা থেকেও তালগাছ তিনটির মাথা দেখা যেত। দিনের বেলায় সবুজ চেরা পাতার তালগাছ ব'লে তাদের চিনতে একটুও ভুল হতো না; সন্ধ্যা হ'লে কিন্তু মনে হতো তারা যেন তিনটে বিকট দৈত্যের মাথা। স্বপ্নে তাদের কী রকম মূর্তি দেখতাম তা জানি নে; কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখতাম, তারা আবার সবুজ পাতার তালগাছ হ'য়ে সোনালি রৌদ্রকিরণে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। সন্ধ্যাকালের দৈত্যদের কোনও চিহ্নই তাদের মধ্যে খুঁজে পেতাম না।

ফুলদাদার কথা বক্সারের তৃতীয় কথা, যা আমার এখনও মনে আছে। বক্সারের স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু ডাক্তার-বৈদ্যদের সুচিকিৎসা এবং প্রাণপণ চেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের নিরবসর সেবা ও পরিচর্যা এবং কান্তিবাবুর বিচক্ষণ তত্ত্বাবধান কিছুই ফুলদাদাকে আটকে রাখতে পারলে না। একদিন রৌদ্রস্নাত ঝলমলে প্রভাতে আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন—চোদ্দ বয়সের ফুটফুটে বালক, পূর্ণিয়া গভর্নমেণ্ট স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, বাপ-মার নয়নের মণি। ফুলদাদার নিয়মিত ডায়রি লেখার অভ্যাস ছিল—বক্সারে অবস্থানকালেও তিনি ডায়রি লিখেছিলেন। বড় হ'য়ে আমরা মুক্তার মতো অক্ষরে লিখিত সেই ডায়রি পাঠ ক'রে মুগ্ধ হয়েছি। সে ডায়রির একখানা ছিন্ন পাতাও আজ নেই। ধীরে ধীরে কেমন ক'রে ক্রমশ তা অবলোপের অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করল, তা কেউ বলতে পারে না। থাকলে আমাদের পরিবারের একটা মূল্যবান সম্পদ হতো।

ফুলদাদার মৃত্যু-দিবসের কোনও কথা আমার একটুও মনে পড়ে না,—এমন কি, কান্নাকাটির কথাও না। বোধ হয় বিপদের মুহূর্ত আসন্ন দেখে আমাকে কান্তি-

বাবুর বাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একখানা সবুজ রঙের র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে ফুলদাদা নিত্য বারান্দায় রৌদ্র কিরণে ব'সে বহুক্ষণ ধ'রে মুখ ধুতেন, আমার শুধু মনে পড়ে তাঁর সেই রুগ্ন কৃশ ফুটফুটে চেহারাখানি। তখন সে কথা নিশ্চয়ই মনে হতো না—এখন কিন্তু ফুলদাদার ক্লান্ত-পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়লেই মনে হয়, সেই সুন্দর মুখখানির উপর যেন মৃত্যুর নিশ্চিত নীলাভ ছায়া ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল।

আমাদের বিপদের বন্ধু কান্তিবাবু যিনি আমাদের বক্সারের বাসা বেঁধে দিয়েছিলেন, তিনিই পুনরায় সেই বাসা ভাঙার দুঃখময় কার্যে সচেষ্ট হলেন। মার মুখে শুনেছি, ফুলদাদার মৃত্যুকালে কান্তিবাবু শোকে অধীর হ'য়ে রোদন করেছিলেন। একটি মৃত্যুপথযাত্রী শরণাগত বালককে রক্ষা করার জন্য যে চেষ্টা তিনি কায়মনোবাক্যে করেছিলেন, তা অসার্থক হওয়ার দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল।

কান্তিবাবুর চেষ্টায় সংসার গুটিয়ে দিন দুয়েকের মধ্যে পুনরায় আমরা বক্সার রেল-স্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হলাম। আমার মাতাঠাকুরানী শোকে ধৈর্যশীলা রমণী ছিলেন—আমাকে বুকে জড়িয়ে তিনি ভাগলপুরের পথে ফিরে চললেন। পশ্চাতে প'ড়ে রইল বক্সারের শ্মশানঘাটে তাঁর জীবনের আনন্দ, হৃদয়ের নিধি নগেনের সুকুমার দেহের ভস্মাবশেষ।

তিন

মাতাঠাকুরানীর দুঃসহ পুত্রশোক যথাসম্ভব লাঘব করবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কয়েক মাস পরেই পিতাঠাকুর মহাশয় দাদার বিবাহ দিলেন।

মাঘ মাস—ভাগলপুরের দুর্জয় শীতের এক গভীর রাত্রে নববধূ এলেন ব্যাণ্ড বাজিয়ে আতশবাজি পুড়িয়ে, প্রচণ্ড হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে। বধূর পিত্রালয় পাটনায়।

পাটনার বিহার সার্ভে স্কুলের হেডমাস্টার কুড়ারাম রায় কন্যার পিতা। এই কুড়ারামবাবু অতিশয় উদারহৃদয়, পরিহাসরসিক, সঙ্গীতপ্রিয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বহুবিধ গুণের বলে ক্রমশ ইনি আমাদের সংসারের কুটুম্ব হ'তে আত্মীয়ের পর্যায়ে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। আমাদের গৃহে তিনি আগমন করলেই আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একটা উল্লাস প'ড়ে যেত। মুখে তাঁর সর্বদা লেগে থাকত কোন-না-কোন গানের মৃদু গুঞ্জন। হাসির গল্পের তাঁর ছিল অফুরন্ত ভাণ্ডার—এবং সেই সব গল্প অদ্ভুতভাবে সরস ক'রে বলবার ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। একটা নমুনা দিই।

এক ছিলেন পণ্ডিত মহাশয়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যত না ছিল বিদ্যা, দাপট ছিল তাঁর দশগুণ বেশি। একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের খড়ের ঘরের মটকায় আগুন লেগেছে। ব্যস্ত হ'য়ে চালের উপর আরোহণ ক'রে পণ্ডিত মশায় অগ্নি নির্বাপিত করবার জলের জন্য পাঁচী নামক তাঁর এক পরিচারিকাকে আহ্বান করছেন।

'পাচি, পঞ্চি, প্রপঞ্চি, পঞ্চাননি, বারি আনয়।' অর্থাৎ, পাচি, পঞ্চি, প্রপঞ্চি, প্রঞ্চাননি, জল আনো। পাচিও যোগ্য পণ্ডিতের সুযোগ্য পরিচারিকা। পণ্ডিত মশায়ের কাছে থেকে থেকে সে সংস্কৃতভাষা খানিকটা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিল। সে উত্তর দিলে, 'ভট্টাচার্য। শিরোধার্য। আচার্য। পরমগুরো। গঙ্গোদকং বা কূপোদকং ?' অর্থাৎ গঙ্গার জল আনব অথবা কুয়ার জল ? এদিকে সংস্কৃত ভাষায় বিলম্বিত আলাপ-আলোচনার সুযোগে পণ্ডিত মশায়ের কাছায় ততক্ষণে আগুন ধ'রে গিয়েছে। জলের জন্য আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক বিবেচনা ক'রে তিনি 'বাপ' ব'লে লাফ দিয়ে উঠানে প'ড়ে পা ভাঙলেন। গল্প তো এই সামান্য—কিন্তু এই গল্প তিনি যতবার বলতেন, ততবারই আমাদের প্রথম শোনার মতো ভালো লাগত।

যে কথা বলছিলাম, তাই বলি। যে রাত্রে নববধূ আমাদের গৃহে পদার্পণ করলেন, সেদিন লোকজনের ভিড়ে, বরণ এবং অপরাপর অনুষ্ঠানের হাঙ্গামায় নববধূকে ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ পেলাম না। তা ছাড়া, চার বৎসরের বালকের অর্ধ রজনীর ঘুমভাঙা চোখে নিদ্রা ঘনিয়ে এসে তাকে যদি লেপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে থাকে তো বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

রাত্রি জাগরণের জন্য প্রভাতে ঘুম ভাঙতে বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে নববধূর কমনীয় কান্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বারান্দায় এক জায়গায় সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে বউদিদিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। উগ্র গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ, সুশ্রী মুখাবয়ব ; মুখে হাসি ও লজ্জার ভাগাভাগি খেলা। মাতাঠাকুরানী ঘুরে-ফিরে এসে বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে আদর করেন, আবার দু চোখ ভ'রে অশ্রুর বন্যা নামবার উপক্রম করলে তাড়াতাড়ি স'রে পড়েন।

তেড়ে-ফুড়ে এগিয়ে গিয়ে বধূর সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত একটা আলাপ করলাম। বউদিদি আমাকে পাশে বসিয়ে আদর করলেন, কিন্তু ইতরজনের সংখ্যাধিক্যবশত আলাপ তেমন জমল না।

মাঝে মাঝে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু অবান্তর লোকের ব্যূহ ভেদ ক'রে যথাস্থানে উপনীত হ'তে পারে নে। আমাদের ভাগলপুরের গাঙ্গুলি পরিবারে তখন তিন কর্তা, পাঁচ গৃহিণী ও তাঁদের পুত্রকন্যা নাতি-নাতনীর সুবৃহৎ সংসার। বউদিদির সমবয়সী মেয়ে আমাদের বাড়িতেই বোধ হয় আট-দশ জন ; তা ছাড়া, পাড়া থেকে নিরবসর আমদানি আছেই। আমাদের গৃহখানি ঠিক যেন লঙ্কাপুরীর অশোক-বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বউদিদি সর্বদা চেড়ীবেষ্টিতা সীতার মতো ব'সে আছেন। চেড়ীগণের সুদৃঢ় প্রাকার ভেদ করে কার সাধ্য! আমাকে তো তারা পাত্তাই দেয় না, তাদের মতে আমি নিতান্তই নগণ্য। তাদের মুখের বুলি,—খোকা, তুমি এখানে কা করছ ? যাও, খেলা করগে। তারা জানে না, চার বৎসর বয়সের কতকটা প্রাচীন খোকার মনে তখন ব্যক্তিত্ব অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ

করেছে। তা ছাড়া, এ কথাও তারা বোঝে না যে, যে রকম ক'রেই হোক ফুলদাদাকে পাকাপাকিভাবে হারানো গেছে এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে খোকার মনে একটা যে ক্ষোভ বাসা বেঁধে আছে, এই নববধূটি তার কতটা সান্ত্বনা।

ভাগলপুরে বউদিদির সঙ্গে তেমন আলাপ জমল না। জমল বৎসর খানেক পরে পূর্ণিয়ায় বউদিদি যখন আমাদের বাড়ি কতকটা স্থায়ীভাবে ঘর করতে এলেন। আমি ও আমার দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা সহোদরা সরোজিনীদিদি বউদিদিকে প্রায় একচেটে ক'রে ফেললাম। এখানে অবশ্য চেড়ীগণের তেমন দৌরাত্ম্য ছিল না, কিন্তু আর এক বিপদ ছিল; সুযোগ পেলেই দাদা বউদিদিকে আমাদের কাছ থেকে হরণ করতেন। যে ক'রেই হোক আমরা বুঝেছিলাম, বউদিদির উপর দাদার একটা বিশেষ অধিকার আছে; কিন্তু তথাচ মনে মনে যে দাদার উপর একটু বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে উঠেছিলাম, সে কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। দাদার কলেজ খুললে আমরা নির্বিঘ্ন হতাম।

সন্ধ্যাকালে শাঁখ বাজানো, প্রদীপ দেখানো হ'য়ে গেলে বউদিদি আমাদের দুজনকে দুই পাশে নিয়ে নিজ কক্ষের পালঙ্কের উপর শয়ন ক'রে নানাপ্রকার কৌতুকজনক গল্প শোনাতেন। সে সব গল্প তাঁর পিতার নিকট শেখা। গল্পগুলি আমাদের খুবই ভালো লাগত, কিন্তু সব চেয়ে ভালো লাগত ইংরেজী বর্ণমালার অনুক্রমে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামকথন। বউদিদি যখন বলতেন, অ্যাকোনাইট বেলেডোনা ক্যামোমিলা ডাল্কামারা ইউফ্রাইটিস ফেরমফস ইগ্নেশিয়া, তখন আমাদের দুই ভাইবোনের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকত না এই কথা ভেবে যে, বারো-তেরো বৎসর বয়সের একটি ক্ষুদে বালিকার পেটে এত বিদ্যে কী ক'রে ঢোকে! তারপর যখন বউদিদি আর একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নাম ক'রে বলতেন, রস্‌টক্স্‌ সিকডনড্রন, তখন আমরা ভাবতাম, নাঃ, এবার চূড়ান্ত হয়ে গেল। এর পর আর কিছু থাকতে পারে না। বউদিদির পিতা গৃহচিকিৎসক হিসাবে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তাঁরই নিকটে বউদিদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামগুলি শিখেছিলেন।

বউদিদির নাম ছিল মৃন্ময়ী। অভিধানে মৃন্ময়ীর কী অর্থ লেখে তা আমি ঠিক জানি নে. কিন্তু আমাদের মানসিক অভিধানে মৃন্ময়ীর অর্থ ছিল বুদ্ধিমতী। প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন তিনি। বহু চাণক্য এবং উদ্ভট শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমরা একটু বড় হ'লে সেই সকল শ্লোক আমাদের কাছে আবৃত্তি ক'রে এবং তার অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করতেন।

আমি যখন স্কুলের উপর ক্লাসে ও কলেজে পড়ি, তখন আমার কবিতা রচনার ব্যাধি ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে, তিনখানা বাঁধানো খাতা আমার রচিত কবিতায় পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। 'ভারতী' এবং অপরাপর মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে আমার রচিত কবিতা প্রকাশিত হতো। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এখনও অনেকের ধারণা, কবিতা রচনার পথ পরিত্যাগ ক'রে আমি ভুল করেছি।

হয়তো করেছি—কিন্তু সে জন্ত মনে বিশেষ দুঃখ নেই, কারণ জীবনে তদপেক্ষা গুরুতর আরও অনেক ভুল করা গেছে।

বউদিদি আমার প্রতি অতিশয় স্নেহশীলা ছিলেন; আর, সেই উগ্র অবুঝ স্নেহই বোধ হয় আমার রচনার প্রতি, বিশেষত আমার কবিতার প্রতি, তাঁর অন্ধ অনুরাগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। আমার বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি যখন সেই কবিতাগুলি উৎফুল্লভাবে আবৃত্তি করতে থাকতেন তখন আমাদের মনে হতো, আমার কবিতা রচনা নিতান্তই অসার্থক হয় নি। একটি কবিতা যা তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন, তার মাঝের কয়েক ছত্র আমার মনে আছে—

হালভাঙা তরী পাল নাই ব'লে
অসহায় তাই স্রোতমুখে চলে,
ডুবে বুঝি হায়। ডুবে পলে পলে,
নাহি কূল, নাহি তীর ভাই।
শুধু চারিধারে নীল জলরাশ,
ছলছলি' কহে ছলনার ভাব;
বলে, চল চল্ সাগরেতে চল্,
তীরের তরণী হেথা নাই।
সুদূরের দিকে হেরি অনিমিখে,
কিনারার দেখা নাহি পাই।

আমার কবিতা সম্বন্ধে বউদিদির নিকট হ'তে যে সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম তা এতই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট যে, তা পরিপাক করতে আমারই বেদনা বোধ হতো। সেই সার্টিফিকেটের মর্ম যদি এখানে প্রকাশ ক'রে, বলি, তা হ'লে বাংলা দেশের কবিসম্প্রদায় হয়তো আমাকে ঢিল-পেটা করবেন। সে যা হোক, সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে আমি যদি কারও কাছে উৎসাহ পেয়ে থাকি তা হ'লে বউদিদি তাঁদের মধ্যে অন্যতমা এবং ন্যূনতমা নিশ্চয়ই নন, সে কথা এখানে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার ক'রে রাখলাম।

কবিতার প্রসঙ্গে ভাগলপুরের একটি আট-নয়-বৎসর বয়সের বালিকার কথা মনে প'ড়ে গেল—তার কথা একটু বলি। অত ছোট একটি মেয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত হিল্লোলিত ছন্দের আবির্ভাব কীরূপে হয়েছিল, এখন সে কথা ভেবে আশ্চর্য হই; কিন্তু তখন একত্রে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খ্যাতনামা গল্পলেখক গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি সেই ছন্দের উৎপাতে নাজেহাল হয়েছিলাম।

আমার তখন বৎসর বারো বয়স। আমরা উক্ত তিন ভাই বয়সে কাছাকাছি তো ছিলামই, কিন্তু মনের মধ্যে ছিলাম আরও বেশি কাছাকাছি। সুতরাং আমরা তিনজনে থাকতাম সর্বদা পাশাপাশি। আমাদের তিনজনের 'কর্মনাশা জোট'

ভাঙবার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁরাই হার মানতেন বেশি। কোনও কাজের ভার আমাদের মধ্যে একজনের উপর অর্পিত হ'লে আমরা তিনজনে একত্রে সে কাজে লেগে পড়তাম; আবার এমন কোনও কাজের ভার যদি আমাদের পড়ত যা চারজন মিলে করবার কথা, তা হ'লে চতুর্থ ব্যক্তিকে নিষ্কাশিত ক'রে দিয়ে আমরা তিনজনেই সে কাজ শেষ করতাম। এই কারণে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ আমাদের তিনজনকে ব্যঙ্গচ্ছলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল ঐ আট-নয় বৎসর বয়সের মেয়েটির কাব্যশরাঘাতে। শর অতি সংক্ষিপ্ত হ'লেও ছন্দে ও মিলে নিখুঁত, কিন্তু অর্থ বিশেষ প্রাঞ্জল নয় ব'লে তীক্ষ্ণতায় নির্মম। যে জিনিসের অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায়, সে জিনিস স্পষ্টই বুঝি; কিন্তু যে জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় না, তার মধ্যে আশ্রয় বাঁধবার সুবিধা পায় যত সন্দেহ আর সংশয়। দুষ্ট বললে বুঝি, দুষ্ট পর্যন্তই বললে; কিন্তু ঘুষ্ট বললে মনে হয় বুঝি দুষ্টকেও ছাড়িয়ে আরও কিছু বললে।

মেয়েটি আমাদের প্রতিবেশিনী, খুব নিকটেই একটি গৃহে বাস করত। আমাদের গৃহ হ'তে পথ নিষ্ক্রান্ত হ'লে অব্যবহিত উত্তরে ভাগীরথী নদী; একমাত্র গঙ্গাস্নান করা ছাড়া সংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজ করতে হ'তো দক্ষিণ দিকের পথ ধ'রে। সুতরাং দিনের মধ্যে কয়েকবারই সেই মেয়েটির বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যেতে-আসতে বাধ্য হতাম। যেতাম অবশ্য আমরা যথেষ্ট সতর্ক হ'য়ে; চতুর্দিক দেখে-শুনে সে বাড়িটার সামনে পৌঁছে চোঁ দৌড় মারতংম—কিন্তু তাতেই কি রক্ষা পাবার জো ছিল? গেটের পাশে লতাপাতার আড়ালে কোথায় যে মেয়েটি অদৃশ্য হ'য়ে লুকিয়ে থাকত, যথাসময়ে ধাঁ ক'রে সামনে বেরিয়ে এসে অব্যর্থ লক্ষ্যে নিক্ষেপ করত তার কাব্যবাণের অস্ত্র—

উপেন পণ্ডিত ধুন্ধব ধণ্ডিত!

আমার চেয়ে বয়সে অন্তত বছর দুয়েকের ছোট এক বালিকার নিকট হ'তে অযথা পণ্ডিত আখ্যার সহিত অজানা ভাষার 'ধুন্ধব ধণ্ডিত' লেজুড় লাভ ক'রে অতিশয় অপমানিত বোধ করতাম। প্রতিবাদস্বরূপ পিছন ফিরে মুষ্টি-আস্ফালন দেখাতাম' কিন্তু সে প্রতিবাদ ব্যর্থ হ'য়ে রাজপথের বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে মিলিয়ে যেত। বালিকা নির্বিকার মুখে লতাকুঞ্জের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করত।

ছন্দের দ্বিতীয় আয়ুধটি ছিল আরও গোলমেলে, সেইজন্য আরও মর্মান্তিক। আর, ঘটনাচক্রেই হোক, অথবা অপর যে-কোনও কারণেই হোক, সেটি নিক্ষিপ্ত হতো প্রধানত বেচারা গিরীনের উপরেই বেশি। গিরীন ছিল আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং ভালোমানুষ; সে হয়তো কতকটা অতর্কিতে কিছু ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে চলেছে সেই বাড়ির সম্মুখ দিয়ে, এমন সময়ে কর্ণে এসে বিদ্ধ হ'লো—

গিরীন ভদৈয়া ধুব্বব ধৈয়া।

সচকিত হ'য়ে গিরীন মারত দৌড়, বোধহয় পুনরাঘাতের ভয়ে; কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কয়েকটি বীরজনোচিত ভদ্রতা ছিল। প্রথমত, পুনরাঘাত সে কখনও করত না; ঐ একবারের মারে যা-কিছু হবার তা হ'লো। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সে পছন্দ করত না। দ্বিতীয়তঃ, ছন্দের মার মারবার পর তার মুখে বিদ্রূপ অথবা অবজ্ঞা, এমন কি, কৌতুকের নিঃশব্দ হাসিও দেখা যেত না। বোধ হয় সে মনে করত, বোমা ফাটাবার পর তুবড়ি ফোটানোর কোনও অর্থ হয় না।

আমাদের তিন ভাইয়ের প্রতি ছন্দের বাণ প্রয়োগ করার বিষয়ে মেয়েটির একটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যেত। 'ভদৈয়া'-বাণ সুরেনদাদার প্রতি সে কদাচিৎ প্রয়োগ করত; আমার প্রতি করত মাঝে মাঝে; কিন্তু গিরীনের প্রতি সদা-সর্বদা। এজন্য গিরীনের মনে মনে বেশ একটু ক্ষোভ ছিল। ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যবহার করলেও পণ্ডিতের নিকৃষ্টতম অর্থ হয় মূর্খ; কিন্তু ভদৈয়া এমন এক অজানা বস্তুর বিবর, যার মধ্যে অপমানের যে-কোনও সাপ-ব্যাঙ বাস করতে পারে। কখনও কদাচিৎ মেয়েটি গিরীনকে 'গিরীন পণ্ডিত' বললে গিরীন মনে মনে একটু খুশিই হ'তো। কথাটা কোনও ছলে-ছুতোয় সে আমাদের শুনিয়ে দিত, "আজ আমাকেও 'গিরীন পণ্ডিত ধুব্বব ধণ্ডিত' বলেছে।"

যে কারণেই হোক, সুরেনদাদার পণ্ডিত্য সম্বন্ধে মেয়েটির আস্থা ছিল; সে সুরেন পণ্ডিত ভিন্ন সহজে সুরেনদাদাকে ভদৈয়া বলত না।

মেয়েটির পরবর্তী ইতিবৃত্ত কী তা জানি নে, কিন্তু অতি অল্পবয়সে সে যেরূপ ছন্দ রচনার ক্ষমতা দেখিয়েছিল তাতে যদি হঠাৎ অবগত হই যে, আমাদের বাংলা দেশে কোনও সুবিখ্যাত মহিলা-কবি ভাগলপুরের সেই নয় বৎসরের মেয়েটি, তা হলে আশ্চর্য হব না।

চার

প্রতি বৎসর আমরা নিয়মিত দুবার পূর্ণিয়া থেকে ভাগলপুরে আসতাম; একবার পূজার ছুটিতে, আর একবার ফাগুন চৈত্র মাসে বাসন্তী বারোয়ারি পূজার সময়ে। ভাগলপুরে আসবার প্রধান কারণ ছিল দুটি; প্রথমতঃ, বাড়ি আসা এবং ঘরের জগদ্ধাত্রী পূজায় উপস্থিত থাকা; দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুকাল বাস ক'রে পূর্ণিয়ার ম্যালেরিয়া আক্রমণের চোট খানিকটা সামলে নেওয়া। ভাগলপুরের বারোয়ারী পূজা দেখবার পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রবল আগ্রহ ছিল; প্রতি বৎসর সে সময়ে তিনি দিন পনের-কুড়ির ছুটি নিয়ে সপরিবারে ভাগলপুরে আসতেন। ছুটি ফুরোলে তিনি পূর্ণিয়ায় ফিরে যেতেন; আমরা অনেক সময়ে আরও কিছুদিন ভাগলপুরে থেকে যেতাম।

তখনকার দিনে পূর্ণিয়া থেকে ভাগলপুর যেতে হ'লে কাটিহার, মণিহারীঘাট,

সকরিগলিঘাট ও সাহেবগঞ্জ জংশন হ'য়ে রেল ও ষ্টিমার যোগে যেতে হ'তো পূর্ণিয়ায়। রেল হবার আগে ভাগলপুর যেতে হ'তো ভাগীরথীর উত্তর তীরে উত্তর ভাগলপুর ও দক্ষিণ ভাগলপুরের মধ্যে কাড়াগোলাঘাট হ'য়ে। সে সময়ে কাড়া-গোলাঘাট আমদানি-রপ্তানির একটা বিখ্যাত বন্দর ছিল।

পূর্ণিয়া শহর থেকে দুই ঘোড়ার সিক্রাম গাড়ি চ'ড়ে বিউগল্ বাজাতে বাজাতে দার্জিলিং-হিমালয়ান রোড দিয়ে উনিশ-কুড়ি মাইল পথ কাড়াগোলায় যাওয়া, সে এক ভারি জবর ব্যাপার ছিল। তারপর, বৃহৎ পালোয়ার নৌকায় জিনিসপত্র সহ সওয়ার হয়ে বীচিবিক্ষুব্ধ ভাগীরথীর বক্ষ ভেদ ক'রে সাহেবগঞ্জ ঘাটে পৌছানো—সে তো সাত সাগরের দেশে পাড়ি-জমানোর একটা উপক্রমণিকার মতোই মনে হ'ত।

কাড়াগোলার পথে আমার জ্ঞানকালে আমি ভাগলপুরে গিয়েছিলাম অন্তত একবার, দুটো কারণে সে কথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি। দার্জিলিং-হিমালয়ান রোডের এক জায়গায় একটা পুল বেমেরামত হওয়ার দরুন মুটের মাথায় জিনিস-পত্র চাপিয়ে পরপারে অপর একটা সিক্রামে গিয়ে আমাদের উঠতে হয়েছিল, সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে আছে, কাড়াগোলাঘাটে উপনীত হ'য়ে প্রখর রৌদ্র-কিরণে ভাগীরথাবক্ষে কোটি কোটি উজ্জ্বল মণি-মুক্তার যে অপূর্ব ঝিকিমিকি খেলা দেখেছিলাম তার কথা। বহুদিন গঙ্গাতীরে বাস করেছি, গঙ্গা-বক্ষে বিচরণ করার অভিজ্ঞতাও নিতান্ত কম হয় নি, কিন্তু সেদিন যেমন ভাগীরথী-বক্ষে মৃদু তরঙ্গের শীর্ষে বিচূর্ণ আলোকের লীলা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম, তেমন বোধ করি আর কোনও দিন হই নি।

বাল্যকালে যখন আমরা বারোয়ারি পূজা দেখেছি ভাগলপুরে, তখন বাঙালীদের প্রচণ্ড রোয়াব। জন দুই-তিন উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারী ব্যতীত হাকিম-হোমরা প্রায় সবই বাঙালী—রেলে, ডাকঘরে, পুলিসে, সর্বত্রই বাঙালীর প্রভুত্ব। উকিলদের অধিকাংশই, এবং উপর দিকে বাঘা-ভালুকা প্রায় সব বড় বড় উকিলই বাঙালী। কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, স্কুলের হেডমাস্টার ও অধিকাংশ শিক্ষকও বাঙালী। হাতীর মতো বড় বড় ওয়েলার ঘোড়ার জুড়ি হাঁকিয়ে রাজপথ দিয়ে গমগম্ করে বিহারী জমিদারগণ বেড়াতে যান—পথে ভদ্রবেশধারী কোনও অপরিচিত বাঙালীকে দেখলে হাত তুলে অভিবাদন করে রাখেন, কে জানে যদি কোনও সদ্যাগত হাকিম-টাকিমই হন, ভবিষ্যতে অভিবাদনটা কাজে লাগতে পারে।

বারোয়ারি পূজার চাঁদা বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ভালোই উঠত; কিন্তু মোটা মোটা চাঁদা উঠত উগ্রমোহন ঠাকুর, প্রাণমোহন ঠাকুর, রাজ বনেলী, তেজনারায়ণ সিং প্রমুখ আরও বড় বড় জমিদার ও ব্যবসায়িগণের নিকট হ'তে। গৃহবিবাদ ও মামলা-মকদ্দমার ফলে তখনও ভাগলপুর জেলার বিহারী জমিদারগণ বিশীর্ণ হ'য়ে যান নি,—চাঁদার খাতা সম্মুখে উপস্থিত হ'লে তাঁরা উদার-উন্মুক্ত হস্তে

চাঁদা দিতেন। বিশেষত পূজা-কমিটির সদস্যদের শীর্ষদেশে যদি কোনও উচ্চ রাজকর্মচারীর নাম থাকত, তা হ'লে অর্থ ক্ষরিত হতো গাঢ় প্রবাহে এবং অবলীলাক্রমে। কিন্তু সে যাই হোক, তখনকার দিনের বিহারিগণ পূজা-পার্বণে উৎসব-আনন্দে বাঙালীদের সহিত সর্বান্তঃকরণে যোগ দিতেন, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

অর্থের প্রাচুর্যবশত বিশেষ ধুমধামের সহিত বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হতো। এত প্রকারের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকত যে, কয়েকদিন স্নানাহারের অবসর পাওয়া যেত না। সকালে ফুল তোলা, বেলপাতা বাছা থেকে আরম্ভ ক'রে পূজার নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজন; বেলা দশটা আন্দাজ একদফা পুতুল নাচ; মধ্যাহ্নে দেবীপূজা এবং অন্নব্যঞ্জন-মিষ্টান্নের প্রসাদ ভোজ; সায়াহ্নে দ্বিতীয় দফা পুতুল নাচ; তৎপরে আরাত্রিক; আরাত্রিকের পর চণ্ডীর গান অথবা কীর্তন; কীর্তনের পর রাত্রি দশটা হ'তে পরদিন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত যাত্রাগান। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় নিচ্ছেদ একটি আনন্দচক্র।

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধা কীর্তনগায়িকা পান্নাসুন্দরী আসতেন দুই রাত্রির ফুরণে কীর্তন গাইবার জন্য; দেশপ্রসিদ্ধ মতি রায়ের দল আসতেন যাত্রা গাইতে; কৃষ্ণনগর থেকে বিখ্যাত মূর্তিশিল্পী শশিভূষণ পাল আসতেন প্রতিমা, সঙ এবং পুতুল নাচের পালা গড়বার জন্য। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকজনক ঘটনা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

সারা রাত্রি যাত্রা চলেছে; ভোরের দিকে জমেছে অসম্ভব রকম। প্রাচীন মাতব্বরগণ, যাঁরা রাত্রি জাগরণের চোট সহ্য করতে পারেন না, শেষ রাত্রি চারটা সাড়ে চারটা থেকে এসে সভা জাঁকিয়ে বসেছেন। আসরে তিল ধারণের স্থান নেই। প্রতিমার দিকে এবং চিক-ঘেরা মেয়েদের দিক ছাড়া বাকি দুই দিকে চার-পাঁচ কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে ঠেলে-ঠুলে এগিয়ে এসে এক ডাক-পিয়ন তন্ময় হ'য়ে যাত্রা শুনছে। সকালে বেচারা কাঁধে ডাকব্যাগটি ঝুলিয়ে চিঠি বিলি করতে বেরিয়ে যাত্রা হচ্ছে দেখে একটু শুনে যাবার লোভ সংবরণ করতে পারে নি।

মাতব্বরদের মধ্যে একজনের হঠাৎ পিয়নের উপর দৃষ্টি পড়ায় হাত বাড়িয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, "এয় পিয়ন! হামারা চিঠ্‌ঠি হ্যায়?" পিয়ন কিন্তু যাত্রা শুনতে এমনই মগ্ন যে, না বার করে চিঠি, না দেয় কথার উত্তর। ততক্ষণে কিন্তু নিকটবর্তী জনতার মধ্যে ব্যাপারটা মালুম হয়ে গেছে। একটা প্রচণ্ড হাস্যরোলে ক্ষণকালের জন্য যাত্রা বন্ধ হ'য়ে গেল।

চার-পাঁচজন লোকের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে ভাগলপুরের গঙ্গামাটির তৈরি পিয়নকে যাত্রার আসরে দাঁড় করিয়ে শশিভূষণ নিকটেই অপেক্ষা করছিলেন—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সেই চিঠিপ্রার্থী ভদ্রলোকের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে করজোড়ে বললেন, "খুশি হয়েছেন, বাবু?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে

উঠে শশিভূষণের মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক'রে বললেন, "খুশি হই নি বললে এত বড় সভায় কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না, শশি সত্যিই খুশি হয়েছি। দীর্ঘজীবী হও।"

এটি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ঘটনা। মাতাঠাকুরানীর মুখে একটি কাহিনী শুনেছিলাম, সেটি এই কাহিনীর জুড়িদার কাহিনী। পাঠক-পাঠিকাগণ, বিশেষত পাঠিকাগণ শুনলে নিশ্চয় খুশি হইবেন।

বারোয়ারি পূজার ভোগের জন্য রাশি রাশি আনাজ এসে পড়েছে। জন দশ-বারো বউ-ঝি মিলে দশ-বারোখানা বঁটি নিয়ে আনাজ কুটতে বসেছেন। বড় বড় গামলায় আর পরাতে রাশি রাশি কোটা তরকারি স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠছে—এমন সময়ে জন দুই কুলির সাহায্যে শশী পাল মাঝ-মধ্যিখানে বসিয়ে দিলেন একটা মেছুনীর মূর্তি। দুধিয়া নামক ভাগলপুরের একজন সর্বজনবিদিত মেছুনীর সহিত তার আকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য। উবু হ'য়ে ব'সে মেছুনী একটা প্রকাণ্ড বঁটি নিয়ে দশ-বারো সের ওজনের একটা বৃহৎ রুইমাছের গলায় সবে মাত্র কোপ বসিয়েছে। তাজা রুইমাছের দেহ থেকে টকটকে রক্ত ঝ'রে পড়েছে। সঙ দেখে বউ-ঝিরা মুখ টিপে হাসাহাসি আর নিম্নকণ্ঠে কথোপকথন করছেন। সঙ বসিয়ে দিয়ে শশী পাল একটু গা-ঢাকা হয়েছেন।

ক্ষণপরেই একজন নেতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী মহিলা হন্তদন্তভাবে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "কই গো, কুটনো কতদূর এগুলো ?" তারপর মেছুনী-মূর্তির উপর দৃষ্টি পড়তেই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, "এ মাগীর তো আচ্ছা আক্কেল দেখছি! আর জায়গা পেলে না! এই তরকারির মাঝখানে এসে মাছ কুটতে—।" কথা কিন্তু আর অগ্রসর হ'তে পারলে না, একটা তুমুল হাস্যধ্বনির মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। ভদ্রমহিলাও ততক্ষণে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সানন্দে হাস্যে যোগ দিয়েছেন।

অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে সহাস্য মুখে যুক্ত করে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন ক'রে শশিভূষণ বললেন, "আপনার তরকারি কিন্তু আঁশ হয় নি, মা।"

সহাস্য অপ্রতিভমুখে ভদ্রমহিলা বললেন, "না, তা হয় নি—কিন্তু বাছা, আমাদের নিয়েও তুমি যেন আবার সঙ-টঙ বানিয়ো না।"

জিভ কেটে মাথা নেড়ে শশিভূষণ বললেন, "আপনাদের নিয়ে কি সঙ বানাতে পারি, মা! একান্তই যদি বানাই, প্রতিমাই বানাব।"

আগেকার সে-সব দিন চ'লে গেছে। তার দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, সে কথা তুলছি নে। কিন্তু আজকালকার সভ্যতর দিনের কথা মনে হ'লে মনে হয়, আগেকার ধরিত্রী যেন আরও একটু সবুজ ছিল।

পাঁচ

পিতাঠাকুর মহাশয়ের পেনশন নেওয়ার পর পূর্ণিয়ার পাট তুলে দিয়ে আমরা সপরিবারে কলিকাতায় ভবানীপুর এসে বাস আরম্ভ করেছি। কলিকাতায় দাদা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেছেন।

পূর্ণিয়ায় আমি গর্ভনমেণ্ট হাইস্কুলে অধ্যয়ন করতাম। আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন ফ্র্যান্সিস্ জেভিয়ার মুখার্জি। ধপধপে গৌরবর্ণ দেহ, মুখে এক মুখ কাঁচা দাড়ি গোঁফ, শান্ত ভদ্র আকৃতি, শাসনের লেশমাত্র উগ্রতা ছিল না; কিন্তু আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সমীহ করতাম সহজ প্রবৃত্তির বশে।

পূর্ণিয়ার স্কুলে বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং আমাকে পড়তে হতো হিন্দী। আমার বাংলা দেশের সহপাঠিগণ যখন পড়তেন, 'ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ, কে দিল তোমারে এরূপ রূপ?' তখন আমি পূর্ণিয়ার স্কুলে পড়তাম,—

ছহরেঁ শিরপর ছব মোর-পখ
উনকী নথকী মুক্তা থহরেঁ।
ফহরেঁ পিয়রো পট-বেণী ইতে,
উনকী চুনরিকে ঝবা ঝহরেঁ॥

আরও নিম্নশ্রেণীতে আমি যখন পড়তাম—

সুত বিত নারী ভবন পরিবারা
হোঁ হি যাহি জগ বার হি বারা।
অস বিচার জয়ী জাগহুঁ তাতা,
মিলে ন জগমে সহোদর ভ্রাতা॥

তখন বাংলা দেশের আমার বয়সের বালকেরা পড়তেন,—

রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন,
কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ।

আমার সরোজিনীদিদি বাংলা পড়তেন। তাঁর কাছে শুনে শুনে আমি বাংলা ভাষার শিশু-কবিতা কণ্ঠস্থ করতাম। তা ছাড়া, 'সখা', 'সাথী', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি ছেলেদের মাসিকপত্রগুলি বাংলা শিক্ষার বিষয়ে আমাকে সাহায্য করত। আমার বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রকৃত ক্রম হচ্ছে, 'প্রথম ভাগ,' 'দ্বিতীয় ভাগ', 'কথামালা'—তারপর একেবারে সুদীর্ঘ লম্ফে 'বিষবৃক্ষ'। 'কথামালা' এবং 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যস্থল জুড়ে ছিল হিন্দী ভাষার শিক্ষা।

কলিকাতায় আসার পর ভর্তি হলাম ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে। প্রকাণ্ড স্কুল, হাজার-বারো শ ছাত্র, হেডমাস্টার সুবিখ্যাত শিক্ষা-নায়ক বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। হেডমাস্টার মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা করতাম যথেষ্ট। কিন্তু তার চতুর্গুণ ভয় করতাম শ্রীপতি হেডপণ্ডিত মহাশয়কে। সাধারণত ছেলেরা পণ্ডিত মশায়দের ভয়-ভীতি একটু কমই করে, কিন্তু শ্রীপতি পণ্ডিত মশায়ের ক্ষেত্রে

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই ছিল। দেখতে তিনি সুপুরুষ ছিলেন; দোহারা দেহ, ফুটফুটে রঙ, সুন্দর মুখশ্রী, প্রতিভাব্যঞ্জক চক্ষু। কিন্তু তিনি যখন কোন কারণে অসন্তুষ্ট হ'য়ে কোন ছাত্রের প্রতি ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বক্র কটাক্ষে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতেন, তখন সে ছাত্রের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ভয়ে হিম হ'য়ে যেত। তিনি গাল-মন্দ দিতেন না, রূঢ় কর্কশ ভাষাও প্রয়োগ করতেন না; কিন্তু মার্জিত ভদ্র ভাষায় এমন মর্মন্তুদ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে জানতেন যে, তার কাছে কিল-চড়-চাপড় অনেক নিম্নস্তরের দণ্ড ব'লে মনে হতো।

শ্রীপতি পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাসের একদিনকার একটা ঘটনা বলি। সেদিন আমাদের পাঠ্য ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় নামে আমাদের ক্লাসে কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণের একটি ছাত্র পড়ত। সর্বদা অসুখে ভুগে-ভুগেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সনৎ ছিল নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারা ধরনের ছেলে। তার শান্ত মিষ্ট প্রকৃতির জন্য তাকে আমার বড় ভালো লাগত।

বেঞ্চে ব'সে ডেস্কের উপর নেতিয়ে পড়ে নিবিষ্টচিত্তে সনৎ পড়া শুনছিল, এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীপতি পণ্ডিত মহাশয়ের তার উপর মনোযোগ আকৃষ্ট হলো।

"সনৎকুমার!"

ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সমীহ ভরে সনৎ বললে, "আজ্ঞে পণ্ডিত মশায়।"

শ্রীপতি পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন, "কিম্‌টা ধাতু, না, শব্দ?"

মুহূর্তকাল চিন্তা ক'রে সনৎ বললে, "ধাতু পণ্ডিত মশায়।"

শ্রীপতি পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন "পরস্মৈপদী, না, আত্মনেপদী?"

এখন, সংস্কৃত ব্যাকরণের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের কল্যাণে সনৎকুমারের এটুকু জানা ছিল যে, উভয় পদের মধ্যে পরস্মৈপদীটা কিছু সহজ এবং আত্মনেপদী অপেক্ষাকৃত কূট-কচালে। তাই সে মাথা একটু চুলকে বললে, "পরস্মৈপদী, পণ্ডিত মশায়।"

"রূপ কর।"

পরস্মৈপদীর সাধারণ ফর্মায় কিম্ শব্দকে নিক্ষেপ ক'রে সনৎকুমার রূপ ক'রে চলল, "কিমতি কিমতঃ কিমন্তি, কিমসি কিমথঃ কিমথ, কিমামি কিমাবঃ কিমামঃ, অকিমৎ অকিমতাম্ অকিমন্—"

হস্ত প্রসারিত ক'রে সনৎকুমারকে বাধা দিয়ে গভীর স্বরে শ্রীপতি পণ্ডিত মশায় বললেন, "থামো সনৎকুমার, থামো—তুমি যে রকম অবলীলাক্রমে রূপ ক'রে চলেছ, তাতে আমারই এখন সন্দেহ হচ্ছে কিম্‌টা ধাতু, না, শব্দ!"

অবস্থার কৌতুকপরতায় এবং তার উপর এই সরস মন্তব্যে একটা দম-ফাটা হাস্য আমাদের কণ্ঠে এসে হাজির হয়েছিল; কিন্তু শ্রীপতি পণ্ডিত মশায়ের ব্যক্তিত্বের চাপে সেই দুর্দমনীয় হাস্যকে তার উৎসক্ষেত্রে নিঃশব্দে নামিয়ে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে 'হিতবাদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত "রুচিবিকার" শীর্ষক এক কবিতা সম্পর্কে মানহানির মকদ্দমায়

বিচারে উক্ত পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নয় মাসের কারাদণ্ড হয়। বিচারে অসন্তুষ্ট হ'য়ে আমরা সাউথ সুবার্বন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিত হ'য়ে প্রতিবাদস্বরূপ একটি কবিতা ছাপাই। কবিতাটি রচিত করেন বন্ধুবর শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়। দুই ভাগে কবিতাটির মর্ম বিভক্ত। প্রথম অংশে বিচারপতির অবিচারের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ; এবং দ্বিতীয় অংশে অকারণে দণ্ডিত কাব্যবিশারদ মহাশয়ের প্রতি সুগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ভবানীপুরে বাস করতেন। 'হিতবাদী' পত্রের সুযোগ্য এবং নির্ভীক সম্পাদনার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ছাপিয়ে যুগপৎ কর্তব্যবোধ ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছি মনে ক'রে আমরা মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করছিলাম। কবিতাটি স্কুলের ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের মধ্যে বহুলভাবে বিতরিত হয়েছিল।

ইংরেজীর ক্লাস। ধীরে ধীরে ক্লাসে প্রবেশ করলেন হেডমাস্টার বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। আসন গ্রহণ ক'রে তিনি চাপকানের পকেট থেকে বার করলেন এক খণ্ড আমাদের প্রতিবাদ-কবিতা। সাগ্রহে আমরা কান পাতলাম সুখ্যাতি শোনবার প্রত্যাশায়। কিন্তু হরি হরি! আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বেণীমাধব বললেন, "এই কবিতাটি ছাপিয়ে তোমরা দুটি ভুল করেছ। প্রথমত, মকদ্দমার বিচার-অবিচার সম্বন্ধে তোমরা ছেলেমানুষেরা কী বোঝ? আমরা, তোমাদের মাস্টার মশায়রা তো কিছু বুঝি নে। সুতরাং ও-বিষয়ে তোমরা যা কিছু অভিমত প্রকাশ করেছ, তা হয়েছে অনধিকার চর্চা। তোমাদের দ্বিতীয় ভুল, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তোমরা সান্ত্বনারই বানান ভুল ক'রে বসেছ। 'ন'য়ের নিচে শুধু 'ত' দিলে সত্যিকার সান্ত্বনা দেওয়া হয় না; 'ন'য়ের নিচে 'ত' আর তার নিচে 'ব' দিলে তবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। সুতরাং তোমরা সান্ত্বনাও দিয়েছ ভুল।" আমাদের কবিতার শিরোনাম ছিল "সান্তনা।"

হেডমাস্টার মহাশয়ের মন্তব্যে আমরা লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই; কিন্তু উপকৃতও হয়েছিলাম, অন্তত আমি। আগেকার কথা বলতে পারি নে, কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সান্ত্বনা শব্দ লিখতে কখনও বানান ভুল করি নি। হাতীর কথা মনে হ'লে শুঁড়ের কথা যেমন অনিবার্যভাবে মনে আসে, সান্ত্বনার কথা মনে হ'ল ব-ফলার কথা তেমনিই মনে পড়ে।

আর একটি ইংরেজী শব্দের বানানের বিষয়েও একটি কৌতুকজনক কাহিনী আছে। আমি তখন ক্যাসুয়াল স্টুডেন্ট-রূপে রিপন কলেজে বি. এ. পড়ি। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার দুই বৎসরের বি. এ. অধ্যয়ন সাঙ্গ করা ছিল, অসুস্থতাবশত পরীক্ষায় উপস্থিত হ'তে পারি নি ব'লে অধ্যয়নের অভ্যাসটা চালু রাখবার উদ্দেশ্যে রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কলেজে আমার কর্তব্য ছিল দুটি—প্রথমত, মাসে মাসে কলেজের মাহিনা দেওয়া, এবং দ্বিতীয়ত, ইচ্ছামতো

ক্লাসের লেকচারে উপস্থিত হওয়া অথবা না হওয়া। বৎসরান্তে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে পরীক্ষা দেব, সুতরাং রিপন কলেজে অ্যাটেণ্ডেন্স রাখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রথম প্রথম নিয়মিত কলেজে যেতাম, কিন্তু যাওয়ার মূলে প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না ব'লে ক্রমশই যাওয়ার শৈথিল্য দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বেছে-বুছে পছন্দমতো, এমন কি সুযোগমতো যেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্লাস আমি পারতপক্ষে বাদ দিতাম না। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বার্কের 'অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' পড়াতেন। কিন্তু সে তো পড়ানো নয়। সে যেন অগ্নিগর্ভ ওজস্বিনী ভাষায় স্বাধীনতা অর্জনের মন্ত্রপাঠ। সুরেন্দ্রনাথের পড়ানো শুনে মনে হ'তো, এডমণ্ড বার্কের অশরীরী আত্মা যেন তাঁর দেহের মধ্যে ভর ক'রে 'অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে'র ভাষায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের দুর্বার দাবি পেশ করছে। যে সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী বক্তৃতার ভাষা, যুক্তি এবং-কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিলাতের ইংরেজগণ পিট, ফক্স প্রমুখ ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর বক্তাগণের ভাষা, যুক্তি এবং কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে বিমুগ্ধ হতেন, সেই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের উদাত্ত হ'তে অনুদাত্তের মধ্যে ওঠা-নামার অপূর্ব কর্তব্য শুনে আমাদের রক্তের মধ্যে আগুন ধ'রে যেত। তখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের অগ্নিযুগ আরম্ভ হয়েছে; আর সে অগ্নিযুগের প্রধান যজ্ঞক্ষেত্র বাংলা দেশ এবং প্রধান হোতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন সুরেন্দ্রনাথের ক্লাসে প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী 'বিগিনিং, শব্দের কথা উঠল। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "সুনিশ্চিতভাবে আমি জানি বিগিনিং শব্দের মধ্যস্থলে পাশাপাশি দুটি 'এন্' আছে, কিন্তু লেখবার সময়ে কেন বলতে পারি নে, বেরিয়ে যায় একটা 'এন্'।" এ প্রসঙ্গের পর আর কোনও দিন সুরেন্দ্রনাথের একটা 'এন্' বেরিয়েছিল কি না বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বেরোয় নি। বিগিনিং লিখতে হ'লেই সুরেন্দ্রনাথ দুটি 'এন্'-এর গল্প মনে না প'ড়ে যায় না।

সুরেন্দ্রনাথের ক্লাস ব্যতীত অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্লাসে প্রায়ই যেতাম, আর যেতাম মাঝে মাঝে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্লাসে। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান পড়াতেন। তাঁর লেখবার পেন্সিলটি উঁচু ক'রে ধ'রে ছাত্রদের বলতেন—Suppose this to be a test-tube. প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আমার পক্ষে এমন কথায় হাস্য-সংবরণ করা কঠিন ছিল; কিন্তু পড়ানোর গুণে পেন্সিল টেস্ট-টিউব হ'য়ে উঠত। তখনকার দিনে অনেক কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হতো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বাদ দিয়ে।

ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণিত পড়াতেন। গণিতশাস্ত্রে তিনি সেকালে একজন অতিশয় নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। নীরস গণিতশাস্ত্র পড়াতেন, কিন্তু মনে হতো কাব্য পড়ছি। সেই লোভে সুবিধে পেলেই, অর্থাৎ কলেজে গেলেই এবং তাঁর ক্লাস থাকলেই ক্লাসে উপস্থিত হতাম। একদিন ক্লাসে হাজির হয়েছি, নাম

ডাকা হচ্ছে। আমার নাম ডাকা হ'তেই একটু উঁচু হ'য়ে উঠে বললাম্—"প্রেসেণ্ট সার্।"

রেজিস্টার থেকে মুখ তুলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ক্ষেত্রমোহন বললেন, "কী গাঙ্গুলী মশায়! ব্যাপার কী? এদিকে আজ কোন বরাত-টরাত ছিল নাকি? অমনি দয়া ক'রে আমাদের অঞ্চলটাও সেরে যাচ্ছেন? খাতায় তো দারুণ অবস্থা। পাঁচ-ছটা ক'রে 'এ', তারপর একটা করে 'পি'। বলি এ রকম আচরণ করলে অ্যাটেণ্ডেন্স থাকবে তো?"

অনেক কষ্টে ক্যাসুয়াল স্টুডেণ্ট হয়েছিলাম। একবার সিটি কলেজে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের নিকট গিয়ে সাধাসাধি করি, তারপর হতাশ হ'য়ে রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে এসে চাপাচাপি লাগাই। পাঁচ-ছয় দিন এই রকম ব্যাপার চলছিল। হেরম্ব মৈত্র বলেন, "তুমি রেগুলার স্টুডেণ্ট হ'য়ে এক বছর প'ড়ে আমাদের কলেজ থেকে পরীক্ষা দাও, তোমাকে এখনই ভর্তি ক'রে নিচ্ছি। তা নয়, পড়বে তুমি আমাদের কলেজে, আর পরীক্ষা দেবে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, এই বা কেমন কথা? প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাস করলে তুমি কি লাটসাহেব হবে?"

তা হয়তো হব না, কিন্তু দু বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে বারো টাকা হিসাবে মাহিনা গুঁজে নাম বেরোবে ছ টাকার কলেজ থেকে—তাই বা কোন্ দেশের কথা? রিপন কলেজে গিয়ে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে ভালো মানুষ ত্রিবেদী মহাশয় ভীত হ'য়ে বলেন, "দেখ, পরীক্ষা তুমি দেবে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, আর পড়বে তুমি এখানে, এ রকম ক্যাসুয়াল স্টুডেণ্ট হবার ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটিতে আছে কি না, তা আমি ঠিক জানিনে। তার চেয়ে তুমি আমাদের কলেজে এসে প'ড়ে যেয়ো, তোমাকে ভর্তি হ'তেও হবে না, মাইনেও লাগবে না।" আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম না; বললাম, "অযথা কলেজের নিকট অর্থ-ঋণে ঋণী হওয়া তো উচিত নয়, স্যার্। তা ছাড়া, মাসে মাসে টাকা না দিলে কলেজে আসবার চাড় থাকবে না।" কিছুটা দয়াপরবশ এবং অনেকখানি অনন্যোপায় হ'য়ে ত্রিবেদী মশায় আমাকে ভর্তি ক'রে নেবার আদেশ দিলেন।

আসল কথা ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ফাঁস ক'রে দিয়ে অত কষ্টে অর্জিত ক্যাসুয়েল স্টুডেণ্টশিপ-কে বিপন্ন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা উচিত হবে না মনে ক'রে তাঁর মন্তব্যের বিষয়ে কোনও উত্তর দিলাম না। কী জানি, যদি তাঁর খাতা থেকে আমার নাম খারিজ ক'রে দেবার জন্যে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের কাছে কোন প্রস্তাব ক'রে বসেন। একটু চতুকে হাসি হেসে শুধু নিঃশব্দে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম, অ্যাটেণ্ডেন্স না থাকে তো রম্ভা!

ছয়

পূজার ছুটিতে আমরা সপরিবারে কলিকাতা থেকে ভাগলপুরে এসেছি। দুর্গাপূজা সবেমাত্র হ'য়ে গেছে। প্রথম কার্তিকের লতায়-পাতায় দূর্বাঘাসে নূতন হেমন্তের শিশিরকণা প্রভাত-সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক করতে আরম্ভ করেছে।

বিহার প্রদেশে শীতকালেই ঘুড়ি ওড়াবার ধুম। অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রভাস ও আমি যখন পারি তখনই ঘুড়ি ওড়াই—প্রধানত গঙ্গার তীরে, কখনও কখনও বা দোতলার ছাতে। প্রভাস আমার ভাগীনেয়, অর্থাৎ স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মধ্যম সহোদর। প্রভাস ও আমি প্রায় সমবয়সী; আমিই এক-আধ বৎসরের বড়।

ঘুড়ি ওড়ানোর বিষয়ে প্রভাস ও আমার মধ্যে পরিপূর্ণ মিত্রতা বিদ্যমান। পরস্পরের প্রতি আমরা কখনও আক্রমণশীল হই নে। একান্তই যদি প্যাঁচ লড়তে হয় তো লড়ি অপর কোন পক্ষের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা অতর্কিতে এক গোঁত্তা মেরে প্রভাস আমার ঘুড়ি কেটে দিলে। ঘুড়িখানা হায় হায় ক'রে এপাশ ওপাশ কাত হ'য়ে উড়তে উড়তে গঙ্গাবক্ষে প'ড়ে ঘুড়ি-জন্ম থেকে মুক্তি-লাভ করলে।

বিনা প্ররোচনায় এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্যে অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে তীব্র প্রতিবাদ করলাম, "তুই আমার ঘুড়ি কাটলি কেন?"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রভাস বললে, "কাটলাম নাকি?"

"কাটলি নে তো ঘুড়ি জলে গিয়ে পড়ল কেমন ক'রে?"

মনে হ'ল প্রভাসের মুখে অতি ক্ষীণ এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল। সে বললে, "তাই যদি দেখতে পাব উপীনমামা, তা হলে কি তোমার ঘুড়ি কাটি?"

"দেখতে যদি না পাস, তা হ'লে তোর ঘুড়ি অমন গুছিয়ে গোটাচ্ছিস কেমন ক'রে?"

"ও একদম আন্দাজে।"

এ কথার উপর আর কথা নেই, লাটাইয়ে কাটা সুতো গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম। পথ চলতে চলতে প্রভাস কতকটা আপন মনেই বলতে লাগল, 'চোখ অনেক দিনই খারাপ হয়েছে, এতদিন বলি নি, আর কিন্তু না বললেই নয়। চশমা না নিলে চোখ নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

এর পর প্রভাস চশমার জন্য অনেকের নিকটই দরবার করতে লাগল; কিন্তু কেউ বড় গা গোছ করে না। হতাশ হ'য়ে হ'য়ে অবশেষে সে অহিংস উপায় পরিত্যাগ ক'রে হিংস্র উপায়ের শরণাপন্ন হ'লো। কেউ হয়তো সামান্য একটু ঝাপসা আলোয় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে চলেছে, হঠাৎ প্রভাস শক্ত মাথা নিয়ে একেবারে তার নাকের উপর গিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে নাক চেপে ধ'রে

'গেছি গেছি' ব'লে সে বেচারা চিৎকার করে উঠল। অম্লান মুখে প্রভাস বললে, "তা কী করব, আমি কী চোখে দেখতে পাই ?"

চাকররা হয়তো তিন ঘড়া গঙ্গাজল ভ'রে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে, এমন কায়দা ক'রে প্রভাস চ'লে গেল যে, তার মধ্যে দুটো ঘড়া উল্টে প'ড়ে ভক্ ভক্ ক'রে জলোদ্গিরণ করতে লাগল। ব্যস্ত হ'য়ে চাকররা হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। প্রভাস বললে, "চোখে দেখতে পাই নে, অমন জায়গায় ঘড়া রাখলে পড়বে না ?" অথচ জলের ঘড়া রাখবার অমন উপযুক্ত স্থান বাড়ির মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না।

এই ধরণের উৎপাত দিনের পর দিন বেড়েই চলল। অবশেষে একদিন পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে ডেকে বললেন, "ভুবন বলছিল, প্রভাসের চোখ ভারি খারাপ হয়েছে, ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবুকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমার ব্যবস্থা কর।"

ভুবন, অর্থাৎ ভুবনমোহিনী প্রভাসের মাতা, আমাদের মেজদিদি ; আর নিমাইচরণ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার, সরকারী হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন, পিতাঠাকুর মহাশয়দের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রভাসের পিতা মতিদাদা তো সন্ন্যাসী-বৈরাগী মানুষ ; সংসারে থাকেন, কিন্তু এমন নির্লিপ্তভাবে যে, তাঁর হিসেব থেকে সবাই নিজেদের বাদ দিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনের তিনি কেউ নন, কিন্তু অপ্রয়োজনের এমন বন্ধু আর দুটি নেই। দুটো পাটকাঠি, কিছু লাল-সবুজ-সাদা কাগজ, খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে যদি কেউ বললে, "মতিদা, একটা খেলনা ক'রে দিন।" তৎক্ষণাৎ মতিদাদা তৎপর হলেন। খানিকটা আঠা করিয়ে নিয়ে কিছু সুতা যোগাড় ক'রে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এমন এক সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি করলেন, যা আজকালকার দিনে মনিহারী দোকানের শো-কেসে রাখলে তিন টাকা মূল্যের টিকিট লাগানো চলে। অপূর্ব প্রতিভা, কিন্তু সে প্রতিভা সঞ্চিত হবার আধার খুঁজে না পেয়ে অপচয়িত হ'য়ে গিয়েছিল।

মতিদাদাকে দিয়ে জাহাজ তৈরি করানো সহজ, কিন্তু প্রভাসকে সঙ্গে দিয়ে হাসপাতালে পাঠানো সহজ নয়। ওদিকে কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদমপুর ক্লাবের থিয়েটারের মহলা নিয়ে শরৎচন্দ্র এমন মেতেছেন যে, স্নানাহারের সময় নেই। অগত্যা প্রভাসকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ভার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার উপরই দিলেন।

প্রভাসকে বললাম, "আজ দেরি হ'য়ে গেছে, কাল তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাব প্রভাস।"

শুভস্য শীঘ্রং নীতি স্মরণ ক'রে প্রভাস বললে, "কাল আবার কেন ?—আজই চল। কিছু দেরি হয় নি।"

"তবে চল।"

দুজনে গুটি গুটি হাসপাতালের পথে অগ্রসর হলাম। দুই চক্ষুর আসন্ন অলঙ্করণের চিত্র মানস মুকুরে দর্শন ক'রে মনে হলো, প্রভাস বেশ সপুলক চিত্তে চলেছে। আমিও যে প্রভাসের আগতপ্রায় সৌভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হই নি, তা বলতে পারি নে।

হাসপাতালে পৌঁছলাম।

আমাদের দুজনকে দেখে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে ?"

বললাম, "প্রভাসের চোখ খারাপ হয়েছে ; বাবা আপনাকে দিয়ে দেখাতে পাঠিয়েছেন।"

প্রভাসের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নিমাইবাবু বললেন, "চোখ আবার কবে খারাপ হলো ? আচ্ছা, ঐ বেঞ্চে বস্, একটু পরে দেখছি।"

দুজনে পাশাপাশি বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

বেশি বিলম্ব হলো না, অল্পক্ষণ পরেই নিমাইবাবু আমাদের দুজনকে চক্ষু-পরীক্ষার ঘরে নিয়ে গেলেন। একটা দেওয়ালে বৃহৎ আকারের চার-পাঁচখানা বোর্ড টাঙানো ; কোনটাতে ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষর এলোমেলোভাবে মুদ্রিত, কোনটাতে হিন্দী বর্ণমালার, কোনটাতে বাংলা বর্ণমালার, কোনটাতে উর্দুর, কোনটাতে বা আর কোনরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন। প্রত্যেক বোর্ডেই অক্ষরগুলি কয়েক শ্রেণীতে বৃহত্তম হ'তে ক্ষুদ্রতম আকারে মুদ্রিত।

লম্বা এক লাঠির সাহায্যে ইংরেজী বোর্ডের চতুর্থ লাইনের একটা অক্ষর দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কোন্ অক্ষর বল্ ?"

ধরা যাক, সে অক্ষরটা 'P', কিন্তু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে প্রভাস বললে, "S"।

তৃতীয় লাইনের গোটা তিনেক অক্ষর নিয়ে নিমাইবাবু পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ফল একই হলো, কোনটাই প্রভাস বলতে পারল না। তখন দ্বিতীয় লাইন টপ্‌কে নিমাইবাবু একেবারে প্রথম লাইনে গিয়ে পড়লেন। প্রথম অক্ষর একটা বৃহৎ সাইজের E ; সেটার উপর লাঠি ফেলে বললেন, "বল্ এটা কোন্ অক্ষর ?"

আমি আশা করেছিলাম, এবার প্রভাস বলতে পারবে ; কারণ অক্ষরটা এমনই প্রকাণ্ড বড় যে, একমাত্র অন্ধ ভিন্ন আর-সকলেরই বলবার কথা। প্রভাস কিন্তু দেখে দেখে ব'লে বসল, "O"।

নিমাইবাবু বললেন, "ঠিক। বারান্দায় চল্।"

আমি ভাবলাম, না। প্রভাসটা নির্ঘাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চশমা তার কে মারে।

কম্পাউণ্ডের কাছেই একটা কালো রঙের গরু চরছিল, যে রকম হৃষ্টপুষ্ট দেহ, বোধ করি নিমাইবাবুরই হবে। বারান্দায় এসে গরুটাকে দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলে "ওটা কী চরছে বল্ ?"

ভাবলাম, এটা তো প্রভাস বলবেই, কিন্তু তাতে ওর কোন ক্ষতি হবে না; যে রকম বৃহৎ সাইজের E-কে O ব'লে এসেছে, চশমা ওর অনিবার্য।

প্রভাস হয়তো আমার চেয়েও সতর্কপ্রকৃতির মানুষ; গরুটাকে দেখে বললে, "ঘোড়া।"

যাঁহাতক্ বলা ঘোড়া, এক বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়ের শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহগর্জন, "বল্, কী ওটা ?"

অতর্কিত চড়ের জন্য দুজনের মধ্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। ইঞ্চি ছয়েক নিচু হ'য়ে গিয়ে আর্তকণ্ঠে প্রভাস ব'লে উঠল, "গরু, গরু, গরু।" তিনবার গরু শব্দ উচ্চারিত করবার উদ্দেশ্য বোধ হয় পাছে স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে নিমাইবাবু আবার একটা চড় বসান।

এদিকে, আমি তো আর আমাতে নেই। চড়ের শব্দ শোনামাত্র তিন হাত পেছিয়ে দাঁড়িয়েছি। কী জানি, এডিং ও অ্যাবেটিং-এর অভিযোগে যদি আমার উপরও একটা চড় পড়ে।

চক্ষু-পরীক্ষার ঘরে প্রভাসকে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবু পুনরায় প্রভাসের চক্ষু পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। চড়ের কল্যাণে প্রভাস দিব্য-দৃষ্টি লাভ করেছিল; ছোট, বড়, মাঝারি—সব অক্ষরই সে যথাযথভাবে ব'লে গেল। আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিমাইবাবু বললেন, "বাড়ি যা তোরা। মহেন্দ্রবাবুকে বলিস, ওর চোখ বেশ ভালো আছে।"

আবার আমরা গুটি গুটি বাড়ির পথে পা চালালাম। ঘটনার শোচনীয়তা আমাদের দুজনকে নির্বাক ক'রে দিয়েছিল। খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর প্রভাসকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "সামনেই ছট্ পরব আসছে প্রভাস। ছটের মেলায় চার আনা দিয়ে একটা সাদা কাচের চশমা কিনে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পরিস। দামটা না হয় আমিই দোব।"

প্রভাস আমাকে ভুল বুঝলে, মনে করলে আমি তাকে উপহাস করছি। কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু আমার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টির অর্থ—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না।

সে যাই হোক, সেদিন থেকে আমাদের বাড়ির লোকজনের নাক আর চাকরদের গঙ্গাজল-ভরা ঘড়া আবার নিরাপদ হলো।

সাত

প্রভাসকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই জ্বরে পড়লাম, সামান্য গা-গরম, আততায়ীর পদক্ষেপ অত্যন্ত মৃদু—আছে কি নেই, সব সময়ে ধরাই যায় না।

এ পূর্ণিয়ার অকুলীন ম্যালেরিয়া জ্বর নয়, যা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে ঘণ্টা-

দেড়েকের মধ্যে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রিতে পৌঁছে দেয়। আমরা তো গোলা লোক, আমাদের কথা স্বতন্ত্র, জ্বরের ধীর-মন্থর বনেদী চাল দেখে বহুদর্শী চিকিৎসক নিমাইবাবুই ধরতে পারেন নি যে, যিনি আমার দেহে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি রাজচক্রবর্তী সান্নিপাতিক বিকার; ইংরেজী চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এণ্টারিক অথবা টায়ফয়েড ফিভার।

উপসর্গ কিছুই নেই; তরল পথ্যের উপর আছি; শুয়ে ব'সে কাটাই; অল্প-স্বল্প পড়ি; গল্প-টল্পও করি। এদিকে জ্বরের গতি ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে উর্ধ্বদিকে এগিয়ে চলেছে—মুখের দিকেও, লেজের দিকেও। অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম টেম্পারেচার—দুই-ই। কিন্তু এমন একটু বিশেষ কায়দায় যে, মুখ এবং লেজের দূরত্ব ক্রমশ অল্প হ'য়ে আসছে।

এ লক্ষণটা তেমন ভালো নয়। জ্বর যদি ডিগ্রী সাড়ে তিন-চারের মধ্যে ওঠা-নামা করে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে নমনীয়, সুতরাং তার প্রকৃতি কতকটা সরল। কিন্তু সে যদি লেজ ও মুখ সঙ্কুচিত ক'রে ডিগ্রী দেড়-দুয়েকের মধ্যে ঠাঁই নেয়, তা হ'লে বুঝতে হবে সে বিষধর সর্পে পরিণত হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে দংশন ক'রে প্রাণবিয়োগ ঘটাতে পারে।

সে যাই হোক, আমাকে নিয়ে তেমন উদ্বেগের কারণ ছিল না। নিমাইবাবু অন্তত আমাদের আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে, সরল রেমিটেণ্ট জ্বর, যে কোন সপ্তাহের মাথায় ছেড়ে যাবে। উদ্বেগ কিন্তু প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠছিল মেজদিদিকে নিয়ে। গত পাঁচ-ছয় মাস ধ'রে তিনি নানা প্রকার জটিল ব্যাধিতে ভুগছিলেন; রোগশয্যা থেকে সংবাদ পাচ্ছিলাম, তাঁর অসুখটা হঠাৎ অনিবার্যগতিতে বাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। শরৎ প্রায়ই আমাকে দেখতে আসত আর মাঝে মাঝে বলত, "উপীন, মা বোধ হয় এবার আর বাঁচবে না।" শুনে মনের মধ্যে ভারি কষ্ট পেতাম। সরল ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য মেজদিদিকে আমরা ভারি ভালোবাসতাম।

এদিকে আমার জ্বর আপাত-সরল গতিতে দিনের পর দিন অতিক্রম ক'রে তিন সপ্তাহের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বৈকালে নিমাইবাবু আমাকে দেখতে এসেছেন। বহুক্ষণ ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে মনে হ'লো তাঁর মুখটা যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠল। ভাবলাম, তিন সপ্তাহের শেষে জ্বরটা ছেড়ে না গিয়ে আরও এক-আধ সপ্তাহ নেবে, হয়তো সেই কথা ভেবে নিমাইবাবু একটু বিষণ্ণ হয়েছেন। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য তিনি পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত নিচে নেমে গেলেন।

মার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "মা, মশারিটা তুলে দাও তো।"

আমার কথা শুনে মার মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছায়া দেখা দিলে; দাদাকে সম্বোধন ক'রে তিনি ভয়ার্তকণ্ঠে বললেন, "লালমোহন, উপীন ভুল বকছে; শীগগির নিমাইবাবু ডেকে আন।"

দাদা তাড়াতাড়ি নিচে চ'লে গেলেন। আমি দেখলাম, ভুলই বলেছি বটে,

মশারি তোলাই আছে। মাতাঠাকুরাণীর অতি-ভয়ার্ততায় ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বললাম, "আচ্ছা, কুড়ি-একুশ দিন জ্বরে ভুগছি, একটু যদি ভুলই হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বলতে হবে—ভুল বকছে ?"

শুনেছিলাম মিনিট চার-পাঁচেকের মধ্যে বাবা ও নিমাইবাবু আমার পার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে আমি বিকারের চরম স্তরে উপনীত হ'য়ে উন্মত্তভাবে চিৎকার করছি, 'চামার! চামার!' কার প্রতি এই সৌজন্য প্রকাশ করেছিলাম, সেটা কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ পায় নি।

অতঃপর দিন কুড়ি-বাইশ চলল একেবারে মহা-নিমগ্নতার পালা। চন্দ্র-সূর্য যার উঠেছে, তার উঠেছে, আমার ওঠে নি; দিবা-রাত্রি যার হয়েছে, তার হয়েছে; আমার হয় নি। জ্ঞান-জগতে যখন প্রথম প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন বুদ্ধি স্তিমিত, অনুভূতি আচ্ছন্ন, স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায় এবং দৈহিক শক্তির পরিপূর্ণ বিরতি। নবজাত শিশুর অপরিণত চৈতন্য যেরূপ হয় আমারও তখন কতকটা সেইরূপ অবস্থা।

শুনেছিলাম, ঐ ন দিন ন রাত, 'ন চন্দ্র ন সূর্য দিনগুলিতে আমার উপর দিয়ে টাইফয়েডের টাইফুন-ঝটিকা প্রবাহিত হয়েছিল। ডবল-নিউমোনিয়া থেকে আরম্ভ ক'রে কোমা, ডিলিরিয়াম, বেড-সোর—কিছুই বাদ পড়ে নি। অসুখ বাড়াবাড়ি হ'তেই ভাগলপুরের অপর একজন বড় ডাক্তার, টাইফয়েড-স্পেশ্যালিস্ট, শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিমাইবাবুর সহিত চিকিৎসায় যোগ দিয়েছিলেন। শুনেছি, একদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে আমার অবস্থার চরম অবনতিকালে, ভাইনাম গ্যালিসিয়া, মৃগনাভি ও মকরধ্বজের সর্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ ক'রেও চিকিৎসকদ্বয় যখন আমার দ্রুত-অপচীয়মান জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন মাতাঠাকুরানী সব কিছু লৌকিক উপায়ের অন্ত হয়েছে আশঙ্কা ক'রে পাগলিনীর ন্যায় পদব্রজে ছুটেছিলেন এক মাইল দূরস্থিত বুঢ়ানাথ মহাদেবের মন্দিরে। বাধ্য হ'য়ে তাঁর সঙ্গে বাড়ির আরও তিন-চারজন স্ত্রী-পুরুষকে ছুটতে হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি থেকে লোক গিয়ে যখন সংবাদ দিল, আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তখন মা উপুড় হ'য়ে বুঢ়ানাথের সামনে প'ড়ে, কপালে রক্তের চিহ্ন। সাষ্টাঙ্গে বুঢ়ানাথকে প্রণাম ক'রে ফুল-বিল্বপত্র নিয়ে মা যখন গৃহে ফিরলেন, তখন আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া পুনরায় বোঝা যেতে আরম্ভ হয়েছে।

নিমাইবাবু বলেছিলেন, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র দুটি টাইফয়েড রোগীকে এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা থেকে সেরে উঠতে দেখেছিলেন—আমাকে এবং একটি সতের বৎসর বয়সের মুসলমান বালককে।

পথ্যের পরিমাণ এবং প্রকারের ক্রমোন্নতির সহিত হারানো শক্তিগুলি পুনরায় ফিরে পেতে লাগলাম। মেজদিদির কথা মনে পড়তে আরম্ভ করেছে; কিন্তু কেউ আমাকে তাঁর কথা বলে না ব'লে আমিও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাই নি —কী জানি, কী কথা শুনতে হয়! মনটা তাঁর জন্য উৎসুক ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকে।

সহসা দৈব একদিন আমার সংশয়ের নিরসন ক'রে দিলে। জ্বর ত্যাগ হয়েছে প্রায় দিন কুড়িক, তখনও কিন্তু আমি সম্পূর্ণ উত্থাপন-শক্তি-রহিত। বৈকালের দিকে জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে আছি, হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করলে শরৎ। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই জিভ কেটে পালিয়ে গেল। মাথা তার ন্যাড়া। শরৎ হয়তো ভেবেছিল, আমি হয় ঘুমিয়ে, নয় পাশ ফিরে শুয়ে আছি।

শরতের ন্যাড়া মাথার অর্থ বুঝতে বিলম্ব হলো না। আঘাত পেলাম, কিন্তু দুর্বল চিত্তে আঘাতের চোটও বোধ হয় তেমন সবল হ'তে পারে না। সন্নিপাতিকের মহাসাগরতলে আমি যখন নিমগ্ন, সেই সময়ে মেজদিদি পরলোকগমন করেছেন।

দিন দুয়েক পরে মাকে বললাম, "মা, প্রভাসকে ডেকে দাও—একটু গল্প করব।"

মা বললেন, "তোমার ছোঁয়াচে অসুখ হয়েছিল ; আর দিনকতক যাক, তারপর প্রভাস আসবে।"

আমি বললাম, "আসছ তো ঘরে সবাই, এক শরৎ আর প্রভাস ছাড়া। আমি জানতে পেরেছি, মেজদিদি মারা গেছেন।"

বিস্মিতকণ্ঠে মা বললেন, "কে তোমাকে বললে ?"

বললাম, "কেউ বলে নি, ন্যাড়া মাথা নিয়ে শরৎ পরশু ঘরে ঢুকে পড়েছিল।"

দুঃখের মধ্যেও মা'র মুখে মৃদু হাস্যের আমেজ দেখা দিল ; বোধ হয় মনে মনে ভাবলেন, ধর্মের কল বাতাসে এমনই ক'রেই নড়ে। প্রকাশ্যে বললেন, "তোমার মনে কষ্ট হবে ব'লে ও আসত না। আচ্ছা, প্রভাসকে ডেকে দোব।"

শরতের কনিষ্ঠ ভাই প্রকাশের না-আসা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি নি—বয়সে আমি তার নাগালের অনেক বাইরে।

ক্ষণকাল পরে প্রভাস এসে হাজির হলো। আমার খাটের পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে ব'সে আমার একটা হাত ধ'রে হাসিমুখে বললে, "কেমন আছো, উপীনমামা ? ভালো আছো ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললাম, "হ্যারে প্রভাস, মেজদিদি চ'লে গেলেন ? কিছুতেই রইলেন না ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে প্রভাস বললেন, "নাঃ ! কিছুতেই না।"

"কবে মারা গেলেন ?'

"দিন কুড়ি-বাইশ হবে।"

বললাম, "তুই আমার কাছে আসতিস নে কেন বল্ দেখি ? বিকারের ঝোঁকে 'প্রভাস আমার লাটাই নিয়ে গেল ! প্রভাস আমার লাটাই নিয়ে গেল !' ব'লে চেঁচাতাম, তাই রাগ করেছিলি ?"

ভুরু কুঁচকে প্রভাস বললে, "দূর ! তাই কখনও কেউ করে ? বোমা মামা (আমার দাদা) কাঁচি দিয়ে তোমার চুল ছেঁটে দিচ্ছিলেন, তুমি যে তাঁকে নাপিত মনে ক'রে ঠাস ক'রে তাঁর গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিলে, তাইতে কি তিনি

তোমার উপর রাগ ক'রেছিলেন? বিকারের রুগী আর পাগল তো একই ধরণের মানুষ।"

কিছুক্ষণ গল্প ক'রে প্রভাস চ'লে গেল।

বৈকালের দিকে শরৎ এসে হাজির হলো। হাসতে হাসতে বললে, "আমার ন্যাড়া মাথা দেখে তুই ভেবে নিলি কেন উপীন, মা মারা গেছেন? আমার নামই তো ন্যাড়া।"

আমি বললাম, "তোমার নাম ন্যাড়া হ'তে পারে, কিন্তু মাথায় তো তোমার বড় বড় চুল ছিল।"

মেজদিদির মৃত্যুতে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে শরৎ বললে, "মা মারা গেছেন, সে একরকম ভালোই হয়েছে, উপীন।"

বিস্মিত ও আহত হ'য়ে বললাম, "কেন?"

শরৎ বললে, "এক বাড়িতে দুজন রুগীর অবস্থা অত বাড়াবাড়ি হ'লে একজন মারা না গেলে, আর একজন ভালো হয় না। তুই ছেলেমানুষ, তুই ভালো হ'য়ে উঠেছিস, এ কত আনন্দের কথা।"

এ কথার মধ্যে আমার প্রতি শরতের মমতা প্রকাশ পেলেও কথাটা আমার তেমন ভালো লাগল না। প্রতিবাদ স্বরূপ বললাম, "কিন্তু দুজনে ভালো হ'য়ে উঠলে আরও কত ভালো হতো!"

শরৎ বললে, "তা তো হতোই, কিন্তু অত ভালো সব সময় হয় না।"

আমার সহিত বেশি কথা কওয়া তখনও বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল, অল্পক্ষণ পরেই শরৎ চলে গেল।

উপেন্দ্রনাথ রচনা সমগ্র প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

উপেন্দ্রনাথ রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সম্পাদকীয়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'সন্ধ্যা' নামে একটি পদ্য—এটি তাঁর বারো বছর বয়সে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'সখা ও সাথী' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর পরিবেশ ও পরিবারের প্রভাবে এবং আপন অন্তর্গূঢ় প্রবণতায় তিনি বাংলা সাহিত্যের সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ রাজপথে অগ্রসর হ'তে থাকেন। কী ভাবে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ও বিকাশ হয় সেকথা তিনি 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থটিতে আপন মনোহারী ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'সপ্তক' ১৩১৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে এবং প্রথম উপন্যাস 'শশিনাথ' ১৩২৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপরে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'লো ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৩৩৪-এর আষাঢ় মাসে 'বিচিত্রা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় এবং সেসঙ্গে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যে এক নতুন গৌরবময় যুগের।

বিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যের সার্বভৌম সম্রাট রবীন্দ্রনাথ আর এই শতাব্দীর প্রথম চার দশকে যদিও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরীর মতো আলোকসামান্য প্রতিভার প্রায় একযোগে আবির্ভাব হয়, তবু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই পর্বটি অবিসংবাদিত রূপে রবীন্দ্রনাথেরই একাধিপত্যের পর্ব। শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমার এই পর্বে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন বটে এবং প্রমথ চৌধুরী ছিলেন শিক্ষিত মননশীল বিদগ্ধ ও বিশ্বতোমুখী সারস্বত সমাজের আদর্শ সাহিত্যিক, তবু এঁদের কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পরেও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলতে পারি, Others abide our question—Thou art free.

আবার এই রবীন্দ্রপর্বেই একজন অন্তত সম্পূর্ণ স্বকীয় পন্থায় প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেছিলেন এবং প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে বৈষয়িক সাফল্যের মাপকাঠিতেও অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—তিনি শরৎচন্দ্র। অবশ্য তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পড়েই তিনি আত্ম-প্রকাশের প্রথম আশ্বাস লাভ করেছিলেন, কিন্তু কোনও দুর্বোধ্য কারণে দুজনের মধ্যে শুধু ব্যক্তিত্বের বৈষম্য নয়, সামাজিক সম্পর্কের কিঞ্চিৎ জটিলতাও ছিল। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে-দুটি পত্রিকাতে সাধারণত লিখতেন সেই 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রের' পৃষ্ঠাতে শরৎচন্দ্র অনুপস্থিত থেকে গেছেন বরাবর আর শরৎচন্দ্র যে-পত্রিকাতে সাধারণত লিখতেন সেই 'ভারতবর্ষে' রবীন্দ্রনাথের স্থান হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দুজনেই সসম্মানে একটি পত্রিকার মঞ্চে সমবেত হয়েছিলেন এবং সেই পত্রিকাটি হলো 'বিচিত্রা'—দুজনের এই ঐতিহাসিক মিলনের পুরোহিত ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই পৌরোহিত্যের অধিকার তিনি বংশ-বা-

জন্মগত সূত্রে লাভ করেননি, এই অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণরূপেই আপন অনন্য ব্যক্তিত্বের সূত্রে। শুধু এর থেকেই উপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি ভবিষ্যতের আশুচেতন পাঠক-সমাজের অনুধাবন করা উচিত।

প্রবীণ বা প্রখ্যাতদের মধ্যে মিলনের পৌরোহিত্য করেই উপেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নতুন প্রতিভা আবিষ্কারেও। অন্নদাশঙ্কর রায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা তো 'বিচিত্রা'তেই প্রকাশিত হয়; অন্নদাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনা 'পথে প্রবাসে' উপেন্দ্রনাথের ফরমাশেই লেখা আর সেই লেখা পড়ে প্রমথ চৌধুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার ভূমিকা লিখে দেন এবং অন্নদাশঙ্করকে বলেন, "এখন থেকে তুমি লিখবে, আমরা পড়ব।" তাঁছাড়া সেদিনের অখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মানের সঙ্গে স্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন 'বিচিত্রা'র সম্পাদক এবং সেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কালেই 'পথের পাঁচালী' রাতারাতি দিগ্বিজয় করেছিল।

আচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থটিতে উপেন্দ্রনাথ ও 'বিচিত্রা' সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি—"কল্লোলের শেষ বছরে 'বিচিত্রা'য় চাকরি নিলাম। আসলে প্রুফ্ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। বহুবিশ্রুত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিচিত্রা'র সম্পাদক। তাঁর ভাগ্নে আদি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে আমার সহপাঠী ছিল। সে-ই একদিন বললে, চাকরি করব কিনা। চাকরিটা অপ্রীতিকর, মাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। তারপর 'বিচিত্রা'র মত উঁচকপালে পত্রিকা—যার শুনেছি, বিজ্ঞাপনের পোস্টার শহরের দেয়ালে ঠিক-ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই ট্যাক্সি-ভাড়া লেগেছিল একটা স্ফীতকায় অঙ্ক। কিন্তু আমরা নিন্দিত অতি আধুনিকের দলে, অভিজাত মহলে পাত্তা পাব কিনা কে জানে। সাহিত্যের পূর্বগত সংস্কার-মানা কেউ আছে হয়তো উমেদার। সে-ই কামনীয় সন্দেহ কি। কিন্তু উপেনবাবু অবাক্যব্যয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন। দেখলাম গণ্ডূষজলে সফরীরাই ফরফর করে, সত্যিকারের যে সাহিত্যিক সে গভীরসঞ্চারী।......প্রথম আলাপেই বুঝলাম, 'বিচিত্রা'র ললাট যতই উচ্চ হোক না কেন, উপেনবাবুর হৃদয় তার চেয়ে অনেক বেশি উদার। আর, সাহিত্যে যিনি উদার তিনিই তো সবিশেষ আধুনিক। কাগজের ললাটে-মলাটে যতই সম্ভ্রান্ততার তিলক ছাপা থাক না কেন, অন্তরে সত্যিকারের রসসম্পদ কিছু থাক, তাই উপেনবাবুর লক্ষ্য ছিল। সেই কারণে তিনি কুলীনে-অকুলীনে প্রবীণে-নবীনে ভেদ রাখেননি, আধুনিক সাহিত্যিকদেরও সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বয়সের প্রাবীণ্য তাঁর হৃদয়ের নবীনতাকে শুষ্ক করতে পারেনি। আর যেখানেই নবীনতা সেখানেই সৃষ্টির ঐশ্বর্য। আর যেখানেই প্রীতি সেখানেই রসস্বরূপ।"

তাহলে স্পষ্ট রূপেই দেখা যাচ্ছে যে উপেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন-ধর্মা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক বিস্ময়কর ও বিরল যোগসূত্র ছিলেন—তিনি যেন এক বিশাল মোহানা যা একই সঙ্গে সাগর নদনদী খালনালা সব কিছুকেই একই সত্যে যুক্ত করে রেখেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব আর নেই।

উপেন্দ্রনাথের সাহিত্য পাঠের সময় একথাটা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই যুগসন্ধির সাহিত্যিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পর্বটিকে সাধারণভাবে রবীন্দ্র-পর্ব বলে অভিহিত করলেও এই পর্বটি প্রকৃত-পক্ষে খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো যুগ আর একাধিক সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত গোষ্ঠী-তন্ত্রের কাল—রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্বের সীমানার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের যুগ, 'সবুজপত্রে'র যুগ, 'কল্লোল-কালিকলমে'র যুগ, 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠী, 'পরিচয়ে'র গোষ্ঠী, তৎকালীন আধুনিক গোষ্ঠী, পাশ্চাত্য তথা নরওয়েজিয়ন আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যিক সম্প্রদায়, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সম্প্রদায়, একান্ত ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিকগণ, সাম্যবাদী সম্প্রদায়, রসবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রভৃতির যে-উদ্ভব-ও-বিস্তার হয়েছিল তার তুলনা পাওয়া ভার। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বৈচিত্র্য এত বৈশিষ্ট্য এত ঐশ্বর্য এত নানামুখী বিকাশ পৃথিবীর আর কোন্ ভাষায় হয়েছে?

এই যে বহু ধারা ও ঐতিহ্যের, বহু আদর্শ ও মতবাদের, বহু সম্প্রদায়ের ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ—এই সংমিশ্রণের প্রধানতম প্রতিনিধি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটিতে অতি আধুনিক উপন্যাস শীর্ষক পরিচ্ছেদের অব্যবহিত আগেই যে উপেন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন এটা কাকতালীয় হলেও এই স্থান-নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তাঁর উপন্যাসে যেমন ঐতিহ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের বহু উত্তরাধিকার বর্তেছে তেমনই অতি আধুনিক উপন্যাসের বহু বৈশিষ্ট্য পূর্বাভাসিত হয়েছে। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের মতো সাহিত্যিক যে-দৃষ্টিতে উপেন্দ্রনাথকে দেখেছেন ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমালোচক সেই দৃষ্টিতে দেখতে পারেন কিনা সেটা স্বতন্ত্র ভাবে বিচারের বিষয়। অবশ্য 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তে উপেন্দ্রনাথের 'শশিনাথ' 'রাজপথ', 'অমূলতরু', 'অমলা', 'অন্তরাগ' ও 'দিকশূল' মাত্র এই ছটি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে। আলোচিত ছ'টি উপন্যাসের ভিত্তিতে প্রবীণ সমালোচক মশায় মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট কলাসংযম ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মন্তব্য-বিশ্লেষণে গভীরার্থক চিন্তাশীলতা ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ক্ষমতা যুগপৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার স্থির, সংযত বুদ্ধি-বৃত্তি সুলভ উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতার দ্বারা সহজে বিচলিত হয় না। কথোপকথনের ধারার মধ্যে সহজ ভদ্রতা, সাবলীল উত্তর-

প্রত্যুত্তর-নিপুণতা ও লঘু সরসতা প্রভৃতি গুণ সুপরিস্ফুট—তবে মার্জিত বুদ্ধি ও রুচির প্রাধান্যের জন্য ভাবগভীরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার সমস্ত উপন্যাসেই এই ভাবগভীরতার অভাব ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান দিয়াছে—emotional crisis বা গভীর ভাবমূলক চরম পরিণতি বিশেষ কোথাও দৃষ্টি-গোচর হয় না।" অবশ্য এই বিচারের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা কঠিন। মর্ম উদ্ধার করতে গেলে স্বভাবতই কতকগুলি প্রশ্ন জাগে।

প্রশ্নগুলো এই রকম: (১) যাঁর মন্তব্য-বিশ্লেষণে গভীরার্থক চিন্তাশীলতার অভিব্যক্তি দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে ভাবগভীরতার অভাব আছে বললে কি ধাঁধা লাগে না?; (২) সুলভ উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা দিয়ে কারও স্থির, সংযত বুদ্ধি-বৃত্তি সহজে বিচলিত না হলে কি তাঁর উপন্যাস নিম্নস্থানীয় হয়?; (৩) মার্জিত বুদ্ধি ও রুচির প্রাধান্যের জন্য কি উপন্যাসের ভাবগভীরতা ক্ষুণ্ণ হয়? শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত বাক্যগুলোকে তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে তাঁর মন্তব্যে যুক্তির পারম্পর্য অথবা অনিবার্যতার অভাব আছে অর্থাৎ তাঁর বিশ্লেষণ ও বিচার পরস্পর-বিরোধী।

এইবার দেখা যাক ডক্টর শ্রীভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে কী লিখেছেন। তিনি আলোচনা শুরু করেছেন 'শরৎ গোষ্ঠীর গল্প-শিল্পী" শিরোনামে; আর উপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রথম দুটি বাক্য হলো: "শরৎ গোষ্ঠীর লেখকদের প্রসঙ্গ কিছুতেই শেষ হয় না, আর একজনের কথা না বললে—তিনি আমাদের কালের লব্ধকাম গল্প-শিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের চেয়ে আমূল পৃথক।" তাহলে উপেন্দ্রনাথকে শরৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা কেন? কারণ উপেন্দ্রনাথ ছিলেন শরৎচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ জ্ঞাতি মাতুল এবং কিশোর কালে শরৎচন্দ্র নাকি উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক গুরুর আসন দখল করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে কি কখনও সাহিত্যগত সম্পর্ক নির্ণয় করা সংগত? এর পরে ডক্টর চৌধুরী এক স্থানে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে খানিকটা উদ্ধার করে বলেছেন, "এই কলা-সংযম আর মার্জিত বুদ্ধি ও রুচির শালীনতায় উপেন্দ্রনাথ অসংশয়ে রবীন্দ্র-মনোধর্মের সফল উত্তরাধিকারী। সেই সংগে তাঁর অনন্য শিল্প-স্বভাব রবীন্দ্রানুসারীদের থেকে তাঁর আসনকে পৃথক পংক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ে উপেন্দ্রনাথকে একজন স্বভাব-গাল্পিক বলা যেতে পারে।"

ডক্টর চৌধুরীর বিচার থেকে যে-বাক্যগুলোকে উদ্ধার করেছি সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়: (১) উপেন্দ্রনাথ শরৎ-গোষ্ঠীর লেখক, তবে তাঁর প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; (২) বুদ্ধি ও রুচির শালীনতায় উপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী, তবে শিল্প-স্বভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাঁর সে স্বাতন্ত্র্য হলো স্বভাব-গাল্পিকতায়। ডক্টর চৌধুরী তাঁর

গ্রন্থে পাদটীকা দিয়ে লিখেছেন : "এ-রচনাটি উপেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় লিখিত হয়; তাঁর ভালও লেগেছিল খুব। সেই পুণ্যস্মৃতির স্মরণে লেখাটি অপরিবর্তিত রইল।" উত্তম কথা।

বিখ্যাত বিদ্বানগণ উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যের যে-আলোচনা করেছেন তা বিশদ ভাবে জানতে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা ওইসব বৃহদাকার সমালোচনাগ্রন্থগুলি কষ্ট করে পড়বেন এবং বহু বিদ্যা লাভ করবেন। তবে যাঁরা সাহিত্য ভালোবাসেন, যাঁরা রসের পিপাসী, যারা আনন্দের সন্ধানী তাঁরা যদি পরের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজের চোখ ও বোধ দিয়ে উপেন্দ্রনাথেরই রচনা পাঠ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আরও বেশি মূল্যবান বস্তু লাভ করবেন। সেইসব সাহিত্যপাঠকের জন্যে আপাতত এই খণ্ডে উপেন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস ও একটি গল্পগ্রন্থ অখণ্ড আকারে এবং "স্মৃতিকথা'র অংশ বিশেষ রইল। উপেন্দ্রনাথের রচনার কোনও নতুন মূল্যায়নের আপাতত প্রয়োজন নেই, কেন না আশা করি যে পাঠক স্বয়ং সে-মূল্যায়ন করে নেবেন।

তবে পাঠকের বিচারে কিছু প্ররোচনা জোগাবার উদ্দেশ্যে এখানে দু-একটি কথা নিবেদন করি।

সাহিত্যে কেউ বা জীবন সমালোচনা, কেউ বা সমাজ বাস্তবতা, কেউ বা অন্য-কিছু প্রত্যাশা করেন। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসটি পড়তে শুরু করলে কোন জিনিসটা সবচেয়ে প্রকট রূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? এক-একজন পাঠক এর এক-একরকম উত্তর দেবেন। আমি এর উত্তরে বলব— উপন্যাসের গঠন-শৈলী। 'অভিজ্ঞানে'র প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে নবদম্পতীর প্রথম মিলনের উল্লাস-উচ্ছল সুখচিত্র দিয়ে; শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিয়েছেন নায়িকার ভীতিকাতর হৃদয় আর নায়কের প্রত্যয়ে সবল চরিত্রের কথা; আর ওই পরিপূর্ণ সুখচিত্রের মধ্যে একটি বিন্দুর মতো গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার ভাগ্য বিপর্যয়ের ইঙ্গিত—যেসব অমনোযোগী পাঠক ওই ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করবেন তাঁরাও পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রবাহ অনায়াসে অনুধাবন করতে পারবেন আর যাঁরা ইঙ্গিতটাকে ধরতে পারবেন তাঁরা শুরু থেকেই আসন্ন বিপর্যয়ের কল্পনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে দুর্গম পথে কাহিনীর আরোহণ শুরু হয়েছে এবং বিপর্যয়ের প্রথম শিখরে পৌঁছে গেছে তৃতীয় পরিচ্ছেদেই। তারপর থেকে কাহিনী পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে চলেছে বিশাল পর্বতমালার শিখর থেকে শিখরে ধারাবাহিক অবরোহণ ও আরোহণের মতো; পরবর্তী ঘটনার জন্যে উদগ্র কৌতূহল জাগ্রত করে সমাপ্ত হয়েছে প্রত্যেক পরিচ্ছেদ। তারপর কাহিনী শুধু ক্রমাগত পতন ও উত্থানেই আন্দোলিত হয়নি, দুর্দম জলস্রোতের মতো চক্রাকারে পুনঃপুনঃ আবর্তিতও হয়েছে, আবার প্রত্যেক আবর্তনের পরেই রয়েছে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময়। 'অভিজ্ঞানে'র মতো বিরাট উপন্যাসের কোনখানে কাহিনী ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে অথবা বর্ণনার বিস্তার

অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ হয়েছে তা খুঁজে বের করা ছিদ্রান্বেষী পাঠকদের পক্ষেও দুঃসাধ্য। নানামুখী ঘটনার এরকম জটিল টানাপোড়েনে এমন কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বাংলায় আর কী আছে তা পাঠকদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

ঘটনার পরে চরিত্রের রূপায়ন কী ভাবে করা হয়েছে তা বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য। অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে সযত্নে ও সুরক্ষণায় এর নায়িকা লালিত হয়েছে, শ্বশুরালয়ে তার প্রতি যত্নের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে আর স্বামীর প্রেমে সে আরও বিগলিত ও কৃতার্থ হয়েছে, কিন্তু অকল্পনীয় সব ঘটনার পর ঘটনার প্রেষণে তার অপরিণত চরিত্র আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ নতুন আকার ধারণ করেছে, কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অকল্পনীয় পরিণত ও দৃঢ় রূপ লাভ করেছে। বাংলা উপন্যাসের আর কতগুলি নারী চরিত্রের নাম করতে পারি যাদের এমন অমোঘ ও মৌল বিবর্তনকে ঔপন্যাসিক পাঠকের চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে উন্মোচন করেছেন? নায়িকার প্রতি শ্বশুরের অবিচার আর তার স্বামীর কাপুরুষোচিত আচরণে আজকের পাঠকের ক্রোধ যেমন উদ্দীপিত হয় তৎকালের পাঠকদেরও তেমনই হতো; কিন্তু যেকালের ভিত্তিতে একাহিনীকে লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে শ্বশুর বা স্বামীর কাউকেই দুষ্টগ্রহ বলতে পারিনে, শুধু এটুকু বলতে পারি নায়িকার পিতা-ই যেখানে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের যূপকাষ্ঠে মেয়েকে বলি দিতে প্রস্তুত সেখানে শ্বশুরবাড়িকে আমরা অপরাধী করতে পারি না আর সেকালের কথা মনে রাখলে তাদের অসহায় অবস্থাকেই বরং স্পষ্ট করে বোঝা এবং এখানে অন্তত আমার সহানুভূতি স্ত্রী ও স্বামী দুজনের মধ্যেই দ্বিধান্বিত যায়। এখানে দোষী করতে হলে ব্যক্তি বিশেষকে দোষী না করে সেই সমাজকেই দোষী করতে হয় যা বিপদকে প্রতিরোধ করতে পারে না কিন্তু বিপন্নকে অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারে। আর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লুণ্ঠক সম্প্রদায়—হিংস্রতা ও স্নেহের, মহত্ত্ব ও বর্বরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখানো হয়েছে এদের চরিত্রে। আর সবশেষে নায়িকার জীবনে আবির্ভূত সেই দুষ্টগ্রহের চরিত্রটির স্বরূপ অনুধাবন করলে প্রশ্ন জাগে যে সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এরূপ আলো-ছায়া শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে জটিল চরিত্র আর আছে কি? লেখক এখানে চরিত্র সৃষ্টিতে যে-অন্তর্দৃষ্টি আর বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা কোথায়? এই চরিত্রটিকে যে এক মুহূর্তের জন্যে-ও অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না এটুকু ছাড়া এই বিশাল উপন্যাসে অস্বাভাবিকতার কোনও অসতর্ক অভিব্যক্তি দেখা যায় কি?

অতঃপর বিবেচ্য হলো এই উপন্যাসের সামাজিক তাৎপর্য। বঙ্কিমচন্দ্র কেন প্রতাপ-শৈবলিনীর মিলন ঘটাননি তা নিয়ে শরৎচন্দ্রের তীব্র অভিযোগ ছিল; শরৎচন্দ্র নিজে কিন্তু বাল্যপ্রণয় অভিশপ্ত মনে করে দেবদাস পার্বতীর মিলন ঘটাতে পারেননি এবং সামাজিক আদর্শ মেনে রমা-রমেশের মিলনকেও সঙ্গত মনে করেননি—বরং সামাজিক সংস্কারের বাধা ভেঙেছিল যে কিরণময়ী তাঁর পরিণাম যে কী ভয়ংকর সেটাকেই তিনি নির্দয় সমাজপতির দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন

করেছেন, গৃহদাহে অচলাকে যেভাবেই হোক ফিরিয়ে এনেছেন আবার সেই স্বামী মহিমের কাছে ; সামাজিক সমালোচনার চাপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কাহিনীকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছেন প্রথাসিদ্ধ আদর্শের অনুসারী করে এবং 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী' ও 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পে আর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধগুলিতে প্রতিস্পর্ধা জানিয়েছেন সত্য কিন্তু এই রচনাগুলোর মধ্যে উপন্যাসটিকে তো শেষ করতেই পারেননি। সত্যি বলতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব যেসব অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিক বিদ্রোহের জয়ধ্বনি তুলেছিলেন তাঁরা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগত বিদ্রোহের উর্ধ্বে ওঠার কমই চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের সেই বিদ্রোহকে কোনও সামাজিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ করেননি—তাঁদের বিদ্রোহ নিতান্তই যেন এক সৃষ্টিছাড়া মানুষের আর দশটা সৃষ্টিছাড়া কাজের মতোই আর একটা সৃষ্টিছাড়া কাজ যার দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রবোধকুমার সান্যালের মতো ঔপন্যাসিকদের রচনায়। কিন্তু 'অভিজ্ঞানে' প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে নায়িকা যে বিদ্রোহ করেছে তা একান্তরূপেই কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহের থেকে অনিবার্যরূপেই উদ্ভূত, তার মধ্যে না আছে কোনও অস্বাভাবিকতা, না, কোনও ভাবোচ্ছ্বাসের আড়ম্বর, না কোনও আরোপিত বা আকস্মিকভাবে লব্ধ আদর্শবাদ, তার বিদ্রোহের সবটাই অবিচ্ছেদ্য কার্যকারণের সূত্র ধরে একটি চরিত্রের সুসঙ্গত পরিণতি। ঐতিহ্য ও প্রচলিত নিয়ম, দেশাচার ও সামাজিক সংস্কারকে ভেঙে উৎকৃষ্টতর যুক্তি-বিচার ও মানসিক-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আধুনিক সাহিত্যের যে আন্দোলন তার এমন সার্থক প্রকাশ অন্নদাশঙ্কর রায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আর আর কোন্ উপন্যাসে হয়েছে ?

ঘটনার উদ্ভাবনে ও বর্ণাঢ্যতায়, বহুমাত্রিক বিমিশ্র মানসিকতার চরিত্র সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে, বহুস্তরযুক্ত জীবনের চিত্রাঙ্কনে উপেন্দ্রনাথ যে-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্য থেকে খুঁজে বের করতে একালের পাঠকদেরই অনুরোধ করি।

কিন্তু আরও একটি জিনিস আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে : সেটি হলো ভবিতব্য আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবিরাম টানাপোড়েন। স্বামী প্রিয়লাল নিশ্চিত রূপেই স্ত্রী সন্ধ্যার প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত, কিন্তু উপন্যাসের শুরুতে তার যে চারিত্রিক সবলতা প্রকাশ পায় ঘটনাচক্রের প্রভাবে তা ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে আর তার পরিণামে স্ত্রী সন্ধ্যা নিরুপায় ভাবে ভবিতব্যের স্রোতে ভেসে চলে, কিন্তু এভাবে ভেসে যেতে যেতেই সে স্রোতের মধ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কৌশল শেখে আর ভবিতব্যের উর্ধ্বে নিজের বিচার ও ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার শক্তি অর্জন করে। শুধু তা-ই নয়, প্রমথর মতো শিথিল চরিত্রের ব্যক্তিকেও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য রূপে গড়ে তোলে এক বিকাশশীল ব্যক্তিতে এবং এই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিকেরই সৃষ্টি। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকেছে, কিন্তু তাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে—কাহিনীর অন্তিমপর্বে যখন জীবনের সঙ্গী

নির্বাচনের প্রশ্ন সন্ধ্যার সামনে উপস্থিত হয়েছে সে তখন প্রিয়লালকে নয়, প্রমথকেই নির্বাচন করেছে। যদি বলি, প্রিয়লাল ভবিতব্যের হাতে ক্রীড়নক আর সন্ধ্যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তাহলে যে-প্রমথ শুরুতে ছিল ভবিতব্যের দূত সে-ই কি পরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক দর্শনীয় শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়নি?

এই প্রসঙ্গে 'অভিজ্ঞানে'র আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে-বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যিক গুণাগুণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়, কিন্তু তলিয়ে দেখলে মানতে হবে যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আবশ্যিক রূপেই জড়িত। এই বৈশিষ্ট্যটি উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্বৃত্তরা সন্ধ্যাকে লুঠ করে নিয়ে এল তাদের অড্ডায়, সেখানে তাকে বন্দিনী রাখল বেশ কিছুকাল এবং পরে তাদেরই কেউ কেউ তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিল। এই দুর্বৃত্তদের ধর্মীয় পরিচয় কী? অসতর্ক পাঠক এর উত্তরে বলে বসতে পারেন, মুসলমান। কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে এখানে দুর্বৃত্তদের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চাওয়াটাই নির্বুদ্ধিতা, সন্ধ্যাকে যারা লুঠ করেছিল তাদের মধ্যে সন্ধ্যা ও প্রিয়লালের রক্ষক রূপে নিযুক্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী রঘু-ও ছিল আবার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মহবুব-ও ছিল, প্রকৃতপক্ষে দুর্বুদ্ধি আর দুর্বৃত্তি-ই তাদের ধর্ম। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজের যে-চিত্র উপেন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাতে দেখি যে গফুর ও মহবুব দুজনেই সহোদর আর দুজনেই দুর্বৃত্ত, তবুও তাদের দুজনের প্রকৃতি দুরকম। এসঙ্গে একথাও মনে রাখা সমীচীন যে 'অভিজ্ঞান' যখন লেখা হয় তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধের রাজনীতি এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং শরৎচন্দ্র মুসলমানদের প্রতি ধিক্কারে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি থেকে (শরৎচন্দ্র রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য), তাছাড়া ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তিন-তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতা এমন ঘৃণ্য রূপে আত্ম-প্রকাশ করে যার ফলে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ রচনায় উৎসাহিত হন এবং ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস রূপ নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত হয় ১৯৩৫-এর ভারত আইনে। তার পরের বছরেই 'অভিজ্ঞান' প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। এটাই স্বাভাবিক ছিল যে তৎকালীন সাহিত্যের একটা বিরাট অংশের মতো এই উপন্যাসটিতেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গ হয় একেবারে বাদ দেওয়া হবে আর নতুবা তাঁদেরকে আঁকা হবে বিদ্বেষের কালো রঙে। এটা লক্ষণায় যে উপেন্দ্রনাথ এর কোনটাই করেননি—' নিম্নশ্রেণীর জীবনের যে-চিত্র উপেন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন তার পেছনে কোনও উদার আদর্শবাদ প্রচারের অভিপ্রায় নেই যা আছে তা উচ্চতর সাহিত্যের পক্ষপাতহীনতায় ও সমদর্শিতায় বিশিষ্ট। আমি মনে করি যে রঘু, মহবুব, গফুর, ইয়াসিন প্রভৃতি দুর্বৃত্তপক্ষের চরিত্রগুলি পরিস্ফুটনে উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সত্তা প্রকৃত মহত্ত্বে উন্নীত হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিচার করার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই। তবে একথা তো সবারই জানা যে বাঙালী বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি এবং উপেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাবলী যখন প্রকাশকদের দৌলতে দুষ্প্রাপ্য সাহিত্যে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে তখন অনেক ছাত্রছাত্রীই শুধু সমালোচকদের মন্তব্য পরিপাক করেই পরিতুষ্ট থাকবেন। তাঁদের সুবিধার্থে আর একজন বিদ্বান সমালোচকের সিদ্ধান্ত এখানে উদ্ধার করছি। 'উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটির ভূমিকাতে সম্পাদক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "জীবনাশ্রয়ী শিল্পসৃষ্টি মূলত দু' জাতের—সমালোচনপন্থী আর উন্মীলনপন্থী। সমালোচনপন্থী শিল্পে জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শিল্পীর মনোভাব সেখানে স্পষ্টোচ্চারিত। নরনারীর দুঃখবেদনার মূলে সমাজের যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ও অন্যায় বিধিবিধান রয়েছে তার বিরুদ্ধে দ্রষ্টার বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে, কখনো কখনো তা প্রচণ্ড বিদ্রোহের রূপ নিয়েও দেখা দেয়। স্বভাবতই সামাজিক চিত্তের বিক্ষুব্ধ বাসনা-বেদনাগুলি শক্তিশালী শিল্পীর লেখনী মুখে সাকার হতে দেখে পরিতৃপ্ত পাঠকসমাজ দরদী স্রষ্টাকে মাল্যচন্দন দিয়ে সদ্য-সদ্য বরণ করে নেয়। লোকপ্রিয়তার দিক দিয়ে তাই সমালোচনপন্থী শিল্পেই সাফল্যলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। শাণিত ভাষণের তীক্ষ্ণ আঘাতে উচ্চকিত পাঠকসমাজে প্রতিবেদন সৃষ্টি করা কঠিন নয়। কিন্তু উন্মীলনপন্থী শিল্পীর সাধনা অন্য গ্রামের। নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে ব'সে নিরুদ্বিগ্ন মনে শুভে-অশুভে-স্থাপিত বিষামৃতময় জীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং তার সুগভীর রহস্যকে আপন স্বরূপে উন্মীলিত ক'রে তোলার শিল্পকর্ম নিভৃতচারী নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যেই জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে স্রষ্টা জীবন রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে অদৃশ্যলোক থেকেই রহস্যের যবনিকা তুলে ধরেন। নিজেকে সৃষ্টির অন্তরালে রেখে শিল্প সৌন্দর্যকে জীবনবৃন্তে বিকশিত হতে দেওয়ার এই রীতিই বিশুদ্ধতর শিল্পরীতি ব'লে বিদগ্ধ রসিকসমাজ স্বীকার ক'রে থাকেন। কেননা, শিল্পলোকের শান্ত ও সমাহিত পরিবেশে জীবনের উত্তাপ নয়, জীবনের আলোকই রসিকজনের কাম্য।" এর পরে অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর রায় ঘোষণা করেছেন, "বাংলা-কথাসাহিত্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শেষোক্ত দলের শিল্পী। উন্মীলনপন্থাই তাঁর শিল্পপন্থা।"

এই সব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পড়তে পড়তে আমরা সহজেই বুঝে ফেলি যে উপেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে কত বিশুদ্ধতর শিল্পরীতির চর্চা করে গেছেন। তবে 'স্মৃতি-কথা'র প্রথম পর্বের সূচনাতেই উপেন্দ্রনাথ বলেছেন যে আনন্দ দান করাই তাঁর রচনার উদ্দেশ্য; আর অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন যে সাহিত্যের "অন্তরে সত্যিকারের রস-সম্পদ কিছু থাক" এইটেই উপেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। এর সঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ভাষাতে "নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে ব'সে নিরুদ্বিগ্ন মনে শুভে-অশুভে স্থাপিত বিষামৃতময় জীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং তার সুগভীর রহস্যকে আপন স্বরূপে উন্মীলিত ক'রে তোলার শিল্পকর্মে"-র আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা

বিচারের দায়িত্ব আমি সেই সব পাঠকপাঠিকাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি যাঁদের কথা ভেবে, যাঁদের সঙ্গে মনের ও রুচির যোগ স্থাপনের জন্যে, যাঁদের তৃপ্তি সাধনের জন্যে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চা করতেন। একথা ভাবা সত্যিই ভুল হবে যে তিনি অপেক্ষাকৃত মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্যেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে বিশুদ্ধতর শিল্পরীতির অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে 'বৈতানিকে'র ছোটগল্পগুলি পড়লেই পাঠকেরা বুঝবেন যে নিছক গল্প শোনার যে আগ্রহ মানব-সমাজের শৈশবকাল থেকে চলে আসছে, সেই আগ্রহকে ষোল আনা মিটিয়ে দেওয়ার অদ্ভুত নৈপুণ্য গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং শুধু সেইটেই তার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর গল্প শুধুই গল্প—এইটেই তাঁর গল্পের দোষ আবার এইটেই তাঁর গল্পের গুণ। এর মধ্যে মধ্যে জীবনের গভীরতর সত্যের বা ভবিতব্যের যে-বিদ্যুৎ ঝলক আছে তা লেখকের অনভিপ্রেত নয়, কিন্তু আকস্মিক এবং তাতেই গল্পগুলির আকর্ষণ ও চমৎকারিত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করি।

আগুন সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে একটি দেশলাই কাঠি জেলে ধরলে আগুন জিনিসটা যে কী তা আরও সার্থকভাবে বোঝানো সম্ভব হবে। সেজন্যেই এই গ্রন্থের শুরুতে সম্পাদকীয় না দিয়ে গ্রন্থের শেষে দিয়েছি, পাঠক যাতে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মনে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে উপেন্দ্র-সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধানে নিজেই অগ্রসর হতে পারেন; আর একথা কে না জানে যে পাঠকের বিচারই শেষ বিচার। যে-পাঠক উপেন্দ্রনাথের রচনা পাঠের পরে উপেন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ কী মনে করেন না করেন তা জানতে আগ্রহী তাঁদের সে-আগ্রহ মেটাবার জন্যেই এই সম্পাদকীয়ের অবতারণা।

এই সম্পাদকীয়ের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে: সেটি হলো, পাঠকের কাছে বানানের অসংগতির জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়া। উপেন্দ্রনাথ নিজেই কোনও বইয়ে বানানের সংগতি রাখেননি এই কথা বলে এই খণ্ডে বানানের অসংগতির দোষ স্খালনের চেষ্টা করে আসল ত্রুটি ঢাকা যায় না। যে-ধরনের বিপুল সংগঠনে এধরনের রচনাসমগ্রের সুষ্ঠু সম্পাদনা সম্ভব সে-ধরনের সংগঠন আমাদের ছিল না। তবে এই রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের রূপের সঙ্গে উপস্থাপিত রূপের তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে এই সংগতি রক্ষার চেষ্টা কতদূর করা হয়েছে; পরবর্তী মুদ্রণের সময় এই চেষ্টা আরও ফলবতী হবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর উপেন্দ্র-সাহিত্যে পাঠকের মনোরঞ্জনের এতরকম আয়োজন এমন নিখুঁতভাবে করা আছে, যার অনেকটাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবনী প্রতিভা: পরিণাম, যে, বহিরঙ্গের দোষত্রুটি তার কাছে আপনা থেকেই নগণ্য হয়ে যায়।